উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি
২য় বর্ষ-
১২৯৯

প্রতিনিধি

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রতিনিধির আত্মকথা।

স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় কালস্রোত একই নিয়মে অবিরাম গতিতে অনন্তকাল-সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। কোন্ অনাদি উৎস হইতে এই কালস্রোতের উৎপত্তি, কোন্ অনন্ত বারিধিতে ইহার নিবৃত্তি, অদ্যাবধি তাহা নির্ণীত হয় নাই। অনুপল-বিপল-পল, দণ্ড-মুহূর্ত্ত-প্রহর, দিবা-রাত্রি-সপ্তাহ, পক্ষ-মাস-ঋতু, অয়ন-বৎসর-শতাব্দী, যুগ-মন্বন্তর-কল্প এই অসীম কাল-প্রবাহের উচ্ছ্বাস ও তরঙ্গ। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র পদার্থ এবং ব্রীড়াকুণ্ঠিতা-অবগুণ্ঠনবতী নববধূর অধরপ্রান্তস্থিত ঈষদ্ধাস্য হইতে গভীর আরাবী বজ্রনির্ঘোষ, ক্ষুদ্রবপুঃ শিশুর হাস্যোদ্দীপক কলহ হইতে ভীমকায় দেবাসুরের প্রলয়কারী যুদ্ধ ও দীনহীন দরিদ্রের নগণ্য উৎসব হইতে দেবরাজ শতক্রতুর শত অশ্বমেধ পর্য্যন্ত অসংখ্য অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলী জীবহৃদয়ে ভীতি প্রীতি ও বিস্ময়ের সঞ্চার করতঃ এই তরঙ্গোচ্ছ্বাসে পতিত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে নিয়তিচক্রের আবর্ত্তন ক্রমে ও কাল-ধর্ম্মবশে সময়-স্রোতের অতলতলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

সন ১২৯৮ সাল অনন্ত কালপ্রবাহের একটী ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র। কোটি কোটি পদার্থ নিচয়ের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র উড়ুপ সদৃশ প্রতিনিধি এই তরঙ্গে পতিত হইয়া বহু আয়াসে ইহার অভিঘাত সহ্য করতঃ পরবর্ত্তী তরঙ্গে পতিত হইতে চলিল। বর্ত্তমান ১২৯৯ সাল প্রতিনিধির পক্ষে দ্বিতীয় তরঙ্গ। প্রতিনিধি এই দ্বিতীয় তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে কি না, তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভূতভাবন ভগবানই বলিতে পারেন। যে কালস্রোতের উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়া, বঙ্কিমচন্দ্র, যোগীন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি সুদক্ষ নাবিকের সতর্ক পরিচালন সত্ত্বেও বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, প্রচার, নবজীবনরূপ মহা মহা অর্ণবযান সমূহও নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, সেই তরঙ্গে প্রতিনিধিরূপ ক্ষুদ্র ভেলা ভাসমান, ক্ষুদ্রশক্তি আমরা সেই ভেলার কর্ণধার। ভগবানের কৃপা ব্যতীত সাধ্য কি আমাদের, নিমজ্জন হইতে আমরা ইহাকে রক্ষা করি।

প্রতিনিধি নববর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল। বিগত বর্ষে প্রতিনিধিকে বড়ই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে। এ বৎসরেও সেই বিড়ম্বনা ঘটিতে পারে, পাছে গ্রাহক ও পাঠকবর্গ এই

সন্দেহ করিয়া প্রতিনিধির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন, এই আশঙ্কায় প্রতিনিধির গত জীবনের কার্য্যাবলী সমালোচনা করিয়া উক্ত বিভ্রাটের কারণ প্রদর্শন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কিন্তু প্রতিনিধির দোষগুণের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই ধর্ম্ম-মত-বিপ্লব সময়ে প্রতিনিধির লক্ষ্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সার এবং সত্য মত প্রচার করাই প্রতিনিধির প্রধান লক্ষ্য। প্রতিনিধি অন্য ধর্ম্ম ও সমাজের কদাচ বিপক্ষ বা নিন্দুক নহে, তবে হিন্দুর পত্র বলিয়া প্রতিনিধি প্রধানতঃ হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের গৌরবগান করাকেই আপনার জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করে। যাহা হিন্দু ধর্ম্মের বা হিন্দু সমাজের অনুমোদিত নহে, তাহা প্রতিনিধি কদাচ সমর্থন করিবে না। কিন্তু সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে সম্প্রদায়ভেদে ধর্ম্ম ও সমাজ নীতি সম্বন্ধে যত প্রকার মত আছে, তাহা পরস্পর বিরোধী হইলেও একমাত্র সত্য আবিষ্কারের জন্য বাদ-প্রতিবাদচ্ছলে আলোচনা করিতে প্রতিনিধি কখনই কুণ্ঠিত হইবে না। এই কথাটার মূলেই যত গোল, সুতরাং এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশদ-ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছি।

বিশাল হিন্দুশাস্ত্রে কি ব্রহ্মতত্ত্ব, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি সমাজতত্ত্ব যে সম্বন্ধেই হউক না কেন, যখন যিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি প্রমাণ ও বচন অনুসন্ধান করিবেন, উদার শাস্ত্র কখনই তাঁহাকে বিমুখ করিবেন না। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা যে শাস্ত্রের বিধি, সাকার ঈশ্বরের পূজাও সেই শাস্ত্রেরই বিধান; "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" যে শাস্ত্রের উক্তি, পশুবলিও সেই শাস্ত্রেরই অনুমোদিত; নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্য যে শাস্ত্রের মতে পালনীয়, সকাম বিধবা-বিবাহও সেই শাস্ত্রের মতেই করণীয়; যে শাস্ত্র অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণকে আদর করিতে পরামর্শ প্রদান করে, সেই শাস্ত্রই ম্লেচ্ছান্নভোজী পরমহংসকে পূজা করিতে উপদেশ দেয়; আদ্য ঋতুতে গর্ভাধান করিতে যে শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ আজ্ঞা প্রদান করে, ঊনষোড়ষী রমণীর সহিত সহবাস করিতে সেই শাস্ত্রই পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া থাকে। এইরূপ পরস্পর বিরোধী মত একই হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত। স্থূল দৃষ্টিতে এই সব মতে বিরোধ দৃষ্ট হইলেও দেশ-কাল-পাত্রভেদে সকল গুলিই যুক্তিযুক্ত ও পালনীয়। ইহার একটীকে ত্যাগ করিয়া অপরটীকে মানিতে গেলে হিন্দুশাস্ত্রের অবমাননা করা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রতিনিধি হিন্দুর পত্র, সুতরাং নিরপেক্ষভাবে সত্য নির্দ্দেশের জন্য হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত সকল তত্ত্বেরই আলোচনা করিবে। কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য্য যে, ঐ সকল পরস্পরবিরোধী মত হিন্দুশাস্ত্র সম্মত হইলেও গুণ ও ফলভেদে কোনটী বা উৎকৃষ্ট কোনটী বা নিকৃষ্ট। হিন্দু শাস্ত্রের সম্মান রক্ষার জন্য নিকৃষ্ট মতটীর বিপক্ষ না হইলেও, প্রতিনিধি অবশ্য উৎকৃষ্ট মতটীর পক্ষপাতী ইহা নিঃসন্দেহ।

আরও এক কথা, স্বর্গ অপেক্ষা নরক নিকৃষ্ট হইলেও প্রয়োজনানুসারে উভয়ই একই সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি। ঈশ্বরের নিকটে উভয়েরই আবশ্যকতা সমান। সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা বিধবা-বিবাহ নিকৃষ্ট হইলেও দেশ-কাল-পাত্রভেদে প্রয়োজনানুরোধে উভয়ই একই হিন্দুশাস্ত্র কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ। দিবার উজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শন করিতে হইলে যেমন রাত্রির তামসী মূর্ত্তি অঙ্কন করিতে হয়, ময়ূখমালী মার্ত্তণ্ডদেবের প্রচণ্ড মূর্ত্তি না দেখিলে যেমন কৌমুদী-নিধান কুমুদনাথের সৌম্যভাব সুন্দররূপে অনুভূত হয় না, পূতিগন্ধময় নরকের চিত্র আঁকিয়া না দেখাইলে যেমন মলয়-নিলয়-প্রবাহিত স্বর্গের চ্ছবি পরিস্ফুট হয় না, সেইরূপ সকাম বিধবাবিবাহের আলোচনা না করিলে নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব ও পবিত্রতা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয় না। এই কারণেই প্রতিনিধি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত তত্ত্বসমূহ পরস্পরের মত বিরোধী হইলেও বাদ-প্রতিবাদ আকারে আলোচনা করিবে। তাহাতে যেন কেহ প্রতিনিধিকে সমাজবিরোধী দেশাচারবিরোধী অহিন্দু নাস্তিক মনে না করেন। সাম্প্রদায়িক মতনির্ব্বিশেষে হিন্দুশাস্ত্রের সত্য ও সার আদেশ প্রচার করাই প্রতিনিধির প্রধান লক্ষ্য।

এক্ষণে মূলবিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত হওয়া যাউক। প্রতিনিধির দোষ গুণ প্রদর্শন করিতে গেলে, প্রথমতঃ প্রতিনিধি যে উদ্দেশ্যাবলম্বন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এ পর্য্যন্ত প্রতিনিধি তৎ প্রতিপালনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহাই প্রদর্শন করিতে হইবে।

প্রতিনিধির উদ্দেশ্য ত্রিবিধ। সে উদ্দেশ্যের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বহুবার প্রদান করা গিয়াছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

১ম। উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহ।

২য়। সমাজ সংস্কারার্থ উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সামাজিক বিষয় লইয়া আন্দোলন।

৩য়। সাধারণ পাঠকের ও উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ।

প্রথম বর্ষের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক উক্ত ত্রিবিধ উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইয়াছে দেখা যাউক। প্রথম উদ্দেশ্য প্রতিনিধি গত বর্ষে কিছুই সাধন করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই, তাহা গত কার্ত্তিকের সংখ্যাতে "আমাদের উদ্দেশ্য কি?" শীর্ষক প্রবন্ধে বলা গিয়াছে। বোধ হয় সেই অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। "প্রথম কার্য্যে অর্থাৎ জাতীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহে প্রতিনিধি আজিও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কেন পারে নাই, স্থিরচিত্তে এ কার্য্যটীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। আজ কাল কল্পনা বলে বা কিম্বদন্তীর সাহায্য লইয়া জাতীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করা বড় কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু আমাদেরত পাঠক ভুলান ইচ্ছা নাই। যাহাতে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির প্রকৃত ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হয়, আমাদের তাহাই বাসনা রহিয়াছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হওয়া কি বড় সহজ? একেত কোন জাতিরই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিবৃত্ত হইতে পারে কি না সন্দেহ! বঙ্গদেশের মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতি সর্ব্বজাতি অপেক্ষা সভ্য। আবহমানকাল হইতে ইহাঁদের সমুদয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের যে পঞ্চজন আদিপুরুষ এ দেশে আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের নামাবলম্বনে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্ত রচিত হইয়াছে, গ্রন্থান্তরের কথা মানিতে গেলে ঐ নামের ব্রাহ্মণ কেহ এ দেশে আইসেন নাই; তাঁহাদের নাম ঐ পঞ্চ নাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।* যাঁহারা আপনাদের অবস্থা লিখিয়া পড়িয়া রাখিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের দশাই যদি এইরূপ, তবে আমাদের জাতির যখন কোনই লিখিত বিবরণ এপর্য্যন্ত আমা-

* এ সম্বন্ধে আমাদের জনৈক বন্ধু একটী বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা সময়ে প্রতিনিধিতে প্রকাশিত হইবে।

দের কিম্বা আমাদের পরিচিত কোন বন্ধু-বান্ধবেরই চক্ষুঃগোচর হয় নাই, তখন ভাবুন, আমাদের উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির ইতিহাস সংগ্রহ কত কঠিন ব্যাপার। আমাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইলে, কতকগুলি মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ক্রয়, প্রাচীন রাজসংসারের দপ্তরখানা তল্লাস, উগ্রক্ষত্রিয় জাতির আদিম বাসস্থানে গমন করিয়া তথ্য অনুসন্ধান ইত্যাদি কত ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ কার্য্যের প্রয়োজন, তাহা একবার সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রতিনিধির সেরূপ অর্থ ও সময় আজিও হয় নাই। পাঠকবর্গ একটু ধীর হইয়া সময় প্রতীক্ষা করুন, যদি প্রতিনিধি জীবিত থাকে তবে জাতীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে অবশ্যই প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।"

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা স্বয়ং কোন কথাই বলিব না। উগ্রক্ষত্রিয়-সমাজের স্বার্থ সাধনে প্রতিনিধি কিরূপ কার্য্য করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সুযোগ্য বিজ্ঞ সহযোগী ইণ্ডিয়ান মিরার যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে। মিরর বলিয়াছেন—

"The treble number of the Ugrakshetriya-Pratinidhi which *mainly* represnts the interests of the Ugrakshetriya Community, contains a large number of papers bearing on social religious and literary subjects" ইহার ভাবার্থ এই যে, উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধিতে প্রধানতঃ উগ্রক্ষত্রিয়-সমাজের স্বার্থ-সূচক প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়। ইহাতে ধর্ম্ম, সমাজ এবং সাহিত্য বিষয়ক বহুবিধ প্রবন্ধাদিও আলোচিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিনিধি বোধ হয় সাধ্যানুসারে ত্রুটি করে নাই। যখন নবীনা সহযোগিনী "প্রকৃতি" বলিয়াছেন "বিষয় নির্ব্বাচনে, লিপিচাতুর্য্য, গবেষণায়, উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি প্রশংসার্হ। আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।" তখন আমাদের আর কি বলিবার আছে?

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রতিনিধির অনুকূলে। এক্ষণে দেখা যাউক প্রতিনিধির প্রতিকূলে কিছু বলিবার আছে কিনা?

প্রতিনিধির প্রথম এবং প্রধান দোষের মধ্যে অনিয়মিতরূপে প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ প্রতিনিধিতে যে সকল প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রতিনিধির পাঠকবর্গকে তুল্যরূপে সন্তোষ প্রদান করিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ জন্মভূমি প্রভৃতি ২।১ খানি মাসিক পত্রিকার তুলনায় প্রতিনিধির মূল্য কিছু বেশী।

প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে প্রতিনিধির পক্ষে এইমাত্র বলিবার আছে যে, প্রতিনিধি ব্যবসায়ের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং প্রতিনিধি পরিচালনের জন্য পরিমিত মূলধনও সংগৃহীত হয় নাই। প্রধানতঃ উগ্রক্ষত্রিয় গ্রাহকবর্গের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয়-পত্র প্রতিনিধি পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনায়, প্রতিনিধি যে সকল মহাত্মাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা যথা সময়ে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সাহায্য করিতে উদাসীন থাকায়, প্রতিনিধি প্রকাশ সম্বন্ধে অযথা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে প্রতিনিধির ভাগ্য পরিবর্ত্তন হওয়ায় বোধ হয়, অতঃপর আর প্রতিনিধিকে অনিয়মিতরূপে প্রকাশরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না।

প্রতিনিধির দ্বিতীয় অপরাধ সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে। প্রতিনিধি মাসিকপত্র। দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রের যে উদ্দেশ্য

মাসিক পত্রের তাহা নহে। মাসিক পত্রে নানা প্রকার গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। বিষয় যেরূপ গুরুতর, ভাষা ও ভাব তদনুরূপ হওয়া কর্ত্তব্য; হইয়াও থাকে তাহাই। পুরাতন বিষয়ের আলোচনাই মাসিক-পত্রের ব্রত। নূতন সংবাদ ইহাতে কিছুই থাকে না। সুতরাং সংবাদপ্রিয় পাঠকবর্গ প্রতিনিধি পাঠে তত আনন্দ অনুভব করিতে পারেন না। বিশেষতঃ পাঠকবর্গের মধ্যে সবাকার মত ও রুচি সমান নহে। এই বিভিন্ন রুচির বা বিভিন্ন মতের পাঠকবর্গকে সমানভাবে সন্তোষ প্রদান করা তরুণ-বয়স্ক নিরপেক্ষ প্রতিনিধির পক্ষে অতীব দুরূহ ব্যাপার। অর্থ ও প্রবন্ধ সংগ্রহ এই দুই দিক দেখিতে গেলে সংবাদপত্র পরিচালকের পক্ষে পত্রের সৌন্দর্য্য রক্ষা করা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে। প্রতিনিধির পরিচালকদিগকেও অত্যন্ত অর্থকৃচ্ছ্রতায় পড়িতে হইয়াছিল বলিয়া, ইচ্ছা ও আগ্রহ সত্ত্বেও প্রতিনিধিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন নাই। আশা হয়, এবারে প্রতিনিধি পাঠকবর্গকে সন্তোষ প্রদান করিতে অধিকতর সক্ষম হইবে।

প্রতিনিধির তৃতীয় দোষ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। বিবিধ প্রবন্ধপরিপূর্ণ ৯৪০ পৃষ্ঠার একখানি বৃহদায়তন মাসিকপত্রের ডাকমাশুল ২৲ দুই টাকা মূল্য অতিরিক্ত নহে। যেমন কয়েকখানি পত্রিকার তুলনায় ইহার মূল্য কিছু বেশী, সেইরূপ অপরাপর অনেকগুলি পত্রের তুলনায় ইহার মূল্য অনেক কম। আর এখানি যখন জাতীয়পত্র এবং কেবলমাত্র একটী জাতির উপরই ইহার অধিকাংশ আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে, তখন ২ টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ অসঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ এবারে প্রতিনিধির আকার আরও কিছু বৃদ্ধি হইবে।

উপসংহারে আমরা অতি আনন্দসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের মহামান্য "উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতি" বর্ত্তমান বর্ষ হইতে প্রতিনিধির প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিলেন। অতএব অতঃপর যখন অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘুচিল, তখন প্রতিনিধি যাহাতে সর্ব্ববিষয়েই উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া উগ্রক্ষত্রিয়-সমাজের মঙ্গলসাধন করিতে সক্ষম হয় তজ্জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিবে না। অতএব হে স্বসমাজহিতৈষী পাঠক ও গ্রাহক মহোদয়গণ! আপনারা প্রতিনিধিকে চিরস্থায়ী করিতে নববর্ষ হইতে কর্ত্তব্যানুরূপ সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হউন। সাধারণ শিক্ষিত সমাজের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনারা যদি প্রতিনিধিকে অপাঠ্য বিবেচনা করেন, তবে দূরে নিক্ষেপ করিবেন, দুঃখিত হইব না। কিন্তু ইহাতে যদি পাঠোপযোগী কিছু প্রাপ্ত হন, তবে কেবলমাত্র "উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি" এই নামের জন্য ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না; যেহেতু ইহা উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মুখপত্র হইলেও কার্য্যতঃ সাহিত্য বিষয়ক মাসিকপত্র। সুতরাং জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেরই সহানুভূতি পাইবার উপযুক্ত। অতএব আপনারাও প্রতিনিধির প্রতি সদয় হউন। আর তুমি হে করুণানিধান মঙ্গলময় বিধাতঃ! তুমিই প্রতিনিধির একমাত্র সহায়; তুমিই প্রতিনিধিকে সর্ব্বাপদ হইতে রক্ষা কর। হে অনন্তশক্তি! তুমি প্রতিনিধিকে নববল প্রদান কর—প্রতিনিধি যাহাতে উত্তরোত্তর নির্ব্বিরোধে দ্বিতীয় ও তৎপরবর্ত্তী তরঙ্গ সমূহ উত্তীর্ণ হইয়া তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়, তাহার বিধান কর।

বিবাহ ও স্ত্রীধন।

এই পরিদৃশ্যমান জীবসঙ্কুল জগতে মানব জাতি বিশ্বপতির অলৌকিক সৃষ্টির সারভূত হইয়া বিশ্বমাঝে জীবজগতের উপর আধিপত্য করিয়া বিচরণ করিতেছে। জ্ঞান, বিবেক ও ধর্ম্ম দ্বারা বিভূষিত হওয়াতেই মানব অপরাপর জীব হইতে উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় ও সময়ে সময়ে দেবতার স্থান অধিকারেও সমর্থ। যখন মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান, বিবেক ও ধর্ম্মাদি গুণনিচয়ের প্রাধান্য হয়, তখনই মানবের দেবত্ব; যখন ঐ সকল গুণাবলী পরস্পর সামঞ্জস্যরূপে মানবকে পরিচালিত করে, তখনই মানুষের মনুষত্ব এবং ঐ সকল সৎপ্রবৃত্তির অভাব বশত মানব যখন রিপুর দাস হইয়া পড়ে, তখনই মানবের পশুত্ব। আমাদের হিন্দুজাতির মধ্যে বহুদিন হইতে দেবভাব লোপ পাইয়াছে, মনুষত্ব বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; এখন যেন কেবল পশুত্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেছে! আমরাও যেন হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ইহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সবই বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি; মানবে ও পশুতে বড় একটা পার্থক্য রাখিতে চেষ্টা করিতেছি না। তাই সমাজের এত দুর্দ্দশা! তাহার জন্যই দুরাকাঙ্ক্ষা-রাক্ষসীকে কিছুতেই সান্ত্বনা করিতে পারিতেছি না এবং তজ্জন্যই বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের ভয়ঙ্কর অবস্থা—ভীষণ দৃশ্য।

বিবাহ।

বিবাহ হিন্দুর পক্ষে মানবজীবনের প্রধান সংস্কার। এ সংস্কার কেবলমাত্র আসঙ্গলিপ্সা বা ভোগবিলাস পরিতৃপ্তির জন্য নহে; ইহা ধর্ম্মের আবরণে আবরিত। ধর্ম্মভাবে ভবিষ্যৎ বংশের বীজ সংস্থাপনই বিবাহ সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য। এই শ্রেষ্ঠতম সংস্কার আজ সমাজপতিদিগের ও সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থপরতাগুণে "সমাজকালিমায়" পরিণত হইতে চলিয়াছে। এখন বিবাহ হইয়াছে এক মহাযজ্ঞ—এ যজ্ঞে আহুতি কন্যাকর্ত্তার যথাসর্ব্বস্ব (কোথাও বা বরের)। যে ব্যক্তি উপযুক্তরূপ জামাতৃরত্ন লাভহেতু যথাসর্ব্বস্ব বর-কর্ত্তার চরণে অর্পণ করিলেন, তাঁহারই মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, জীবন সার্থক হইল। পূর্ব্বেও বিবাহ একরূপ যজ্ঞ ছিল। তাহাতে পিতৃপুরুষদিগের পূজা অর্চ্চনা করিয়া (তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ হেতু) দুইটী অসম্পূর্ণ নরনারী-হৃদয় একীভূত করিয়া দেওয়া হইত। শুভক্ষণে-শুভলগ্নে মিলিত নব দম্পতি নবানুরাগে পরস্পর পরস্পরকে সংসারক্ষেত্রে সাহায্য করিয়া বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিত। এখন এ বিবাহ-যজ্ঞে নরনারী মিলন নয়; এখন বর-কর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার মিলন—অর্থ উদ্দেশে। এখন ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলোদ্দেশে পূর্ব্বপুরুষের পূজা নয়; এখন "মুদ্রা-রাক্ষসের" পূজা—স্বার্থ উদ্দেশে। এখন বরকর্ত্তা মুদ্রা রাক্ষসের পূজার জন্য খড়্গোত্তলন করতঃ "কাট কাট" শব্দে বলি প্রদানে উদ্যত; আর কন্যাকর্ত্তা উৎসর্গীকৃত অজশাবকের ন্যায় ছেত্তার আরক্তিম বদন সন্দর্শন করিয়া "ত্রাহি ত্রাহি" শব্দে তৎসন্নিধানে দণ্ডায়মান। বড়ই অভিনব মিলন!

এক্ষণে চতুর্দ্দিক হইতে ধ্বনিত হইতেছে, "কন্যাদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত শেষ হইল, ভবিষ্যৎ জীবনোপায় নষ্ট হইল"। কোথায় বা দেখিতে পাওয়া যায় বিবাহ অভাবে

বংশলোপের উপক্রম হইয়াছে—উপক্রম কেন, কার্য্যেও তাহাই দাঁড়াইয়াছে। বিবাহের উদ্দেশ্য আর পূর্ব্ববৎ নাই; এখন হইয়াছে, পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া অর্থ সঞ্চয় করা। বিবাহ একটা হাট-বাজারের মধ্যে গণ্য হইতে চলিয়াছে—পুত্রকন্যা হইয়াছে ঐ হাটবাজারের গণ্য দ্রব্য। এ বাজারের দর ক্রমশই চড়িতেছে; কোথায় গিয়া যে বাজারদর সমভাবে থাকিবে তাহা বলা যায় না। পুত্রদায় অপেক্ষা হিন্দুসমাজ কন্যাদায়ে অধিক জর্জ্জরিত হইলেও উভয়বিধ কুপ্রথাতেই সামাজিক অনিষ্ট ও দরিদ্রতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে। পুত্রের যথাসময়ে বিবাহ না হইলে হিন্দু সমাজে বিশেষ কলঙ্কের বা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই; কিন্তু কন্যার যথাসময়ে বিবাহ দিতে না পারিলে ধর্ম্মহানি ও সামাজিক অনিষ্ট অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। স্ত্রীচরিত্রে কালিমা পড়িলে হিন্দুসমাজে অধিকতর লজ্জার ও কলঙ্কের কথা এবং তজ্জন্য ভাবী বংশের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখাও দায় হইয়া পড়ে। এজন্য হিন্দু-পিতা ভিক্ষা করিয়াই হউক বা যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াই হউক, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত সময়ে কন্যাদান করিতে বাধ্য। সেই জন্য কন্যাভারগ্রস্ত-ব্যক্তি বর্ত্তমান সমাজের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছে। এদিকেও এই শাস্ত্র ও সমাজ-শাসন, তার উপর আবার উপযুক্ত (?) পাত্রের পিতার পীড়ন! ব্যাপার বড়ই গুরুতর। সকলেই আপন কন্যাটীকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ-কালকার বিবাহ-বাজারে উপযুক্ত পাত্রের দর বড়ই মহার্ঘ। উপযুক্ত পাত্র খরিদ করিতে হইলে, কন্যাকর্ত্তা যথাসর্ব্বস্ব দান না করিলে আর পাত্ররত্নের পিতৃদেবের মন উঠে না। সেই পাত্ররত্ন যদি আবার কি বল্লালী বা অবল্লালী কোনরূপ কৌলিন্যে বি
তাহা হইলেত বরকর্ত্তার "পৌষ ম
কর্ত্তার সর্ব্বনাশ! এই সব দেখিয়া শু
পতঙ্গস্বভাব কন্যাকর্ত্তাগণ ঝাঁকে ঝাঁ
বহ্নিতে ঝাঁপ দিতেছে ইহাই আশ্চ
এখন কিন্তু অনেকেই আপন আপ
অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝি
য়াছে—সমাজগ্রন্থি শিথিল হইয়া স
মুখে পতিত; বুঝিতে পারিয়াছে—
অবস্থাও ততোধিক; বুঝিতে পারিয়া
রক্ষার উপায় না করিলে অচিরে অস্থি
সম্ভাবনা। তাহাতেই বিকারগ্রস্ত
ন্যায় সমাজ মধ্যে বিকট চীৎ
যাইতেছে।

যাহাহউক পুত্রপণ ও ক
বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করিয়া বঙ্গদেশ
রিত, তাহা আর অধিক বলিতে হ
চতুর্দ্দিক হইতে আন্দোলন চলিতে
সমিতি হইতেছে, প্রতিজ্ঞা করা হইতে
স্বাক্ষর করা পর্য্যন্ত হইতেছে। কিন্তু
ফল হইয়াছে কি? সকলেই জা
বিবাহের টাকাতে কিছু অন্ন সংস্থ
অথচ কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি নিঃস্ব হই
এক জনের বিশেষ লাভও হইল না
জন সর্ব্বস্বান্ত হইল। কি চমৎকার
অভিনব সামাজিক প্রথা! আলোচ্য
ফল না হওয়ার কারণ আছে, সে কা
যাহার পুত্ররত্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আ
ক্ষায় পাস হইল, তাহার মনে হইতে
হইতেই দুই তিন হাজার টাকা পা
টাকার মায়া কি মানুষে ছাড়িতে পা
আর এরূপ পণ উঠাইবার সভাসমিতি
না। এইরূপে যাহার পাইবার আ
সে আর সে দিকে যায় না। আর

দিতে হইবে, সে দিনরাত্রক পণপ্রথা নিবারণে বৃথা চেষ্টা করে, অবশ্য ফল পায় না।

এই বিষবৃক্ষের মূল কোথায় তাহা ঠিক বলা যায় না। শাস্ত্রজ্ঞ বা প্রত্নতত্ত্বজ্ঞগণ এ বিষয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসা করিতে পারেন। তবে এইমাত্র বলা যায় আমাদের হিন্দুশাস্ত্র এরূপ বিষময় কুপ্রথার প্রশ্রয় দেয় না। উপস্থিত হিন্দুসমাজে অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম ও আসুর বিবাহ প্রচলন আছে, কিন্তু সাধারণতঃ ভদ্র হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মবিবাহই প্রচলিত। ব্রাহ্ম-বিবাহের লক্ষণ। যথা,—

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ
শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া
ব্রাহ্মধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥২৭।৩ মনুসংহিতা।

অর্থাৎ কন্যাকে উপযুক্ত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া যে কন্যাদান, তাহাকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলে। এই শ্লোক হইতে এমন বুঝায় না যে,বরকর্ত্তা তাহার পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য পণ্য দ্রব্যের ন্যায় দর করিয়া বসিয়া থাকিবেন ও নানা প্রকারে কন্যাকর্ত্তার নিকট মূল্য আদায় করিয়া আপনার বিষয়াদি করিবেন। ব্রাহ্মবিবাহে কন্যাকে অলঙ্কারাদিতে ভূষিত করিয়া উপযুক্ত বরে কন্যাসম্প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। তবে উপযুক্ত বর পাইবার জন্য কোথায় যৌতুক স্বরূপ ও সম্মান স্বরূপ কিছু বরাভরণ দিবার কথা থকিতে পারে বা দিতে হয়। এরূপ ব্যবসাদারী দরকষাকষির কথা কোথায়ও উল্লেখ নাই। আসুর বিবাহে কন্যাশুল্কের কথা দেখা যায়, কিন্তু উহা অশাস্ত্রীয় ও সমাজে ঘৃণার্হ।

"জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা
কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ॥
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যা-
দাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রমতে নয়, পরন্ত স্বেচ্ছামতে কন্যার পিত্রাদিকে ও কন্যাকে ধন দিয়া কন্যা গ্রহণ করাকে আসুর বিবাহ বলে। কন্যাশুল্ক সকল সময়েই হিন্দুসমাজে ঘৃণিত ও লজ্জাকর ও শাস্ত্রানুসারে পাপজনক। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্
গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন
স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥
স্ত্রীধনানি তু যে মোহা-
দুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারীযানানি বস্ত্রং বা
তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্॥" ৫১।৫২।৩

অর্থাৎ ধনগ্রহণদোষজ্ঞ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত অল্প শুল্কও গ্রহণ করিবে না, কারণ লোভ বশতঃ শুল্ক গ্রহণ করিলে অপত্যবিক্রয়ী হইতে হয়। (গোবধ ও অপত্য বিক্রয় উভয়ই সমান উপপাতক)। পিতা প্রভৃতি যে বন্ধু স্থানীয়গণ মোহ বশতঃ কন্যা বা ভগিনীর স্ত্রীধন বা তৎসম্বন্ধীয় দাসী বাহন বা বস্ত্রাদি উপভোগ করে, সেই পাপমতি পুরুষেরা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শাস্ত্র কথা মানিয়া কয়জনে কার্য্য করিয়া থাকে? "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। অতএব কতকটা দেখা গেল যে, হিন্দুশাস্ত্র এ সকল কুপ্রথার প্রবর্ত্তক নহে। হিন্দুশাস্ত্রে যদিও কিছু পাত্রপণের কথার আভাস পাওয়া যায়; তাহা আভাসমাত্র। উহা [illegible] তাহাও শাস্ত্রকারেরা এ বিষয়ে কন্যাকর্ত্তাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে বাধ্য করেন নাই। কন্যাকর্ত্তা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দিবেন তাহাই যথেষ্ট। উপস্থিত

[illegible]য়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাংসারিক হিসাবে [illegible]লেও এ কুপ্রথায় কেহই লাভবান হন না। [illegible]রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি [illegible]ত্রর বিবাহে বেশ দশ টাকা পাইলেন, তিনি [illegible]নি নানা প্রকার বাজ্‌বাজনা, আমোদ-[illegible]মোদ, নাচ-তামসা করিয়া তাহার পনর আনা [illegible] করিলেন। (যদি কেহ বলেন যে, আমি [illegible]র টাকা লইয়া খরচপত্র না করিয়া যদি [illegible]স্পানির কাগজ করি, তাহা হইলেত আমি [illegible]ভবান হইতে পারিব। আমরা বলি যে, সে [illegible] ঠিক নয়; তুমি বাধ্য হইয়া খরচ করিবে। [illegible]ার ঐরূপ তোমরাও "পালা" আছে।) আর [illegible]দিকে তাহার নব বৈবাহিক মহাশয়ের কি [illegible]হইল? তিনি কন্যাদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া [illegible]মাতৃরত্ন লাভ করিয়া বিরলে অশ্রুজল [illegible]ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আবার যখন [illegible]কর্ত্তার ঐরূপ 'পালা' পড়িবে, তাহাকেও [illegible]ইরূপ চক্ষের জলে পৃথিবী আর্দ্র করিতে [illegible]বে। মানুষ পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া কার্য্য [illegible]রে না বলিয়াই ত এত লাঞ্ছনা—এত কষ্ট। *

* কথায় বলে "ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।" হায়! হায়! গোবর ভায়া যদি ভাবিতেন আমাকেও একদিন ঘুঁটের দশা পাইতে হইবে, তবে কি তিনি হাসিতেন? আমরাও বলি যদি পুত্রের বিবাহ কালীন বরকর্ত্তা মহাশয় ভাবেন, আমাকেও একদিন কন্যাকর্ত্তারূপে "ঘাড়কাটে" মাথা দিতে হইবে, তবে কি তিনি [illegible] লম্ফ ঝম্ফ করিয়া একজনের গলায় ছুরি [illegible]াইতে উদ্যত হন! সাধে কি আর যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি [illegible] মন্দিরং। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য [illegible]ঃপরম॥ অর্থাৎ নিয়তই ভূতসকল যম [illegible]দরে গমন করিতেছে দেখিয়াও জীবিতেরা [illegible]মি বাঁচিয়া থাকিব' এই স্থির করে, [illegible]র বাড়া আর আশ্চর্য্য কি?" আমরা বলি [illegible]পরকে মরিতে দেখিয়া ভূতসকলের মনে যে

আত্ম-বিনাশের কথা একেবারেই উদয় হয় না, এমত নহে। তবে মায়ার এমনি মোহিনী শক্তি যে, তৎ প্রভাবেই জীবগণ মরিতে হইবে জানিয়াও পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া যায়। মরণ জনিত বৈরাগ্যের উদয় না হইলে জীব-হৃদয়ে কখনই ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হয় না; সুতরাং তাহারা পাপাসক্ত হইতেও কুণ্ঠিত হয় না। সেইরূপ কন্যাকর্ত্তার দশা দেখিয়া বরকর্ত্তা যে আপন অন্তিম দশা ভাবেন না, এরূপ নহে, তবে স্বার্থের প্রলোভন এতই আপাতমধুর যে, তিনি তখন তাহার আস্বাদনে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়েন; তাই কন্যাকর্ত্তার সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠানুভব করেন না। স্বার্থের কবলে যিনি পতিত হইয়াছেন তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। সমাজ মধ্যে এখন স্বার্থের একাধিপত্য। চক্ষু-লজ্জা, দয়া, পরোপকার অনেক দিন স্ব স্ব অধিকার পরিত্যাগ করিয়াছে। স্বার্থের প্রাধান্য থাকিতে যে, সমাজ হইতে পুত্রপণ ও কন্যাশুল্ক উঠিবে এরূপ আশা করা যায় না। রাজশাসন ব্যতীত যে এই পাপ প্রথার হস্ত হইতে সমাজ নিস্কৃতি লাভ করিবে, এরূপ বোধ হয় না। আমরা কিন্তু সামাজিক বিষয়ে রাজশাসনের পক্ষপাতী নহি। রাজসাহী—তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর ও বর্দ্ধমান—রাণীগঞ্জের কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুরদ্বয় এই দুইটী পাপ প্রথা সমাজ হইতে তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমরা ইহাঁদের উদ্যোগ দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। হিন্দু সমাজের প্রত্যেক জাতির সমাজপতি ও গণ্য মান্য ব্যক্তি বর্গের নিকট আমাদের কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক অনুরোধ এই যে, এই সময় সকলেই উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়া যাহাতে "বরকন্যা বিক্রয়" প্রথা সমাজ হইয়া উঠিয়া যায় তজ্জন্য সচেষ্ট হউন। উ,-প্র, স।

ক্ষয় ও চীৎকারই সার হইতেছে; কারণ প্রধান অন্তরায় স্বার্থ। যাহাহউক বর্ত্তমান সময়ে নানা স্থানে নানারূপ প্রস্তাব হইতেছে। তন্মধ্যে কয়েকজন নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন।

(১)। কেহ বলেন কৌলিন্য বংশগত হওয়ায় সমাজের অনিষ্টকরী এই সকল কুপ্রথার উদ্ভব হইয়াছে। কেহ বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশরূপ কৌলিন্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ী কৌলিন্য সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিলেই সমাজের মঙ্গল। আর এ বিষয়ের ভার নবপ্রসূত ভারত ধর্ম্মমণ্ডলীর হস্তে নিক্ষেপ করিলেই চলিতে পারিবে এবং ঐ মহামণ্ডলীর বিধান শিরোধার্য্য করিয়া লইলেই হইবে।

(২)। কেহ বলেন, অবিবাহিত শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় সমিতি করিয়া সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, যদি কেহ পণ গ্রহণ করে, তবে তাহাকে সমাজচ্যুত করিলেই সমাজের কালিমা দূর হইতে পারে।

(৩)। কেহ বলেন কুলীনপাত্র কেবল কুলীন কন্যাকে বিবাহ করিবে, বংশজ বা শ্রোত্রীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। সেইরূপ বংশজ বর বংশজের কন্যাকে এবং শ্রোত্রীয় বর শ্রোত্রীয় কন্যাকে বিবাহ করিলেই বর্ত্তমান পণপ্রথার কঠোরতা অনেকটা কমিয়া আসিবে ও ক্রমশই সমাজ হইতে উঠিয়া যাইবে।

আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয় উক্ত ত্রিবিধ প্রস্তাব মধ্যে কোনটাই সম্পূর্ণরূপ আশানুযায়ী ফল প্রদানে সমর্থ নয়।

প্রথমতঃ কৌলিন্য প্রথাই যে এই অনিষ্টকরী পণপ্রথার একমাত্র কারণ, তাহা বোধ হয় না; তবে ইহা যে মূল কারণের পৃষ্টপোষক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশরূপ কৌলিন্য [illegible] বেশ যোগ দিয়াছে তাহাও নিশ্চয়। কার[illegible] সকল জাতির বরকর্ত্তাই কুলীন হউন বা [illegible] হউন অবস্থা বিশেষে পুত্রের বিবাহে বেশ [illegible] টাকা পাইয়া থাকেন। মোটামুটি বুঝিতে গেলে [illegible] পণপ্রথা মানুষের ধনের বা বিদ্যার অহংকারিত[illegible] ও তদ্দ্বারা অপরের নিকট হইতে সম্মান পাইবা[illegible] প্রবল বাসনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অত[illegible] এব কৌলিন্য প্রথা উঠাইলেই যে ইহা[illegible] মূলোৎপাটন করা হইল, এরূপ বিবেচনা ক[illegible] ভুল। আর অদ্যই যদি তুমি বল্লালীই হউ[illegible] আর অবল্লালীই হউক কৌলিন্য প্রথা উঠাইবা[illegible] চেষ্টা কর, তাহা হইলে সমাজের মূলেও টা[illegible] পড়িবে; গতিশীল সমাজে একরূপ কৌলিন[illegible] উঠাইবার চেষ্টা করিলে আর একরূপ কৌলি[illegible] আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিবে[illegible] বংশগত গুণগত কৌলিন্যের স্থান ধনগ[illegible] কৌলিন্য অধিকার করিবে—করিবে কে[illegible] তাহাই করিতেছে। আর এরূপ সমা[illegible] বিপ্লবকারী ব্যাপার নবজাত ভারত-ধর্ম্মমহা[illegible] মণ্ডলীর হাতে দিলে কার্য্যের সফলতা সুদূ[illegible] পরাহত হইবে বলিয়া বোধ হয়। কার[illegible] সম্মতি আইন পাসের সময়ই দেশের সমাজে[illegible] শক্তি অনেকটা বুঝা গিয়াছে। সমাজে[illegible] বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সমাজশক্তি রাজ[illegible] নৈতিক শক্তির নিকট অনেকটা মুখাপেক্ষী[illegible] তবে রাজকীয় শক্তির যে সাহায্য লইতে হইবে[illegible] একথা আমরা বলিতেছি না।

দ্বিতীয়তঃ। অবিবাহিত শিক্ষিত যুব[illegible] সম্প্রদায় সভা সমিতি করিয়াও "বিবাহে প[illegible] লইব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেই যে কার্য্য[illegible] সিদ্ধ হইবে তাহাও অসম্ভব। আর উহাতে[illegible] একটা ভয়ঙ্কর বাধা আছে, কারণ তাহা হইলে[illegible] হিন্দু পরিবারের পূর্ব্বাবস্থা লোপ পাইবে[illegible]

[illegible] কর্ত্তৃত্ব নষ্ট হইবে। যুবক সম্প্রদায় [illegible] মাতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগের প্রতি [illegible] প্রদর্শন করিবে। কর্ত্তার চিরন্তন কর্ত্তৃত্ব [illegible] করিলে হিন্দু সমাজের পূর্ব্বগ্রন্থি শিথিল [illegible] হইবে। গৃহ সংস্কার করিতে গিয়া গৃহ চূর্ণীকৃত [illegible] হইবে—তাহা আর নূতন নির্ম্মাণ করিতেও [illegible] বে না ও যাহা ছিল তাহাও যাইবে। [illegible] ন সংসারের অপর বিষয়ে, তেমনি বিবাহ [illegible] য়েও হিন্দুকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব থাকা চাই। যত[illegible] হিন্দু সমাজে বাল্য-বিবাহ, ততদিন [illegible] কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব। যদি যুবক-যুবতী বিবাহ [illegible] লন করিতে পার, তাহা হইলেই উক্ত [illegible] াব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে। কিন্তু [illegible] হইবে কি?

[illegible] তৃতীয়তঃ। কুলীন বরে কুলীন কন্যাকে [illegible] হ করিবে ও বংশজে বংশজ কন্যা বিবাহ [illegible] বে এরূপ প্রস্তাবেও অনেক দোষ আছে। [illegible] প্রথা প্রচলন হইলে সমাজ মধ্যে অনর্থক [illegible] ভিন্ন সম্প্রদায় হইয়া উঠিবে। সাম্প্রদায়িক [illegible] ব প্রবল হইলে সমাজে অনিষ্টের অধিক [illegible] ভাবনা। আর ইহার দ্বারা সমাজ মধ্যে [illegible] শই জাত্যভিমান বৃদ্ধি হইতে পারে। [illegible] র একটা দোষ আছে; মনুষ্য স্বভাবতঃ [illegible] ভবংশে কন্যা সম্প্রদান করিয়া আপনাকে [illegible] রবান্বিত মনে করে ও অবস্থা ভাল হইলে [illegible] ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রায়ই দেখা [illegible]। তাহা যদি না করিতে দেওয়া হয়, তাহা [illegible] লেও সমাজ মধ্যে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে [illegible] রে। অতএব দেখা গেল, উক্ত প্রস্তাবগুলি [illegible] াঙ্গ সুন্দর নহে ও বর্ত্তমান সমাজের অব[illegible] র অনুপযোগী।

হিন্দুসমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতিতে [illegible] ভক্ত। এই সকল জাতির মধ্যে কোন কোন [illegible] াচার ব্যবহার বা কার্য্য প্রণালী পরস্পর বিভিন্নরূপ। এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজপতিগণ আছেন; তাঁহারাই স্বজাতি মধ্যে সামাজিক ব্যবহারের ব্যবস্থাপক ও সমাজ-নিয়মোল্লঙ্ঘনকারীদিগের শাসক। তাঁহারা যদি বদ্ধপরিকর হইয়া নিঃস্বার্থভাবে স্ব স্ব জাতি মধ্যে এই কন্যাশুল্ক ও বরপণ-প্রথা দূর করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই এ বিষয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। কারণ দেখা যায়, সমাজ মধ্যে যিনি কন্যাভারগ্রস্ত তিনিই এ কুপ্রথা দূর করিবার বিশেষ উদ্যোগী; আর যাঁহার সে ভার স্কন্ধে নাই অথচ দুই একটী পুত্র আছে, তিনি এ বিষয়ে কাণও দেন না। সেই জন্যইত এ ঘোর বিপদ আসিয়া সমাজকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। অতএব সমাজহিতৈষী সহৃদয় সমাজপতিগণ আপন আপন সমাজ মধ্যে সচেষ্ট হইয়া এ বিষয়ে কোনরূপ উপায় বিধিবদ্ধ করিতে পারিলেই আশানুযায়ী ফল হইবার সম্ভাবনা। কন্যাশুল্ক একেবারেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও সমাজের বিশেষ অনিষ্টকারী তাহা আমরা দেখাইয়াছি। অতএব উহা সমাজ হইতে একবারে উৎপাটন করিতে পারিলেই সমাজের মঙ্গল। বরের পণ সম্পূর্ণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নয় বলিয়া ও ইহাতে সমাজের কিছু না কিছু উপকার হয় বলিয়া, বরের অবস্থানুসারে, বংশানুসারে, ও গুণানুসারে পাত্রপণ-বিষয়ের মীমাংসা ও একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। এবং তদ্দ্বারা যদি কিছু বরপণ দিতেই হয়, তবে উহা বরকর্ত্তার তহবিলে অর্থরূপে না দিয়া বিবাহিতা কন্যার স্ত্রীধনরূপে অলঙ্কারাদিতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই বরপণের সার্থকতা ও সমাজের কিছু উপকার করা হয়। স্ত্রীধনের আবশ্যকতা আছে কিনা ও স্ত্রীধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের অভিমত কি, অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

স্ত্রীধন।

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ
পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ
বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥ মনু, ৩।৫৫।

অর্থাৎ স্ত্রীলোককে বহুমান পূর্ব্বক ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা বহুকল্যাণকামী পিতা ভ্রাতা পতি ও দেবরগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু কথা হইতেছে যে, পিতা বা ভ্রাতা স্ত্রীলোকের বিবাহ কালেই যে তাহাকে অলঙ্কারাদি দিবেন, শাস্ত্রে এমন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে স্ত্রীধন বলিলে;—

অধ্যগ্ন্যধ্যবাহনিকং
দত্তঞ্চ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়ৈ।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং
ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতং॥ মনু, ৯।১৯৪।

অর্থাৎ অধ্যগ্নি, অধ্যবাহনিক, ভ্রাতৃদত্ত, পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত ও প্রীতিদত্ত এই ছয় প্রকার স্ত্রীধন বুঝায়। বিবাহ হোমকালে লব্ধ যে ধন তাহাকে অধ্যগ্নি, পতিগৃহ-নয়ন সময়ে লব্ধ যে ধন তাহাকে অধ্যবাহনিক, প্রীতিপূর্ব্বক পতিকর্ত্তৃক যে দত্ত ধন তাহাকে প্রীতিদত্ত ধন কহে। অতএব বিবাহকালে যাহা কিছু কন্যা-কর্ত্তা-বরকর্ত্তা দিবেন তাহা কন্যার স্ত্রীধন হওয়াই উচিত; বরকর্ত্তার আত্মসাৎ করা উচিত নহে। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, যদি কোন পিতা বা ভ্রাতা বা অন্য কোন অভিভাবক মোহ বশতঃ স্ত্রীধন ভোগ করেন, তবে তাহার অধোগতি হয়।

যতদিন হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে, ততদিন বাল্য বৈধব্য অনিবার্য্য; যতদিন বাল বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সমাজ মধ্যে শাস্ত্রানুমোদিত হইয়া প্রচলন না হইবে, তত দিন হিন্দুপত্নীর স্ত্রীধনের অবশ্যকতার বিরুদ্ধে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিবে না। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা পত্নী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীধনে উত্তরাধিকারিণী হয়, কিন্তু শ্বশুর বর্ত্তমানে স্বামী-বিয়োগ হইলে বিধবা পুত্রবধূর কোন সম্পত্তিতে অধিকার থাকে না। আর বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে পিতা বর্ত্তমানে প্রায়ই পুত্রদিগের বিবাহ হইয়া থাকে ও অনেক সময়ে হতভাগ্য বিবাহিতা পুত্রগণ পিতৃঅঙ্কেই কাল গ্রাসে পতিত হইয়া নব বিবাহিতা বাল বিধবাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া যায়। পৈতৃক অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতে—সহোদর ভ্রাতাদিগের বিষয় বৈভব থাকিতে বিধবাকন্যাদিগকে উদরান্নের জন্য অনেক সময়ে কষ্টে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। কোথাও বা সামান্য উদরান্নের জন্য ভ্রাতৃজায়াদিগের নিকট অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে দেখা গিয়াছে। হইতে পারে কোন পিতা বা ভ্রাতা স্নেহবশতঃ তাহার বিধবা কন্যা বা ভগিনীর ভরণপোষণের জন্য কোন উপায় করিয়া গেলেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এরূপ উপায় হয় না। তাহার পর যদি সেই বিধবার শ্বশুরকুল নিঃস্ব হয়, তাহা হইলে ভাবুন দেখি কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! বিশেষতঃ যেখানে বহুবিবাহ প্রচলন আছে, সেখানে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে ও অনেক স্থলে ইহা অপেক্ষা আরও বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দুসমাজে লোকের ধর্ম্মজ্ঞান কর্ত্তব্য-বিবেচনা থাকিলে এত কথার উল্লেখের আবশ্যক হইত না। সেইজন্য বলিতেছি পাত্রপণ কন্যাকে অলঙ্কারাদিকে স্ত্রীধনরূপে দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। শাস্ত্রে যে কিঞ্চিৎ পাত্রপণের আভাস পাওয়া যায় তাহা বরকর্ত্তার স্বার্থ-সাধন জন্য নহে—বিবাহিতা কন্যার স্ত্রীধন সংস্থাপনেরই নিমিত্ত এই হেতুবাদ আছে বলিয়াই দেশকাল পাত্র

বিবেচনায় সামান্যরূপ পুত্রগণ সমাজের বিশেষ অনিষ্টকারী নয়। অতএব সমাজপতিদিগের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া উপস্থিত কুপ্রথা সংস্কারের বিধান করা উচিত হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য যে, আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতির সংস্থাপনের পর অনেক সমাজহিতৈষী মহোদয়গণ এ অনিষ্টকরী কুপ্রথার সংস্কার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাঙ্গালী-স্বভাব-সিদ্ধ সামাজিক বিরোধ হেতু বা কার্য্যকারিণী শক্তির অভাব বশতঃ বা স্বার্থের সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত উহাতে কোনরূপ ফল হয় নাই এবং উক্ত বিষয়ে আর কোন চেষ্টাও লক্ষিত হইতেছে না। একবার উদ্যম সফল হইল না বলিয়া কি নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত? আবার দেখিলাম উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ও বর্ত্তমান সমিতির অবস্থা দেখিয়া সমিতির সম্পাদক মহাশয়ও সম্পাদকীয় ভার আপনার মস্তক হইতে নামাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বাস্তবিকই সমিতির এহেন শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। এক্ষণে স্বসমাজ-হিতৈষী শিক্ষিত সহৃদয় কোন মহাত্মা এভার গ্রহণ করিয়া সমাজকে ও সমিতিকে সজীব করুন ও সমাজের হিতব্রতে নিযুক্ত হউন। তাহা দেখিলেই আমরা বিশেষ সুখী হইব। উচ্চ শিক্ষাভিমানী, জাত্যভিমানী ও ধনাভিমানী স্বজাতিমহোদয়গণ এখন কোথায়? তাঁহারা কি কেবল শিক্ষাগর্ব্বে, বংশাভিমানে বা ধনমদে স্ফীত হইয়া প্রকাণ্ড উপাধানোপরি অর্দ্ধাঙ্গ ন্যস্ত করিয়া লালারসে উপাধান আর্দ্র করতঃ দিবা রাত্রি নিদ্রাদেবীর সেবা করিবেন? একবার কি চক্ষুঃ উন্মিলন করিয়া জগতের গতি প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না? এক্ষণে সমিতির সভ্যমহাশয়গণই বা কোথায়?

শ্রীনিবারণচন্দ্র হুই।

রাজা ও প্রজা (৩)।

(প্রথম খণ্ডের ২৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

রাজপদের এইরূপ অবান্তর ভেদ ঘটিলেও রাজার বা মূল রাজকার্য্যের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনা। উহা যেমন অবিনশ্বর তেমনি স্থির। রাজপরিবর্ত্তন বা বিধিবিপর্য্যয় ঘটিলেও উহার বিকৃতি ঘটেনা। তবে দেশ কাল ও পাত্রভেদে কোথাও বা বহু বিস্তার হয়, কোথাও বা পূর্ব্ববৎ থাকে এবং কোথাও কিছু ইতস্ততঃ হইয়া সঙ্কুচিত হয়। যে দেশে যেরূপ ভাবে যেমন অবস্থাই ঘটুক না কেন; উহা যে রাজপদ সেই রাজপদই থাকে। উহার যে অবধারিত উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য তাহা বিকৃত হয় না।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ও পুরাণে রাজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত নিয়মাবলী সঙ্কলিত আছে। তৎসমুদায় উদ্ধার বা আলোচনা করিতে গেলে পাছে পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ও বিরক্তিকর হয়, এই আশঙ্কায় আমরা

তাহাতে নিরত হইয়া স্বল-বিশেষে স্বল-বিশেষের মাত্র উল্লেখ করিব। আর হিন্দুর চক্ষে রাজা—দেবতা—অলৌকিক বস্তু। তাঁহার কার্য্য কলাপও অলৌকিক। তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় সামান্য মানবের সাধ্যাতীত।

রাজার কর্ত্তব্যের উল্লেখের পূর্ব্বে রঘুকুল ধুরন্ধর দাশরথি, অপ্রকৃতিস্থ ও বিকৃতবেশধারী ভরতকে যে কয়েকটী কুশল প্রশ্ন উপদেশচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন তাহারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। রামচন্দ্র কহিলেন "প্রিয়তম! ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যথাকালে তোমাকে তত্তৎকার্য্যের শুভাশুভ সংবাদ দেন ত? তুমি দেবতা, পিতৃ, গুরু, ভৃত্য, গুরুতুল্য বৃদ্ধ, বৈদ্য ও জ্ঞানীগণকে যথাযোগ্য সম্মান কর ত? অস্ত্রগুরুদিগকে সমুচিত মর্য্যাদার সহিত পূজা কর ত? তোমার আত্মবৎ বিশ্বাসী মন্ত্রী আছেন ত? তুমি নিদ্রা কর্ত্তৃক পরাজিত হও নাই ত? যথাকালে জাগরিত হও ত? রাত্রিশেষে অর্থ চিন্তায় নিমগ্ন হও ত? একাকী অথবা বহু জনের সহিত মন্ত্রণা করনা ত? সম্যক্ বিচার দ্বারা স্থিরীভূত মন্ত্রণাসকল সংগোপিত থাকে ত? অনায়াসসাধ্য মহৎ ফলপ্রসূ কার্য্যচয় অবিলম্বে সম্পাদিত হয় ত? প্রাণাধিক মন্ত্রই রাজ্যের মূল যন্ত্র। কার্য্যকল দ্বারা তোমার মন্ত্রণা প্রকাশ পায় ত? যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে তোমার কল্যাণ কামনা করেন তাঁহার বিশিষ্ট সম্মান কর ত? তথাকথিত কার্য্যে নিযুক্ত ভৃত্যগণ স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য অন্তরের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করে ত? বাহ্যান্তর শুদ্ধ নিষ্কপট অমাত্যগণ রাজসম্মানে সম্মানিত হন ত? প্রজামণ্ডলী কখনও কঠোর দণ্ডে বিরক্ত হয় না ত? নীতিজ্ঞ! মন্ত্রিগণ বা ভৃত্যবর্গ তোমায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না ত? স্বার্থপর ভৃত্য বা সেবক তোমার নাই ত? অকারণে প্রকৃতিবর্গের বিরাগভাজন হও না ত? উপযুক্ত সৈনিকপুরুষের উপযুক্ত প্যারিতোষিক হয় ত? সেনাগণের নিয়মানুযায়ী দৈনিক, মাসিক বা বার্ষিক বেতন তাহাদিগকে উপযুক্ত সময়ে প্রদান কর ত? রাম! রূপ ব্যক্তিগণ যথাকালে জীবিকা না পাইলে প্রভুর অহিত ও বিনাশ চিন্তায় রত হয়। সর্ব্বপ্রধান জ্ঞাতিগণ তোমার বিশিষ্টরূপ অনুরক্ত ত? অষ্টাদশ তীর্থের মধ্যে (ক) মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ ভিন্ন অপর সকলে পরস্পর পরস্পরের অবিজ্ঞাত থাকে ত? চর দ্বারা ইহাদের মতিগতি ও কার্য্যকলাপ অবগত হও ত? বৃথা লিঙ্গধারী, নাস্তিক, বাচাল ও চাটুকারের সম্মান কর না ত? অধিকৃত রাজ্য সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আছে ত? রাজ্য অঙ্গহীন (খ) হয় নাই ত? কৃষিজীবী, পণ্যজীবী ও শিল্পজীবীগণ তোমার ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ত? ভ্রাতঃ, তাহারাই রাজ্যের একমাত্র সম্বল। তাহাদের রক্ষাই রাজ্য রক্ষা। তাহা তুমি যথাবিধি সম্পন্ন কর ত? স্ত্রীগণ আত্মোচিত সম্মানে সম্মানিত হয় ত? তাহাদের নিকট কোন মন্ত্রণা প্রকাশ করনা ত? তুমি রাজবেশে দর্শনার্থী প্রজাগণকে দর্শন দাও ত? তাহাদের সুখ দুঃখের কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ত? অধিকৃত ভৃত্যগণ তোমার দৃষ্টি মধ্যে বা দৃষ্টির বহির্ভূত স্থানে নিঃশঙ্কভাবে থাকে না ত? দুর্গ সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ আছে ত?

(ক) মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক অন্তঃপুরাধিকৃত, কারাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, বক্তা, ব্যবহারদর্শী, ধর্ম্মাসনাধিকারী, ব্যবহারনির্ণেতা, সেনাবেতনাধ্যক্ষ, কর্ম্মাবসানেবেতনগ্রাহী, নগরপাল, সীমাপাল, দুষ্টের দণ্ডদাতা ও দুর্গরক্ষক এই অষ্টাদশ তীর্থ।

(খ) স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল রাজ্যের এই সাত অঙ্গ

তোমার আয় অধিক ত ব্যয় অল্প হয় ত? অপব্যয়ে কোষ শূন্য হয় না ত? দেব, পিতৃ, অতিথি, যোদ্ধা, অনাথ, দরিদ্র ও মিত্রের জন্য ধন ব্যয় কর ত? নির্দ্দোষ ব্যক্তি তোমার রাজ্যে দণ্ড পায় না ত? দোষী অসদুপায়ে অদণ্ড্য হয় না ত? কাহারও নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহার দণ্ড হয় না ত? রাজপুরুষগণ ছলে বলে বা কূটনীতি প্রয়োগে প্রজাপীড়ন বা নির্দ্দোষীকে সদোষ করে না ত? বৃদ্ধ, বালক ও বৈদ্যের সম্মান কর ত? তোমার রাজ্যে পূজ্যের উপযুক্ত পূজা হয় ত? তাহাদের পূজার ব্যতিক্রম হইলে শ্রেয়ঃকার্য্যের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। অর্থ, ধর্ম্ম ও কাম পৃথক পৃথক্ করিয়া সেবা কর ত? যুগপৎ তাহাদের সেবা করনা ত? চতুর্দ্দশ রাজদোষ (গ) পরিহার করিয়াছ ত? কামজ ও ক্রোধজ ব্যসন পরিত্যাগ করিয়াছ ত? ত্রিবিধ বিদ্যা সম্যক্রূপে প্রয়োগ হয় ত? দৈবী ও মানুষী আপদ নিবারণের উপায় কর ত? সন্ধি ও বিগ্রহ উপযুক্ত পাত্রের সহিত সম্পন্ন হয় ত? শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ত? পূর্ব্বপুরুষগণ যে সৎপথ অবলম্বন করিয়া ছিলেন তাহা ত্যাগ কর নাই ত? ধর্ম্মানুসারে রাজ্যের তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন কর ত? ইত্যাদি।"

প্রকৃতিই রাজ্যের অস্থি, রক্ত, মাংস, মেদ ও মস্তিষ্ক এবং রাজা তাহার সমবায়ী পরিচালক স্নায়ুরজ্জু। মানবসমাজ দেহ, জাতীয়তা জীবনীশক্তি এবং অধিকার সমসাময়িক অঙ্গ-

(গ) নাস্তিকতা, মিথ্যাকথা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রিতা, জ্ঞাতিদর্শনবিমুখতা, আলস্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, একাকীমন্ত্রনা, বিপরীতদর্শিসহমন্ত্রনা, কর্ত্তব্যের-অনারম্ভ, মন্ত্রনাপ্রকাশ, প্রাতে-মঙ্গল-চিন্তা-বিরতি, সকলশত্রুকে-যুগপৎ-আক্রমণ, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ।

সঞ্চালন ক্রিয়া। এ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে সংযত রাখিতে দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রের শক্তি অনুযায়ী সমবায়ী ক্রিয়ার প্রয়োজন। কেবল স্নায়ুরজ্জু শতগ্রন্থিতে দেহ সংযত থাকিলে, রক্ত মাংসাদির অভাবে তাহা গুণাশ্রিত না হইয়া দোষ ভাজন হইয়া থাকে। আবার অস্থি মাংসাদির প্রাচুর্য্য থাকিলেও যকৃত অভাবে তাহা যথাযথ পরিচালিত না হইয়া অকর্ম্মণ্য হয়। কারণ কে তাহাদিগকে নিয়ন্তার ন্যায় প্রকৃত সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবে? বস্তুতঃ রাজা প্রজা এইরূপ পরস্পর অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য সম্বন্ধগুণে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। পরস্পর সামঞ্জস্যেই মঙ্গল ও অসামঞ্জস্যেই ক্ষয় অনিবার্য্য। উভয়ের সংঘর্ষণে উভয়েরই মহদপচয়। অন্যতরের অভাবে অন্যতর কখন নির্ব্বিঘ্নে উদ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না এবং পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

যদ্যপ্যল্পতরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুশ্চরম্।
পুরুষেণাসহায়েন কিমু রাজ্যং মহোদয়ম্॥
৩। ২১৫অ। মৎস্যপুরাণ।

মানব অসহায় হইলে অতি সামান্য কর্ম্মও সুন্দররূপে সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। এই বিশালায়ত, বিভিন্নপ্রকৃতিক মানবগণের অধিষ্ঠানভূত, বহুআয়াস-সাধ্য, অশেষবিধ কার্য্যক্ষেত্র-বিশিষ্ট ভূভাগ কখনই একমাত্র রাজার দ্বারা আয়ত্ত হইতে পারে না। দক্ষ রাজা ও রাজপুরুষ থাকিলেও বিনয়ী ও রাজভক্ত প্রজাই রাজ্য সংযমের একমাত্র উপায়। কর্ম্মক্ষেত্র যতই জটিল হউক না কেন, যদি প্রকৃতিপুঞ্জ প্রকৃতরূপে ভূপতির অনুগত হয়, তবে বিনা আয়াসে নিমেষমাত্রে তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হয়। ধন, মান, জীবন যাহা কিছু রাজ্যরক্ষার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, অদুঃখিতচিত্তে তাহা অর্পণ করিতে

তাহারা কখনই কুণ্ঠিত হয় না। যাহাদের হিতের জন্য বা অহিত নিবারণ জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তাহারা সমবেত হইয়া তাহার উপায় ও অপায় চিন্তায় যেরূপ সিদ্ধতা লাভ করে, তত্তৎ কার্য্যের মর্ম্মজ্ঞানহীন জনগণের গবেষণায় তাদৃশী সূক্ষ্মতা কখনই প্রকাশিত হয় না।

রাজ্যের অনিষ্ট শান্তির একমাত্র স্বস্ত্যয়ন প্রজার বশ্যতা। যতই তেজীয়সী শক্তি আক্রমণের উপক্রম করুক না কেন, মুষ্টিমেয় প্রজা হইলেও তাহা যদি বশীভূত থাকে, তবে সেই অভিঘাতী শত্রু প্রস্তর-ছেদনে-উদ্যত তরবারির ন্যায় আত্মসার নাশ করে। যথাকালে যথাযোগ্য পরিপালনেই প্রজা বশীভূত হয়। রুক্ষ নীতি বা পরুষ দণ্ড ভয়ের হেতু হইলেও তাহাতে তাহারা কখনই সম্যক্ আয়ত্ত হয় না। অকপটভাবে তথাকথিত সরল ব্যবহারই প্রজার অন্তকরণ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। ইহার বৈলক্ষণ্য ঘটিলেই সেই সরল পথ কুটিল ও দুর্গম হয়। তখন উভয়ে উভয়কে ভ্রমে পাতিত করিবার পন্থা অন্বেষণ করে। অর্থের অনাটন, শক্তির অসংযম ও কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা অনুগত প্রজার দ্বারা যেমন নিবারিত হয়, বিরূপ প্রজার দ্বারা কখনই সেরূপ হয় না। রাজশক্তি প্রবল শক্তি,রাজপদ প্রধান পদ এবং রাজবিধি অলঙ্ঘনীয় বিধি বটে, কিন্তু প্রজা বল, অদ্বিতীয় বল, প্রজা সমবায় অদ্বিতীয় সামর্থ্য,প্রজা সম্পত্তি অদ্বিতীয় সম্পত্তি। কি ধনী কি নিঃস্ব সমস্ত প্রজা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে রাজশক্তি যতই প্রবল হউক, রাজবিধি যতই কঠোর হউক এবং রাজদণ্ড যতই পরুষ হউক না কেন, দিনযামিনী মধ্যে তাহার বিপর্য্যয় ঘটিতে দেখা যায়। প্রাচীন পুরাবৃত্তে তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কেবল প্রজার হিতার্থেই রাজবিত্তের প্রয়োজন। উহার আর দ্বিতীয় ব্যয় নাই। যখন প্রজাই রাজার একমাত্র সম্পত্তি, প্রজাই রাজার এককাত্র বল, প্রজাই রাজার একমাত্র সহায়, তখন অনন্যগতি ভূপতি সেই অমিত সম্পত্তির সদ্ব্যবহার না করিলে তাহা কখন স্থায়ী হয় না। তাহাদের নিকট যথাশক্তি আদায়, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা রক্ষণ ও বর্দ্ধন এবং তাহাদের অভাবে অকাতরে তাহার ব্যয় করিলে তবে রাজবিত্তের সদব্যয় হয়। অরাতি নিপাত বা আক্রমণার্থ সেনা পালনই হউক, অন্নকষ্ট জলকষ্ট বা মার্গকষ্ট নিবারণার্থই হউক, বাণিজ্য বিস্তার, শিল্পোন্নতি, শাস্ত্রচর্চ্চা বা কৃষিসাধনোদ্দেশেই হউক, ইত্যাদি যে কোন প্রয়োজন সম্পাদনার্থ ব্যয়িত হউক না কেন, তাহা সেই একমাত্র প্রজা-হিত-কামনার প্রতি লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। ঐরূপ লক্ষ্য থাকিলে সাক্ষাতেই হউক বা পরোক্ষেই হউক ঐ সকল মহৎ কার্য্যে ব্যয়িত ধন প্রজার মঙ্গলার্থেই উৎসৃষ্ট হয়। বাহ্য দৃষ্টিতে উহার প্রয়োগ, ভিন্ন প্রকার থাকিলেও তাহা কখনও বিচারমার্গ ভ্রষ্ট হয় না।

শ্রীরামশঙ্কর রায়।

মেঘদূত।

[যে সকল সুবর্ণময় কীর্ত্তিস্তম্ভ—যে সকল অক্ষয় স্মৃতি-চিহ্ন, কাব্যপ্রিয় সুধীগণের যত্নে ক্ষিত হইয়া মহাকবি কালিদাসের পরিচয় জনসমাজে প্রচার করিতেছে, যে সকল অমূল্য াব্য-রত্নের উজ্জ্বল প্রভা দেখিয়া বিদ্বন্মণ্ডলী বিমোহিত হওত বাগ্দেবীর বরপুত্রকে কাব্য গতের সম্রাটের আসনে বসাইতে কুণ্ঠানুভব করেন না, যে অমৃতের সৃষ্টি করিয়া কালিদাস মর হইয়া গিয়াছেন, সেই সকল অমূল্য কাব্যের মধ্যে "মেঘদূত" অন্যতম। সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই ই "মেঘদূতের" কবিত্বসুধা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ সংস্কৃতানভিজ্ঞগণই ই অমৃতাস্বাদনে বঞ্চিত। অনেকেই মেঘদূতের গদ্য ও পদ্য অনুবাদ করিয়াছেন। আমরাও ামাদের প্রতিনিধির পাঠকবর্গকে মেঘদূতের মূল শ্লোক ও তন্নিম্নে ইহার পদ্যানুবাদ উপহার রূপ প্রদান করিলাম। "রাখালের হাতে যেমন শালগ্রাম শিলার মরণ" হয়, আমাদের তেও কালিদাসের সেই দশা ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।]

পূর্ব্বমেঘ।

১

শ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥

শাপগ্রস্ত যক্ষ এক প্রভু রোষানলে
বসিয়া নমেরুতলে চিত্রকূট শিরে,
প্রিয়ার বিহনে ভাবে ভাসি আঁখিজলে।
প্রিয়া ছাড়ি এক বর্ষ যাপিবে কি করে।
চক্ষে বহে নীরধার,
কান্তিশূন্য শীর্ণাকার
নিষ্প্রভ শশাঙ্ক যেন রাহুর কবলে,
কাঁদে যক্ষ নীরবেতে বসিয়া বিরলে॥

২

স্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥

দৃঢ় শাল-সম বাহু এবে অস্থি শেষ,
মণিবন্ধে মণিময় আহিক বলয়,
হৃদয়ে বিরহ বজ্র যাতনা অশেষ,
হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাস দিন রাত বয়!
এক দিন শূন্য মনে
আষাঢ়ে প্রথম দিনে,
মত্ত করী সম মেঘ দেখি গিরিতলে
মনেতে পড়িল কান্তা-বদন-কমলে।

৩

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥

দুরন্ত বিরহ যার হৃদয়ে কখন
করে নাই বজ্রাঘাত, সে কি কোন কালে
প্রাবৃটের মেঘে শোভা করিয়া দর্শন
বিরলেতে ছাড়ে শ্বাস? হৃদি কি উথলে?
ভাবে যক্ষ এক মনে,
প্রিয়তমা চন্দ্রাননে,
উন্মত্ত পাগল সম বাহ্য জ্ঞানহারা;
কপোল বহিয়ে গণ্ডে পড়ে জল ধারা।

৪

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।

স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥

এইরূপে এক মাস হইল বিগত ;
হৃদয়ের ভাব যক্ষ নারিল লুকাতে।
মনেতে ভাবিল মেঘে করি নিজ দূত
পাঠাইয়া দিবে নিজ প্রিয়ার কাছেতে।
তাই হ'য়ে কুতূহলি
আরণ্য কুসুম তুলি
যথাবিধি উপচারে জলদে পূজিল।
স্বাগত কুশল বার্ত্তা তারে জিজ্ঞাসিল।

৫

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥

ধন্য দেব রতিপতি তোমার কৌশল !
তোমার প্রভাবে নর হারায় চেতনা।
তা না হলে কেন যক্ষ হইয়ে পাগল
অচেতনে সচেতন করিবে কল্পনা ?
বিনয়ে কাতর স্বরে,
বলে যক্ষ যোড় করে
সম্ভাষি জলদে, চাহি করুণ নয়নে।
খুলিল হৃদয় যেন সখা সম্মিলনে।

৬

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্ দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥

"পুষ্করের বংশধর বাসবসহায়
ধন্য তুমি মহাভাগ সর্ব্বগ জলদ ;
যাচি ভিক্ষা কর যোড়ে দাওহে আমায়।
সজ্জন যাচক জনে সদাই বরদ।
সজ্জনের অস্বীকার
শ্রেয় বলি বার বার,
অসজ্জনের দয়া কাব নাই মোর ;
তাই হে জানাই দুঃখ তোমার গোচর।

৭

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা ॥

"জানি তুমি হে বারিদ, দারুণ আতপে
উত্তপ্ত জনের কায়া কর হে শীতল,
অথবা যাহারা তপ্ত বিচ্ছেদ-সন্তাপে
তাহাদের হিয়া মাঝে ঢাল শান্তি জল।
দয়া করি হে সুবোধ
রাখ এক অনুরোধ—
যাও মিত্র দয়া করি অলকানগরী,
হর-শির-শশী-করে উজ্জ্বল যে পুরী।

৮

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥

"দেখা দাও যবে তুমি ওহে জলধর
সুনীল আকাশে, জানি বিরহিণীগণ
কৃতজ্ঞ নয়নে তোমা' করে দরশন
কান্ত লাভ আশা করি' হরষ অন্তরে।
মোর মত ভাগ্যহীন,
মোর মত পরাধীন
নহে যারা, তারা কভু তোমা দরশনে
ভুঞ্জে কি প্রবাসে দুঃখ প্রিয়ার বিহনে ?

৯

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥

"যবে তুমি শূন্য পথে করিবে গমন,
চাতক গাহিবে গান তোমা দরশনে,
সুশীতল মন্দ মন্দ বহিবে পবন,
আদর করিবে সবে তোমারে যতনে।
গর্ভাধান-কালাগত
ভাবি বক-বধূ যত
কলরবে তব গুণ করিবে বর্ণন,
যবে তুমি বায়ু ভরে করিবে গমন।

১০

ত্বাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥

"কিছু কাল অবিরাম গমনের পরে
পাবে মিত্রবর মিত্র-পত্নী দরশন।
আমা বিনা সে ললনা জানে না অপরে,
মোর আশা-পথ সদা করে নিরীক্ষণ।
আমার বিচ্ছেদ বাণ
বিনাশিত তার প্রাণ,
এক মাত্র আশাবৃন্তে আছে হে সে ফুল ;
নতুবা সে এত কাল হইত নির্ম্মূল।

১১

কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আ কৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥

" যে নিনাদ শুনি তব দেবী বসুমতী
ফলে ফুলে সুসজ্জিত হয়েন সত্বর,
সেইরূপ মৃদু নাদ শুনি শীঘ্রগতি
রাজহংসকুল তব হবে সহচর।
মানস গমন কালে
মেঘ ! তব সহ মিলে
মৃণাল পাথেয় করি লইবে সত্বর ;
যাবে তব সনে তারা কৈলাস শিখর।

১২

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥

"এই সেই চিত্রকূট যার শ্রোণী তলে
রঘুকুলপতি রাম স্থাপিলা চরণ,
ইনি বন্ধু তব, তাই আসি কুতূহলে
(একবার গিরি সনে কর আলিঙ্গন)
প্রতি বর্ষে বর্ষা-কালে
মেঘ ! তব সহ মিলে
বিরহ জনিত অশ্রু করে বরিষণ।
তব মিত্র এই গিরি পবনবাহন !

১৩

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ॥

শুন সখে যেই পথে করিবে গমন,
তাহার বর্ণনা করি শুন সাবধানে।
তার পর বলে দিব করিয়া যতন
কি কথা বলিবে মোর প্রিয়া সন্নিধানে।
পথে যদি জলধর
হও ক্ষীণকলেবর,
বিশ্রাম লভিও বসি পর্ব্বত শিখরে ;
জুড়াইও প্রাণ তব নির্ঝরিণী নীরে।

১৪

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥

"দেখিয়া তোমার ভীম ভীষণ মূরতি
সচকিতে বিদ্যাঙ্গনা চাহিবে আকাশে ;

ভাবিবে তোমারে দেখি যত রূপবতী
গিরিচূড়া আকাশেতে যেতেছে কি ভেসে ?
পথেতে দিগ্‌গজগণ
করে যদি নিবারণ
শুনিওনা ; ক'র তুমি উত্তরে গমন
দুখের কাহিনী মোর করিয়া বহন।

১৫

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তা-
দ্বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ॥

"ঐ যে সম্মুখে শোভে চারু রামধনু !
বিচিত্র ভূষণে যেন ভূষিত শরীর,
শোভিবে তোমার কণ্ঠে ওহে শ্যামতনু !
ময়ূর চূড়ায় যথা শোভে যদুবীর।
হইবে দ্বিগুণ শোভা
মুনিজন মন-লোভা ;
তোমার শ্যামল দেহে শোভিবে সুন্দর,
জুড়াইব দেখি তব রূপ মনোহর।

১৬

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিবলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎপশ্চাদ্‌ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ॥

সরলা কৃষক-বালা তোমা দরশনে
চেয়ে রবে স্থির নেত্রে কৃতজ্ঞ অন্তরে,
তব দয়া বিনা শস্য হয় না যতনে
জানে তারা তাই তোমা দেখি হর্ষ মনে।
ক্ষণ কাল বরিষণ
করিয়া তাদের মন
সন্তুষ্ট করিয়া সখে করিও গমন
পুনরায় উত্তরেতে—রাখ নিবেদন।

১৭

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ

"ধারা পাতে দাবানল করিও নির্ব্বাণ
আম্রকূট গিরি দেহে। সে বড় যতনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা সম্যক বিধানে।
অকৃতজ্ঞ নহে সেই রেখ তুমি মনে,
সদাচারে ক্ষুদ্র প্রাণী
বশ হয় মনে জানি।
আম্রকূট মহা গিরি উচ্চ মন তার,
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দিবে উপহার।

১৮

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥

"সুপক্ক রসাল ফলে শোভিত ভূধর,
ধরা-পয়োধর সম শরীর তাহার ;
পবন-সহায়ে তুমি ওহে জলধর !
গিরি-চূড়া মাঝে গিয়া করিও বিহার।
তাহা হ'লে গিরিবর
শোভিবে হে নিরন্তর
অমর মিথুন সম তব সম্মিলনে,
নায়ক অলক যেন নায়িকার স্তনে।

১৯

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য॥

"বননারী যথা কেলি করে নিরন্তর,
তেয়াগি যাইও তুমি সে সব কানন

বরষি সলিল তথা ; ওহে মিত্রবর
লঘুদেহ হবে তুমি তাহে বরিষণ।
সে গিরির পদতলে
দেখ তুমি কুতূহলে,
শোভিতেছে রেবা নদী, যেন চিত্রে লেখা ;
অথবা গজের দেহে চন্দনের রেখা।

২০

ছায়াস্তস্যৈ বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
ন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
ক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়॥

"বরিষণে লঘুদেহ হইলে তোমার
রেবার নির্ম্মল জল করিও সেবন।
বনহস্তী যথা সদা করে হে বিহার
মদগন্ধে সুবাসিত মানসমোহন।
অন্তরে হইলে সার
বায়ুর কি সাধ্য আর,
তোমারে লইয়া উচ্চে করিবে গমন ;
অস্থির চঞ্চল হয় সার-শূন্য জন।

২১

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈ-
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্॥

যে পথে হরিণ শিশু আনন্দে বিহরে,
ভূমিরম্ভা যেই পথে সদা শোভা পায়,
কদম্ব কুসুম যথা ফোটে থরে থরে,
মৃত্তিকার গন্ধ যথা মত্ত করি মাতায়।
সেই পথে জলধর
যেও তুমি নিরন্তর,
দেখিয়া পথের শোভা জুড়া'ও নয়ন ;
তোমারে অধিক বলা নাহি প্রয়োজন।

২২

অন্তোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দ্দিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি॥

যবে তুমি জলধর করিবে গমন,
চাতক সলিল পানে জুড়াইবে জ্বালা।
হৃষ্ট মনে সিদ্ধগণ করিবে গণন
এক দুই করি যত বলাকায় মালা।
শুনি তব গরজন
সচকিতে আলিঙ্গন
করিবে কান্তারে ভয়ে সিদ্ধনারীগণ ;
হাসি সিদ্ধগণ তোমা করিবে বর্দ্ধন।

২৩

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিয়াসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজললয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তমাশু ব্যবস্যেৎ॥

জানি আমি প্রাণসখে গমন সময়
বনজ কুসুম গন্ধে হইবে পাগল।
বিলম্ব হইবে তব বলিনু নিশ্চয়
পশিবে নাসায় যবে স্নিগ্ধ পরিমল।
ময়ূর ময়ূরীগণ
কেকা রবে সম্ভাষণ
করিলে তোমায় সখে ! যেও ত্বরা করি,
নীরবে কাঁদেন যথা মোর সহচরী।

২৪

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ
র্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ॥

দশার্ণ দেশেতে সখে যাইবে যখন,
কুসুমে কেতকী বন হইবে ভূষিত ;

রচিবে আনন্দে নীড় গ্রাম্য পক্ষিগণ,
দেখিবে তোমায় সবে হয়ে হরষিত।
পক্ক তণ্ডু আভরণে
শ্যাম হবে তরুগণে,
তোমা সনে হংসগণ রহিবে তথায়;
সকলি সুন্দর হবে যাইবে যথায়।

২৫

তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধ্বা।
নীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি॥

দশার্ণের রাজধানী বিদিশা নগরী,
বেত্রাবতী নদী যায় ধোয়ায় চরণ।
পথের যন্ত্রণা তথা যাইবে পাশরি
সুশীতল বারি পান করিবে যখন।
চঞ্চল তরঙ্গবতী
কল্লোলিনী বেত্রাবতী
আদরে অধর-সুধা করাইবে পান;
ভুলিবে পথের কষ্ট জুড়াইবে প্রাণ।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কবিতাবলী।

বন্ধুর প্রতি।

১

জীবনের সহচর প্রণয়ের ধন
ভাল বাসি সখা তোমা জীবনের মত;
হসিত মুরতি তব সুন্দর আনন,
হৃদয় কমলে মম জাগিছে সতত।

২

বাল্যের প্রণয় আর যৌবনের প্রীতি,
অচ্ছিন্ন প্রণয়-ডোরে অতি সযতনে
বাঁধিয়া রেখেছি সখা মনে পেয়ে ভীতি,
পাছে কেহ ছিন্ন করে ঘোর আকর্ষণে!

৩

বাল্যকালে কুতূহলে প্রফুল্লিত মনে
খেলিতাম দুই জনে আনন্দে অপার;
সুধাসিক্ত করিতে হে অমিয় বচনে
এমন সুদিন পুনঃ হইবে কি আর?

৪

অমৃত বচনে সেই মাধুর্য্য-লহরি
কখন উঠিয়া মম হৃদয়-নদেতে
হাস্য-বায়ু সংযোগে ধীরি ধীরি করি,
ভাসাইবে প্রাণমন মৃদুল স্রোতেতে?

৫

ভাবিতে তোমার গুণ হৃদি পুলকিত,
নাচিয়া উঠিছে রক্ত ধমনী ভিতরে,
প্রতি কেশরন্ধ্রে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত
হতেছে সর্ব্বদা তব দরশন তরে।

৬

যত দিন জীব আমি, দেহে রবে প্রাণ,
কখনই ভুলিব না তব গুণ রাশি।
বর্দ্ধিত হউক তব যশ-কীর্ত্তি-মান,
অমর সমীপে যাচি তাই দিবানিশি।

৭

এস এস প্রিয়তম এস একবার
উভয়ে মিলিত হই আনন্দিত মনে।
প্রণয় কুসুমে গাঁথি সুচিকণ হার
দোলাই তোমার গলে অতি সযতনে।

শ্রী প, প, হা।

রেভেনসাউ কলেজ—কটক।

কোন আত্মীয়ার পতিবিয়োগে।

১

কাল যার হেরিয়াছি সহাস্য আনন,
সুখ মনে সখি সনে বাক্য আলাপনে,
কেন আজ শুনি তার করুণ রোদন,
অনর্গল ঝরে অশ্রু নয়নের কোণে?
কেন সদা বহে শ্বাস,
কেন করে হা হুতাশ!
কেন করে অভাগিনী করুণ রোদন;
কাল হেরিয়াছি যার সহাস্য আনন?

২

কেন কাঁদে কি করিয়া করিব প্রকাশ!
ভাঙ্গিয়াছে এতদিনে সুখের সংসার,
অভাগীর এতদিনে হ'ল সর্ব্বনাশ!
ফাকি দিয়ে চলে গেছে প্রাণনাথ তার।
সংসার-জলধি নীরে
সহায় করিয়া যারে,
ভেসেছিল ধীরে ধীরে সেত নাই আর;
তাই কাঁদে অভাগিনী করি হাহাকার!

৩

দেখেছিল ধ্রুবতারা দিগন্তের কোলে
তারে লক্ষ্য করি বালা চলিত অবাধে;
সংসারের যত জ্বালা গিয়াছিল ভুলে।
(হায় বিধি কেন বাদ সাধিলে সে সাধে!)
মেঘে ঢাকা ধ্রুবতারা,
তাই হয়ে পথহারা,
নীবিড় সংসার বনে করিছে ভ্রমণ;
জীবনের ধ্রুবতারা গিয়াছে যখন।

৪

একটি সুতায় বাঁধা যথা দুটি ফুল,
ধীরে ধীরে ভেসে যায় ভাগীরথী জলে;
বহুদূরে গিয়া পড়ে হারা হয়ে কূল,
তথাপি নিশ্চিন্ত মনে ঊর্ম্মিসনে দোলে।
পরস্পর আলিঙ্গন
ক'রে থাকে দুইজন,
পরস্পর মনে জানে ছাড়িব না আর,
ছিঁড়িবে না এ জীবনে পরিণয় হার।

৫

কিন্তুরে কালের বশে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে
সুতা ছিড়ে দুটি ফুল ছুটিল দু ধারে;
একটি গেলরে ভাসি ভাগীরথী স্রোতে,
আর একটী গিয়া পড়ে কাদার উপরে।
কাদামাখা কলেবর,
ছিন্ন ভিন্ন নিরন্তর,
উলটি পালটি কাঁদে কে নিবারে তায়?
প্রাণের বাঁধন তার ছিঁড়িয়াছে হায়!

৬

প্রাণের প্রতিমা তার নিবিড় আঁধারে
লুকায়েছে চিরতরে। কারে অভাগিনী
হৃদি সিংহাসনে রাখি প্রেম প্রীতি ভরে
পূজিবে প্রসন্ন মনে দিবস রজনী?
দারুণ সংসারানলে
যবে প্রাণ যাবে জ্বলে,
কার সুধামাখা কথা জুড়াইবে তায়,
কোথায় জুড়াবে বালা সংসার জ্বালায়?

৭

অভাগিনি! হিন্দুকুলে লভেছ জনম,
সতীত্ব কাহারে বলে শিখাও জগতে;
জগতে দেখাও সতী হিন্দুর ধরম,
শিখুক জগৎ আজ তোমার কাছেতে।
শূন্য হৃদি সিংহাসন
রাখিও না একক্ষণ;
গেছে পতি বিশ্বপতি আছেন সহায়,
সিংহাসনে যত্ন করি বসাও তাঁহায়।

৮

হিন্দু সতী পতিহীনা হলেও কখন
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা করেনা প্রকাশ,

জগদীশে করে তারা প্রাণ সমর্পণ ;
জানে তারা এ সংসার ক্ষণিক আবাস।
"বঙ্কিমের নিশি" মত
ভাব কৃষ্ণে অবিরত ;
কর সতী ঈশ্বরেতে প্রাণ সমর্পণ
সুপবিত্র হিন্দুকুলে জন্মেছ যখন।

৯

প্রত্যেক মানবে কর পুত্রতুল্য জ্ঞান,
প্রাণের উদ্দেশ্য কর পর উপকার,
হাসি মুখে নিজ স্বার্থ দাও বলিদান,
দেখিবে আবার যদি সুখের সংসার।
মুছ সতী অশ্রু ধারা
হ'ওনাক আত্মহারা
আর্য্য নারী বিপদেতে হয়না কাতর,
সহস্র অশনি পাতে কাঁপেনা অন্তর।

১০

যদিও বালিকা তুমি তবু বুদ্ধিমতী,
(অবোধ জনের সুধু রোদন সম্বল)
জানি আমি প্রৌঢ় প্রায় তোমার প্রকৃতি ;
কি করিবে ? মুছ বালা নয়নের জল।
হিন্দুর ললনা তুমি,
তাই এত বলি আমি।
অহিন্দুকে এসকল উপযুক্ত নয়।
হিন্দুর রমণী সতী আদর্শ ধরায়।

ওরে আমার সোণার ছেলে।

১

এতদিন কোথা ছিলি ওরে
আমার সোণার ছেলে ?
এবার তোকে ছাড়্‌ব নাক
রাখ্‌বো বেঁধে মায়ের কোলে।
যখন বড় হবে ক্ষুধা, খেতে দিব স্নেহের সুধা,
মায়ের বুকে থাকবি শুয়ে
রেতের বেলা ঘুমুটি পেলে।
এত দিন কোথা ছিলি
ওরে আমার সোণার ছেলে ?

২

কচি কচি নয়ন মুদে
থাকবি যখন ঘুমের ঘোরে,
ব'লে দিব স্বপনেরে
করবে খেলা নিয়ে তোরে।
রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট দুটিতে, ফুট্‌বে হাসি স্বপনে
ছোট ছোট গাল দুটী তোর
নড়্‌বে হাসির তুফান ভরে,
সেই হাসিটি লুকিয়ে থেকে
দেখ্‌বো সবাই স্নেহভরে।

৩

(তোর) স্বপন সখা ভয় দেখিয়ে
ভাঙ্গিয়ে যখন দিবে ঘুম,
তাড়াতাড়ি নিয়ে কোলে
চাঁদমুখেতে খাব চুম্‌।
নিয়ে যাব বুকে করে, এই পৃথিবীর একটী ধারে
যে ধারেতে হৃদয় ভরে
হাসেরে চাঁদ মনের সাধে, ((
সে ধারেতে নিয়ে গিয়ে
চাঁদ দেখাব সোণার চাঁদে।

৪

তোরই মত সরল প্রাণে
যে দেশেতে কুসুম হাসে,
সেই দেশেতে নিয়ে গিয়ে
রাখ্‌বো তোরে ফুলের পাশে।
ফুলের পাশে রেখে তোরে, দেখব সবে নয়ন ভ'রে
কার শোভাতে হৃদয় হরে
দেখবো তখন মনে মনে,
কোন ফুলটীর শোভা বেশী
মিলিয়ে নেব ফুলের সনে।

৫

ছোট ছোট সোণার পাখি
যে দেশেতে গায়রে গান,
যে দেশেতে যার মাসই
মাঠে থাকে সবুজ ধান,
দেশেতে খোকা তোরে, নিয়ে যাব বুকে ক'রে,
সেই দেশেতে থাকবি সুখে
পাখির সনে কুসুম মাঝে,
যে দেশেতে শুকায়না ফুল
কুটিলতার দারুণ ঝাঁজে।

৬

ঘুমো আমার সোণার বাছা
আর কাঁদিস্‌নে মায়ের কোলে ;
ঘুমাইলে দিব আমি
মালা গেঁথে গগন-ফুলে।
আমার সোণার যাদু, খাওয়াব তোয় ফুলের মধু
কাঁদ্‌লে পরে স্নেহের ডোরে
বাঁধ্‌বে তোরে সবাই মিলে,
মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়
ওরে আমার সোণার ছেলে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ফুলের বিয়ে।

১

জ্যোছনার সাথে ফুলের বিয়ে !
আয়রে মলয় সুরভি নিয়ে !
শশধর সুধা বরণডালা
মাথায় করলো তারকামালা,
সাজ লো সাজ।
ফুটিল কলি ;
প্রেমিক অলি
গুন্‌ গুন্‌ রবে বাজ্‌রে বাজ্‌।

২

তড়িতের হাসি, পিকের তান,
নির্ঝরের চুমো, তটিনীর গান,
শাখি ঝন্‌ ঝন্‌, লতায় বাট,
প্রেমিকের প্রাণে প্রেমের হাট,
আসবে আজ।
জাগ্‌বে বাসর।
রাখ্‌বে আসর
চতুর ভ্রমর সাধি আওয়াজ।

৩

বহিছে আজি বসন্ত বাতাস,
জ্যোছনায় আজি প্রফুল্ল আকাশ;
ফুলের সৌরভ চৌদিকে ধায়,
কে যেন আজি গো জানায়ে দেয়
আজি সুদিন।
হয়েছে কিবা
প্রফুল্ল শোভা
জ্যোছনায় আজি ! স্তব্ধ এ ধরা।

৪

সুখ দুঃখ মোহ ত্যজহ আজি,
ভাসায়ে দেহ গো কলহ রাজি,
আনন্দ হৃদয়ে সবে গাও হে !
জ্যোছনা-ফুলের শুভ বিবাহে।
মিলিবে দোঁহে,
এ শুভ দিনে,
নূতন প্রাণে,
পথিক হইবে প্রেমের পথে !

৫

দেখিব বলে আজি দাঁড়াইয়ে,
গেলত সবাই উধাও হয়ে !
কোন জগতের কোথায় গিয়ে,
হবেরে এমন প্রেমের বিয়ে ?
কে পুরোহিত ?
গগন পানে
চাহিলে, প্রাণে—
হু, হু, হু—কে যেন হয়েছে তৃষিত !

৬

ছিঁড়িয়া গিয়াছে হৃদয়-তার,
ভাঙ্গা প্রাণ জোড়া লাগেনা আর!
জানিনু জগতে সঙ্গীত-সুর
যতই দুঃখের, তত মধুর!
হায় হুতাশ!
কত কি ছাই,
আনন্দে গাই,
প্রাণে প্রাণে বিয়ে দিই বারম্বার।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

গিয়াছে নিভিয়া।

১

সুখের প্রদীপ মম গিয়াছে নিভিয়া।
কেন তবে অন্ধকারে,
মরি মিছে ঘুরে ঘুরে,
দুঃখের তিমির মাঝে কি ফল থাকিয়া?
জীবনের সাধ যদি গেলরে মিটিয়া।

২

এইতরে সেই স্নিগ্ধ বকুলের তল।
এই খানে কত খেলা,
খেলিয়াছি ছেলে বেলা,
কুড়ায়েছি কত ফুল ভরিয়া আঁচল;
কেন এবে ভাল নাহি লাগে এ সকল?

৩

কৈশোরে দুজনে বসি এই তরুতলে,
ফুলেতে ভরিয়া ডালা,
গাঁথি চারু ফুল-মালা,
হাসি হাসি পরা'তাম পরস্পর গলে।
এবে সে আমার সাধ গিয়াছে রে চলে!

৪

এই খানে—এই সান্ধ্য গগনের তলে,
কত এলো-মেলো কথা,
কত সুখ-দুঃখ-গাথা,
কহিতাম ভাসি হায়! সুখের সলিলে।
সে অস্ফুট প্রেম কথা বহিত অনিলে।

৫

কোথা সে সুখের দিন—সে সুখ স্বপন?
কেন তবে স্মৃতি! আর
জাগাতেছ বার বার,
অতীতের সুখপূর্ণ শান্তি নিকেতন?
বিস্মৃতি সলিলে সব হও রে মগন।

৬

কেন তারা! একা তুমি আঁধারে মিশিয়া
হইয়াছ প্রভাহীন?
তোমার (ও) কি সুখ-দিন
জীবনের মত হায় গিয়াছে চলিয়া?
তবে আর একাকিনী কি ফল থাকিয়া!

৭

আসিবে না সুখ দিন যদি লো ফিরিয়া,
কেন মিটি মিটি করে,
জ্বলিতেছ এক ধারে,
এখন (ও) হৃদয়-মাঝে দুরাশা বহিয়া?
মিটিবে না আশা হেথা, যাও লো নিভিয়া

৮

আকাশ-কুসুম এ যে মানব-জীবন!
শৈশবের ধূলা-খেলা,
যৌবনে আশার লীলা,
নিমিষে লুকা'ল হায়! চপলা মতন।
হ'ল না ত এ জীবনে আশার পূরণ!

৯

কি ফল ধরিয়া তবে নিরাশ-জীবন?
সুখ যদি ফুরাইল,
আশা যদি চলে গেল,
কেন তবে শূন্য প্রাণে বৃথায় রোদন?
হ'বে না জেনেছি হেথা আশার পূরণ!

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

নেপোলিয়নের শেষ জীবনী।

(প্রথম খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠার পর)

মহাবীর নেপোলিয়ন আমেরিকা গমনাশা ত্যাগ করিলেন। ম্যালমেসনে (Malmasion) অবস্থানও তাঁহার বীর-হৃদয়ে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তিনি রসফোর্ট (Rochefort) গমনে কৃতসংকল্প হইলেন। রজনী সমাগমে প্রিয় সুহৃদ কলেনকোর্ট (Coulaincourt) ও প্রাণের দুহিতা হর্টেন্সের (Hortense) নিকট নিরতিশয় করুণতা-সহকারে বিদায় ভিক্ষা করিলেন; এবং যে মনোহর প্রমোদ উদ্যানে একদা তিনি রাজ-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বীরদর্প সহকারে প্রাণপ্রিয়া যোসেফাইনের (Josephine) সহিত প্রেম-পুলকিত-চিত্তে সময় ক্ষেপ করিতেন, আজ সেইখানে রজনীর গভীর ছায়ায় চির জীবনের জন্য স্নেহ মমতার নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বীর-হৃদয়ে এ চিন্তা একবারও উদিত হইল না যে, জীবনের অবশিষ্ট কাল তাঁহাকে অকূল সাগরের অগাধ বক্ষে—সেণ্টহেলেনায় (St. Helena) শিলা-সঙ্কুল বন্ধুর প্রদেশে অতিবাহিত করিতে হইবে।

যাহা হউক তিনি ম্যালমেসন(Malmasion) ত্যাগ করিয়া বহু পরিশ্রমানন্তর চতুর্থ দিবসে রসফোর্ট (Rochefort) উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের আগমনে রসফোর্ট ও তৎপার্শ্বস্থ স্থানে মহা আনন্দের কোলাহল উঠিল। চতুর্দ্দিক "সম্রাট চিরঞ্জীবী হউন" এই ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু নেপোলিয়ন রসফোর্টে অধিক দিন অবস্থান করিতে পারিলেন না; তিনি অবিলম্বে জলপথে ফ্রান্স ত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন। সত্বর দুইখানি জলতরী প্রস্তুত হইল; বীরবর নেপোলিয়ন ফরাসীভূমি ত্যাগ করিলেন। যে ভূমিকে নেপোলিয়ন একদা অধীনতার দুর্ম্মোচ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্ত ও যথেচ্ছাচারের সর্ব্বগ্রাসী কবল হইতে রক্ষা করিয়া গৌরবের উচ্চতম শিখরে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, যে ভূমি তাঁহার বীরত্ব-গরিমায় বলীয়ান্ হইয়া মহোল্লাসে জগতের বক্ষে বিজয়পতাকা উড্ডীন ও সুখ শান্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই বীরত্বের লীলাক্ষেত্র ও স্বাধীনতার নিদানভূমি ফরাসী রাজ্য আজ তিনি ত্যাগ করিয়া চলিলেন। স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এই তাঁহার শেষ বিদায়।

সাগর-বক্ষে কিয়দ্দূর গমনের পূর্ব্বেই ইংরাজ-সৈনিক কাপ্তেন মেটল্যাণ্ড (Captain Maitland), বেলারফন্ (Bellerphon) নামক রণপোত সাহায্যে নেপোলিয়নের সম্মুখীন হইলেন। নেপোলিয়নের তরণী বিপক্ষ ইংরাজের হস্তগত হইল—নেপোলিয়ন ইংরাজের আয়ত্তাধীন হইলেন! এত দিনে ফরাসী মন্ত্রীসভার ঘৃণিত নীচাশয়তা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষময় ফল ফলিল। কালের কি কুটিল গতি; ভাগ্যচক্রের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে শত শত রাজন্যবর্গ যাঁহার পদতলে স্থান পাইলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিতেন, যাঁহার ভেরীর গভীর নিনাদে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত—আলোড়িত হইত, যাঁহার নামোচ্চারণে শত শত নরপতির শিরোমুকুট-মৃত্তিকা আঘ্রাণ করিত, সেই বীরপ্রবর মহাবলী নেপোলিয়ন আজ ঘোর প্রতারণার জালে

জড়িত হইয়া ইংরাজ সেনানীর হস্তগত হইলেন। জগৎ! তোমার নাম অবর্থ হইল!

সম্রাট ইংরাজ-তরীতে আরোহণ করিলেন। পোতস্থ ইংরাজ-সৈনিক ও কর্ম্মচারিগণ সমুচিত সম্মান-সহকারে সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তিনিও ইংরাজের জাতিগত ঔদার্য্যের উপর প্রত্যয় স্থাপন পূর্ব্বক,ইংলণ্ডেও এতদনুরূপ সম্মান পাইবেন এই বিশ্বাসে, হৃদয়াবেগ সংবরণ করিয়া ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। ২৫ শে জুলাই (১৮১৫) তাঁহারা প্লিমাউথ বন্দর (Plymouth) উপস্থিত হইলেন।

তরী কূলস্থ হইবা মাত্র সম্রাট, ইংরাজ-কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারে সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার প্রতি তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে যে প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন, এখন আর তাহার কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। চতুর্দ্দিকে সৈন্যশ্রেণী আসিয়া প্লিমাউথ বন্দর সুরক্ষিত করিল। দুইখানি রণতরী সসজ্জ হইয়া বেলারফনের (Bellerphon) চতুর্দ্দিকে প্রহরীরূপে নিযুক্ত হইল। সম্রাটের প্রতি ঈদৃশ অসম্মানসূচক ব্যবহারে কাপ্তেন (Captain Maitland) মনে মনে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন; কিন্তু কি করিবেন, তাঁহার আর কোন ক্ষমতা নাই। এখন সমস্ত বিষয় ইংরাজ মন্ত্রীদিগের ইচ্ছাধীন। জানিনা—রাজশক্তির পূর্ণাবতার, স্বাধীনতার জলন্ত ছবি, প্রতিভা ও ভুজবীর্য্যের অলৌকিক মূর্ত্তি, বীরেন্দ্রসমাজের শিরোভূষণ নেপোলিয়ন আজ ইংরাজ-সচিবের নিকট কেন ঈদৃশ সম্মানের(?)উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন! সভ্য ইংরাজ! তোমার সভ্যতা ও মহত্ত্বকে ধন্য! জগতের ইতিহাসে তোমার সুযশ চিরদিন ঘোষিত হইবে।

ইংরাজ-সচিবের এতাদৃশ ব্যবহারে সম্রাটের হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত বোধ হইল না, তিনি প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। কিন্তু বিবেচক পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাঁহার গভীর হৃদয়ের অভ্যন্তরে কি ভীষণ বাত্যা প্রধাবিত হইতেছে!

অনন্তর ৩০শে জুলাই অধস্তন রাজমন্ত্রী স্যর হেনরী ব্যানবেরী (Sir Henry Banbury) এ্যাডমিরল্ কিথের (Admiral Kith) সমভিব্যাহারে নেপোলিয়নের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একখণ্ড ক্ষুদ্রলিপি তাঁহার নিকট পাঠ করিলেন। পত্র খানিতে কাহারও কোন স্বাক্ষর বা ইংরাজরাজের কোন সমনুমোদন চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না, অথচ এই সামান্য লিপি খণ্ডে যে নিদারুণ বাক্যাবলীর সমাবেশ ছিল, তাহা সভ্য জগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অশ্রুতপূর্ব্ব। ইংরাজ এইখানে স্বীয় রাজপ্রথার মস্তকে পদাঘাত করিলেন এবং জগতের বক্ষে চির অপরাধী হইলেন। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কঠোর তুলিকায় এই ইংরাজমহিমা চিরদিন অঙ্কিত হইবে। স্যর ব্যানবারি, নেপোলিয়নের সম্মুখে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পাঠ করিলেন—"যদি ইংলণ্ড,আপনার যথেচ্ছাচারের দমনপূর্ব্বক ইউরোপে শান্তি সংস্থাপন না করে, তাহা হইলে ইংরাজজাতির নিকট এবং সমগ্র ইউরোপের নিকট ইহার দায়িত্ব চিরদিন রহিয়া যাইবে। অতএব ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আপনি আজীবন স্বাধীনতাচ্যুত হইয়া সেণ্টহেলেনা (St. Helna) দ্বীপে ইচ্ছানুরূপ তিন জন স্বীয় ভৃত্য ও বার জন আত্মীয় লইয়া বাস করিবেন। এই দ্বীপ স্বাস্থ্যকর স্থান এবং সুদূরে অবস্থিত হওয়ায় সাধারণ শান্তির অনুকূল। আপনি তথায় নিরতিশয় সতর্কতা সহকারে রক্ষিত হইবেন।" এই কঠোর আদেশলিপি

পাঠান্তর ইংরাজ কর্ম্মচারী সম্রাটের দ্রব্যাদি পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। কার্য্যটী অতি ভয় ভয় করিয়াই সমাধা করিলেন। সম্রাটের পরিহিত পরিচ্ছদ অনুসন্ধানেরও আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু সে তেজঃপুঞ্জময় বীরদেহের নিকটবর্ত্তী হইতে কাহারও সাহস হইল না, দর্শনমাত্র সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। অতঃপর তাঁহার তরবারী গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল! কিথ্ (Admiral Kith) সসম্ভ্রমে সঙ্কুচিতভাবে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তরবারী সমর্পণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। পুরুষসিংহ নেপোলিয়ন ইংরাজ রাজ-পুরুষদিগের হস্তে এতাদৃশ জঘন্য ব্যবহারেও এ পর্য্যন্ত গম্ভীর অবিচলিত ভাবে ছিলেন, কিন্তু তরবারী সমর্পণের কথা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র শত শত সমরক্ষেত্রের বীরত্ব কাহিনী স্মৃতিপথে জাগরিত হইল। তিনি সহসা বিচলিত ভাব ধারণ করিলেন, বীর-ধমনীতে বীর-শোণিত তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় সঞ্চালিত হইয়া উঠিল, বদনমণ্ডলে অলৌকিক ভাবের সমাবেশ হইল, তেজোময় দৃষ্টি সংযত ভাব ধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির বিকাশ করিল, বীর ভুজ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ভুবন-বিজয়ী তরবারী দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিল। সে জলন্ত বহ্নির নিকট সমগ্র জগৎ ভস্মীভূত হয়; সামান্য ইংরেজসৈনিক দূরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। পার্শ্বস্থ কর্ম্মচারী, কিথ্ সাহেবকে স্বীয় কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেন, কিন্তু তিনি বিকট অস্বাভাবিক স্বরে কর্ম্মচারীর প্রতি ভীষণ ভ্রূভঙ্গি করিয়া উঠিলেন—তরবারীর কথা কাহারও মনে আনিতেও সাহস হইল না, সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

৯ই আগষ্ট নেপোলিয়নকে সেণ্ট হেলেনা প্রেরণ করিবার দিন স্থির হইয়াছিল। উক্ত দিবস বহুসংখ্যক সৈন্য সংরক্ষিত নর্দাম্বরলণ্ড (Northumberland) নামক রণপোতে নেপোলিয়নকে আরোহণ করাইয়া সেণ্টহেলেনাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ হইল। নেপোলিয়ন আজ বন্দীভাবে অকূল সাগরে ভাসিলেন! শত্রুর মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল! বীর জীবনের শেষাঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল।

১৫ই অক্টোবর নেপোলিয়ন সেণ্টহেলেনা দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। অমনি প্রদোষের ছায়া গভীর হইতে গভীরতর হইয়া সেণ্ট হেলেনা দ্বীপকে শোকের অন্ধকারময় পরিচ্ছদে পরিবৃত করিল। নেপোলিয়ন বিষণ্ণ ও মৌনভাবে পোতমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পর দিবস ইংরাজ কর্ম্মচারী যামিনীর নিবিড় কালিমার মধ্যে নেপোলিয়নকে ক্ষুদ্র তরণী সংযোগে দ্বীপে অবতরণ করাইল। জেমস্ টাউন্(James town) নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে একখানি সামান্য কুটীরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নেপোলিয়নের বন্ধুগণ সামান্য একখানি লৌহময় খট্টোপরি একটী সামান্য শয্যা বিস্তৃত করিয়া দিলেন। জগতের সম্রাট সেই শয্যোপরি শয়ন করিলেন। নেপোলিয়নের আগমন বার্ত্তায় যাবতীয় জানপদবর্গ মহা উৎসুক চিত্তে দেবপ্রতিম মহাপুরুষকে দর্শনাভিলাষে উক্ত কুটীরের চতুঃপার্শ্বে সমবেত হইল—দেখিল বীর হৃদয় আজ অবসন্ন, বিষণ্ণ, চিন্তার কালিমাতে কলঙ্কিত।

নেপোলিয়ন বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া এই বিচিত্র শয্যায় নিদ্রিত হইলেন। সম্রাটের প্রথম রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হইল। পর দিবস তাঁহার জন্য যে বাসভবন নির্ম্মিত হইতেছিল,তদ্দর্শন মানসে অতি প্রত্যূষে তিনি অশ্বারোহণে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেখিলেন

সমুদ্রবক্ষের ১৫০০ ফিট উচ্চে একটী পর্ব্বত গুহাভ্যন্তরে লং উড(Long-wood) নামক এক ক্ষুদ্র কুটীর প্রস্তুত হইতেছে। দেখিবা মাত্র তাঁহার হৃদয় সহসা চমকিত হইল। যাহা হউক তথা হইতে তিনি জেম্‌স টাউনে(James town) প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং আগমনানন্তর ইংরাজ সৈনিকের নিকট কহিলেন যে, যাবৎ লং উড্ নিবাস সম্পূর্ণ না হয়,তাবৎ তিনি নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র কুটীরে একাকী বাস পরিবর্ত্তে সন্নিকটস্থ ব্যালকম্ (Balcomb) নামক জনৈক ইংরাজের সপরিবার গৃহে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। ইংরাজ-সৈনিক তাহাতে স্বীকৃত হইলেন; নেপোলিয়ন ব্যালকম সাহেবের বাটীতে অক্টোবর ও নবেম্বর মাস যাপন করিলেন। অতঃপর ১০ই ডিসেম্বর তাঁহাকে লং উড্ নিবাসে স্থানান্তরিত করা হইল। স্যর হড্‌সন লো (Sir Hudson Lowe) নামক জনৈক জঘন্যবৃত্ত ইংরাজ এই দ্বীপের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নেপোলিয়ন তাঁহার আদেশাধীন বন্দী রহিলেন। এই ক্ষুদ্রমনা ইংরাজ তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় যে প্রকার অপমান ও নির্য্যাতন করিয়াছিল, তাহা সভ্য-নামধারী ইংরাজের চির কলঙ্কের বিষয়। এই অবস্থায় তিনি জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। দুর্ব্বিষহ অপমান,নিদারুণ নির্য্যাতন ও কঠোর অত্যাচারে তাঁহার অবসন্ন দেহ-মন বিকল হইল—কর্ম্মপ্রাণ জীবন কর্ম্মের অভাবে শিথিল হইয়া পড়িল। বীর হৃদয় ক্রমশঃ মৃত্যুর বিকট ছায়াভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল—জীবনদীপ ত্বরায় নিষ্প্রভ ভাব ধারণ করিল! অবশেষে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে মহাবলী নেপোলিয়নের জীবন সংগ্রাম শেষ হইল। নিখিলবিজয়ী মহাপুরুষ কালের অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তিকে জয় করিয়া অমর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন—দুর্ব্বৃত্ত নীচাশয়দিগের অত্যাচার ও অবিচারের হস্ত হইতে তিনি কীর্ত্তিশৈলের মহিমাময় শিখরে সংস্থাপিত হইলেন! মরশক্তি অমরশক্তিতে পরিণত হইল, মানব অতুল সম্পদে সম্পন্ন হইল; জগতের নাম উজ্জ্বল হইল!

মহাপুরুষ নেপোলিয়ন মর্ত্ত্য শরীর ত্যাগ করিবামাত্র তদীয় বন্ধুবর্গ মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। আদেশ হইল যে, নেপোলিয়নের সমাধির উপর কোন প্রকার স্মরণচিহ্ন রক্ষিত হইবে না কেবল একখণ্ড প্রস্তরে তাঁহার নাম, জন্মস্থান ও জন্মদিন এবং মৃত্যুস্থান ও মৃত্যুদিন লিখিত থাকিবে। বন্ধুবর্গকে নিরাশ হৃদয়ে এই নীচ আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে হইল। মৃতদেহের উপরও ইংরাজের বিজাতীয় ঘৃণা ও শত্রুতা দূর হইল না। জ্ঞানী ইংরাজ! তোমার বৈর নির্য্যাতন বাসনাকে ধন্য! শবদেহের উপরও বীরত্ব প্রদর্শনে তুমি পশ্চাৎপদ নহ! তোমার এই অমানুষী বৃত্তিনিচয় হইতে বীর হৃদয় আজ নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চির শান্তির ক্রোড়ে সংস্থাপিত হইল।

মাহাত্মা নেপোলিয়নের শবদেহ সমাধিস্থ করিয়া বন্ধুবর্গ বিষণ্ণ হৃদয়ে লংউড ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে গৃহ সজীবতাময় তেজঃপুঞ্জের অধিষ্ঠানাগার ছিল, আজ তাহা নিবিড় তমসাবৃত গিরিকন্দরে পরিণত! সেই পর্ব্বত, সেই গুহা, সেই নিবাস,সকলি বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু সেই প্রাণ-প্রদ প্রাণ আর নাই। চতুর্দ্দিক মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী ছায়া বিকট দশন বিস্তারপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে! এ গভীর নৈরাশ্যের দৃশ্য বন্ধুবর্গের হৃদয়ে চিতানল প্রোজ্জ্বলিত করিয়া দিল, সেণ্টহেলেনা দ্বীপে অবস্থিতি তাঁহাদের পক্ষে বড়ই অসহ্য হইল। তাঁহারা ২৭শে মে মৃতদেহের নিকট বিদায়

গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রা করিলেন। আহা! যাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা একদিন প্রিয় জন্মভূমি ও প্রাণাধিক স্ত্রীপুত্রের নিকট বিদায় লইয়া অকূল সাগরে ভাসিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সেই সাধের বীরদেহ কোথায় রাখিয়া আসিলেন!

এ দিকে ১৮৩০ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে ফরাসীজাতি বুর্ব্বোঁ (Burboun) বংশীয় নরপতিগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া লুই ফিলিপকে (Luis Phillip) সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এত দিন শত্রু ভাবাপন্ন নরপতির প্রবল শাসনদণ্ডে যে ভাব সংকুচিত ছিল, আজ সহসা তাহা প্রসারিত হইল—সম্রাটের মৃতদেহাবশেষ ফরাসী ভূমিতে আনয়নের জন্য মহান্দোলনের সূচনা হইল। ১৮৩৩ অব্দে বীরবর নেপোলিয়নের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি ভেণ্ডম প্রাসাদে (Palace de Vendom) সংস্থাপিত হইল। পর বৎসর ১৮৩৪ অব্দে রয়্যাল হোটেল অব ইনভ্যালিড্‌স(Royal hotel of invalides) নামক আলয়ও সম্রাট মূর্ত্তিতে পরিশোভিত হইল। চতুর্দ্দিক সম্রাটের প্রতি ফরাসীজাতির আন্তরিক ভক্তি নানাভাবে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। অনন্তর ১৮৪০ অব্দে নেপোলিয়নের মৃতদেহাবশেষ ফ্রান্সে আনয়নেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া, ফরাসী-রাজ-সভা ইংলণ্ডীয় নরপতির নিকট লিপি প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ নরপতি সাদরে উক্ত লিপির অনুমোদন করিলেন। এত দিন পরে ইংরেজের কিঞ্চিৎ সাধুভাব লক্ষিত হইল। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যুত্তর আসিবামাত্র ফ্রান্স মহোল্লাসে প্রিন্স ডি জইনভিলিকে (Prince de Joinville) দুইখানি অর্ণবপোত সহকারে সেণ্টহেলেনায় প্রেরণ করিলেন। ৮ই অক্টোবর পোতারোহিগণ উক্ত দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। ১৫ই অক্টোবর মৃতদেহ সমাধি হইতে উৎখাত হইল। বিষণ্ণ ও গম্ভীর বদনে সকলে মৃতদেহ বহনপূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিলেন। দারুময় শবাধার উন্মোচন করিয়া সকলেই চমৎকৃত ভাবে দেখিলেন যে, মৃতদেহ আর্দ্রতা নিবন্ধন কোনপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হয় নাই। সেই বীর পরিচ্ছদ পরিধায়ী বীরপুরুষকে যাঁহারা জীবদ্দশায় দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও তদীয় সৌম্য বদনমণ্ডলে দিব্য জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব করুণ-রসের আবির্ভাব হইল;কেহই অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। ১৮ই অক্টোবর জলদের মুষল বর্ষণের মধ্যে সম্রাটের শবদেহ অর্ণবপোতে আরোপিত হইলে, তরী মহোল্লাসে ফ্রান্সাভিমুখে ধাবমান হইল এবং ২রা ডিসেম্বর স্বদেশের গৌরব-নিধানকে স্বদেশে বহন করিয়া আনয়ন করিল। চতুর্দ্দিক উল্লাসের কোলাহলে কম্পিত হইতে লাগিল! ফ্রান্স আজ আনন্দ স্রোতে নিমগ্ন—দিব্য জ্যোতিতে সমালোকিত। এই সুদূরব্যাপী মহোৎসবের মধ্যে দিব্য লাবণ্যময় দেহ, চার্চ্চ অব দি ইনভ্যালিড্‌স (Church of the invalides) নামক বিচিত্র প্রাসাদের সুবিচিত্র কক্ষের বিচিত্রতম গর্ভে সমাহিত হইল। ফ্রান্স বীর শরীর পুনরায় বক্ষে ধারণ করিলেন—মর্ত্তভূমি সম্মানিত হইল।

মহাত্মা নেপোলিয়নের অলৌকিক জীবনী পাঠ ও পর্য্যালোচনা করিলে, যুগপৎ চমৎকৃত বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। তদীয় লোকাতীত বীরত্ব ও বুদ্ধিবিক্রম, বালোচিত ঔদার্য্য ও সরলতা, নারীজনসুলভ স্নেহ ও প্রেমপ্রবণতা, যোগিজনবাঞ্ছিত ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠা এবং দেবআকাঙ্ক্ষিত মহাপ্রাণতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। বীরদর্পের হুহুঙ্কার নিনাদে তাঁহার বীর-

হৃদয় মাদৃশ নব রসাবেশে নৃত্য করিত, শিশুর অকপট মধুময় সহাস্য বদনমণ্ডলও তাঁহার কোমল হৃদয়ে তাদৃশী প্রীতি প্রদান করিত। বন্ধু-বর্গের প্রতি তাঁহার প্রেমপূরিত হৃদয় এতাদৃশ অনুরক্ত ছিল যে,দীর্ঘকাল তাঁহাদের অদর্শনে তিনি নারীজনোচিত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। যাহা একবার তিনি সত্য এবং কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাহা যতই দুরূহ ও দুঃসাধ্য হউক না কেন, তাঁহার নিকট অতি সুকর ও সুসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত এবং তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। "অসম্ভব"এ কথা তাঁহার অভিধানে লিখিত ছিল না। তাঁহার নিকট সকলই সম্ভব, সকলই সুসাধ্য। এই হেতু তিনি যখন কোন নির্দ্দিষ্ট সত্য লক্ষ্য করিয়া সিংহবিক্রমে তদভিমুখে ধাবমান হইতেন, তখন যে কোন ব্যক্তি বা কোন বস্তু তাঁহার অন্তরায় হইত, তিনি তাহার সম্মান জানিতেন না—ভবিষ্যতে বর্ত্তমান বিস্মৃত হইয়া যাইতেন, কর্ত্তব্যের দ্বারে—সত্যের দ্বারে তাহা উৎসর্গীকৃত হইত। এই কারণ তাঁহার বিরোধিগণ তাঁহাকে "যথেচ্ছাচারী নরঘাতক" সংজ্ঞা দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। বস্তুতঃ তিনি মানব সমাজের শ্রেষ্ঠতম উত্তরসাধক ছিলেন ও অদ্যাপিও রহিয়াছেন। তাঁহার বীরত্বগরিমা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়, তাঁহার হৃদয়গত সারল্যের ছবি অনুপম। বালপ্রিয়তা,সরল ও বিশুদ্ধ হৃদয়ের একটী প্রধান ধর্ম্ম। নেপোলিয়নে তাহার অসদ্ভাব ছিল না। নির্ব্বাসন কালে তিনি যখন ব্যালকম্ব সাহেবের আলয়ে বাস করিতেন তখন উক্ত পরিবারের সন্তান সন্ততিই তাঁহার একমাত্র সঙ্গী ছিল। তাহাদিগকে লইয়া তিনি পরম উল্লাসে দিন যাপন করিতেন। ধর্ম্মেও তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। সেণ্টহেলেনা দ্বীপে মৃত্যুর কিঞ্চিৎপূর্ব্বে জেনারেল বার্টাণ্ডের (General Bertand)সহিত তাঁহার যে সুন্দর খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক কথোপকথন হইয়াছিল,তাহাপাঠ করিলেই জানা যায়, ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস কেমন গভীর অচল ও অটল ছিল। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় দেবপ্রতিম পুরুষ জগতে অতি বিরল। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি মানবজীবন ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অমর জীবন সমগ্র সভ্য জগতে জলন্ত দেহে বিদ্যমান থাকিয়া প্রত্যেক বীরহৃদয়ে শৌর্য্যের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, প্রত্যেক রাজ-হৃদয়ে অপূর্ব্ব রাজশক্তির বিকাশ করাইতেছে, প্রত্যেক প্রজামণ্ডলীতে বিমল রাজভক্তির তরঙ্গ উত্থাপিত করিতেছে এবং প্রত্যেক মানবের মনে অলৌকিক মহত্ব ও গৌরবের উজ্জ্বলতম ছবি অঙ্কিত করিয়া দিতেছে। অত্যাচারীর হৃদয়ে তাঁহার জীবন কুলিশবৎ কার্য্যকারী হইতেছে, উপদ্রুত এবং নিগৃহীতের হৃদয়ে আশার সুখময় পবন সঞ্চারিত করিতেছে।

ধন্য নেপোলিয়ন! তুমিই ধন্য! তোমার অমানুষী শক্তির নিকট জগৎ প্রণিপাত করিতেছে—আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে।

শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী (৬)।

(প্রথম খণ্ডের ২৯২ পৃষ্ঠার পর)

কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্তোপাখ্যান হইতেও কেহ কেহ কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের কথা তুলিয়া নানা ছন্দোবন্ধে বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন। ডাক্তার ভাওদাজী বলেন, ঐ মাতৃগুপ্তই কালিদাস। তিনি বলেন, মাতৃ=কালী; গুপ্ত=দাস। উভয় শব্দের একার্থ কালিদাস। আমরা রাজতরঙ্গিণীস্থ মাতৃগুপ্তোপাখ্যানের স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, ঐ মাতৃগুপ্তও কালিদাস বা তাৎকালিক বিক্রমাদিত্যও সম্বৎপ্রবর্ত্তক রাজা বিক্রমাদিত্য নহেন। এই মাতৃগুপ্তে ও আমাদের কালিদাসে বহুল অনৈক্য আছে। রাজতরঙ্গিণী দেখুন—

তত্রানেহস্যুজ্জয়িন্যাং শ্রীমান্ হর্ষাপরাভিধঃ। একচ্ছত্রশ্চক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ইত্যভূৎ॥

* * * *

ম্লেচ্ছোচ্ছেদায় বসুধাং হরেরবতরিষ্যতঃ। শকান্ বিনাশ্য যেনাদৌ কার্য্যভারো লঘুঃ কৃতঃ॥

* * * *

নানাদিগন্তরাখ্যাতং গুণবৎ-সুলভং নৃপম্। তং কবির্মাতৃগুপ্তাখ্যঃ সভাস্থানস্থমাসদৎ॥

* * * *

নৃপং স সেবমানস্তং উদ্যোগেন বলীয়সা। অনির্ব্বিন্নো মাতৃগুপ্তঃ ষড়তূনত্যবাহয়ৎ॥

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলির স্থূল তাৎপর্য্য এই, যে, তৎকালে উজ্জয়িনীতে শ্রীহর্ষ এই অপর নামধারী রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ছিলেন। তিনি ম্লেচ্ছদিগের উচ্ছেদের জন্য শকগণকে বিনাশ করত কার্য্যভার লঘু করিয়াছিলেন। সেই নৃপতির দিগন্তবিশ্রুতগুণশ্রবণে মাতৃগুপ্ত নামে কবি আসিয়া তাঁহার আশ্রয় লইল, এবং ছয় ঋতু পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকারে তাঁহার সেবা করিল। পাঠক! প্রথমেই বিষম বিসম্বাদ দেখুন। কালিদাস কোথা হইতে আসিয়া এক বৎসর মাত্র বিক্রমাদিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাসের কেবল একবৎসরমাত্র স্থিতিতে কে সম্মত হইবে? অধিকন্তু ইনি শ্রীহর্ষনামা 'বিক্রমাদিত্য; আমাদের বিবাদস্থানীয় নবরত্ন-পোষক বিক্রমাদিত্য নহেন।

তৎপরবর্ত্তী বিষয় যথা—

প্রভাতায়াং বিভাবর্য্যামথাস্থানস্থিতো নৃপঃ। আকার্য্যতাং মাতৃগুপ্ত ইতি ক্ষত্তারমাদিশৎ॥ ততঃ প্রধাবিতানেকপ্রতীহারপ্রণোদিতঃ। প্রবিবেশ মহীভর্ত্তুস্ত্যক্তাশঙ্ক ইব সোঽন্তিকম্॥ তস্মৈ কৃতপ্রণামায় মুহূর্ত্তাদেব পার্থিবঃ। ভ্রূসংজ্ঞিতেন ব্যতরৎ লেখং লেখাধিকারিণা॥

ইহার অর্থ এই—একদা রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া মাতৃগুপ্তকে আহ্বান করিতে বলিলেন। রাজাদেশে অনেক প্রতীহারী যাইয়া তাঁহাকে আহ্বান করায়, তিনি রাজান্তিকে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রণাম করিলে, লেখাধিকারী ভ্রূসং-

জ্ঞিতমাত্র তদীয় হস্তে একখানি লেখ প্রদান করিল।

এস্থলে দ্বিতীয় বিসম্বাদ এই যে, মাতৃগুপ্ত যাইয়া বিক্রমাদিত্যকে প্রণাম করিল। মাতৃগুপ্ত কালিদাস হইলে কখনই বিক্রমাদিত্যকে প্রণাম করিত না; কারণ, কালিদাস ব্রাহ্মণ। আমরাত কালিদাসবিক্রমাদিত্য-ব্যাপারে কোথাও কালিদাসের প্রণামাদি নীচক্রিয়ার সন্ধান পাই নাই। এতৎস্থলে Anglicized ভায়ারা বলিতে পারেন, রাজার নিকট ভক্ত প্রজার প্রণামে আপত্তি কি? আমাদের রাজা যবন হইলেও কি ব্রাহ্মণ প্রজা তাঁহাকে প্রণাম করে না? অথবা, রাজার কথা যাউক, Subordinate ব্রাহ্মণ কি Superior ধোপাকে প্রণাম করিতেছে না! ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, এবম্বিধ আচার ইদানীং প্রবর্ত্তমান হইলেও পূর্ব্বে ছিল না। পূর্ব্বকালীন রাজচক্রবর্ত্তীও ব্রাহ্মণদর্শনে সিংহাসনত্যাগ করত তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেন; এবং সর্ব্বকল্মষধ্বংসী বিপ্রপাদোদকপানে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতেন। আজকাল ঊনবিংশ, দুদিন পরে বিংশ; তাহাতেই সব ধ্বংস হইবে। ফলতঃ পূর্ব্বাচারানুরোধে আমরা মাতৃগুপ্তকে কালিদাস বলিতে সম্মত নহি। অন্যান্য বিসম্বাদ অনুপদে প্রকটিত হইতেছে।

বৈরাগ্যাৎ ভুবমুৎসৃজ্য কাশ্মীরেভ্যো বিনির্গতঃ। আহূয় প্রকৃতীঃ সর্ব্বাঃ মাতৃগুপ্ত উবাচ হ॥ পুণ্যাং বারাণসীং গত্বা সমমার্গসমুৎসুকঃ। ইচ্ছামি সর্ব্বসংন্যাসং কর্ত্তুং দ্বিজজনোচিতম্। অথ বারাণসীং গত্বা কৃতকাষায়সংগ্রহঃ। সর্ব্বং সংন্যস্য সুকৃতী মাতৃগুপ্তোঽভবদ্‌যতিঃ॥

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলির কেবলমাত্র অর্থ করিলে অসংলগ্ন ও দুর্ব্বোধ হইবে, তজ্জন্য উহাদের অন্তঃস্থ বিবরণও বিবৃত হইতেছে। কাশ্মীররাজ প্রবরসেন কোন কারণবশতঃ রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে যাইলে রাজ্য অরাজক হয়। তৎকালে শ্রীহর্ষ বিক্রমাদিত্যের সভায় মাতৃগুপ্ত ছিলেন, তিনি তাঁহাকে আহ্বান করাইয়া লেখার্পণ করিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্ত মাতৃগুপ্ত পত্র লইয়া গিয়া কাশ্মীরে রাজ্য পালন করিতে থাকেন। কালক্রমে রাজা প্রবরসেন প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় রাজ্যগ্রহণ করিলে মাতৃগুপ্ত প্রকৃতিমণ্ডলীকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, আমি বারাণসীগমনপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন করিব। এইরূপ বলিয়া কাষায়পরিধানপূর্ব্বক কাশ্মীরবিনির্গমনান্তে বারাণসীধামে যতিভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এস্থলেও বিসম্বাদ এই যে, আমাদের কালিদাস কবে, কিরূপে যতি হইয়াছিলেন; তিনি যে কাষায় সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এ কথাত কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই। অতএব মাতৃগুপ্ত কালিদাস নহেন। দাদাভাই (ভাওদাজী) যাহা বলিয়াছেন, তাহাত ফুৎকারেও টিকে না। আর যাঁহারা ঐ বিক্রমাদিত্যকে নবরত্ন-পোষক বিক্রমাদিত্য বলিতেছেন, তাঁহাদের কথাও খাটিতেছে না। এক্ষণে মাতৃগুপ্ত ও বিক্রমাদিত্যের সময় নিরূপণ করা যাউক।

মাতৃগুপ্তের রাজ্যকাল নির্ণয় করিতে অগ্রে আমরা রাজতরঙ্গিণীর সাহায্য লইব। রমেশ বাবুও উক্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি স্বকপোল-কল্পিত

কালনির্ণয় করিয়াই যত অনর্থ বাধাইয়াছেন। তিনি বলেন, কনিষ্ক হইতে মাতৃগুপ্ত পর্য্যন্ত একত্রিশ নৃপতির রাজ্যকালে চারিশত বায়াত্তর বৎসর অতীত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি, কনিষ্ক সহিত দ্বাত্রিংশৎ রাজ্যের সময় তের শত এগার বৎসর। তিনি গড়ে প্রত্যেকের রাজ্যকাল পঞ্চদশ বৎসর স্থির করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, দুইজন ব্যতীত আর সকলেরই রাজ্যকাল ১৫ অপেক্ষা অনেক অধিক; তজ্জন্য আমরা রাজতরঙ্গিণী হইতে প্রত্যেক রাজার নাম ও রাজ্যকাল উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ জানিবেন, যে দুইজন মাত্র ভূপতি পঞ্চদশ বর্ষের কম রাজত্ব করিয়াছিলেন, আর সকলেই উক্ত সংখ্যার দুই, তিন, এমন কি চারি গুণ সময় পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছেন।

	রাজাদের নাম	রাজ্যকাল
১।	হুষ্ক, জুষ্ক, কনিষ্ক,	৬০
২।	অভিমন্যু	৩৫
৩।	গোনর্দ্দ (৩য়)	৩৫
৪।	বিভীষণ	৪৫।৬
৫।	ইন্দ্রজিৎ রাবণ (২জন)	৩০।৬
৬।	বিভীষণ (২য়)	৩৫
৭।	শ্রীকিন্নর	৩৯।৯
৮।	সিদ্ধ	৬০
৯।	উৎপলাক্ষ	৩০।৬
১০।	হিরণ্যাক্ষ	৩৭।৭
১১।	হিরণ্যকুল	৬০
১২।	বসুকুল	৬০
১৩।	মিহিরকুল	৭০
১৪।	বকাক্ষ	৩৬
১৫।	ক্ষিতিনন্দন	৩০
১৬।	বসুনন্দ	৫২
১৭।	নর	৬০
১৮।	অক্ষ	৬০
১৯।	গোপাদিত্য	৬০
২০।	গোকর্ণ	৫৩
২১।	নরেন্দ্রাদিত্য	৩৬।৩
২২।	যুধিষ্ঠির	৩৪
২৩।	প্রতাপাদিত্য	৩২
২৪।	জলৌক	৩২
২৫।	তুঙ্গীন	৩৬
২৬।	বিজয়	৮
২৭।	জয়েন্দ্র	৩৭
২৮।	সন্ধিমান	৪৭
২৯।	মেঘবাহন	৩৪
৩০।	প্রবর সেন	৩০
৩১।	হিরণ্য	৩০।২
৩২।	মাতৃগুপ্ত	৪।৯

পূর্ব্বদত্ত তালিকা দৃষ্টে জানা যাইতেছে, যে কনিষ্ক হইতে মাতৃগুপ্ত পর্য্যন্ত রাজগণের রাজ্যকাল ১৩১১ বৎসর। ৪৭২ বৎসর নয়। উহা লেখকের কপোলকল্পনামাত্র।

রমেশ বাবুর আদৌ বিচারশক্তি নাই; অথচ তিনি এবম্বিধ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে কি প্রকারে সাহস করিলেন, তিনিই জানেন। তাঁহার মতেই তাঁহার ভ্রমপ্রদর্শন করা যাইতেছে। যদি কনিষ্কের রাজ্যারোহণ ৭৮ খৃষ্টাব্দে হয়, তৎপরে তদীয় রাজ্যকাল ষাটি বৎসর হইলে, তদুত্তরাধিকারী অভিমন্যুর রাজ্যারোহণ অবশ্যই ৭৮+৬০=১৩৮ খৃষ্টাব্দে হইবে। তিনি করিয়াছেন ১০০ শত খৃষ্টাব্দে। এক রাজ্যেই ৩৮ বৎসরের পার্থক্য। একত্রিশ রাজ্যে কত হইবে, যিনি গুণ করিতে জানেন, গুণ করিয়া লইবেন। আমরা পারিলাম না।

রমেশবাবু আরও লিখিয়াছেন—

We are told that 52 Kings reigned

for a period of 1266 years from the time of Kuru Panchala war to Abhimanyu, the successor of Kanishka.

দত্তজ মহাশয় এ উপদেশটী কোন গুরুর কাছে শিখিয়াছেন? Royal Asiatic Society of London, Asiatic Society of Bengal, এবং Bombay Branch Royal Asiatic Societyর জার্নেলগুলিইত তাঁহার গুরু। ইহাদের কেহইত একথা বলে না। এতদ্বিষয়ে রাজতরঙ্গিণীর মতব্যক্তি করা যাইতেছে। উহাতে লিখিত আছে—

পঞ্চত্রিংশৎ রাজানঃ মগ্না বিস্মৃতিসাগরে। তদ্রাজ্যে গত বর্ষাণি ১২৬৬।

অর্থাৎ, ৩৫ জন রাজার নাম বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহাদের রাজ্যে ১২৬৬ বৎসর গত। আদিগোনর্দ্দের রাজ্য পর্য্যন্ত কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইয়াছিল; অনন্তর, তৎপুত্র দামোদরের রাজ্যকাল ৩৫। ৬। পরে তৎপত্নী যশোবতীর রাজ্যও ৩৫। ৬। তৎপরে দামোদর পুত্র বাল গোনর্দ্দের রাজত্ব ৩০ ত্রিশ বৎসর। তাহার পরে পঁইত্রিশ জন বিস্মৃত রাজার রাজ্যকাল ১২৬৬ বৎসর। এই কয়েকটি রাজ্যেই কলির প্রারম্ভাবধি ১৯২০ বৎসর গত হইয়াছিল। তৎপরে

১।	লব	৩৫
২।	কুশেশয়	৩। ৮
৩।	খগেন্দ্র	৬০
৪।	সুরেন্দ্র	৩০। ৬
৫।	গোধারা	৩৫। ৭
৬।	সুবর্ণাখ্য	৬০
৭।	জনক	৬
৮।	শচীনর	৭১
৯।	অশোক	৬২
১০।	জলৌক	৩০
১১।	দামোদর (২য়)	২৫

দামোদরের পরই হুষ্ক, জুষ্ক, ও কনিষ্কের রাজ্যকাল। দামোদরের রাজ্যপর্য্যন্ত কলির ২৪৩৮ বৎসর অতীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে কলির ৪৯৯২ অতীতাব্দ। উহা হইতে ২৪৩৮ অন্তর করিলেই ২৫৫৪ পাওয়া যায়। উহা হইতেই ইসবী সনের ১৮৯২ অন্তর করিলে জানা যায় যে, ৬৬২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের রাজ্যকাল। কিন্তু রমেশ বাবু বলিয়াছেন ৭৮ খৃষ্টাব্দ। ইহাতে তদুক্তির অপ্রামাণিকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

General Cunningham Arhæological Reportএ লিখিয়াছেন—'this cannot be the Saka era of A. D. 79, as we are quite certain that Kanishka flourished long before that date.

তবেই রমেশ বাবুর কনিষ্কের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ সর্ব্বথৈব কপোলকল্পনা।

তন্মতে কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ। আমাদের মতে, আমাদের কেন হিন্দুদের মতে, ন্যূনাধিক সার্দ্ধ চতুঃসহস্র বৎসর। কারণ, দ্বাপরের শেষে ও কলির প্রারম্ভে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব, এ কথায় হিন্দুদের ধ্রুব বিশ্বাস। অন্যান্য পুরাণাদিতেও ইহার প্রসঙ্গ আছে।

কনিষ্কের রাজ্যারম্ভ ৬৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইলে তদবধি ১৩০৭ বৎসর পরে মাতৃগুপ্ত রাজ্যারোহণ করেন; এবং তৎপরে চারি বৎসর রাজ্য শাসন করতঃ ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে যতি হইয়া বারাণসী অধিবাস করিয়া ছিলেন। অথবা ইহার দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বেও হইতে পারে, কারণ ৬৫৩ বৎসর অতীত কলিতে কুরুপাণ্ডবদিগের আবির্ভাবে মতবাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। পুরাতন কথায় ২০। ৫০ বৎসরের অনৈক্য দোষাবহ নহে।

Old Testament নামক গ্রন্থে 'কাইরুস' একটী শব্দ আছে। Rawlinson সাহেব বলেন, উহা সংস্কৃত 'কুরু' শব্দজ। উভয়েরই অর্থ সূর্য্য সম্বন্ধীয় কোন বংশ। পারসীক জাতিরা সূর্য্যকে 'কুরোস' বলিয়া থাকেন। নব্য পারসীক ভাষাতেও 'খুর'শব্দের অর্থ সূর্য্য। Old Testament গ্রন্থেও 'কুরু' শব্দের সমাবেশ জন্য স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, যে উক্ত শব্দটী অতি প্রাচীন। অতএব, কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয় নাই।

রাজাবলীর মত, যে, কলির প্রারম্ভেই কুরুপাণ্ডবদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল। Dharwar ও Mysore প্রভৃতি স্থানে যে সকল উৎকীর্ণ বর্ণাবলী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাত্মা কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন শিব মন্দিরগাত্রে একটী রাজপ্রশস্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, উহার কাল নির্ণয় এইরূপ। শকাব্দা ৫০৬, কল্যব্দ ৩৮৫৫; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাব্দ ৩৭৩০। ইহাতেই জানা যাইতেছে, যে, কলির ১২৫ বৎসর ব্যতীত হইলে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

এইবার রমেশ বাবুর অন্যান্য আপত্তির খণ্ডন করা যাইতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, Houen Tsang নামে চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে শিলাদিত্যের পূর্ব্বতন নৃপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রমেশ বাবুর অনুমিতি প্রমিতি উভয়ই প্রশংসার্হ। স্থূলদৃষ্টিতে গোগুবয় এক বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উভয়নিষ্ঠ ধর্ম্মে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই স্থূলদৃষ্টিবশতই রমেশবাবু শিলাদিত্যের সমসাময়িক বিক্রমাদিত্যকে নবরত্ন-পোষয়িতা বিক্রমাদিত্য বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভারতক্ষেত্রে অনেকগুলি বিক্রমাদিত্য রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই এবমাদিক নানা গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। Meadows Taylor সাহেব তদীয় ইতিহাসে যে কয়েকটী রাজাধিরাজের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মালবাধিপতি Vikramaditya, the great একতম। ইহাঁর রাজ্যকাল ৪৯০ খৃষ্টাব্দ; কিন্তু ইনিই আবার স্থানান্তরে নবরত্নপোষক বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল ৫৬পূঃ খৃষ্টাব্দ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং, অধস্তনকালীন বিক্রমাদিত্যকে প্রমারবংশজ উজ্জয়িনীপতি বীর বিক্রমাদিত্য বলা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত নহে, তাহা নিঃসন্দেহ। অধিকন্তু, আমরা দেখিতেছি, বিবুধসখ শ্রুতান্বিত পরন্তপ বিক্রমাদিত্যের পর তৎপুত্র বিক্রমসেন রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন; রমেশ বাবু বলেন—শিলাদিত্য। আরও, বিক্রমচরিত বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের যেরূপ জীবনবৃত্ত পাওয়া যায়, তাহাতে পরবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিন্মাত্রও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। অতএব, ইনি কালিদাসপ্রিয় বিক্রমাদিত্য নহেন।

অমরসিংহ বিক্রমভানুর সমকালবর্ত্তী। এইরূপ প্রসিদ্ধি, যে তিনি বুদ্ধ গয়ায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। General Cunningham অনুমান করেন, উহার নির্ম্মাণকাল ৪০০ হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দ *। মৃত মহাত্মা

* পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর বাক্যের প্রামাণিকতা দেখিয়া আমরা হতজ্ঞান হইয়াছি। যে Cunningham সাহেব বিক্রমাদিত্যকে খ্রীষ্টীয় শকের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মতব্যক্তি করিয়াছেন, তিনিই আবার তৎসভাসদ অমরসিংহের বুদ্ধগয়ার মন্দিরনির্ম্মাণকাল ৪০০ হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দ বলিতে আদৌ ইতস্তত করিলেন না। ইহাঁদের বাক্যে মনুষ্যের আস্থা থাকিবে কেন!

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অজন্ত নামকস্থানের উৎকীর্ণ বর্ণমালা সন্দর্শনে বিশিষ্ট নৈপুণ্য সহকারে সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে তত্তৎস্থানের স্থাপত্যকর্ম্ম সকল খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছিল। তাঁহার এই বাক্য শ্বেতকায় সূরিগণের গাত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দুঃসহ হওয়াতে James Fergusson সাহেব বিবিধ ব্যঙ্গোক্তিতে স্বীয়গাত্রের জ্বালা নিবারণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। যাঁহাদের কাছে জগতের সৃষ্টি পাঁচ হাজার বৎসর বৈ নয়, তাঁহাদের নিকট বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, তন্ত্র, সভ্যতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে অবশ্যই তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টীয় শকের পরে না আসিলে চলিবে কেন? তাঁহাদের এই বাহাদুরী যে উক্ত সময়ের ভিতর এতগুলি প্রবেশ করাইয়াছেন—'হাঁদুর মেয়েরা কি কারিগর! যাতে চুল চলে না, তাইতে বাইগুণ পুরলে কি করে।' শ্বেতাঙ্গ বিবুধগণও কম কারিগর নহেন!

স্থানান্তরে রমেশ বাবু লিখিয়াছেন—

'In the Satrunjaya Mahatmya it is stated that Vikramaditya ascended the throne in 469 of the Saka era or 544 A. D.

প্রকরণ-জ্ঞান-হীন ভিষক্ পুত্র যেমন 'নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্বা কটিং দহেৎ' এই বচনার্দ্ধ দেখিয়া নেত্ররোগীর তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়াছিল, আমাদের অনুমান হয়, এস্থলে সিভিলিয়ান বাবুও হয়ত তদ্রূপ প্রকরণ নির্ণয় না করিয়াই উক্তরূপ বাগ্বিন্যাস করিয়াছেন। যেহেতু, তিনি স্বচক্ষে শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য দেখেন নাই। এসিয়াটিক রিসার্চস নামক গ্রন্থ হইতে Wilford সাহেবের অভিপ্রায়, যাহা ডাক্তার Kern সাহেব স্বীয় বৃহৎ-সংহিতার সংস্করণে প্রকটিত করিয়াছেন; তদ্দৃষ্টে রমেশ বাবুর এই অভিনব ভাবাবতারণ। এইরূপ অপ্রকরণীয় সমাবেশে জিগীষুতা ব্যক্তিবিশেষের অত্যন্ত বটে, কিন্তু তাহাতে মাদৃশ জনের নিরস্তিই বিধেয়।

একবিধ বাক্যের পুনঃ পুনঃ সমাবিষ্টিতে অনবীকৃততা সংঘটন ভয়ে আমরা উত্তরে আর ইহার প্রলম্বন করিব না। তবে রমেশ বাবুর ন্যায় আর এক মহাত্মার আর একটী কথার আর একটু আলোচনা করিয়া আমরা আর এক বার পাঠকবর্গকে উদ্ভ্যক্ত করিব। এই মহাত্মার নাম ডাক্তার ভাওদাজী। ইনিও হিন্দুসন্তান বটে, কিন্তু সমুদ্রযাত্রাপরাধে সমাজচ্যুত হইয়া ঘোরতর হিন্দুদ্বেষী হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের আচারব্যবহারে রমেশ বাবুর ন্যায় তাঁহারও তীব্র কটাক্ষ আছে। তিনি Royal Asiatic Societyর মুম্বয়ীশাখার একখানি জার্ণেলে কর্ণাটদেশের ৬৩৭ খৃষ্টীয় সনের কোন প্রস্তরলিপির অনুকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন; উহার স্থলবিশেষে কালিদাস ও ভারবির নামোল্লেখ থাকায়, ভাওদাজী অনুমান করেন, যে উহাই কালিদাস ও ভারবির সময়।

ভাওদাজীর এই বাক্‌চাতুরীতে বিস্মিত হইয়া আমরা অনুকৃতি পাঠ করিতে অভিলাষী হই। উহা প্রাচীন কার্ণাটিক ভাষায় লিখিত। নব্যকার্ণাটিক ভাষায় আমাদের অত্যল্প জ্ঞান থাকিলেও বর্ণমালার পার্থক্য ও ভাষার বৈভিন্নপ্রযুক্ত আমরা প্রাচীন কার্ণাটিক ভাষায় লিখিত সেই লিপিখানির সম্পূর্ণরূপ মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া এক সুবিজ্ঞ কার্ণাটিক অধ্যাপকের সাহায্যে লিপিখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া ডাক্তার সাহেবের চাতুর্য্য হইতে রক্ষা পাইলাম। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণকেও ব্যাপারটা অবগত করাইয়া রাখি।

লিপিস্থ শ্লোকগুলি রবিকীর্ত্তিনামা কোন কবির রচিত। ইনি যে ভাবে কালিদাস ও ভারবির নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, স্বীয় কৃতিত্বে সুখ্যাতির আশাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এস্থলে সমগ্র লিপির বিষয় আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, তবে যে স্থলে রবিকীর্ত্তি কালিদাসাদির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তৎপাঠে কাহারও মনে এরূপ ধারণা হইবে না, যে কালিদাস ও ভারবি তৎসম সাময়িক।

ডাক্তার সাহেবওত উহার ইংরাজি অনুবাদে লিখিয়াছেন—'Kalidas and Bharabi whose fame is compared with that of Robikirti'! তবে তিনিই আবার কালিদাসাদির জীবনকাল ৬৩৭ খৃষ্টাব্দ বলেন কিরূপে! শূন্যগর্ভ দ্রব্যের ন্যায় তদ্বিধ বাক্যেরও কোনকালে আদর হইতে পারে না।

আর একটী গাজুরির কথা শুনুন—R. A. Societyর মুম্বয়ী শাখার একখানি জার্ণেলে Ball Gangadhar Shastri নামক কোন মহাত্মা একখানি দানপত্র পাঠান্তে লিখিয়াছেন—

'On comparing the names of kings, mentioned in this grant, * * * I am disposed to think that the Prince Vardhan, referred to in this grant, must be the grandson of Vikrama or Vikramaditya, the beginning of whose reign is placed in the Saka year 653 or 733 A. D.

উল্লিখিত তাম্রলিপিখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আমরা উহা হইতে আবশ্যকীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া সাধারণ সমক্ষে অর্পণ করিতেছি; তৎপাঠে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, যে বিক্রমকে উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য বলায় তাঁহার ষোল আনাই গাজুরি হইয়াছে। লিপির অংশ বিশেষ যথা—

'স্বস্তি স্বামিমহাসেনপাদানুধ্যাতানাং মানব্যসগোত্রাণাং হারীতীপুত্রাণাং মাতৃগণপ্রসাদপরিলক্ষিতভুজার্গলানাং ক্ষীরোদধিশয়নসুপ্তোত্থিতপ্রসাদপরিলব্ধবরাহলাঞ্ছনানাং চালুক্যানাং বংশে সম্ভূতঃ শক্তিত্রয়সম্পন্নঃ॥ জয়তি রণবিক্রমনৃপো নিরন্তরিপুনৃপতিশৌর্য্যমদরাগঃ॥ কলিযুগখলনির্মথনে সত্যাশ্রয়ভাবিতশ্চরিতৈঃ। অভবত্তস্য সকীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিবর্ম্মা স্থিরস্থিতিঃ। সুতঃ সুচরিতাধারঃ কৃতকৃত্যঃ পতিঃ ক্ষিতেঃ। তস্য পুত্রো মহাতেজা কন্দর্প ইব মূর্ত্তিমান্'॥ ইত্যাদি।

লিপিস্থ শ্লোকগুলিদ্বারা জানা যাইতেছে, যে, রণবিক্রমের পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা, তৎপুত্র বর্দ্ধন। যাহা হউক, এখানকার রণবিক্রমের সহিত বিক্রমাদিত্যের কি সাম্য আছে, যদ্দ্বারা শাস্ত্রী-মহাশয় ইহাকে মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। ফলতঃ, এসব ইঁদুর মুখো ঘুঘু ওলাদের (১) কথায় আর

(১) কতকগুলি লোক আপনাদের জিদ-বজায়ে এত মজবুত যে যাহা বলিবে কিছুতেই তাহার অন্যথা স্বীকার করিতে চায় না। যদি তাহারা একটা ইঁদুরকে ঘুঘু বলিয়া ফেলে, শেষে উহাকে ইঁদুর জানিয়াও আপনাদের কোট বাজায়ের জন্য উহাকে ইঁদুর মুখো ঘুঘু বলিবে, তথাপি পরাজয় স্বীকার করিবে না। আমাদের প্রবন্ধকথিত মহাত্মাগণও তদ্রূপ। তাঁহারা বিক্রমাদিত্যকে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন। তিনি তাহা না হইলেও ইঁহারা

আমাদের কাজ নাই। সাধারণের নিকট সবিনয় অনুরোধ, যেন, তাঁহারা ইহঁদের কথায় কর্ণপাত না করেন। কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের বয়ঃক্রম এক্ষণে দুই সহস্র বৎসর বটে।

প্রাগুক্ত গঙ্গাধর শাস্ত্রীমহাশয়ের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়ও আমরা এস্থলে দিয়া রাখি। তিনি ধারমহীশূর প্রভৃতি স্থানের অনেকগুলি ক্ষোদিতলিপি পাঠ করিয়াছেন; তন্মধ্যে তত্রত্য কোন শিবমন্দিরগাত্রস্থলিপি বিষয়ে তিনি বলেন, যে, উহা ৫০৬ শকাব্দ, ৩৮৫৫ কল্যব্দ ও ৩৭৩০ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাব্দে লিখিত।

৩৮৫৫ কল্যব্দে ৫০৬ শকাব্দ কিরূপে হইতে পারে? ৩১৭৯ কল্যব্দে শকাব্দের প্রবর্ত্তন হয়। তদনুসারে ৫০৬ শকাব্দে অবশ্যই ৩৬৮৫ কল্যব্দ হইবে। লিপিমধ্যে এবম্বিধ ভ্রমসমাবেশ একবারেই অসম্ভব। নিশ্চয়ই শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠে কোনরূপে এই ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। অত্যল্প অনুধাবনেই তিনি উক্ত ভ্রমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতেন; তদভাবনিবন্ধন শুদ্ধ তিনি নহেন, সমস্ত জগৎকেই ভ্রমচক্রে নিপাতিত করিবার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। কারণ, ৩৮৫৫ কল্যব্দে ৫০৬ শক বৎসর হইলে ৪৯৯২ কল্যব্দে অবশ্যই ১৬৪৩ শকাব্দ হইবে। সুতরাং, বর্ত্তমানবর্ষে শকাব্দের ১৬৪৩ বৎসর, ১৮১৩ বৎসর নয়, অনেকেই এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইতে পারেন; এবং ঐ মূল হইতে হয়ত কালক্রমে রমেশ সদৃশ কোন মহাপুরুষ শকার বয়ঃক্রম দুই শত বৎসর কমাইয়া দিতেও পারেন। পঞ্চভূতের মিলনে চিরকালই অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপারের সম্ঘটন হইয়াছে। এগুলি সর্ব্বপ্রথম নয়।

পরবর্ত্তীকালীন যে বিক্রমকে দেখিতেছেন, তাহাকেই বীর বিক্রমাদিত্য বলিয়া আপনাদের কোট রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। তজ্জন্য আমরা ইহাদিগকে ইদুর মুখো ঘুঘু ওলাদের দল ভুক্ত করিলাম।

বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গদেশের লোক যে ভাষায় কথোপকথন ও লিখিতগ্রন্থাদি প্রকাশ করে, তাহারই নাম বাঙ্গালাভাষা। বর্ত্তমানকালে কোন্ কোন্ স্থানের অধিবাসীরা বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন করে, আমরা তাহার স্থূল বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। পশ্চিমে মেদনীপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, রাণীগঞ্জ, সিউড়ী, নয়াদুমকা, রাজমহল, পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত। ইহার পশ্চিমেই হিন্দী বাঙ্গালা মিশ্রিত একরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তরে ভুটানের নিম্নপ্রদেশ, অর্থাৎ, দার্জ্জিলিঙ্, জলপাইগুড়ি, কুচবেহার, তেজপুর, লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত। ইহার উত্তরেই ভুটানীভাষা প্রচলিত। পূর্ব্বে আসামের পশ্চিমসীমা, অর্থাৎ, শিবসাগর, গোলাঘাট, সিলচর, চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত। ইহার পূর্ব্বে আসামী ও অন্যান্য ভাষা ব্যবহৃত। দক্ষিণে ডায়মণ্ড হারবার, পটুয়াখালি, সাহারাজপুর পর্য্যন্ত। ইহার দক্ষিণেই বিশাল জলধি। এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানের লোক বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত স্থানের বাঙ্গালা বিশুদ্ধ নহে। ঢাকাপ্রভৃতি পূর্ব্বদেশ ও চট্টগ্রামের বাঙ্গালা অতি কদর্য্য। চব্বিশ পরগণা, হুগলী এবং নদীয়া ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশের অধিবাসীর বাঙ্গালাই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। প্রায় চারি পাঁচ কোটি লোক বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

কোন্ সময়ে এবং কোন্ প্রকৃতি হইতে

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা লইয়া নানা লোকে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন যে, সংস্কৃত হইতেই উহার জন্ম, সংস্কৃতই উহার জননী। আবার কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত উহার জননী নহে, মাতামহী। প্রাকৃতই উহার জননী, প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালার উৎপত্তি। কেহ বা বলেন, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে হিন্দি; হিন্দি হইতে বাঙ্গালা। আমরা কিন্তু যাহা বলিব, তাহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই বলি, যে মনুষ্যাদির জন্মের ন্যায় ভাষা কিছু এক দিনে বা একজন হইতে জন্মাইতে পারে না। সুতরাং, অমুক দিনে বা অমুক হইতে অমুক ভাষার উৎপত্তি বলা একরূপ বাতুলের কথা। আমাদের বিবেচনায় পুচ্ছাবলম্বন রোগ বড়ই সাংঘাতিক। কাহারও পুচ্ছাবলম্বন করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলাও জল উঁচুনীচু বলার ন্যায় নরকভোগ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি কোন নূতন বিষয় বলিতে পারি, বলিব, না পারি, চুপ করিয়া থাকিব। নতুবা, একজনের উদ্গীর্ণ আপনার মুখ হইতে বাহির করা নির্ঘৃণের কর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই পরিবৃত্তিশীল; সুতরাং, ভাষাও যে তদ্বৎ হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি! এজন্য আমরা দেখিতেছি, বৈদিক কালের সংস্কৃতও নানা পরিবৃত্তির মধ্য দিয়া পৌরাণিক কালে ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তৎপরে আবার কাব্যনাটকাদির কালে স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করত প্রাকৃত নামে অভিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ, যাহাকে আমরা প্রাকৃত বলি, উহা অপভ্রষ্ট সংস্কৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেকের ধারণা যে, প্রাকৃত একটী স্বতন্ত্র ভাষা। প্রাচীন পণ্ডিত হেমচন্দ্র প্রাকৃতশব্দের এইরূপ অর্থ করেন,—

প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্ সংস্কৃতমূলকমিত্যর্থঃ।

বাচস্পতি মহাশয়ও উক্ত অর্থানুসারে প্রাকৃত শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—

'প্রকৃতেঃ সংস্কৃতাৎ আগত ইত্যন্'।

অর্থাৎ, যাহা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, তাহাই প্রাকৃত। আমরা এই অর্থ অপেক্ষা—

'প্রকৃত্যা স্বভাবেন নিবৃত্তঃ ইতি প্রাকৃতঃ'।

এইরূপ অর্থে অধিকতর সঙ্গতি দেখিতেছি, অর্থাৎ, যাহা স্বভাবত সম্পন্ন হয়, তাহাই প্রাকৃত। যে শব্দ যেরূপে উচ্চারিত হয়, সঙ্কোচাদির দ্বারা তাহাকে সহজে ও স্বল্পসময়ে উচ্চারণ করার ইচ্ছা, মনুষ্য মাত্রেরই স্বাভাবিক। এই ইচ্ছা বশতই সংস্কৃতের দুরুচ্চার্য্যও কর্কশ শব্দগুলির সুখোচ্চারণের নিমিত্তই যেরূপ ভাষা তৎকালে ব্যবহৃত হইত, তাহাকেই এক্ষণে প্রাকৃতনামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। এরূপ হইলে প্রাকৃতকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা বিধেয় নহে; কেননা, সকল ভাষারই তথাবিধ প্রাকৃত আছে। বাঙ্গালা ভাষায় আমরা 'যাইতেছি' স্থলে 'যাচ্চি,' 'করিতেছি' স্থলে 'কচ্চি'; 'গিয়াছিলাম' স্থলে গেছলাম,' 'করিলাম' স্থলে 'কল্লাম' ইত্যাদি সহজে বলিয়া থাকি, তাহা বলিয়া কি উহারা স্বতন্ত্র ভাষা? ইংরাজেরাও 'I will' স্থলের 'I'll;' 'He should not' স্থলে 'He sh'd n't,' 'you would not' স্থলে 'you won't' ইত্যাদি বলেন, তাহা বলিয়া উহারা স্বতন্ত্র ভাষা হইতে পারে না। উড়ীয়ারা 'যাউঅচি' স্থলে 'যাউচি' 'করিঅচি' স্থলে 'কউচি,' 'গেয়েথিলুঁ' স্থলে 'গৈথিনু'; 'কৌনসি' স্থলে 'কৌটি' বলে। উর্দ্দূতেও 'করতা হুঁ,' 'জাতা হুঁ,'

'দেখতা হঁ' স্থলে 'করেঁ,' জায়েঁ,' 'দেখেঁ' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, এগুলি কিছু স্বতন্ত্র ভাষা নহে। প্রাকৃত ভাষাও তদ্রূপ স্বতন্ত্র ভাষা মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। উহা কেবল সাধারণ লোকের সহজে ও অল্প সময়ে উচ্চারণ করিবার জন্য একরূপ অপভ্রষ্ট সংস্কৃত মাত্র। নিম্ন প্রদর্শিত কয়েকটি উদাহরণ দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, যে, কেবল দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত শব্দের সুখোচ্চারণ ও সহজ প্রয়োগ জন্যই যেরূপ ভাষা পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত, তাহাই প্রাকৃত নামে অভিহিত হইয়াছে।

সংস্কৃত	প্রাকৃত
জানাতু	জানাহু
আর্য্যপুত্র	অজ্জউত্ত
কিন্তু	কিন্দু
অপি	অবি
সকল	সঅল
অতএব	অদোএব
রাঘব	রাহব
চরিতং	চরিদং
এতে	এদে
উপরি	উবরি
অনুগৃহীত	অনুগহীদ
নীলোৎপল	ণীলুপ্পল
মসৃণ	মসিণ
আলিখিত	আলিহিদ
বিবাহ	বিআহ
ভ্রাতরঃ	ভাদর
প্রদেশ	পদেস
কৃত	কিদ
বৎস	বচ্ছ
মাহাত্ম্য	মাহাপ্প
শোভসে	সোহসি
তালবৃন্ত	তালবেণ্ট
সংস্কৃত	প্রাকৃত
আত্মনঃ	অত্তণো
প্রবেশ	পবেস
দক্ষিণ	দক্খিণ
দর্শনম্	দংসণং
অশুভং	অসুহং
দুর্জ্জন	দুজ্জণ
বিপ্রযোগ	বিপ্পওঅ
প্রিয়সখী	পিঅসহী
ব্যাহরতি	ব্যাহরদি
ভগবতি	ভঅবদি
প্রভাত	পহাদ
মুর্চ্ছিত	মুচ্ছিদ
মন্দভাগিনী	মন্দভাইণী
ত্রিলোকনাথ	তেল্লোহণাহ
অধিক	অহিঅ
এবম্বিধেন	এবংবিহেণ
হৃদয়	হিঅঅ
শূন্যং	সুণ্ণং
সত্যং	সচ্চং
দীর্ঘায়ু	দীহাউ
প্রমুক্ত	পমুক্ক
আয়াস	আআস

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি সবিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যালোচনা করিলে, সহজেই উপলব্ধি হইবে, যে, সুখোচ্চারণের জন্যই ঐ সকল শব্দগুলি ব্যবহৃত হইত। অল্পবুদ্ধি লোকদিগের জন্য সংস্কৃতই যে প্রাকৃত হইয়াছিল, তাহার আরও একটি কারণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। সংস্কৃতের কোন্ ধাতু পরস্মৈপদী, কোন্ ধাতু আত্মনেপদী, তাহা জানিতে হইলে বিশিষ্টজ্ঞানের আবশ্যক, তজ্জন্য প্রাকৃতে সকল ধাতুই পরস্মৈপদী। যথা—প্রেক্ষতে-পেক্খদি; শোভসে-সোহসি; বর্ত্তে-বট্টামি; অবগাহিস্যে-

অবগাহিস্সং; অপহ্নিয়ে-ওহরিজ্জামি; শয়িষ্যে-সইস্সং; পরিত্রায়স্ব-পরিত্তাহি। কর্ম্মবাচ্যেও আত্মনেপদ হয় না; যথা—ক্রিয়ন্তে-কুণিঅন্তি। কোথায় কোথায় লোট মধ্যম পুরুষের এক বচনে হি বিভক্তির লোপ হয়, তাহা জানাও কিঞ্চিৎ জ্ঞানসাপেক্ষ, এজন্য প্রাকৃতে প্রায়ই হি বিভক্তির লোপ হয় না; যথা—ধারেহি-ধারয়; জীআবেহি-জীবয়। সুণোহি-শৃণু; করোহি-কুরু। পসাদেহি-প্রসাদয়; কহেহি-কথয়। সংস্কৃতের ষত্বণত্বজ্ঞানও সহজ নহে, এজন্য প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই দন্ত্য স এবং সর্ব্বত্রই মূর্দ্ধণ্য ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব প্রাকৃত যে প্রাকৃত লোকেরই সংস্কৃত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

এক্ষণে যদি কেহ এইরূপ আপত্তি করেন যে, প্রাকৃত স্বতন্ত্র ভাষা না হইলে, উহার প্রত্যেক কথাই পরিবর্ত্তিত হইবে কেন, অন্ততঃ দুই চারিটী কথাও অবিকল সংস্কৃত থাকিত।

এতদুত্তরে আমরা বলি, সমস্ত সংস্কৃত শব্দই যে প্রাকৃতে বিকৃত হইয়া থাকে, তাহা নয়; অনেক শব্দ অবিকল সংস্কৃতের ন্যায় প্রযুক্ত হয়; যথা, বন্ধু-বন্ধু; গুরু-গুরু; কিং-কিং; মে-মে; তব-তব; কুসলং-কুসলং (দন্ত্যসযুক্ত কুসল শব্দও সংস্কৃতে আছে) ধুরন্ধর-ধুরন্ধর; কা-কা; অহং-অহং; মম-মম। এখন যদি কেহ আবার আপত্তি করেন, যদি প্রাকৃত স্বতন্ত্র ভাষাই নহে, তবে উহার ব্যাকরণের কি আবশ্যকতা ছিল? অন্যান্য ভাষারও যাহাকে প্রাকৃত বলা গেল, তাহার জন্যত আর স্বতন্ত্র ব্যাকরণের আবশ্যক হয় নাই?

ইহার উত্তরে আমরা বলি, যে, যৎকালে সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতের প্রচলন ছিল, তৎকালে উহার ব্যাকরণ প্রণীত হয় নাই। কিন্তু সংস্কৃত নাটকাদিতে প্রাকৃতের বহুল প্রয়োগ থাকায়, পাছে অধস্তন লোকেরা উহার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারে, এইজন্য সংস্কৃতের লোপ ও অন্যান্য ভাষার উৎপত্তিকালেই প্রাকৃত ব্যাকরণ বিরচিত হইয়া থাকিবে। এই প্রাকৃত স্থানভেদে ও লোকবিশেষে বিশেষ বিশেষ নামে আখ্যাত হইত। সাহিত্যদর্পণকার শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, প্রাচ্যা, অবন্তিকা, দাক্ষিণাত্যা, শাকরী, বাহ্লীকী, দ্রাবিড়ী, আভীরী, চাণ্ডালী, শাবরী, পৈশাচী, প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ করিয়া—

'শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা
তাদৃশানাঞ্চ যোষিতাম্।
আসামেব তু গাথাসু
মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধী ভাষা
রাজান্তঃপুরচারিণাম্।
চেটানাং রাজপুত্রাণাং
শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী।
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং
ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা।
যোধনাগরিকাদীনাং
দাক্ষিণাত্যা হি দীব্যতাম্।

ইত্যাদি প্রকারে এক এক রকম লোকের এক একরূপ ভাষার নিয়ম করিলেও আমাদের ধারণা যে, উহারা তত্তৎ-স্থান-প্রচলিত প্রাকৃত ভেদমাত্র। তদ্ভিন্ন শাকরী, আভীরী, চাণ্ডালী, পৈশাচী এগুলি ব্যক্তিগত প্রাকৃত। কোলব্রুক Colebrooke সাহেব প্রাকৃতের দশটী বিভাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রাকৃত স্বতন্ত্র ভাষা নহে, সংস্কৃতেরই রূপান্তর মাত্র। তবে আমরা যে যে স্থলে প্রাকৃতের উল্লেখ করিব, পাঠকগণ তত্তৎ স্থলে সংস্কৃতেরই রূপান্তর বুঝিয়া লই-

যেন। প্রাকৃতের মধ্য দিয়া অনেকগুলি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। Colebrooke সাহেব বলেন, যে, সারস্বত, কান্যকুব্জ, বাঙ্গালা, মৈথিল, উৎকল, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কার্ণাট, তৈলঙ্গ, ও গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় ভূরি ভূরি প্রাকৃত অর্থাৎ অপভ্রষ্ট সংস্কৃত শব্দ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্যাদির উৎপত্তির ন্যায় ভাষায় উৎপত্তি কিছু একজন হইতে হইতে পারে না। সুতরাং, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তিও কিছু কোম এক নির্দ্দিষ্ট ভাষা হইতে হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, হিন্দী, (মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী ভোজপুরী, মৈথিল) ও উৎকল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি ক্রমে যেমন পরস্তন ভূতে শব্দাদি গুণের আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়; অর্থাৎ আকাশের কেবল শব্দগুণ; আকাশ হইতে বায়ু, সুতরাং, বায়ুর শব্দ স্পর্শ দুইগুণ; বায়ু হইতে অগ্নি, তজ্জন্য অগ্নির শব্দস্পর্শরূপ তিন গুণ; অগ্নি হইতে জল, সেইজন্য জলের শব্দস্পর্শরূপরস এই চারি গুণ; জল হইতে পৃথিবী, এই নিমিত্ত পৃথিবীর শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এই পাঁচ গুণ; তদ্রূপ উৎপত্তিক্রমে অধস্তন ভাষা সকলেও প্রাক্তন ভাষার শব্দ সকল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং, সংস্কৃতে কেবল সংস্কৃত; প্রাকৃতে সংস্কৃত, প্রাকৃত; পালিতে, সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি; হিন্দিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, হিন্দী; উৎকলে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালী, হিন্দী, উৎকল; এবং বাঙ্গালায় সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, হিন্দি, উৎকল ও বাঙ্গালা শব্দ পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত যে যে শব্দ যে যে ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহারা তাৎকালিক কোন না কোন বিজাতীয় ভাষার সংমিশ্রণে মিলিত হইয়াছে। সেইগুলি ভাষার উৎপত্তির সহায়তা করে নাই; বরং পুষ্টির সহায়তা করিয়াছে।

সংস্কৃত কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াই প্রাকৃত হইয়াছে; আবার উহারই বিকৃতিতে পালি ভাষার উৎপত্তি। পাঠকবর্গের মধ্যে বোধ হয়, অনেকে পালি ভাষার নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। উহা বিকৃত প্রাকৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাকেও স্বতন্ত্র ভাষার মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। সাহেবগণ ইহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া থাকেন।* আমাদের মতে প্রাকৃত, পালী ও সংস্কৃতের বর্ণমালা এক। অপাততঃ যে টুকু বৈষম্য প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা নানা লোকের নানাবিধ হস্তলিখিত অক্ষর প্রযুক্তই সংঘটিত হইয়াছে। সাহেবগণ কিন্তু, পালি ভাষার স্বতন্ত্র অক্ষরের কথা বলেন। আমরা বর্ণমালা বিচার স্থলে ইহার সম্পূর্ণ মীমাংসা করিব।

এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা প্রচরদ্রূপ ছিল, এরূপ অনুমান করা যায়। ঐ সংস্কৃতই বিকৃতভাবে স্থানবিশেষে মাগধী, দ্রাবিড়ী, অবন্তিকা, দাক্ষিণাত্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। তজ্জন্য, কেহ কেহ অনুমান করেন, মাগধী প্রাকৃতই পালী; আমাদেরও তাহাই অভিপ্রেত। সিংহলদেশীয়

* মৃত মহাত্মা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, যে, পল্লী মধ্যে ঐ ভাষা ব্যবহৃত হইত বলিয়া, উহাকে পল্লী ভাষা বলিত; তাহা হইতেই পালি ভাষা নাম হইয়াছে। কিন্তু চাইলডারস (Childers) সাহেব তদীয় পালী ভাষার ডিক্সনারীতে লিখিয়াছেন, যে পালি শব্দের অর্থ শ্রেণী। বুদ্ধদেবের জাতক শ্রেণী উহাতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই উহার নাম পালি হইয়াছে। নাসিক নামক স্থানের গুহাভ্যন্তরস্থ লিপিমধ্যে উহা 'গাওবাচ' অর্থাৎ রাখালদের কথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বৌদ্ধগণও উহাকে মাগধী বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—

সা মাগধী মূলভাসা নরা চেয়াদিকপ্পিকা।
ব্রহ্মাণো চস্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥

অর্থ। সেই মাগধীই মূল ভাষা, যাহা আদি কল্পের লোকেরা ব্রহ্মার উজ্জ্বল মুখ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৌদ্ধদেবের সময় হইতেই আমরা পালি ভাষার নাম শুনিয়া আসিতেছে। সিংহলবাসীরা বলে উহা পূর্ব্বে মৌখিক ভাষা ছিল; কালক্রমে পুস্তকাদিতে নিবদ্ধ হইয়াছে।

পিতকত্তয় পালিঞ্চ তস্সা অট্ঠকথঞ্চ তং।
মুখপাঠেন আনেচ্ছুং পুব্বে ভিক্খু মহামতি॥
হানিং দিখান সত্তানং তদা ভিক্খু সমাগতা।
চিরট্ঠিতত্থং ধম্মস্য পোত্থকেসু লিখাপয়ুং॥

অর্থ। পূর্ব্বকালীন মহামতি ভিক্ষুকগণ তিনটী পিতক, জাতক শ্রেণী এবং বৌদ্ধদেবের অন্যান্য আজ্ঞা মুখে মুখে পাঠ করিয়া অভ্যস্ত রাখিতেন। কিন্তু, তাহাতে উহাদের সত্তার হানি দেখিয়া এবং ধর্ম্মকে চিরকাল রাখিবার জন্য অবশেষে পুস্তকে লিখাইয়া ছিলেন।

মগধরাজ্যই পালী ভাষার জন্ম স্থান, অনেকে একথা স্বীকার করেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, পালী যে মাগধী প্রাকৃত, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সংশয় থাকে না। তবে মাগধী প্রাকৃত ও পালীতে যে টুকু বৈলক্ষণ্য প্রত্যক্ষ করা যায়, সেগুলিকে উহার প্রচলনকালীন কোনরূপ বিকৃতি সম্ভব বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং এক্ষণেও বলিতেছি, যে, প্রাকৃত ও পালিতে অত্যল্পমাত্রই বিভিন্নতা আছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অর্থাৎ ৩০০ পূর্ব্বঃ খৃষ্টাব্দে পালী ভাষার ভূয়িষ্ঠ প্রচলন হইয়াছিল। চাইলডারস্ সাহেব বলেন, যে, ৬০০ শত পূঃ খ্রীষ্টাব্দেও পালি প্রচলিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইত। অশোক ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে পালিভাষায় বিজয়বার্ত্তা খোদিত করাইয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি সুদূর কচ্ছ প্রদেশস্থ গিরনার পর্ব্বত গাত্রেও স্বীয় বিজয় লিপি উৎকীর্ণ করিতে ছাড়েন নাই। বৌদ্ধগ্রন্থের অধিকাংশই পালিভাষায় লিখিত।

চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে পারসাধিপতি দারা ও গ্রীসাধিপতি সিকন্দর (Alexander) ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহাদের ভাষার দুই চারিটী শব্দ পালি ভাষার মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে কি না বলা যায় না। পারসী ভাষা যে সংস্কৃতের অনুকরণেই গঠিত, তাহা আমরা শীঘ্রই পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় বিশেষরূপে প্রদর্শন করিতেছি। কিন্তু পালি ভাষায় যদি কোন পারসীক শব্দ প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে সেইগুলি নব্য পারসীক নহে; প্রাচীন পারসীক। তজ্জন্য উহাকেও বিকৃত সংস্কৃত বলিয়া ধারণা জন্মে। সংস্কৃতেরও যেমন প্রাচীন ও নব্য দুই বিভাগ আছে; পারসী ভাষাও তদ্রূপ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন পারসীক বৈদিক সংস্কৃতের ছায়া মাত্র। ঐ প্রাচীন ভাগ এক্ষণে জেন্দ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পারসী জাতির অবেস্থা গ্রন্থ উক্ত ভাষায় লিখিত, এজন্য উহাকে জেন্দ অবেস্তা বলে। কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ মৌলভীর সহিত কথোপকথনে অবগত হইয়াছি, যে অবেস্তার ঋয়েথ, যেজো, হেস্যাম, অথুঅরন এই চারিটী বিভাগ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব শব্দেরই নামান্তর। তাঁহারা বলেন, যে, চতুর্ব্বেদের মন্ত্রগুলিই অবিকল প্রাচীন পারসী অর্থাৎ জেন্দ বর্ণমালায় লিখিত হইয়াছিল। তবে লিখিবার সময় অ, আ, ক, খ, গ ইত্যাদি দ্বারা লিখিত হইলেও বিজাতীয়

ব্যক্তিগত বলিয়া যে উচ্চারণ বৈষম্য ঘটিয়াছে, ঐ বৈষম্য নিবন্ধনই এখন উহারা স্বতন্ত্র শব্দ ও উহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া বোধ হয়।

Sir William Jones বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী, নামক সমিতির সমক্ষে পারসীক জাতির যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে বলিয়াছেন—

'The Zand consisting of Six or Seven Sanskrit words in every ten.

মাননীয় Erksine সাহেব পারসীকজাতির ধর্ম্মপুস্তক ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'I conclude it (Zend) to have been a dialect of Sanskrit current in some parts of India'.

আমরা যেমন সংস্কৃতকে দৈবভাষা বলি, পারসীকেরাও তদ্রূপ জেন্দকে 'অসামান বাণী' বলিয়া থাকে। আমরা বৈদিক সংস্কৃত বা পালী ভাষাসম্বন্ধে এখানে আরও অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক বোধ করিলাম না।

পালি ভাষার সঙ্গে দুই চারিটী পারসীক শব্দ মিশ্রিত হউক, বা নাই হউক, হিন্দী ভাষাতে ভূরি ভূরি যাবনিক শব্দ মিশ্রিত আছে। অধিক, কি, হিন্দীর বিভক্তিগুলি সমস্তই পারসীক বিভক্তিজাত। অনেকের ধারণা, যে হিন্দী একেবারে সংস্কৃত হইতে জন্মিয়াছে। আমাদের ধারণা সেরূপ নয়, কেন না, তাহা হইলে বিভক্তির আকৃতি এত পরিবর্ত্তিত হইত না। সংস্কৃতে দ্বিতীয়া বিভক্তির 'অম্' স্থানে হিন্দিতে 'কো' কোথা হইতে আসিল। পঞ্চমী 'ঙস্' স্থানে, 'সে,' ষষ্ঠীর 'ঙস্' স্থানে 'কা', সপ্তমীর 'ঙি' স্থানে 'মে' হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এজন্য আমরা বলি, হিন্দি ভাষা একেবারে সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। উহার শব্দগুলি সংস্কৃতমূলক বটে, কিন্তু বচন বা কারকাদি বিভক্তির আকার সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পারস্য ভাষার অনুরূপ, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্কৃতেরই রূপান্তর বলিলেও চলে। হিন্দী ভাষায় বহুবচনে 'ওঁ' হয়। পারস্য ভাষায় 'আঁ' হইয়া থাকে, উদাহরণ যথা, কারক এই শব্দের বহুবচনে হিন্দী ভাষায় কারকোং; মাস-মাসোং; রাজা-রাজাওঁ, মতি-মতিওঁ; পারস্য ভাষায় বুজুরগ-বুজুরগাঁ, জায়েল-জায়েলাং। যে সকল পারসীক শব্দ হিন্দিতে ব্যবহৃত হয়, উহারা হিন্দিতে হিন্দীর বহুবচন ও পারসীতে পার্সীর বহুবচনের চিহ্ন পায়; যথা, লড়কা, হিন্দি লড়কোঁ, পার্সী লড়কাঁ; ঔরত-ঔরতোঁ-ঔরতাঁ; বাদশাহ-বাদশাহোঁ-বাদশাহাঁ।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য, যে পারস্য ভাষায় বহু বচনের চিহ্ন আন্ (পারসীক ভাষার নুন অনেক স্থলেই চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য আমরা পূর্ব্বেই 'আন্' কে 'আঁ' বলিয়াছি) হইতেই প্রথম প্রথম হিন্দিতেও কোন কোন স্থলে ঐরূপ নকারান্ত বহুবচনের পদ দেখা যাইত। যথা,—

নিবল সবল কে পচ্ছ তেং
সবলন সোং অনাথত।
দেত হিমায়ত কী গধী
এরাকী কো লাত॥
ফির লাগ্যৌ পচ্ছতান
বুদ্ধি অপনী কোং রোয়ৌ।
নিরগুনিয়ন কে পাস
বৈঠি গুণ অপনী খোয়ৌ।

এস্থলে পারসীক 'সবলান' ও 'নিরগুনিয়ান্' হইতে হিন্দীতে 'সবলন্', ও 'নিরগুনিয়ন' হইয়া অন্তস্থিত নুনের চন্দ্রবিন্দুবৎ উচ্চারণ বিধায় 'সবলঁ', নিরগুনিয়ঁ ইত্যাদি হইয়া কাল-ক্রমে 'সবলোঁ' 'নিরগুনিওঁ' হইয়াছে।

সংখ্যা বাচকেও পূর্ব্ববৎ 'ওঁ' হইয়া থাকে; যথা—দোনোঁ, চারোঁ, পাঁচোঁ, হাজারোঁ লাখোঁ ইত্যাদি। এস্থলে ইহাও বলা যায়, যে পারসী ভাষার ঐ 'আন্,' সংস্কৃত হইতেই আসিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে যেমন 'আন্' হয়, ঐ পদ্ধতি অবলম্বনেই পারস্য ভাষায় প্রথমা দ্বিতীয়াদি সকল বিভক্তিতেই 'আন্' (আঁ) হইয়া থাকে। যথা, প্রথমার বহুবচনে বাদশাহাঁ, দ্বিতীয়ার বহুবচনে বাদশাহাঁ রা ইত্যাদি। এতদ্বারা স্পষ্টরূপ প্রমাণিত হইল যে, হিন্দীর বহুবচনের চিহ্ন পারস্য ভাষা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভিন্ন ভারতীয় আর কোন ভাষাতেই কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন থাকে না। প্রাকৃত পালীতেও কর্ত্তৃকারকচিহ্ন নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালা হিন্দী উৎকল প্রভৃতি ভাষাতেও কর্ত্তৃকারকের কোন চিহ্ন থাকে না। তত্তৎস্থলে উহাদিগকে লুপ্ত বিভক্তিক পদ বলিয়া গণ্য করা যায়।

সংস্কৃত প্রাকৃত পালী প্রভৃতি ভাষাতে ক্লীবলিঙ্গ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। বোধ হয়, এই নিয়মেই প্রথম প্রথম হিন্দি ভাষায়ও দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়া থাকিবে। প্রাচীন হিন্দিতে কর্ম্মকারকের বিভক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। যথা—

সপট অবুধ সমঝৈ কহাং বুধজন বচনবিলাস।
অবহুং ভেক ন জানহি অমল কমল কী বাস॥

অর্থ—নির্ব্বোধ লোক জ্ঞানিলোকের বাক্যবিন্যাস বুঝিতে পারে না। ভেক কি কখন নির্ম্মল পদ্মের গন্ধ জানে?

সাংচ ঝুঠ নিরনয় করৈ নীতি নিপুণ জো হোয়।
রাজহংস বিনকো করৈ ছীর নীর কো দোয়॥

অর্থ—যে ব্যক্তি নীতিজ্ঞ, সেই সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিতে পারে। রাজহংস ব্যতীত দুগ্ধ ও জলকে কে বিভিন্ন করে?

দোষহিং কোং উমহৈ গহৈ
গুন ন গহৈ খললোক।
পিয়ৈ রুধির পয় ন পিয়ৈ
লগী পয়োধর জোক॥

অর্থ—খল লোক দোষই গায়, কখনও গুণ গায় না। স্তনে জোঁক লাগাইলে সে রক্তই পান করে, দুগ্ধ পান করে না।

এস্থলে বচনবিলাস, বাস, সাংচ, ঝুঠ, গুন, রুধির, পয় প্রভৃতি স্থলে কর্ম্মকারকের বিভক্তি হয় নাই। প্রাচীন হিন্দিতে, বিশেষতঃ পদ্যে কর্ম্মকারকের বিভক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। পার্সীতেও অনেক স্থলে কর্ম্মকারকের চিহ্ন থাকে না। যথা—'ছথাবত কুনদ নেকবখত এখতিয়ার'।' খতা দরওজারো ছওআবম নমা'॥ ইত্যাদি স্থলে ছথাবত ও খতা দুই পদে কর্ম্মকারকের চিহ্ন নাই। পার্সী ভাষায় অন্যান্য স্থলে কর্ম্মকারকে 'রা' হয়। যথা 'নিগাহদার মারা জে রাহে খতা' এস্থলে মারা অর্থাৎ আমাকে।

ঐ 'রা' হইতেই হিন্দী ভাষায়ও কোন কোন স্থলে কর্ম্মকারকে 'রে' দেখা যায়। ঐ 'র' হইতেই বাঙ্গালায় কর্ম্মকারকে 'রে' হইয়াছে। যথা, 'কাংত ন বিদেস হি বহুর ভুলে'॥ এখানে 'বহুর' র অর্থ বহুকো। অর্থাৎ বধূকে॥

হিন্দি ও পার্সীতে করণ সম্প্রদানের কোন বিশিষ্টতা নাই। হিন্দির পঞ্চমীতে 'সে' কি প্রকারে আসিল, তাহা স্থির করিতে একটী সুন্দর রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পারস্য ভাষায় অপাদানে 'আজ' ব্যবহৃত হয়; ঐ 'আজ' অপাদানবোধক শব্দের পূর্ব্বে বৈসে। যথা, 'আজ তু,' ইহার অর্থ 'তুঝ সে' অর্থাৎ তোমা হইতে; 'আজ বাজিয়ে' ইহার অর্থ 'বাজী সে' অর্থাৎ খ্যাল হইতে; এক্ষণে যদি

কেহ জিজ্ঞাস্য করেন, সংস্কৃত বা হিন্দিতে বিভক্তি শব্দের উত্তরে প্রযুক্ত হয়,এখানে শব্দের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইল কেন ; ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে ঐটীইত রহস্য !

হিন্দুমুসলমান সর্ব্ব বিষয়েই বিপরীত ভাবাপন্ন। হিন্দুরা যাহা করে, মুসলমানেরা প্রায়ই তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে। তাহার কয়েকটী নিদর্শনও প্রদর্শন করা যাউক। হিন্দুরা বস্ত্রের চারিখুট একত্রিত করিয়া পরিধান করে, উহারা চারিখুট আলগা রাখে ; হিন্দুরা পূর্ব্ব মুখে স্নান করে, উহারা পশ্চিম মুখে গোসল দেয় ; হিন্দুর একাঘাতে বলিদান, উহাদের দশ পনর আঘাতে জবাই ; হিন্দুরা কদলী ও পদ্মপত্রের ব্যস্ত ও উত্তানদিকে অন্নাদি ভোজন করে, উহারা ঐ ঐ পত্রের উত্তান ও ব্যস্তদিকে আহার করিয়া থাকে। হিন্দুরা শ্মশ্রু ও ওষ্ঠলোম রাখে না, উহারা রাখে ; হিন্দুরা মস্তক মুণ্ডন করিলেও মস্তকের উর্দ্ধভাগে অত্যল্প শিখা রাখে, উহারা মস্তকের সর্ব্বত্রই কেশ রাখিলেও সেই উর্দ্ধ ভাগটী কামাইয়া ফেলে। হিন্দুরা দাহ করে, উহারা কবর দেয় ; ইহাদের একটী ধর্ম্মপত্নী, উহাদের চারিটী ধর্ম্মপত্নী ; হিন্দুর বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ, উহাদের বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ; গোমাংস হিন্দুর অখাদ্য, উহাদের খাদ্য ; হিন্দুর কর্ণবেধ, উহাদের ত্বকুচ্ছেদ ; হিন্দুরা আসনে বৈসে, ভোজনপাত্র মাটীতে রাখে, উহারা মাটীতে বসে, ভোজনপাত্রের নিম্নে খানচায় বিছায় ; আমরা বাম দিক হইতে দক্ষিণে পড়িয়া যাই, উহারা দক্ষিণ হইতে বামে পড়িয়া আইসে; আমাদের পুস্তকে যে দিক প্রথম, উহাদের কেতাবে সেইখানে খতম। আমরা বলি মন দিয়া শুন, উহারা বলে, 'জেরা কাণ ধর কর শুনো' ; সর্ব্ববিষয়ে এবম্বিধ বৈপরীত্য নিবন্ধনই উহাদের গ্রন্থাদিতেও বৈপরীত্য ঘটিয়াছে ; তজ্জন্যই উহাদের অপাদান চিহ্ন তদ্বোধক শব্দের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়। শুদ্ধ অপাদান নহে ; ষষ্ঠী সপ্তমীও ঐরূপ পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, পারস্য ভাষায় উক্ত অপাদানবোধক 'আজ' কোন কোন স্থলে আলেফ রহিত হইয়া কেবল 'জ' ব্যবহৃত হয় ; ঐ 'জ' জে হইতে জাত বলিয়া, উহাকে 'জে' উচ্চারণ করিতে হয়, ঐ 'জে' হইতেই হিন্দিতে 'সে' হইয়াছে। যথা 'জে রাহে,' ইহার অর্থ রাহাসে অর্থাৎ রাহা হইতে। 'জে বেদাদ,' ইহার অর্থ বেদাদ সে অর্থাৎ জুলুম হইতে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য, যে হিন্দিতে কোন কোন স্থলে অপাদানার্থে 'তে' হয় ; উক্ত 'তে' সংস্কৃত পঞ্চম্যাস্তসিল্ হইতে গৃহীত ; যথা, গ্রামতঃ=গ্রামাৎ ; ইহারই হিন্দী গ্রামতে ; গৃহতঃ, হিন্দি গৃহতে ; উদাহরণ যথা—

হোয় ভলে কো সুত বুরো
ভলো বুরে কো হোয়।)।
দীপক সোং কাজল প্রগট
কমল কীচতেং জোয়॥

অর্থ—সতের অসৎ পুত্র, কিম্বা অসতের সৎপুত্র হইতে পারে। প্রদীপ হইতে কজ্জল উৎপন্ন হয়, এবং কর্দ্দম হইতে পদ্ম জন্মে।

নৃপ প্রতাপতেং দেসমেং
রহৈ দুষ্ট নহি কোয়।
প্রগটৈ তেজ দিনেস কো
তহাং তিমির নহি হোয়॥

অর্থ—রাজার প্রতাপে দেশমধ্যে কেহ দুষ্ট থাকিতে পারে না, সূর্য্য কিরণ বিস্তার করিলে তথায় অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না। এস্থলে 'কীচ তেঁ' ও 'প্রতাপতেং' উভয়ত্র অপাদানে 'তে' হইয়াছে, ঐ 'তে' হইতেও কালক্রমে 'সে' হওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।

রত্নখনি।

৮৬

অন্তর পাপ-কলুষিত থাকিলে, বাক্য ও বেশ-ভূষা দ্বারা যতই কেন বাহ্যাড়ম্বর কর না, কিছুতেই ভদ্র হইতে পারিবে না। কাক কি কখন দুগ্ধ মাখিয়া হংস হইতে পারে ?

৮৭

পরও হিতকারী বন্ধু হয়, আত্মীয় ব্যক্তিও অহিতকারী হইয়া থাকে। যেমন বন্য ঔষধে হিত সাধিত হয়, কিন্তু শরীরজাত রোগে প্রাণ নাশ করে।

৮৮

তোমার গৃহে লোহার সিন্দুকে টাকা থাকিলে যদি অপরের হাতে উহার চাবি থাকে, তবে তোমার ঐ চাবি ব্যতীত টাকা পাওয়া ঘটে না। সেইরূপ মুক্তিও তোমার হৃদয় মধ্যে আবদ্ধ আছে ; চাবিটী কিন্তু ঈশ্বরের হাতে রহিয়াছে। চাবিটী চাহিয়া পাইলেই মুক্তি লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না। সে চাবিটীর নাম ভক্তি।

৮৯

ক্ষুদ্র পরমাণু স্তূপীকৃত হইলে বৃহৎ পর্ব্বত হয় ; আবার পর্ব্বত পতিত হইলে ক্ষুদ্র পরমাণু হইয়া থাকে। কিন্তু নীচ যদি উচ্চ হইয়া আবার অবনত হয়,তবে সে প্রকৃত উচ্চ অর্থাৎ সাধু হয়।

৯০

রাজা প্রজাপালনের নিমিত্ত শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সেই শাসনকর্ত্তা যদি প্রজাপালনের পরিবর্ত্তে তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করেন, তাহা হইলে রাজা তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দেন। ঈশ্বরও সেইরূপ তাঁহার জীবসমূহকে পালন করিবার জন্য মনুষ্যকে স্বাধীনতা প্রদান করতঃ শাসনকর্ত্তারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্য যদি জীবদিগকে পালন না করিয়া তাহাদের প্রতি হিংসা করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া পদচ্যুত করিবেন। অর্থাৎ মনুষ্যত্বরূপ স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়া পশুত্ব প্রদান করিবেন।

৯১

যদি অহংবর্দ্ধক বিনশ্বর রত্ন পাইয়া বিনষ্ট হইতে চাও, তবে জহুরীর বিপণীতে অনুসন্ধান কর। আর যদি অহং নাশক অবিনশ্বর রত্ন পাইয়া অমর হইবার অভিলাষ থাকে, তবে সাধুর আশ্রয় গ্রহণ কর।

৯২

আপনার যশ আপনি ব্যক্ত করিও না। তাহা তুমি যে অভিপ্রায়ে ব্যক্ত করিবে তাহার সম্যক ফল পাইবে না। কারণ তোমার প্রকাশের উদ্দেশ্য সমস্ত লোকে জানা। তুমি স্বয়ং প্রকাশের ভার লইলে অতি অল্প লোকেই জানিবে। আর যদি তুমি নিজে সে ভার না লও, তবে ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশের ভার লইয়া সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিবেন। কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী।

৯৩

সাকার ও নিরাকার উপাসকের মধ্যে যে প্রভেদ, সধবা ও বিধবা স্ত্রীর মধ্যেও সেই প্রভেদ। সাকার উপাসকেরা যেমন মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন, সধবাদেরও সেইরূপ স্বামী পূজা কর্ত্তব্য। নিরাকার উপাসকেরা মন দ্বারা পরব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকেন। বিধবাদেরও সেইরূপ মৃত পতির ধ্যান করা

উচিত। যেহেতু স্বামীই স্ত্রীলোকের ঈশ্বর। যাহারা স্বামীকে ঐহিক সুখের যন্ত্র বলিয়া মনে করেন, তাহারাই সধবাবস্থায় সুখ ও বৈধব্য দশায় দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; যাহারা স্বামীকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি বোধে ভক্তি করে, তাহাদের স্বামী অভাবেও কোন কষ্ট হয় না। শেষোক্ত স্ত্রীরাই মুক্তি প্রাপ্তির যথার্থ পাত্রী।

৯৪

তুমি বহুমূল্য রাজাসনে উপবেশন করতঃ বিচিত্র বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া ও হীরক-মণি-মুক্তা-খচিত কিরীটী মস্তকে দিয়া অভিমান ভরে ভগবচ্চরণে প্রণত হইতে অপমান বোধ কর। কিন্তু তুমি যে কমলার সামান্য কৃপাকটাক্ষে ঐ সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছ, সেই লক্ষ্মীদেবী পদ্মহস্তে ভগবানের চরণকমল অহর্নিশি সেবা করিয়া কৃতার্থা হন। ইহা ভাবিয়াও কি তোমার অহঙ্কার দূর হইবে না?

৯৫

স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিন্দা বা প্রশংসায় সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনই হেতু দেখা যায় না। যদি কোন গৃহস্বামীর গৃহে কতকগুলি সাধুর আগমন হয়, তবে দর্শকমাত্রেই উক্ত সাধুবর্গের প্রশংসা গান করিয়া থাকে এবং সেই একই গৃহে যদি কতকগুলি দস্যুর সমাগম হয়, তবে সকলে সেই দস্যুদিগের নিন্দাবাদ করে। সাধুগণের প্রশংসায় বা দস্যুবৃন্দের নিন্দায় গৃহস্বামী বা গৃহের প্রতি যেমন কোনই প্রশংসা বা নিন্দা বর্ত্তে না, সেইরূপ জীবের দেহরূপ গৃহে সাধুরূপ কতকগুলি সদ্‌গুণ এবং দস্যুরূপ অসদ্‌গুণাবলীর সমাবেশ হইলে লোক সেই গুণের প্রশংসা ও দোষের নিন্দা করিয়া থাকে। তাহাতে দেহী এবং দেহের গৌরব অগৌরব কি?

৯৬

যেমন কষ্টি-পাথরে কসিলে স্বর্ণ ও পিত্তলের প্রভেদ লক্ষিত হয়, সেইরূপ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সংসারের যাবতীয় সার ও অসার পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা অগ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায় তাহাই অসার,আর যাহা অগ্নিতে ভস্মীভূত হয় না তাহাই সার। সংসারের যাবতীয় পদার্থ অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হইয়া যায়, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই অবিকৃত অবস্থায় থাকে। অতএব জগতের মধ্যে ধর্ম্মই সার পদার্থ ও জীবের একমাত্র বন্ধু। মৃত্যু কালের সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে দারা পুত্র, পিতা মাতা, ধন জন, কেহই সঙ্গে যায় না। ধর্ম্মই কেবল সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। অতএব সকলে ধর্ম্মোপার্জ্জনে তৎপর হও।

৯৭

যেমন দুষ্ট অশ্ব অসতর্ক সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্তচেতা মনুষ্যকে পাপ পথে লইয়া গমন করে।

৯৮

যে কখন ভার বহন করিতে অভ্যাস করে নাই, হঠাৎ তাহার মস্তকে প্রচুর ভার চাপাইয়া দিলে সে কিছুতেই তাহা বহন করিতে পারে না। সেইরূপে যে ক্রমে ক্রমে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস না করে, সে মৃত্যুকালে একেবারে মায়া পরিত্যাগ করিতে ভয়ানক কষ্ট পাইয়া থাকে। ইহাকেই মৃত্যু যন্ত্রণা বলে।

৯৯

বিষদানে যে পাপ অসৎ উপদেশ দানেও সেই পাপ। বিষে শরীর জর্জ্জরিত হইলে প্রাণ-

বায়ু বিনষ্ট হয়। অসৎ উপদেশেও মন কলুষিত হইলে মানসিক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অতএব বিষ ও অসৎ উপদেশ-প্রদায়ী উভয়কেই আমরা হত্যাকারী বলিতে পারি।

১০০

ঘৃতের স্বরূপ থাকিলেও দুগ্ধে অদৃশ্য ভাবে ব্যাপিয়া আছে। গোপ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া দুগ্ধ হইতে ঘৃত বাহির করিয়া লয়। সেইরূপ ঈশ্বরও সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; ভক্ত নানাবিধ কঠোর সাধনা দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন।

১০১

বৃক্ষ অতি বাড়িলে ঝড়ে ভাঙ্গিয়া যায়, আবার অতি নীচ হইলে পশুতে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। সেইরূপ মনুষ্যও অতি দর্পিত হইলে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, আবার অতি নীচতা অবলম্বন করিলেও সকলে ঘৃণা করিয়া থাকে।

১০২

প্রকৃত বড় লোক তাঁহাকেই বলি, যিনি শীতাতপ ও লজ্জা নিবারণোপযোগী বসনে এবং শরীর ধারণোপযোগী খাদ্যে পরিতৃপ্ত অথচ মহৎ মহৎ চিন্তায় সদা নিযুক্ত। আর যথার্থ নীচ লোক সে, যে অনুক্ষণ নিকৃষ্ট চিন্তায় কালাতিপাত করে, কিন্তু মহামূল্য বসন ভূষণ প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্য ও রসনা তৃপ্তিকর খাদ্য আহরণে প্রাণপণে সদা সচেষ্ট থাকে।

১০৩

বৃক্ষ ফলশালী হইলে নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করতঃ বিনত হইয়া অকাতরে ফলপ্রদান করে। সেইরূপ ধনশালী হইলে মানবেরও, যাচকের আবদার সহ্য করত বিনীত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ধন দান করা উচিত।

১০৪

মধুপানের সুখভোগ করিতে গেলে মধু আহরণের সময় মধুমক্ষিকার দংশন সহ্য করিতে হয়, পদ্মবনে পদ্ম তুলিতে গেলে মৃণালের কণ্টক গাত্রে বিদ্ধ হইয়া থাকে। শরীরে বেদনা লাগিবে এ ভয় করিলে মধু আহরণ বা পদ্ম সংগ্রহ ঘটিয়া উঠে না। সেইরূপ ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে হইলে সাংসারিক অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়, অধার্ম্মিকের উপহাস সহ্য করিতে হয়। সে ভয়ে ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলে ধর্ম্মামৃত পানজনিত সুখভোগ ঘটিয়া উঠে না।

১০৫

পায়ে ধূলা না লাগিতে পারে এই অভিপ্রায়ে যদি পৃথিবীকে চর্ম্মমণ্ডিত করিয়া তদুপরি ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা করা যায়, তাহা হইলে সে ইচ্ছা কখনই পূর্ণ হয় না। কিন্তু যদি পাদুকা পরিধান করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীকে চর্ম্মাবৃত করিবার ফল লাভ হয়। সেইরূপ জগতের সমুদয় লোক সাধু হইবে, সকলেই আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, এরূপ আশা করা নিতান্ত অসম্ভব। আপনি ভাল হইলে আপনি স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিলে সকলকেই ভাল দেখা যায় এবং সকলে আমাকে ভাল বাসিতেছে বুঝা যায়। বাস্তবিক আপনি ভাল হইলে, আপনি সন্তুষ্ট হইলে সকল পদার্থ ও সকল অবস্থাই সুখের হয় এবং আপনি মন্দ হইলে সকল পদার্থ ও সকল অবস্থাই দুঃখের হয়।

১০৬

যাহার গৃহখানি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নানাবিধ বিলাস দ্রব্যে সুসজ্জিত, সে যদি অন্নাভাবে শীর্ণকলেবর হয় এবং

একখানি জীর্ণ মলিন বসন পরিয়া সেই গৃহে বসিয়া থাকে, তবে সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু যাহার দেহখানি অতি সুন্দর এবং বহুমূল্য বেশভূষায় সদাই ভূষিত, তাহার মন যদি পাপ চিন্তায় অপবিত্র হয় এবং উপযুক্ত জ্ঞানাভাবে ক্ষীণ হইয়া যায়,তবে সে সকলের ঘৃণার পাত্র হয় না কেন?

১০৭

পর ধন অপহরণ করিয়া দান করিলে সে দানে কোন ফল নাই। পরস্ত্রী হরণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না। যে পর ভরসায় দিন যাপন করে তার জীবন মরণ উভয়ই সমান। যে পর নিন্দা করে তার হরি নাম লওয়া বৃথা।

১০৮

যত্ন করিলে মনুষ্যের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পাপ কার্য্য করা যায়, কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরের চক্ষে ধূলি দিবার উপায় নাই। অতএব মনুষ্য ভয় পরিত্যাগ করতঃ ঈশ্বরকে ভয় করিয়া কার্য্য কর।

১০৯

রাজার রাজ্য হইতে ভৃত্য কর সংগ্রহ করে এবং তাঁহারই আদেশে তাহা ব্যয় করিয়া থাকে, ইহাতে ভৃত্য কোনই গৌরব প্রকাশ করে না। কারণ সে জানে ঐ ধন তাহার নিজের নহে; সে কেবল প্রভুর আদেশ পালনকারী ভৃত্য মাত্র। সেইরূপ আমরাও ব্রহ্মাণ্ডপতির রাজ্য হইতে তাঁহার নিয়োগানুসারে ধন সঞ্চয় করিয়া থাকি। কিন্তু যখন উহা দান করি, তখন আমি ধন দান করিতেছি, এরূপ অভিমান হয় কেন? আগয়াও ত তাঁহার আজ্ঞাবাহক ভৃত্য বই আর কিছুই নয়।

১১০

রেলগাড়ি ও সংসার সমান। রেলগাড়ি যেমন চলিয়া থাকে, সংসারও সেইরূপ নিয়ত অবিরাম গতিতে চলিতেছে। রেলগাড়ীতে নিয়ত যাত্রী উঠিতেছে নামিতেছে, সংসারেও জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। রেলযাত্রী নামিবার সময় টিকিট দেখাইতে না পারিলে বিপদগ্রস্ত হয়, জীবগণও মৃত্যুকালে হরিনাম উচ্চারণ না করিলে নরকযন্ত্রণা ভুগিয়া থাকে। আমরা যতক্ষণ রেলগাড়ীতে থাকি, ততক্ষণ পরস্পর যাত্রীদের সহিত সাদর সম্ভাষণ ও সদালাপ করিয়া থাকি। কিন্তু যতক্ষণ আমরা সংসারে থাকি, ততক্ষণ পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরি কেন?

১১১

আমাদের শরীরে কোন ব্যাধি হইলে তাহার প্রতিকারে বিশেষরূপে সচেষ্ট হইয়া থাকি। কিন্তু নিয়ত পাপ চিন্তা দ্বারা আমাদের মন রোগগ্রস্ত হইতেছে, তাহার আরোগ্যের কি উপায় দেখিতেছি? আমাদের এত দুঃখ ত সেই জন্যই!

১১২

দন্তের কোনরূপ অসুখ হইলে যতক্ষণ সেই অসুখ নিবারিত না হয়, ততক্ষণ জিহ্বা প্রাণপণে সেই অসুখ নিবারণে চেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু দন্ত এমনি অকৃতজ্ঞ যে, সুযোগ পাইলেই জিহ্বাকে ছিন্ন করিয়া ফেলে। সেইরূপ সংসারে তুমি খলের যতই উপকার করনা কেন, সে তাহার কিছুই মনে না করিয়া ফাঁক পাইলেই তোমার অপকার করিয়া বসিবে।

১১৩

দর্পণের সম্মুখে যে কোন দ্রব্যই উপস্থিত হয়, দর্পণ নিরপেক্ষভাবে সকলের প্রকৃত প্রতিবিম্ব প্রকাশ করে; কিন্তু অত্যুত্তম ও সুন্দর হইলেও কাহাকে স্বীয় বক্ষে স্থায়ীভাবে ধারণ করে না। সেইরূপ আমাদেরও জগতের সকলকেই সমানভাবে প্রীতি-চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য; কিন্তু নিতান্ত আত্মীয় হইলেও কাহারও প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নহে।

১১৪

প্রস্তরের মধ্যে অগ্নি অলক্ষিতে লুক্কায়িত আছে। প্রস্তর দেখিয়া সে অগ্নি কেহ অনুভব করিতে পারে না এবং প্রস্তরকে জল মধ্যে নিমগ্ন অথবা অস্ত্রাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেও উহার অন্তরস্থ অগ্নির লোপ হয় না। কিন্তু লৌহখণ্ড দ্বারা ঐ প্রস্তরে আঘাত করিতে পারিলে উহার অন্তরস্থ অগ্নি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে ঐরূপে চকমকি ব্যবহার করিতে না জানে, সে কিছুতেই প্রস্তরস্থ অগ্নির সত্তা স্বীকার করে না। সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর স্বয়ং লোক চক্ষুর অগোচরে নিরাকারভাবে বিরাজিত আছেন। ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংশেও তাহার ধ্বংশ হয় না। যে ভক্তিরূপ লৌহখণ্ড দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তরকে আঘাত করিতে পারে, অর্থাৎ যে ভক্তির সহিত ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যসকল পর্য্যালোচনা করিতে পারে, ভগবান তাহারই নিকট প্রস্তরস্থ অগ্নির ন্যায় স্বয়ং প্রকাশ হন। অন্যের নিকট হন না। আমাদের নিকট তিনি চিরকালই নিরাকার।

১১৫

মধুমক্ষিকা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া নিজে ভক্ষণ করে না, চক্রে সঞ্চয় করিয়া রাখে। সেইজন্য তাহার মুখ বিষাক্ত হয় এবং ঐ সঞ্চিত মধুও তাহার আর ভোগে লাগে না, অন্যে ভোগ করিয়া থাকে। সেইরূপ যাহারা ধন উপার্জ্জন করতঃ উহার সদ্ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র মৌজুত করে, তাহাদেরও মধুমক্ষিকার ন্যায় অন্তর ও মুখ কুটিল ভাবাপন্ন হয় এবং ঐ ধন তাহাদেরও ভোগে লাগে না, অপরে তাহার কষ্টে উপার্জ্জিত ধন ভোগ করিয়া সুখী হয়।

তাপ।

উত্তাপ ও শৈত্য কহাকে বলে তাহা সকলেই জানে। কিন্তু শৈত্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই; যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার, তেমনই উত্তাপের অভাব শৈত্য। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহাতে উত্তাপের সম্পূর্ণ অভাব। সমস্ত পদার্থেই উত্তাপ আছে ও সমস্ত পদার্থেরই উষ্ণতা (temperature) আছে। তবে যে কোন কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে অত্যন্ত শীতল বলিয়া বোধ হয়, মনে হয় যেন ইহার কিছুমাত্র উষ্ণতা নাই, তাহার কারণ এই যে, আমরা সচরাচর ত্বক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা উষ্ণতা (temperature) অনুভব করিয়া থাকি, সুতরাং আমাদের ত্বক্ অপেক্ষা যে বস্তুর উষ্ণতা অল্প, তাহাকেই আমরা শীতল বলিয়া অনুভব করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল বস্তুর উষ্ণতা আছে। যদি কোন উপায়ে আমাদের ত্বকের উষ্ণতা ঐ সকল দ্রব্যের উষ্ণতা অপেক্ষা অল্প করা যায়, তখন আবার ঐ সকল দ্রব্যই উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত সকলেই অবগত আছেন—পুষ্করিণীর জলে নামিয়া দেখিলেন জল বেশ শীতল, ক্ষণেক পরে বৃষ্টি হইল, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস

বহিল, শীত শীত বোধ হইতে লাগিল, তখন আবার সেই পুষ্করিণীতেই নামিয়া দেখিলেন জল বিলক্ষণ গরম হইয়াছে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পুষ্করিণীর জল ত কেহ গরম করে নাই, অথচ ইহা গরম হইল কেন। ইহার কারণ এই যে শীতল বাতাসে শরীরের উষ্ণতা কমিয়া গিয়াছে এবং জলের উষ্ণতা অপেক্ষা শরীরের উষ্ণতা অল্প হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্য জল পূর্ব্বাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত শীতল হইলেও আমাদের নিকট উষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ত্বক্ উষ্ণতা অনুভব করিবার ইন্দ্রিয় হইলেও ইহা সর্ব্বদা আমাদিগকে অভ্রান্তরূপে উষ্ণতার পরিমাণ জানাইতে অক্ষম। কারণ ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একই উষ্ণতা আমাদিগের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাপ আমাদের জীবনে সর্ব্বদা যে আশ্চর্য্য কার্য্য করিতেছে, তাহাতে উষ্ণতার (temperature) পরিমাণ স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই তাপমান যন্ত্রের সৃষ্টি।

তাপমান যন্ত্র (Thermometer) সকলেই দেখিয়াছেন। জ্বর হইলে ডাক্তারেরা ইহা দ্বারা শরীরের উত্তাপ পরিমাণ করিয়া থাকেন। অনেক সময় ডাক্তারেরা যে বলিয়া থাকেন, যে ১০২ কি ১০৩ ডিক্রী জ্বর হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, শরীরের উত্তাপ ১০২ কি ১০৩ ডিগ্রী হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক কি প্রকারে তাপমান যন্ত্রের দ্বারা তাপ পরিমাণ করা সম্ভব। তাপ-শক্তির (১)একটী প্রধান গুণ এই যে,ইহার প্রভাবে প্রায় সমস্ত বস্তুরই আয়তনের বৃদ্ধি হয়। এই গুণ প্রভাবেই তাপমান-যন্ত্র কার্য্য করে। তাপমানযন্ত্র একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট কাচদণ্ড মাত্র। এই কাচ-দণ্ডের দুই প্রান্তই বন্ধ। এক প্রান্তের ছিদ্র একটু বড়; তাহার মধ্যে পারদ থাকে। যখন উত্তাপ প্রভাবে পারদের উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, তখন তাহার আয়তনও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সমস্ত পারদ আর সেই প্রান্তস্থ বড় ছিদ্রে ধরে না, কাচদণ্ডের মধ্যে প্রসারিত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ যত উত্তাপ বর্দ্ধিত করা যায়, পারদ তত আয়তনে বর্দ্ধিত হয় এবং কাচ দণ্ডের মধ্যে উঠিতে থাকে। এইরূপে পারদের আয়তন অনুসারে কাচদণ্ডের উপরিস্থ চিহ্নের সাহায্যে আমরা তাপের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। যখন পারদ ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে তখন আমরা বলি যে উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রী।

তাপের যে শক্তি দ্বারা দ্রব্যের আয়তন বর্দ্ধিত হয়, তাহা দ্বারা যে শুদ্ধ তাপমান-যন্ত্রেরই সৃষ্টি হইয়াছে এমত নহে, তাহা দ্বারা আরও অনেক প্রকার যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রকৃতির নানা প্রকার আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পন্ন হইতেছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন কোন গ্রামে অগ্নিতে গৃহাদি দগ্ধ হয়, তখন সেই স্থানে হঠাৎ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। (এই জন্যই বোধ হয় অগ্নির একটী নাম বায়ুসখ।) এই ঘটনার মধ্যে তাপের প্রসারিণী শক্তি কার্য্য করিতেছে। প্রথমতঃ অগ্নি সংযোগে বায়ু উত্তপ্ত হওয়ায় ইহার আয়তন বর্দ্ধিত হয় এবং ভার কমিয়া যায়। এই লঘু বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে এবং চতুর্দ্দিক হইতে শীতল বায়ু আসিয়া এই উত্তপ্ত বায়ুর স্থান অধিকার করে। এইরূপে ক্রমাগত বায়ুর আবর্ত্তন হইতে থাকে সুতরাং চতুর্দ্দিক হইতে যেন ঝড় বহিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ কারণ বশতই আমাদের দেশে বায়ু প্রধানতঃ দুই

দিক হইতে বহিয়া থাকে। কারণ এসিয়াখণ্ডের মধ্যভাগে যে মরুভূমি আছে তাহা শীত কালে অত্যন্ত শীতল হয় বলিয়া তথাকার বায়ুও শীতল হয়, অথচ সমুদ্রের বায়ু সে পরিমাণ শীতল হয় না। সুতরাং সমুদ্রের (বঙ্গোপসাগর) উপরিস্থ বায়ুর উষ্ণতা অধিক থাকে এবং ভারত্বের লাঘব হয়। এই জন্য সেই বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায় ও মধ্য এসিয়া হইতে শীতল বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এই রূপে সমস্ত শীত কাল উত্তর দিক হইতে বায়ু বহিয়া থাকে। ইহার ঠিক বিপরীত কারণে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু বহে। কারণ তখন উক্ত মরুভূমি সকল অত্যন্ত উষ্ণ হয়। তথাকার বায়ু লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায় এবং সাগর সংস্পৃষ্ট বায়ু তাহার স্থান অধিকার করে, সুতরাং এই সময়ে সাগরের দিক অর্থাৎ দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। এই দুইটী দৃষ্টান্তে অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, বায়ুর ভারের লাঘব হইলে তাহা ঊর্দ্ধে উঠিবে ইহার মানে কি? কিন্তু যদি একটু বিবেচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যেমন এক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ গভীর জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহা ক্রমশ জলের উপরে উঠিয়া ভাসিতে থাকে, তেমনই এই প্রকাণ্ড বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যদি কোন স্থানের বায়ু কোন কারণ বশতঃ লঘু হইয়া পড়ে, তবে তাহা বায়ুমণ্ডলের (atmosphere) ঊর্দ্ধ প্রদেশে উত্থিত হইবে এবং যতক্ষণ না সমান ভারাপন্ন বায়ুপ্রদেশে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ ক্রমাগত উঠিতে থাকিবে।

যেমন তাপের প্রভাবে দ্রব্যের আয়তন বর্দ্ধিত হয়, তেমনই তাপের অভাবে দ্রব্যের আয়তনের হ্রাস হইয়া থাকে। যদি কোন দ্রব্য হইতে তাপ বিয়োজিত করিতে পারা যায়, তবে তাহার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া পড়িবে। যাঁহারা কলিকাতায় থাকেন তাঁহারা ইহার একটী দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখিতে পাইয়া থাকেন। যখন গাড়ীর চক্র লৌহ বেষ্টন দ্বারা বেষ্টিত করা হয়, তখন প্রথমে সেই লৌহ বেষ্টনটীকে অগ্নিতে পুড়াইয়া রক্তিম বর্ণ করতঃ সেই বেষ্টন মধ্যে চক্রটীকে নিক্ষেপ করিয়া জল প্রয়োগে ঐ রক্তিম বর্ণ লৌহ বেষ্টনকে শীতল করা হয়। তখন যে চক্র পূর্ব্বে অনায়াসে লৌহ বেষ্টন মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে এরূপ কঠিনভাবে লৌহ বেষ্টন দ্বারা বেষ্টিত হয় যে, আর তাহা হইতে চক্রকে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ উষ্ণতা হরণের সঙ্গে সঙ্গে লৌহ বেষ্টনের আয়তন অল্প হইয়া পড়ে। এই ত হইল তাপের এবং জড়ের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের প্রতিপ্রসবও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকে বোধ হয় জানেন যে, বরফ বা শিলা জলে ভাসে। যেহেতু উহা জল অপেক্ষা লঘু। বরফে উত্তাপ দিলে গলিয়া জল হয়, কিন্তু জলের আয়তন বরফের আয়তন অপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। এই যে সাধারণ বিধির একটী প্রতিপ্রসব, ইহা দ্বারা সংসারের এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে এবং সৃষ্টি কর্ত্তার অতি অনির্ব্বচনীয় মহিমা ও অপরিসীম সৃষ্টিকৌশল সংসারে প্রচারিত হইতেছে। অনেকেই জানেন যে, মেরুদ্বয়ের সন্নিহিত স্থান অত্যন্ত শীতপ্রধান প্রদেশ। তথায় সমুদ্রের জল সর্ব্বদাই বরফাচ্ছন্ন। এমন কি অনেক স্থলে জলের উপরিস্থ বরফের উপর দিয়া মানুষ চলিয়া যাইতে পারে। এক্ষণে এই বরফ কি প্রাকৃতিক নিয়মে প্রস্তুত হয়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, শীতল বায়ুর সংযোগে জল শীতল হইয়া বরফ আকার

ধারণ করে কিন্তু এই শীতল বায়ুর প্রভাব কেবল জলের উপরি ভাগে কার্য্য করে, গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং বরফ সমুদ্রের গভীর প্রদেশে প্রস্তুত হয় না, কেবল সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রস্তুত হয়। কিন্তু যদি বরফ জল অপেক্ষা বেশী ভারি হইত, তাহা হইলে যে মাত্র উপরের স্তর জমিয়া বরফ হইত, অমনি তাহা সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইয়া যাইত। এবং উপরের স্তরস্থ জল আবার বরফ আকার ধারণ করিত। এইরূপে সমস্ত সমুদ্রের জল জমিয়া বরফ আকারে পরিণত হইলে ঐ সকল প্রদেশের সমুদ্র গর্ভে যে অসংখ্য প্রাণী সকল রহিয়াছে, তাহারা এককালীন বিনষ্ট হইয়া যাইত তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির এক অংশ তাঁহারই দ্বারা সমূলে নষ্ট হইত। কিন্তু তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ইহার উপায় অগ্রেই করিয়া রাখিয়াছে। প্রয়োজন হইয়াছে, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি প্রসবেরও বিধান হইয়াছে।

তাপের (২)দ্বিতীয় শক্তি কর্ত্তৃক দ্রব্যের অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। তাপ প্রভাবে বস্তুর অবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তন হয় যে, তাহাকে আর সে বস্তু বলিয়াই বোধ হয় না। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা দেখিতে পাই। তাপ এক দিকে সুবর্ণময় অট্টালিকাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মরাশিরূপে পরিবর্ত্তিত করিতেছে, আর এক দিকে লৌহ প্রভৃতি অতি কঠিন প্রাকৃতিক দ্রব্যসকলকে কর্দ্দমাকারে পরিণত করিয়া নানারূপ আবশ্যকীয় দ্রব্যের আয়োজন দ্বারা মনুষ্যের অশেষ বিধ উপকার সাধন করিতেছে। এ সব বিষয়ের সবিশেষ বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে ও তাহার ক্ষমতাও নাই। বিজ্ঞান অদ্যাবধি তাপের কতিপয় শক্তির পরিচয় পাইয়াছে মাত্র। তাপ প্রভাবে যেমন বরফ গলিয়া জলের আকার ধারণ করে, তেমনই আবার জল নিরাকার বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তাপের এই অবস্থা পরিবর্ত্তনী শক্তি দ্বারা জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া সংসারের যে কি মহৎ উপকার সাধন করিতেছে, সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করা যাউক।

সকলেই দেখিয়াছেন যে, যখন জল গরম করা যায়, তখন প্রথমতঃ জল উষ্ণ হয়; পরে যদি ক্রমাগত উত্তাপ দেওয়া যায় তখন জল হইতে বাষ্প উঠিতে থাকে। এখানে আমরা যে প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা জল উত্তপ্ত করি, তাহার উত্তাপ জলকে বাষ্পের আকার ধারণ করায়। এই উত্তাপ অভাবে কখনই জল বাষ্পাকারে পরিণত হইতে পারে না। জলের পরমাণু (molecule) মধ্যে তাপ কার্য্য করিয়াই তাহাদিগকে পরস্পর হইতে দূরবর্ত্তী করে। আবার যদি কোন প্রকারে ঐ বাষ্প হইতে তাপ নিষ্কাসিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বাষ্প আবার জলের আকার ধারণ করে। ইহার দৃষ্টান্তও আমরা জল গরম কালে দেখিতে পাই। আমরা দেখি যে, উষ্ণ জল হইতে ধূমের মত এক প্রকার পদার্থ উত্থিত হয়; তাহাকেই আমরা বাষ্প বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা বাষ্প নহে, তাহা অতি ক্ষুদ্র বারিকণা মাত্র। বাষ্প নিরাকার, তাহা চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না; কিন্তু যে মাত্র বাষ্প জল হইতে উত্থিত হয়, অমনি শীতল বায়ু সংযোগে উহার উত্তাপ বিয়োজিত হইয়া যায় এবং উহা জল বিন্দু আকার ধারণ করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। ঠিক এই প্রণালীতে মেঘের সঞ্চার হয় ও বৃষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্যের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবী পৃষ্ঠের জলরাশি হইতে বাষ্প উত্থিত হয়। ক্রমে এই বাষ্প উচ্চ প্রদেশে উত্থিত হইলে,

থায় শীতল বায়ুর সংযোগে ইহার উত্তাপ পহৃত হয় এবং উহা জলবিন্দু আকারে পরিত হইয়া মেঘের সঞ্চার করিয়া থাকে বং সেই মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া সংসারের ত্তাপ হরণ করে। এইরূপে বিধাতার আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশলে যে সূর্য্যরশ্মি জগতকে প্রপীড়িত রে, তাহাই আবার জগতের তাপ নিবারণের পায় বিধান করিয়া থাকে। এই যে বাষ্প র্ব্বদা পৃথিবীর জলরাশি হইতে সূর্য্য রশ্মি ভাবে উত্থিত হইতেছে, তাহা বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস-শ্বাসে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাতে অদৃশ্য ভাবে বাষ্প লুক্কায়িত আছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বায়ুর উষ্ণতা যত বর্দ্ধিত য়, তত অধিক পরিমাণে বাষ্প উহার মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারে। যদি বাতাস অত্যন্ত উষ্ণ হয় তাহাতে অনেক পরিমাণে াষ্প লুকাইয়া থাকে। ঐ বাতাসকে যদি শীতল করা যায়, তাহা হইলে উহা ঐ লুক্কায়িত বাষ্পকে আর ধারণ করিতে পারে না; তখন ঐ বাষ্প জলবিন্দু আকার ধারণ করে। অনেকে দেখিয়াছেন যে, যদি একটি ধাতু নির্ম্মিত গ্ল্যাসে বরফ রাখা যায়, তবে তাহার বহির্দ্দেশে জলবিন্দু সকল দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, বরফ সংযোগে বায়ুর উষ্ণতা অল্প হইয়া যায় সুতরাং উহাতে পূর্ব্বে যে বাষ্প লুক্কায়িত ছিল তাহা আর থাকিতে পারে না, জলবিন্দু আকার ধারণ করে এবং গ্ল্যাসের বহির্দ্দেশে সঞ্চারিত হয়। ঠিক এই কারণ বশতই শিশির-বিন্দু উৎপাদিত হইয়া থাকে, অনেকে মনে করেন যে, যেমন বৃষ্টির জল ঊর্দ্ধ হইতে পতিত হয়, তেমনই শিশিরও ঊর্দ্ধ হইতে পড়িয়া থাকে। এই জন্যই সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে শিশির "পড়িতেছে"। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শিশির পড়ে না। রাত্রিকালে সূর্য্য রশ্মির অভাবে পৃথিবী শীতল হয় সুতরাং পৃথিবী সংলগ্ন বায়ুও শীতল হইয়া পড়ে; তখন ঐ বায়ুতে দিবসে যে পরিমাণে বাষ্প লুক্কায়িত ছিল, তাহা আর থাকিতে পারে না বলিয়া জলবিন্দু আকার ধারণ করতঃ বৃক্ষাদির পত্রে শিশিররূপে দেখা দেয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যখনই জল বাষ্প আকারে পরিণত হয়, তখনই ইহাতে তাপের কার্য্য হইয়া থাকে। কিছু পরিমাণ তাপ না পাইলে আর জল বাষ্প হইতে পারে না। সুতরাং যদি জলে অন্য কোন উপায়ে তাপ না দিয়া উহার কিয়দংশকে বাষ্প আকারে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট অংশ অত্যন্ত শীতল হয়। অনেকেই জানেন যে, গ্রীষ্ম কালে কুজাতে জল রাখিলে জল অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, কুজাতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া কুজার বহির্দ্দেশে জল আসে এবং তথায় বাষ্পাকারে পরিণত হয়। এই বাষ্পকার ধারণ করিতে যে তাপের প্রয়োজন, তাহার কিয়দংশ বায়ু হইতে সংগৃহীত হয় ও কিয়দংশ কুজার জল হইতে লওয়া হয়, সুতরাং কুজার জলের উত্তাপ কিয়ৎপরে বিনষ্ট হইয়া উহাকে শীতল করিয়া ফেলে। জলের বাষ্পাকার ধারণ বিষয়ে তাপের যেমন প্রয়োজন বায়ুতে বাষ্পের অভাবও তেমনই আবশ্যক। যদি বায়ুতে অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে তবে আর বেশী বাষ্প উত্থিত হইতে পারে না। কারণ বায়ু ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতায় ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বাষ্প ধারণ করিতে পারে, তাহার অধিক হইলে আর পারে না। এইজন্য বর্ষাকালে আর্দ্র বস্ত্র শুষ্ক করা এত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কারণ তখন বায়ুতে অনেক

পরিমাণে বাষ্প থাকে; বায়ু আর বাষ্প গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ও অপারক। সেই জন্য বস্ত্রের জল বাষ্পাকারে পরিণত হইতে পারে না, সুতরাং বস্ত্র শুষ্ক হয় না। কারণ বস্ত্রের জল বাষ্প হইয়া যায় বলিয়াই বস্ত্র শুষ্ক হয়—অন্য কোন কারণে নহে। আমাদের শরীর হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উত্থিত হইয়া আমাদের শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তাপ নিবারণ করিতেছে। কারণ বাষ্পে যে উত্তাপের প্রয়োজন তাহা শরীর হইতে সংগৃহীত হইতেছে, সুতরাং বাষ্পোদ্গমের দ্বারা আমাদের শরীরের উত্তাপ নষ্ট হইতেছে। এক্ষণে যদি আমাদিগের চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুতে বাষ্প না থাকে, তাহা হইলে এই বাষ্পোদ্গম শীঘ্র শীঘ্র ও অক্লেশে হয়, সুতরাং আমরা কোনরূপ উত্তাপ অনুভব করিতে পারি না। সকলেই জানেন যে, গ্রীষ্মকালে পাখা দ্বারা বাতাস করিলে বেশ শৈত্য অনুভব হয়। ইহার কারণ এই যে, আমাদের গাত্র সংলগ্ন বায়ু আমাদের শরীরোত্থিত বাষ্প দ্বারা এরূপ পূর্ণ হইয়া থাকে যে, শরীর হইতে আর বাষ্পোদ্গম হইতে পারে না; কিন্তু ব্যজনী দ্বারা সেই বায়ু অপসারিত করিলে, অন্য বায়ু আমাদের গাত্রে সংলগ্ন হয়, এই বায়ু কিন্তু পূর্ব্বের বায়ুর ন্যায় বাষ্পপূর্ণ নহে, সুতরাং ইহা শরীর হইতে বাষ্পোদ্গমের তত অন্তরায় হইতে পারে না বলিয়া আমরা শৈত্য অনুভব করিয়া থাকি। ঠিক এই কারণ বশতই উষ্ণ দুগ্ধাদি, বাতাস দিলে শীঘ্র শীঘ্র শীতল হইয়া থাকে। কারণ বায়ু সঞ্চালনে বাষ্পোদ্গম সহজে হয়, এই বাষ্পোদ্গমের উপযোগী উত্তাপ ঐ দুগ্ধাদি হইতে সংগৃহীত হইয়া উহার উত্তাপ নষ্ট করে।

তাপের যে সকল কার্য্য আমরা ইতি পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, তাহা ব্যতীত তাপের আরও অনেক শক্তি আছে তাহা বিস্তারিতরূপে যারান্তরে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইব। এ পর্য্যন্ত আমরা তাপের দুই একটী শক্তির কথাই বর্ণনা করিয়াছি, তাপ কি পদার্থ তাহা একবারও বলি নাই। তাপ যে কি পদার্থ এ সম্বন্ধে প্রাচীনকালের একমত ছিল কিন্তু সে মত এখন অভ্রান্তরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা তাপকে এক প্রকার বস্তু বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে যখন কোন দ্রব্য উত্তপ্ত হয়, তখন তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে তাপ প্রয়োগ করা হয়; আর যখন কোন দ্রব্য শীতল হয় তখন তাহা হইতে তাপ নামক বস্তু নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া হয়। আমরাও সুবিধার জন্য এই প্রবন্ধে তাপকে বস্তু বলিয়া বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু তাপ বাস্তবিকই কোন পদার্থ নহে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে এই একটি প্রমাণ অতি সহজ ও সুগম্য। যদি তাপ পদার্থ হয় তবে, পদার্থের সাধারণ গুণ ভারত্ব তাহাতে অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং যখন কোন পদার্থে তাপযোগ করা যায় অর্থাৎ কোন পদার্থকে উত্তপ্ত করা যায় তখন তাহার ভারত্ব অবশ্যই বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট মাপযন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সকল পদার্থেরই শীতল ও উষ্ণ অবস্থায় এক ভার। অতএব তাপের কোন ভার নাই অর্থাৎ তাপ কোন পদার্থ নহে; সুতরাং প্রাচীন মত এখন আর চলিত নাই। বর্ত্তমান সময়ে তাপ সম্বন্ধে এই মত প্রচলিত যে, তাপ পদার্থের পরমাণুর গতি বিশেষ। বস্তু সকল যে পরমাণু সমষ্টিতে গঠিত তাহা সর্ব্বদাই গতি বিশিষ্ট। যখন কোন বস্তুকে উত্তপ্ত করা যায়, তখন পরমাণুর গতির বেগ বর্দ্ধিত হয়; আর যখন কোন বস্তুকে শীতল করা যায়, তখন পরমাণুর গতির বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক

মন্দ হইয়া যায়। তাপের কারণ এই গতি। এই মত অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতেরা তাপের সমুদয় কার্য্য এমন সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাপের যথার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই নাই। সংক্ষেপতঃ আমাদের প্রবন্ধ এইখানেই শেষ হইল। কিন্তু পাঠকগণকে জানান উচিত যে, তাপ প্রতিনিয়ত জগতে যে অসংখ্য অনির্ব্বচনীয় ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সকল সংঘটন করিতেছে; তাহার অতি সামান্য অংশ মাত্র বর্ণন করা হইয়াছে। তাপ প্রভাবে পৃথিবীতে ও মনুষ্যের জীবনে এতই বিচিত্র কার্য্য সকল সম্পন্ন হইতেছে যে,তাপকে জগতের প্রাণ স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জন্যই আমাদের প্রাচীন পূজ্যপাদ ঋষিগণ তাপকে "ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম্" এই পঞ্চভূতের মধ্যে একটী ভূত বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও জানিতেন যে জগতের মধ্যে তাপ একটী অতি মহতী শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছে। বাস্তবিকই ভগবানের লীলাক্ষেত্র এই জগতে তাপ যে কি মহৎ মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে এবং তাঁহারই প্রসাদে তাঁহারই অনন্ত জ্ঞানের বিন্দুমাত্র লাভ করিয়া, মনুষ্য তাপের কার্য্যকারিতা যে কতদূর বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যখন দেখি সূর্য্যের তাপ প্রভাবে জগৎ অসংখ্য মনোহর তরুলতা-সুশোভিত হইয়া ধরাতলস্থ জীবজন্তুকে নানাবিধ সুমধুর ফল-পুষ্পদানে প্রতিপালন করিতেছে, যখন দেখি সূর্য্যরশ্মিপ্রভাবে ভূমণ্ডলস্থ জলরাশি হইতে বাষ্পোদ্গম দ্বারা নবীন জলধর সঞ্চারে দিঙ্মণ্ডল বিচিত্র শোভায় বিভূষিত হইতেছে এবং সেই সকল জলদমালা শীতল বারি দানে জীবের অসংখ্য উপকার সাধন করিতেছে, যখন দেখি মনুষ্যের আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশলে তাপের বিচিত্র শক্তি প্রভাবে অসংখ্য অসংখ্য যন্ত্রাদি সৃষ্ট হইয়া মনুষ্য সমাজের সুখ স্বচ্ছন্দতা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, যখন দেখি তাপের মহতী শক্তির সাহায্যে মনুষ্য প্রস্তর সদৃশ কঠিন পদার্থকে নিরাকার বাষ্পে পরিণত করিয়া জন সমাজের অশেষ বিধ উপকার সাধন করিতেছে, তখন আমরা তাপের শক্তি চিন্তা করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যাই। আবার যখন ভাবি, যে বিধাতার শক্তির অংশকণা মাত্র পাইয়া তপন এত তাপশালী হইয়াছে, যাঁহার শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া তড়িৎ জগতে এত বিচিত্র বিচিত্র কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে, যাঁহার শক্তি প্রভাবে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে অনন্ত কাল ভ্রমণ করিতেছে, এই তাপশক্তি সেই অনন্তশক্তি আদ্যাশক্তিরই সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর অংশ মাত্র; তখন আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতে একবারে মুগ্ধ, চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাই।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিশ্বাস।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

আজি কালি আমরা ইংরাজি ইংরাজি করিয়া অস্থির হইয়াছি। কাব্য, নীতিশাস্ত্র, জীবনচরিত প্রভৃতি ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহাই অপূর্ব্ব আনন্দকর জ্ঞান করি। যাঁহারা আমাদের সমাজ ও জাতির রত্ন স্বরূপ, যাঁহাদের জীবনীতে শত শত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ

পাওয়া যায়, বিজাতীয় ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত যাহাদের গুণে বিমোহিত হইয়াছিলেন, সেই সকল ঋষি-তুল্য মহাপুরুষগণের কথা আজি কালি কয় জন চিন্তা করেন? এ সকল বিষয়ে আমরা আত্মহারা হইয়া কেবল পরকীয় সম্পত্তির জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছি। অদ্য আমরা আমাদের দেশের একটী উজ্জ্বল রত্নের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিব।

এই মহাত্মার নাম পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। যে স্থান পুরাণে দ্বিতীয় প্রয়াগ বলিয়া বর্ণিত, যেখানে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর ত্রিধারা প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব,বিস্ময় ও বিচিত্র ভাব প্রদর্শন করিতেছে, এখনও শত শত ভক্ত যেখানে অবগাহন করিয়া হৃদয়ের কলুষ-সন্তাপ নিবারণ করিতেছেন, সেই পবিত্রধাম ত্রিবেণী ইহাঁর জন্ম স্থান। জগন্নাথের পিতার নাম বাসুদেব সার্ব্বভৌম। এক সময়ে যে সার্ব্বভৌম আপনার বিদ্যালোকে নবদ্বীপকে উজ্জ্বল করিয়া ছিলেন; দর্শনের বিচারে যিনি নবদ্বীপকে মিথিলার অপেক্ষা উন্নত বলিয়া মৈথিলগণকে স্বীকার করাইয়াছিলেন—সেই দার্শনিক চূড়ামণি রঘুনাথ শিরোমণি যাঁহার এক ছাত্র; যাঁহার সংগৃহীত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব দেখিয়া আমাদের দশবিধ সংস্কার ও নিত্য-নৈমিত্তিক যাবতীয় ক্রিয়া কাণ্ড চলিতেছে ও যিনি পিতৃ কার্য্যার্থ গয়া তীর্থে গমন করিয়া অর্থলোভী গয়ালিগণকে স্তম্ভিত ও বশীভূত করিয়া ছিলেন—সেই স্মার্ত্ত-শিরোভূষণ রঘুনন্দন যাঁহার অন্যতর শিষ্য; পরন্তু যাঁহার বিচার-শক্তি ও ভক্তি-তরঙ্গে কাশী হইতে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল—যিনি কলির গৌরাঙ্গ অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ—সেই দ্বিতীয় শুকদেব তুল্য মহাত্মা শচীনন্দন যাঁহার আর একটী ছাত্র—এই তিন ক্ষণজন্মা শিষ্য যাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ-দ্বিতীয় পরাশর-তুল্য যে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের কথা অনেকে শুনিয়াছেন, ইনি সেই বাসুদেব নহেন। তাহা না হইলেও ইনি শাস্ত্র জ্ঞানে নিতান্ত ন্যূন ছিলেন না। ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তাতেই রত থাকিতেন; ঐহিক সুখ যে অতি অকিঞ্চিৎকর এবং মায়া ও লোভের বশেই জীব সর্ব্বদা জন্ম-জন্মান্তর যন্ত্রণা ভোগ করে, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু মায়ার মোহ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া মানুষ মাত্রেরই পক্ষে না কি নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার, এই জন্য সার্ব্বভৌম সংসারের বন্ধন একবারে কাটাইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তথাপি মধ্যে মধ্যে তীর্থ ভ্রমণ, যোগসাধন ও সাধু পুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠতায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সন্তানসন্ততি কিছুই ছিল না; সে জন্য তিনি মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ ছিলেন।

'সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে।' সন্তান যে কেবল ইহকালের সুখের জন্য তাহা নহে, মরণান্তে সন্তান পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে, সুসন্তান ধর্ম্ম ও কর্ম্মগুণে পিতৃ লোকের মুখ উজ্জ্বল করিবে। ইহাই হিন্দুর সন্তান কামনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সময়ে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পত্নীর কাল হয়। তখন তিনি মনে করিলেন, আমার সংসারের যাহা কিছু বন্ধন ছিল, সমস্তই মোচিত হইল, তবে আর কেন মিছা এই যন্ত্রণাময় সংসার কারাগারে থাকিয়া দুঃখভোগ করি; যখন ঈশ্বর আমাকে সকল ভাবনা হইতে মুক্ত করিলেন, তখন আমি মুক্তিমার্গেরই পথিক হইব। কিন্তু কর্ম্ম-বন্ধন মানবের পক্ষে দুশ্ছেদ্য,

কোথা হইতে কোন্ সূত্র ধরিয়া ইহা উপস্থিত হয় এবং কিরূপে ধীরে ধীরে মানুষকে নাগপাশে বদ্ধ ও অভিভূত করে, তাহা মানব বুদ্ধির অগম্য। বাসুদেবেরও তাহাই হইল। কি করিব না করিব বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াই দেখি, পাছে আত্মবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া—মূঢ় ধর্ম্মের সেবা করিয়া বৃথা জীবনকে কষ্ট দেওয়া হয়—এইরূপে তিনি মনে মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার এক জ্যোতির্জ্ঞ বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, 'সার্ব্বভৌম তোমার কোষ্ঠীপত্র খানি আমাকে দাও দেখি; তাহাতে তোমার শেষ বয়সের ফলাফল কিরূপ উক্ত আছে দেখি। আজিকালি অনেকে বলেন ফলিত জ্যোতিষ সর্ব্বৈব মিথ্যা, কেবল লোক ভুলাইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ জুয়াচুরির পথ বাহির করিয়া গিয়াছেন। একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কতদূর তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে ফলিত জ্যোতিষের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিতে পারি না। যাহা হউক জ্যোতির্জ্ঞ বন্ধু কোষ্ঠীপত্র দেখিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন 'বৃদ্ধ বয়সে তোমার এক কুলপ্রদীপ পুত্ররত্ন লাভ হইবে।' এ কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিলেন "তোমার বিদ্যার বেশ পরিচয় হইয়াছে, এখন স্বস্থানে শুভগমন কর।"

কিন্তু ভাগ্যের অপরিবর্ত্তনীয়তা নিবন্ধন জ্যোতির্জ্ঞের কথাই সত্য হইল। বাসুদেব বৃদ্ধবয়সে দারপরিগ্রহ করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই একটি পুত্রসন্তান হইল। সার্ব্বভৌম যথাসময়ে এই সন্তানের নাম 'জগন্নাথ' রাখিলেন। বৃদ্ধ বয়সের এক সন্তান বলিয়া জগন্নাথ পিতার বড় আদরের ছেলে ছিলেন। বৃদ্ধ পুত্রের সন্তুষ্টির জন্য সর্ব্বদাই তৎপর থাকিতেন। জগন্নাথ স্বভাবতঃ অতি অস্থিরপ্রকৃতি ছিলেন, তাহাতে এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়া নিতান্ত অবাধ্য ও দুর্দ্দম্য হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্বদা প্রতিবেশীদিগের নানাপ্রকার ক্ষতি ও অনিষ্টের কার্য্য করিতেন। পিতামাতার শাসন ত ছিলই না, প্রতিবেশিগণ এজন্য ভৎর্সনা করিলে ভয় করা দূরে থাকুক, সময়ান্তরে তাহার প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকিতেন। প্রত্যহ স্নানের ঘাটের জল কলুষিত করিতেন, সন্তরণ করিয়া লোকের পূজাহ্নিকের ব্যাঘাত জন্মাইতেন, কখন কখন কুলবধূগণের কলসী স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া পলায়ন করিতেন, কখন বা ঢিল মারিয়া তাহাদের কক্ষস্থিত কলসী ভাঙ্গিয়া আনন্দে করতালি দিতেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে লোকের বাগানে ফল থাকিত না। এইরূপ অশিষ্টতা প্রতিবেশীদিগের অসহ্য হইয়া পড়িল। তাহারা মধ্যে মধ্যে তদীয় জননীর নিকট আসিয়া নানা অভিযোগ করিলে, সুশীলা অম্বিকাদেবী বিবিধ অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাদের সান্ত্বনা করিতেন, পিতা এক প্রকার নিতান্ত বিরক্ত হইয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতেন এবং আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতেন। প্রায়ই দেখা যায়, মনস্বী লোকেরা বাল্যকালে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া থাকে; যদি সেই চাঞ্চল্য ক্রমশঃ সুকৌশলে সদ্‌বিষয়ে নিয়োজিত হয়, তবে তাহা প্রতিভায় পরিণত হইয়া অশেষ জ্ঞানরত্ন প্রসব করে। যেহেতু বুদ্ধি অতি প্রবল শক্তিশালিনী, একমাত্র বুদ্ধিই এই জগৎসংসারকে স্বর্গের নন্দনকানন সদৃশ সুখধাম করিয়া তুলিয়াছে; আবার এই বুদ্ধির বিকৃতি নিবন্ধনই সংসার-ক্ষেত্রে নরকের

ন্যায় কত শত বীভৎস কার্য্যের অভিনয় হইতেছে।

যাহাহউক বৃদ্ধ পিতা উপায়ান্তরবিহীন হইয়া পরিশেষে প্রাণাধিক পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে মনঃস্থ করিলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বংশবাটীস্থিত চতুষ্পাঠীতে রাখিয়া আসিলেন। জগন্নাথ এখানে আসিয়াও একবারে শান্ত হইলেন না। স্বভাবের দোষ কি সহজে মানুষকে পরিত্যাগ করে? ববং উহা নিজ মোহিনী শক্তিতে সর্ব্বদা জীবনকে অধিকৃত ও আয়ত্ত করিয়া রাখে। এস্থলে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। বাঁশবেড়িয়া গ্রামে এক প্রসিদ্ধ পঞ্চানন আছেন, ঐ স্থানে সর্ব্বদা ছাগ বলি দেওয়া হইত। জগন্নাথ পাণ্ডাদিগকে এক সময়ে বলেন, 'তোমরা যদি আমাকে কিছু কিছু মাংস না দেও, তবে তোমাদের অনিষ্ট করিব।' কিন্তু পাণ্ডারা তাঁহার ন্যায় বালকের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তাহারা ভাবিল, 'বালকের কথা কি শুনিব? এবং এ আমাদের কি বা করিতে সমর্থ হইবে?' কিন্তু জগন্নাথ সহজ বালক নয়—দ্বিতীয় পঞ্চানন, তাহা তাহাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসিল না। যাহা হউক পাণ্ডাদিগকে বলিয়া যখন অকৃতকার্য্য ও উপহসিত হইলেন, তখন মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইতে সংকল্প করিলেন। একদা রাত্রি প্রহরাধিক হইয়াছে, পল্লীগ্রামের পথে লোকজনের গতিবিধি প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা আহারাদি করিয়া শয়নের উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময়ে জগন্নাথ বায়ু সেবনের ছলে বহির্গত হইলেন এবং একাকী দেবস্থানে উপস্থিত হইয়া পঞ্চাননকে হস্তগত করিলেন ও সন্নিহিত এক জঙ্গলের পুষ্করিণী মধ্যে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রত্যূষে পাণ্ডারা আপনাদের সর্ব্বস্বধন পঞ্চাননকে দেখিতে না পাইয়া একবারে হতবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। চারিদিকে অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। শেষে জগন্নাথই এই অনর্থের মূল বিবেচনা করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে আসিয়া ধরিলেন ও আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়া এই উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের জন্য তাঁহার শরণ লইলেন। বৃদ্ধ ভবদেব বালকের কাণ্ডকারখানা শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইলেন এবং সন্নিহিত এক শিষ্য দ্বারা জগন্নাথকে ডাকাইলেন। জগন্নাথ তাঁহার সম্মুখে প্রত্যর্থীভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জ্যেষ্ঠতাত ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'কেমন জগন্নাথ, তুমি ইহাঁদের পঞ্চানন লইয়াছ কি না, সত্য বলিবে।' দ্বাদশবর্ষীয় বালক প্রকৃত বীরের ন্যায় নির্ভয়ে উত্তর করিলেন—'হাঁ'।

ভ। কেন?

বা। একদা মাংস চাহিয়াছিলাম, পাই নাই বলিয়া!!

ভ। এইমাত্র কারণে এমন কায করিয়াছ! যাহাহউক উহাদের দেবতা উহাদিগকে ফিরিয়া দেও।

বা। উহারা প্রতি বলিতে আমাকে মাংস দিবে স্বীকার করুক!

বালকের মুখে এইরূপ অসম সাহসের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় চমৎকৃত ও পুলকিত হইলেন এবং পাণ্ডার মুখের দিকে একবার কটাক্ষ করিলেন। তখন পাণ্ডা অনন্যোপায় হইয়া, প্রত্যেক বলির একএকটি 'চৌড়' (চৌথ) দিতে স্বীকৃত হইলেন। বালক তখন স্মিত মুখে পূজারি ব্রাহ্মণের দিকে ভ্রূভঙ্গী

করিয়া বলিলেন—'আমার ভাগ যেন চিরস্থায়ী হয়।' জগন্নাথের বাল্যজীবনের এই চতুরতা ও অসম সাহসের কথা বিলক্ষণ কৌতুক ও বিস্ময়াবহ তাহার আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে তাঁহার শিক্ষা-বিষয়িণী প্রতিভা কিরূপ ছিল দেখা যাউক। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। দুর্দ্দম্য বন্য হস্তী সুনিপুণ চালকের হস্তে যেমন ক্রমশঃ শান্ত ও সুশিক্ষিত হইয়া উঠে, জগন্নাথের সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিল—শিক্ষার সহিত তদীয় প্রকৃতির অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বিশেষতঃ তাঁহার এই এক অসাধারণ গুণ ছিল যে, তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় চঞ্চল হইলেও অধ্যয়নকালে, শিক্ষণীয় বিষয়ে দৃঢ়তর মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন। সুতরাং একবার যাহা শিখিতেন, কখনও তাহা বিস্মৃত হইতেন না। ইতিপূর্ব্বে তিনি পিতার নিকট ব্যাকরণ, অভিধান শিক্ষা করেন। এক্ষণে জ্যেষ্ঠতাতের নিকট দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স বার বৎসর মাত্র।

ন্যায়শাস্ত্র দুর্ব্বোধ তর্কপঙ্‌ক্তির সমষ্টি মাত্র। বুদ্ধির প্রখরতা ও প্রবল গবেষণা না থাকিলে ইহার অর্থগ্রহণের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বয়সের অল্পতা নিবন্ধন জগন্নাথের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের কিছুই প্রতিবন্ধক হইল না। ন্যায়ের জটিলতা তাঁহার চঞ্চলতা হরণে ও মহতী বুদ্ধিবৃত্তিকে অনন্যাসক্ত করণে সম্যক উপযোগী হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে ক্রমশঃ প্রগাঢ় চিন্তাশীল ও সুধীরপ্রকৃতি করিয়া তুলিল। এই সকল গুণে জগন্নাথ চতুষ্পাঠীস্থ সমুদয় ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষকের সমধিক প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

বাল্যকাল জীবনের অঙ্কুরের অবস্থা। অঙ্কুরদশা দেখিয়া, অনেক সময় আমরা বুঝিতে পারি, বৃক্ষটী কিরূপ সতেজ ও নয়নাভিরাম হইবে। জগন্নাথের শিক্ষাবস্থায় বিষয় মনে ভাবিলে, এই কথা বিলক্ষণ সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তিনি এক এক দিন ন্যায়ের কূট তর্ক সময়ে যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিতেন, তাহা শুনিয়া অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া থাকিতেন। একদিন ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অধ্যাপনার সময় স্বীয় জ্যেষ্ঠতাতের প্রণীত একখানি ন্যায় সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দেখিতে দেখিতে বলিলেন 'জেঠা মহাশয় এস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।' ইহা শুনিয়া জগন্নাথ শিষ্যমণ্ডলের মধ্যে অকুতোভয়ে বলিলেন, "বোধ হয় আপনার নয়, আমারই জেঠামহাশয় ভুলিতেছেন।" বালকের মুখে জ্যেষ্ঠতাতোচিত এইরূপ ধৃষ্টতার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ভবদেব একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং আরক্ত নয়নে তদীয় মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ কটাক্ষ করিয়া রহিলেন। জগন্নাথ তদীয় ভাব ভঙ্গী দেখিয়া কুণ্ঠিত ও স্বীয় ধৃষ্টতা জন্য অনুশোচিত হইলেন; তথাপি তিনি একবারে নিতান্ত ভগ্নচিত্ত না হইয়া প্রশান্তভাবে ঐ স্থানের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এমন অকাট্য যুক্তিপরম্পরা দ্বারা বিশদরূপে উল্লিখিত সন্দেহের অপনোদন করিয়া দিলেন যে, তাহা শুনিয়া প্রবীণ ভবদেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মনে মনে প্রিয়তম শিষ্যের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে শাস্ত্র বিষয়ক বাদবিতর্কের বিলক্ষণ আস্থা ছিল। যিনি যুক্তি ও বুদ্ধি বলে, প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করতঃ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রীয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া স্বীয় মতের দৃঢ়তা স্থাপন করিতে

পারিতেন, তিনিই পণ্ডিত-সমাজে সমধিক আদৃত ও সাধারণের নিকট সম্মানিত হইতেন। একদা ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় শিষ্যগণকে লইয়া অধ্যাপনা করিতেছেন, এমন সময়ে একজন জিগীষু নৈয়ায়িক পণ্ডিত অতিথিভাবে চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন এবং ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি কূট প্রশ্নের উত্থাপন করিলেন। তখন জগন্নাথ চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত ছিলেন না। অন্যান্য ছাত্রগণের মধ্যে কেহই সে সকল কঠিনতর প্রশ্নের সমীচীন মীমাংসা করিতে না পারায়, অধ্যাপক স্বয়ং বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু দুই একটী বিষয়ের পরিস্ফুট সিদ্ধান্ত না হওয়ায় শেষে অন্যায় তর্কের অবতারণা দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত করিতে মনস্থ করিলেন। প্রশ্নকর্ত্তা ইহাতে যারপর নাই বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে যথেচ্ছ মার্গে প্রস্থান করিলেন।

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন প্রশ্নকর্ত্তা তথা হইতে চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য বোধ হইল—অভ্যাগত ব্যক্তি মধ্যাহ্নকালে বাটী হইতে পরাঙ্মুখ হইল, ইহা গৃহের বিশেষ পাপজনক।

অভিনির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

এখন আমরা কোন মুষ্টি ভিক্ষুক দেখিলে, মহা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠি, সাহেবদের সমাজের সহিত তুলনা করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করি, তখন সে ভাব ছিল না। অতি দীনদুঃখীও অতিথি ও অভ্যাগতের সমুচিত সৎকার করিতেন। বৃদ্ধ ভবদেব এই ঘটনায় অনুতপ্ত হইয়া, বিমনার ন্যায় বসিয়া আছেন, এমন সময় জগন্নাথ উপস্থিত হইলেন। তিনি জ্যেষ্ঠতাতের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, অবশ্যই কোন অত্যহিত ঘটনা ঘটিয়াছে। পরে সহাধ্যায়ীদিগের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা শুনিয়া, ক্ষণবিলম্ব না করিয়া অতিথির অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন এবং অর্দ্ধ ক্রোশাধিক দৌড়িয়া গিয়া জিগীষু পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাত করিলেন। দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলেন এই চণ্ডমূর্ত্তি ব্রাহ্মণই জ্যেষ্ঠতাতের মনঃক্ষোভের কারণ। যেমন সাক্ষাত অমনি শাস্ত্রীয় কথার আলাপ আরম্ভ হইল। সে সময় পণ্ডিতসমাজ শাস্ত্রকথায় কখনও অরুচি প্রকাশ করিতেন না। কথায় কথায় ক্রমশঃ তর্কযুদ্ধের অভিনয় বাধিয়া উঠিল; নৈয়ায়িক মহাশয় বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া পড়িলেন এবং এরূপ তরুণ যুবকের ঈদৃশ অসাধারণ প্রতিভা ও বিচার কৌশল দেখিয়া তিনি যারপরনাই চমৎকৃত হইলেন। শাস্ত্র কথায় তিনি এরূপ অভিনিবিষ্ট হইলেন যে, গন্তব্য পথের প্রতি আর লক্ষ্য রহিল না। চতুরচূড়ামণি জগন্নাথ ইহা বুঝিতে পারিয়া এক এক পদ পিছাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে তদীয় গতির পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া অভিপ্রেত দিকে প্রত্যাবৃত করিলেন এবং কথায় কথায় বাঁশবেড়িয়ার টোলে আনিয়া জ্যেষ্ঠ তাতের মনঃক্ষোভ নিবারণ করিলেন। ভবদেব অতিথিকে পুনরাগত দেখিয়া অপার আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন এবং আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলেন। নৈয়ায়িক মহাশয়, ইতি পূর্ব্বেই জগন্নাথের মুখে পূর্ব্বপক্ষের সমুচিত মীমাংসা শুনিয়া শান্তক্রোধ হইয়াছিলেন, সুতরাং কোন আপত্তি না করিয়া আতিথ্য গ্রহণে গৃহস্থকে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি অধ্যাপকের মুখে জগন্নাথের পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। জগন্নাথের পঠদ্দশায় এরূপ প্রতিভার পরিচয় নানা স্থানে প্রচারিত হইয়া উঠিল। তৎকালীন সুবিজ্ঞ আচার্য্যমণ্ডলীর মধ্যে যিনি জগন্নাথকে একবার দেখিতেন, তিনিই বলিতেন 'কালে এই বালক অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে'। এরূপ অল্প বয়সে দুর্ব্বোধ ন্যায়শাস্ত্রে এতদূর পারদর্শিতা দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্ব জন্মে এসকল তাঁহার অধীত ছিল।"

ক্রমশঃ

শ্রীরামদয়াল কাব্যতীর্থ।

দস্যু-

বর্দ্ধমানের আড়াই ক্রোশ উত্তরে গোপালপুর গ্রাম। গোপালপুর একখানি ক্ষুদ্র পল্লী পল্লীতে এক ঘর কায়স্থ ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন গোয়ালার বাস। কায়স্থ বংশজ রামদুলাল স গ্রামের শীর্ষস্থানীয়, গোয়ালাগণের অধিনায়ক হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। রামদুলালের প্রবল প্রতাপ; তাহার নামে চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামবাসিগণ সশঙ্কিত। যাহার প্রতি রুষ্ট হইত তাহার আর রক্ষা নাই; যাহার প্রতি তুষ্ট থাকিত, সে নিরাপদ। পল্লীবাসী পাঠকগণ, রামদুলালের এরূপ প্রতাপ প্রাদুর্ভাবের গূঢ় রহস্য সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। যাইট সত্তরজন পরাক্রান্ত গোয়ালা লাঠীয়াল যাহার একান্ত অনুগত আজ্ঞার অধীন, পল্লীগ্রামে সে কি এক জন সামান্য লোক; বিশেষতঃ আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বঙ্গভূমি এরূপ শান্তি নিকেতন ছিল না। পথে দস্যুর উৎপাত, পথিকেরা প্রাণ হাতে করিয়া পথ চলিত; গ্রামে ডাকাতের ভয়, গৃহস্থগণ নির্বিঘ্ন চিত্তে নিশাযাপন করিতে পাইত না। এরূপ সময়ে রামদুলালের এত লোক বল, কি সামান্য বল! গোয়ালাগণ কৃষিকার্য্য করিত; কিন্তু কৃষি তাহাদের উপলক্ষ মাত্র। তাহাদের প্রধান কার্য্য—জীবিকা নির্ব্বাহে তাহাদের প্রধান উপায়—লিখিতে লেখনী কম্পিত হয়, বুক দুর দুর করে,—তাহাদের প্রধান উপায় দিনে দস্যুবৃত্তি, রাত্রে ডাকাতি। পাপিষ্ঠেরা ঘাটিতে ঘাটিতে থাকিয়া পথিকগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, প্রাণ বধ করিতেও সঙ্কুচিত হইত না। রাত্রে দলে দলে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ডাকাতি করিয়া আনিত। দুরাত্মাদিগের নিষ্ঠুর আচরণে কত শত সিমন্তিনীর সিমন্তের সিন্দূর বিন্দু জন্মের মত বিলুপ্ত হইয়াছিল, কত দুঃখিনী জননী জীবনাধিক পুত্ররত্ন হারা হইয়া আজীবন নয়নজল নিক্ষেপ করিয়াছিল, কত নিরীহ গৃহস্থ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পথের ভিখারি সাজিয়াছিল। রামদুলাল এই দুরাত্মাগণের রক্ষাকর্ত্তা, এই পাপ কার্য্যের একমাত্র সহায়। যদি কখন কোন বিপদ উপস্থিত হইত, রামদুলাল তাহাদিগকে রক্ষা করিত,

বৎ
নাম
আমাদে
বিরাজ
হইয়া ত্রয়োদ
এক বৎসর গত
হের পর আর স্ব
সতীশচন্দ্র কলিকাত
বৎসরই প্রথম পরীক্ষা
সময়ের অল্পতাপ্রযুক্ত ত
আসা হয় নাই। পরীক্ষা হই
দিয়া আসিয়া সতীশচন্দ্র এত
ছিল। পরে পরীক্ষার শুভ সংব
সকলেই আনন্দিত হইল। সময় বু
লোকে এইবার সতীশকে শ্বশুর গৃহে
অনুরোধ করিতে লাগিল। সতীশ এ
যাইতে অস্বীকার করিয়া—প্রথম প্রথম শ্বশুরালয় যাইতে লোকে যেরূপ করে, অন্তরের ভাব গোপন রাখিয়া মুখে যেরূপ লজ্জা প্রকাশ করিয়া থাকে, সতীশচন্দ্রও সেইরূপ প্রথমে অস্বীকার করিয়া পরে সম্মতি দান করিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের বেলা অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় সতীশচন্দ্র ট্রেণ হইতে বর্দ্ধমান ষ্টেসনে নামিল। সঙ্গে একজন ভৃত্য, তাহার মাথায় একটী পোর্টমেণ্ট, পোর্টমেণ্টোতে পরিচ্ছদাদি আবশ্যকীয় জিনিসপত্র আছে। ষ্টেসনে কিছু জলযোগ করিয়া সতীশচন্দ্র পোগালপুরাভিমুখে যাত্রা করিল। বরাবর পাকারাস্তা। ভৃত্য অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে, সতীশচন্দ্র পশ্চাতে যাইতেছে। সতীশ যাইতেছে, কিন্তু কোন্ দিকে যাইতেছে,—উত্তরে কি দক্ষিণে, কোন্ পথে যাইতেছে—কাঁচা কি পাকা, সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই। মন এখন সতী-

পার্শ্বেই একটী খেজুর গাছ ছিল, একটু সরিয়া আসিয়া খেজুর গাছের অন্তরাল হইতে উঁকি দিয়া দেখিল,ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ভৃত্য ধরাশায়ী,যমের সির তুল্য দুই জন দস্যু তাহার গলদেশে দিয়া দুই পার্শ্বে চাপিয়া ধরিয়াছে, আর জন লাঠী হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। খিয়াই সতীশের প্রাণ বায়ু উড়িয়া গেল, ললাটপ্রান্ত হইতে দর দর বেগে ঘাম পড়িতে লাগিল। দুরন্ত দস্যুর হাতে বুঝি প্রাণ যায়, আর রক্ষা নাই—এই ভয়ঙ্করী চিন্তা মনে উদয় হইল; অমি গাছের আড়াল হইতে ধীরে ধীরে পাড়ের নিম্নে নামিয়া গোপালপুর অভিমুখে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। যে দুই জন দস্যু লাঠী লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা ক্রমে পাড়ের উপরে উঠিল,পূর্ব্ব মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না; যেই পশ্চিম মুখে ফিরিয়াছে, অমি সতীশচন্দ্র সেই মানবরূপী দানবগণের দৃষ্টি পথে পতিত হইল। তাহারা দেখিল যে, শিকার পলাইতেছে; "পালায়, পালায়, ধর"—এই বলিতে বলিতে হিংস্রকগণ সতীশের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। সতীশ তীর বেগে ছুটিয়াছে, তাহারাও ছুটিতে লাগিল; কিন্তু নিয়তি বিরূপ না হইলে, অদৃষ্ট লিখিত আয়ুঃকাল না ফুরাইলে, কে কাহাকে মারিতে পারে! প্রাণ ভয়ে পলায়ন, আর সেই প্রাণ বিনষ্ট করিবার জন্য অনুগমন—এ দুইয়ের অনেক প্রভেদ। সতীশচন্দ্র গ্রামের প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইল, এইবার একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, যে দস্যুরা আর আসিতেছে কি না; কিন্তু তখনও দস্যুদ্বয় সেইরূপ সবেগেই আসিতেছে—বেশী দূরে নয়, নিকটেই। দেখিয়া সতীশ ছুটিয়া গিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পথের ধারেই রামদুলালের বৈঠকখানা বাড়ি রামদুলাল বৈঠকখানায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছে, এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে সতীশ গিয়া উপস্থিত হইল। লোকে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিতেছেমাত্র। রামদুলাল প্রথমে সতীশকে চিনিতে পারিল না, ক্ষণ পরেই "এস এস, কে, বাবা সতীশ, সব ভালত?" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সতীশচন্দ্র অর্দ্ধ-রুদ্ধ স্বরে

"আজ্ঞা হাঁ" বলিয়াই বিছানায় উপর বসিয়া পড়িল। রামদুলাল সতীশের সেরূপ ভয়বিহ্বল ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন বাবা,কিছু হয়েছে না কি?" "ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা পেয়েছি, আর একটু হইলেই প্রাণ গিয়াছিল" এই বলিয়া সতীশ আদ্যোপান্ত সকল কথা খুলিয়া বলিল; চাকরটীর জন্য দর দর বেগে দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। শুনিয়া রামদুলাল গম্ভীর স্বরে বলিল "বটে বটে, ওখানটায় সময়ে সময়ে ভয় হয়ে থাকে; আচ্ছা, আমি বিশেষ করে এর তদন্ত করছি" বলিয়া বৈঠকখানা হইতেই বাড়ির ভিতর হাঁকিয়া বলিল, "ওগো, জামাই এসেছে, শীঘ্র জল খাবারের উদ্যোগ কর।" রক্ষা পাইয়াছি, ভাবিয়া সতীশচন্দ্র একটু সুস্থির হইল। কিন্তু এ কি দৃশ্য! এখানেও যে সেই যমের মূর্ত্তি স্বরূপ দস্যুরা উপস্থিত! এখন আর তাহাদের সে বেশ নাই,হাতে লাঠী নাই, কাপড়ও পূর্ব্ববৎ আঁটিয়া পরা নাই; কিন্তু তাহাদের চক্ষু লাল বর্ণ—ঘোর লাল বর্ণ, দেখিলেই বোধ হয় যেন রক্তবীজের বংশধর। সতীশ তাহাদিগকে দেখিয়াই কাঁপিয়া উঠিল, মনে মনে করিল, এরাই সেই দস্যু। দস্যুদ্বয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া বৈঠকখানায় উঠিল। রামদুলাল তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল "আয় রে, জামাই এসেছে, পথে ভারি বিপদ হয়েছিল।" তাহারা "হুঁ" করিয়া উপবিষ্ট হইল। রামদুলাল তাহাদিগকে তামাকু খাইতে বলিল, প্রথম দস্যু তামাকু টানিতে টানিতে সতীশের প্রতি একটি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সতীশও তাহাদের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল। সেই কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া সতীশ কাঁপিয়া উঠিল। এমন সময় বাড়ি হইতে একটি বালিকা আসিয়া ডাকিল "বাবা, দামাইকে দল খেতে পাতয়ে দে।" রামদুলাল বালিকার কথা শুনিয়া সতীশকে বলিল "যাও বাবা, বাড়ির ভিতর যাও।" সতীশ ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

সরকারদের জামাই আসিয়াছে—এই সংবাদ শুনিয়া পাড়ায় একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। মহাবারুণী যোগে ত্রিবেণী তীরে যেরূপ লোকের সমাগম হয়, সরকার বাড়িতেও আজ সেইরূপ জনতা। কত নববধূ, কত প্রৌঢ়া, কত বৃদ্ধা, কত যুবতী,কত বালিকা আসিয়া উপস্থিত—এখনও আসিতেছে। কত হাসির তরঙ্গ, কত কথার প্রসঙ্গ উঠিতেছে ও পড়িতেছে। কত তামাসা, কত ঠাট্টা, কত উপহাস চলিয়াছে, জামাই কিন্তু ম্রিয়মাণ। জামাইকে নিস্তব্ধ দেখিয়া কোন বৃদ্ধা গঙ্গাদেবীকে ফুটকলাই মানিতেছে, কোন যুবতী ওলার বিবিকে সীর্ণি দিবার প্রস্তাব করিতেছে; জামাই কিন্তু নীরব—ম্রিয়মাণ। তাহাদের সে সব কথায় সতীশের ভ্রুক্ষেপ নাই, শ্বশুরের বৈঠকখানায় দস্যুদ্বয়ের আগমনে, মনে যে এক অভূতপূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, সে ভয় কিছুতেই যাইতেছে না। মনে উদয় হইতেছে যে, নিশ্চয়ই আজ প্রাণ বিনষ্ট হইবে। একবার ভাবিতেছে যে, যখন শ্বশুরের গৃহে আসিয়াছি তখন আর ভয় কিসের? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইতেছে—কে যেন কাণের কাছে বলিতেছে—এও যে দস্যুপুরী। সতীশের হৃদয়ে এইরূপ তোলপাড় হইতে লাগিল। সকলের অনুরোধে একটু জল খাইয়া, পুনর্ব্বার সেইরূপ মৌনভাবে বসিয়া রহিল। সেই সময় রামদুলাল বাড়ীর ভিতর আসিয়া সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "এখন সব মেয়েছেলে দেখ্‌তে আস্‌ছে, আজ আর বাহিরে গিয়ে কাজ নাই" এই কথা বলিয়া রামদুলাল বাহিরে চলিয়া গেল। ক্রমে একটু রাত্র হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বৃদ্ধি পাইল। প্রতিবাসিনীগণ জামতার মৌনভাবে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিতে করিতে চলিয়া গেল। সতীশ এখন একা, কাছে কেবল সেই বালিকাটি বসিয়া আছে, বালিকাটি সতীশের ছোট শালি। কিছুক্ষণ পরে একজন যুবা আসিয়া সতীশকে জিজ্ঞাসা করিল "তামাক খাও কি?" সতীশ বলিল "না"। যুবা পুনর্ব্বার বলিল "এখন আর বাহিরে গিয়া কাজ নাই, এই খানে বসিয়া থাক, আমি আস্‌ছি।" যুবা চলিয়া গেল। যুবকটি রামদুলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

বাড়ির ভিতরের লোকজন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৈঠকখানায় অনেক লোক। সন্ধ্যার সময় গোয়ালাগণ সেই খানে আসিয়া বৈঠক

করিয়া থাকে। সেখানে রামদুলাল এবং রামদুলালের দুই পুত্রও উপস্থিত আছে। তাহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে কি কথা হইতেছে। এক জন বলিল "সবই দেখেছে, আমাদিগেও চিনে ফেলেছে, রাত পোয়ালেই থানায় গিয়া খবর দিবে, তার আর ভুল নাই।" আর একজন রামদুলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "আপনি কি বলেন?" রামদুলাল বলিল "যতই হক জামাই; তা কি কখন পারে?" "উনিত সব বুঝেন, কথায় বলে—"জন জামাই ভাগ্না তিন নয় আপনার," ওকে বিশ্বাস কি, কাল সকালে সকলেরই হাতে দড়ি দেবে"। একটু ক্রুদ্ধভাবে এই কথা বলিয়া দুলালপুত্র আবার বলিল "ভগ্নিটে বিধবা হবে এইত" তা এখনও খেতে দেওয়া যাচ্ছে, তখনও দেওয়া যাবে।" আর একজন বলিল "যেটা ছেলের মত কথা বলেছ, ও কালসাপ রাখা হবে না," তার পর রামদুলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "আপনি কি বলেন বলুন।" রামদুলাল উত্তর করিল "কি আর বলব," জামাই যাক্ তাতে তত ক্ষতি নাই, তবে মেয়েটা,"—রামদুলালের এই কথা শুনিয়া একজন একটু তীব্র স্বরে বলিল "আপনার বেলায় বুঝি জামাই? আমার ঠাকুর মহাশয়—যখন শিষ্যি বাড়ি হতে টাকাগুলো নিয়ে এলো, তখন ত আপনার কথাতেই নিকেশ করে ফেল্লেম্, গুরুহত্যায় কত পাপ বলুন দেখি?" অমি আবার একজন বলিল "আমার সেই কুটুম্বের মেয়েটীকে অনায়াসে ত মেরে দিলাম; কই, আমরা ত কিছুই তখন বলি নাই।" এই কথার পর ক্ষণেকের জন্য সকলে নীরব হইল। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া একজন বলিল "এখন আপনি কি বল্‌বেন বলুন, আমরা ত সব যাবই; কিন্তু আপনি কি রক্ষা পাবেন? আপনার সপুরী এক থালে পেড়ে যাব—এ নিশ্চিৎ। এই কথা শুনিয়া রামদুলালের চমক ভাঙ্গিল; মনে একটু দয়া হইয়াছিল, কিন্তু প্রাণ যাইবে এবং প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম যে ধনসম্পত্তি তাহাও যাইবে, এই ভাবিয়া তাহার মনের সেই স্নেহ দয়া কোন্ দিকে চলিয়া গেল। পাপীর হৃদয় নীরস মরুভূমি, ঊষরে উপ্ত বীজের ন্যায় সে মরুহৃদয়ে দয়ার অঙ্কুর কখন অঙ্কুরিত হয় না। সতীশচন্দ্রকে বিনাশ করাই স্থির সংকল্প হইল। একজন কাপড় আঁটিতে আঁটিতে উঠিয়া বলিল, "তবে এখনি কাজ সারা যাক্," শুনিয়া রামদুলাল বলিল "যখন ঘরে এসেছে তখন মেলেই হবে, তবে জমের মত যাবে, মেয়েটার সঙ্গে একবার দেখা সাক্ষাৎ করুক, ভোরের সময় কাজ সাঙ্গ করলেই হবে—আমার এ কথাটি তোমাদিগকে রাখ্‌তে হবে"। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, "তাই হবে" বলিয়া সকলে রামদুলালের কথার অনুমোদন করিল। তন্মধ্যে একজন অধিক বিচক্ষণ ছিল, সে একজনকে কাণে কাণে বলিল "দেখ, বাড়ি ঘিরে থাকতে হবে, যদি পালায় তবে সর্ব্বনাশ ক'রে ফেল্‌বে"। "ঠিক কথা বলেছিস ভাই" এই কথা বলিয়া অন্য এক ব্যক্তি সকলকে বলিল "দেখ, আজ সমস্ত রাত্তির এইখানে থাকিয়া পাহারা দিতে হবে।" নৃশংসগণের নিষ্ঠুর পরামর্শ স্থির হইল—নিশা শেষে একটী নিরীহ জীবের ইহ সংসারের লীলা খেলার পরিশেষ হইবে।

নিয়তির কি অপ্রতিরোধ্যা গতি, বিধাতার কি অপূর্ব্ব বিধান; জগদীশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! বৈঠকখানার দুই পার্শ্বে দুইটী গৃহ, মধ্যভাগে বিস্তৃত চাতাল; তন্মধ্যে একটী গৃহ ভিতর বাড়ীর দিকে; ভিতর হইতে যাওয়া আসার জন্য একটী দ্বার আছে, চাতালের দিকের দ্বারটী বন্ধ থাকায় গৃহটী অন্তঃপুরের সামিল হইয়াছে। সতীশ যে সময় বাড়ীতে যায়, বিরাজমোহিনী তখন দৌড়িয়া আসিয়া সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সেই সরলা বালিকা নর-পিশাচগণের সকল কথাই অবাধে শুনিতে পাইল। বিরাজমোহিনীর দেহযষ্টি কম্পিত হইতেছে, কপোল বহিয়া ঘর্ম্ম-বিন্দু পাদমূলে পতিত হইয়া ভূমিতল অভিষিক্ত করিতেছে। বালিকা আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, সে যে পিত্রালয়ে পিতামাতার কাছে রহিয়াছে, তাহাও এখন মনে হইতেছে না; বোধ হইতেছে, সে বুঝি আজ বিভীষিকাময়ী প্রেতপুরীতে বিচরণ করিতেছে! এইরূপ আত্মহারা হইয়া বিরাজ

কতক্ষণ বসিয়া রহিল; পরে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না, আবার বসিয়া পড়িল। ক্রমে রাত্রি হইল, আহারের সময় উপস্থিত; রামদুলাল পুত্রদ্বয়ের সহিত আহার করিতে বাড়ীতে যাইল। আহারের স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল, জামাতা ও পুত্রগণের সহিত দস্যুপতি আহারে বসিল। সতীশচন্দ্র আহারে বসিল মাত্র, সকল খাদ্যই পড়িয়া রহিল। তাহা দেখিয়া সেই নরাধম শ্বশুর—এরূপ নরকের কীটকে শ্বশুর বলিলে, শ্বশুর শব্দে কলঙ্ক আরোপ করা হয়, জামতাকে বলিল "কেন বাবা, কিছুই যে খেতে পারিলে না?"। জামাতা বলিল "আজ্ঞে ক্ষুধা নাই"। "তা বটে, পথশ্রমে ক্ষুধা না থাক্‌বারই কথা; যাও যাও শোওগে, শীঘ্র বিছেনা করে দে গো" রামদুলালের এই কথা বলা হইলে পর, সকলে আসন হইতে উত্থিত হইল। আচমন করিয়া পুত্রদ্বয়ের সহিত রামদুলাল বাহিরে চলিয়া গেল; সতীশচন্দ্র শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল।

ক্রমে সকলে শয়ন করিল; গ্রামের কলরব থামিয়া গেল! ধীরে ধীরে বিরাজমোহিনী স্বামী-শয্যায় গমন করিল। বিরাজের এই প্রথম স্বামী-সহবাসে গমন। কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না, কোন অনুরোধ করিতে হইল না, সে আপনি চলিল। বালিকার এই নির্লজ্জ ভাব দেখিয়া তাহার মা মনে মনে করিল—কলিকালের মেয়েকে এখন আর কিছুই বলিতে হয় না, কিছুই শিখাইতে হয় না। কিন্তু, বালিকার হৃদয় হইলেও, সে কোমল হৃদয় হইতে সকল লজ্জা, সকল ভয় যে একেবারে বিদূরিত হইয়াছে, জননী তাহা কেমন করিয়া জানিবে! বিরাজ গিয়া ঘরের দ্বার খুলিল, ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া, কপাটে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইল; দেখিল যে তাহার নারী জন্মের পরম দেবতা অধোমুখে শয্যার উপর উপবিষ্ট আছে। সতীশ একবার মুখ তুলিয়া তাহার প্রতি একটী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বিরাজ অমনি স্বামীর সম্মুখে যাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এমন করে রয়েছ কেন?" সতীশ নিরুত্তর। বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল "এমন করে মুখ নামিয়ে বোসে আছ কেন?" সতীশ আর নীরব থাকিতে পারিল না, যেন একটু তীব্রিরুদ্ধ স্বরে বলিল "জানইত, পথে বিপদের কথাও সব শুনেছ; সেই হতে বড় ভয় হয়েছে; মনে হচ্ছে"—কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল, সতীশ আর কোন কথা বলিতে সক্ষম হইল না। বিরাজ বলিল "ভয় হয়েছে; বুঝিবা সর্ব্বনাশ হয়।" এই কথা শুনিয়া সতীশের আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। সবেগে বিরাজের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল "তবে কি আমারও প্রাণ যাবে না কি? কে রক্ষা করিবে?" বালিকা উত্তর করিল "বাবা যখন দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করতে বসেছেন, তখন আর কে আছে যে রক্ষা করবে।" সতীশের অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল, ধীরে ধীরে বলিল "কোন উপায় নাই? তবে এই সময় দুজনে পালাই চল।" উত্তর হইল "পালাইবারও পথ নাই, দুষ্টেরা বাড়ি ঘিরে বসে আছে।" সতীশ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিরাজের হাত ধরিয়া বলিল "বিরাজ, আজ নিশ্চয়ই মলেম—এই দেখাই বুঝি এ জন্মের শেষ দেখা হলো," আর কিছুই বলিতে পারিল না, নেত্রকোণ হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। "এমন ক'র না, চুপ ক'রে বোসে থাক, হরি রক্ষা করবেন" এই বলিয়া বিরাজমোহিনী আলনা হইতে একখানি কাপড় টানিয়া লইল, পরে স্বামীকে বলিল "দেখ, আমি বাহিরে যাচ্ছি, তুমি কপাট বন্ধ ক'রে বোসে থাক; আমি এসে না ডাক্‌লে কিছুতেই কপাট খুলো না—কারো কথায় কপাট খুলো না।" বিরাজের এই কথা শুনিয়া সতীশ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাবে?" উত্তর হইল "তোমার রক্ষায়"; সতীশ বলিল "রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে বিরাজ?" "হরি রক্ষা করবেন! ভাল ক'রে কপাট বন্ধ কর" এই কথা বলিয়া কাপড়খানি হাতে লইয়া বিরাজ বাহিরে আসিল। সতীশচন্দ্র ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দিল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বিরাজ কোথায় গেল? সে নিতান্ত বালিকা, কেমন করিয়া আমায় রক্ষা করিবে? গ্রামের সকলেই দস্যু-ব্যবসায়ী; ব্যাধের পিঞ্জরে বিহঙ্গমের ন্যায়, সিংহ-গহ্বরে

দুর্ব্বল হরিণ শিশুর মত, আজিও দস্যু-গৃহে আবদ্ধ; রক্ষার উপায় সুদূরপরাহত। কতই দুশ্চিন্তা আসিয়া মনের মধ্যে উদয় হইতে লাগিল; সতীশ একরূপ জীবনে হতাশ হইয়া পড়িল।

কাপড় খানি হাতে করিয়া বিরাজ নিঃশব্দে খিড়কীর দ্বার খুলিল। দ্বার খুলিয়া দেখে সম্মুখে একজন লোক; লোকটা একটু সরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যাইতে পারিল না; বিরাজ তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে গা?" "আমি" বলিয়া লোকটা বিরাজকে বলিল "তুই এখন কোথায় যাচ্ছিস্? "কাপড় কাচ্‌তে যাচ্ছি" বলিয়া বিরাজ আর সেখানে দাঁড়াইল না—চলিয়া গেল। এমন সময় সেই লোকটীর কাছে, আর একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। আগন্তুক বলিল "তুই খেতে যা, আমি খেয়ে এসেছি।" "খুব সাবধানে থাকিস্" এই কথা বলিয়া প্রথম ব্যক্তি প্রস্থান করিল। কিন্তু বিরাজ যে বাহিরে গিয়াছে,—জানি না কাহার ইচ্ছায়!—সে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এ কথা বলিতে ভুলিয়া গেল। ইহারা যে সতীশের পাহারায় আছে, এ কথা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না।

বিরাজ চলিল, কিন্তু কোথায়? সেখানে আর এমন ব্যক্তি কে আছে যে, তাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিবে! বিরাজমোহিনী বর্দ্ধমান যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছে। সেখানে বড় সাহেবের কাছে যাইব, তাঁহাকে এই বিষম সঙ্কটের কথা বলিব, তিনি অবশ্য রক্ষা করিবেন,—এ বিপদে ইহাই একমাত্র উপায়, বিরাজ মনে মনে এই স্থির করিয়াছে। সে ইহ জীবনে দুইবার বর্দ্ধমান গিয়াছিল; একবার ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে, আর একবার বিবাহের পর দিন শ্বশুরালয় গমনে। পথ তত পরিচিত নয়, কিন্তু বিরাজমোহিনী চলিয়াছে। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি ঘোর অন্ধকার, বিরাজ সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিয়াছে। রাস্তার ঠিক নাই; কখন জমী দিয়া, কখন শুষ্ক পুকুরের উপর দিয়া, কখন বা নালা পার হইয়া, বিরাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাস, কত দিন হইতে জল হয় নাই, মাটী শক্ত হইয়া গিয়াছে, কখন সুকঠিন বস্তুর উপরে পদতল আহত হইতেছে, কখন বা কাঁটার উপর পড়িয়া কোমলাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে—তাহার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে—অমনি তখনি উঠিতেছে, আবার প্রাণ পণে ছুটিতেছে। ক্রমে বিরাজ আসিয়া বাঁধা রাস্তায় উঠিল; ভাল রাস্তা পাইয়া আরও বেগে চলিতে লাগিল। দস্যুর ভয়, কি ভূতের ভয়, সাপের ভয়, কি জন্তুর ভয়, বিরাজের অন্তঃকরণে এখন আর কোন ভয় নাই;—এক ভয়ের আবির্ভাবে এ সকল সামান্য ভয় কোথায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

বিরাজ বর্দ্ধমানে পৌঁছিল। আড়াই ক্রোশ রাস্তা বালিকা যে কত সময়ে আসিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে সক্ষম নহি; তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সে অতি অল্প সময়। বিরাজ বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিয়াই একজন কনষ্টেবলকে দেখিতে পাইল; তাহাকে দেখিয়া আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি কে গা! এ সহরের বড় সাহেব কোথা থাকে গা?" কনষ্টেবল টী হিন্দুস্থানী; কিন্তু এদেশে অনেক দিন থাকায় বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপে বুঝিতে ও কহিতে পারে। এত রাত্রে এরূপ একজন বালিকাকে বড় সাহেবের অনুসন্ধান করিতে শুনিয়া, কনষ্টেবল উৎসুকতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথা হইতে আসছ? বড় সাহেবকে দরকার কি?" বিরাজ বলিল "বড় বিপদে পড়েছি, আমায় শীঘ্র সেখানে নিয়ে চল না গা।" বিপদের কথা শুনিয়া, কনষ্টেবল দ্বিরুক্তি না করিয়া বিরাজকে লইয়া দ্রুতপদে থানায় উপস্থিত হইল। দারোগা আমূল সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বিরাজকে সঙ্গে লইয়া পুলিষ সাহেবের নিকট গেলেন। পুলিষ সাহেব ও অন্যান্য সকলে মাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে গেলেন। মাজিষ্ট্রেট বিরাজের মুখে সকল কথা শুনিলেন। কুঠিতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অল্প সময়ের মধ্যেই সহরের সমস্ত পুলিষ কর্ম্মচারী কুঠীতে আসিয়া সমবেত হইল। তন্মধ্যে জন কয়েককে গোপালপুর যাইবার পথপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহ হইতে চৌকীদার সংগ্রহের জন্য পাঠান হইল; এবং তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া

হইল যে, গোপালপুরের প্রান্তভাগে সকলে একত্রিত হইয়া যেন অপেক্ষা করে। বিরাজমোহিনীর জন্য একখানি পাল্কী আসিল, বাহকগণকে বলা হইল যে, তাহারা যত শীঘ্র যাইতে পারিবে, তত অধিক পুরস্কার পাইবে। কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে তরবারী, কাহারও হাতে বন্দুক। মাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট, পুলিষসাহেব, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর, ইন্‌স্পেক্টর, সব-ইন্‌স্পেক্টর, হেড্ কনষ্টেবল, কনষ্টেবল, রিজার্ভপুলিষ সকলেই গোপালপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। কেহ অশ্বে, কেহ পদব্রজে, সকলেই দ্রুতবেগে চলিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে পাল্কীও ছুটিয়াছে।

প্রায় এক শত চৌকীদার গোপালপুরের মাটে একত্রিত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটসাহেবও অনুচরগণের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ইন্‌স্পেক্টরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, কতক লোককে গ্রামের প্রত্যেক রাস্তায় রাখিয়া দিবে, কতক যাইয়া রামদুলালের বাড়ী ঘেরাও করিয়া দাঁড়াইবে এবং যাহাকে পাইবে তাহাকেই গ্রেপ্তার করিবে, অবশিষ্ট বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিবে। নিমিষ মধ্যেই আদেশানুযায়ী বন্দোবস্ত ঠিক হইল। দ্রুতগমনে সকলে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এখানে দস্যুপতি রামদুলাল সদলে বৈঠকখানায় দরবার সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেই উৎসুক চিত্তে সময়ের অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময় দ্বারদেশে পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল। কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টর ও সব্ ইন্‌স্পেক্টর, জনকয়েক কনষ্টেবল্ ও চৌকীদার লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। বৈঠকখানা হইতে প্রশ্ন হইল "কে আসে?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইল "বিদেশী—বিবাহের বরযাত্রী, একবার তামাক খাব"। "আসুন, আসুন" বলিয়া রামদুলাল একজনকে তামাক প্রস্তুত করিতে বলিল। সেই বাড়ীর পার্শ্বে একটা শব্দ হইয়া উঠিল—যাহারা বাড়ী, ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পুলিষ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতেছে। মাজিষ্ট্রেট দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন; অবসর বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "পাকড়াও"। অমনি বহুসংখ্যক লোক বাড়ীর ভিতর আসিয়া পড়িল; ক্ষিপ্রহস্তে যে যেখানে ছিল, তাহাকে সেইখানেই ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। একজনও পলাইতে পারিল না। সতীর সতীত্ববলের নিকট পাপিষ্ঠগণের পিশাচবল পরাজয় স্বীকার করিল—গোপালপুরের বৃদ্ধ, বালক ও বনিতা ভিন্ন সকলেই বন্দী হইল। মাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও পুলিষসাহেব বিরাজকে সঙ্গে লইয়া ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন; যে ঘরে সতীশ ছিল, বিরাজমোহিনী সেই ঘরের দ্বারে আঘাত করিয়া কবাট খুলিতে বলিল। বিরাজের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়াও কপাট খুলিতে সতীশ সাহসী হইল না; পরে মাজিষ্ট্রেটের মুখে অভয় বাক্য শুনিয়া তবে কবাট বিমুক্ত করিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া সতীশচন্দ্র যাহা দেখিল, তাহাতে এ সকল ব্যাপার তাহার পক্ষে যেন অলৌকিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; মনে মনে বলিল "বিরাজ আমার স্ত্রী, না কোন স্বর্গবাসিনী দেবী"!

দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া গেল। ক্রমে এ সংবাদ চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। পাপিগণের পাপ অভিনয়ের শেষ ফল দেখিবার জন্য পার্শ্বস্থ গ্রামবাসিগণ দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিল। সকলে আহ্লাদিত, সকলেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে শত শত ধন্যবাদ দিল, বিরাজমোহিনীকে সহস্র সহস্র আশীর্ব্বাদ করিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বন্দিগণকে লইয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন; স্বামীর সহিত বিরাজমোহিনীও বর্দ্ধমানে যাইল। গোপালপুরে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল।

দুরাত্মাগণ বিচারালয়ে নীত হইল। রাজশাসন বিধি অনুসারে কেহ বা সাত বৎসরের জন্য, কেহ বা দশবৎসরের জন্য, কেহ বা চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এবং কেহ কেহ বা আজীবন দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়া নিজ নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল। রামদুলালের চির-নির্ব্বাসন ও তাহার পুত্রদ্বয়ের সুদীর্ঘ কারাবাস হইল। সতীশচন্দ্র দিন কয়েক বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিয়া সস্ত্রীক স্বগৃহে যাত্রা করিল।

পাঠক, ইহা কবির কল্পনা নহে, ঔপন্যাসিকের উপন্যাসও নহে; সত্য সত্যই এই বঙ্গভূমিতে যাহা এক দিন ঘটিয়া ছিল, তাহাই লেখনী মুখে বিবৃত হইল মাত্র। আশা করি, পরে আরও এইরূপ দুই একটী ভাঙ্গন-গড়ন আপনাদিগকে শুনাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীধনকৃষ্ণ সেন।

গোবিন্দসামন্ত ও উগ্রক্ষত্রিয়।

ইংরাজি সাহিত্যে "গোবিন্দসামন্ত" রেভারেণ্ড লালবিহারী দের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। সুধু তাঁহার কেন, বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। এই এক গ্রন্থের দ্বারা সাহিত্য সমাজে তিনি সুপরিচিত এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ। সুতরাং এরূপ গ্রন্থের সমালোচনায় উপহাস ব্যতীত অন্য কোনরূপ লাভের সম্ভাবনা নাই; এবং জানিয়া শুনিয়া আমরাও সে কলঙ্কের পসরা মস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। তবে স্থানে স্থানে গ্রন্থকর্ত্তা যে, তাঁহার উদ্দেশীভূত বিষয়ের অতিক্রম করিয়া অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন করা এ প্রবন্ধের অন্যতর উদ্দেশ্য। আজ কাল প্রায়ই দেখা যায় যে, উগ্রক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে হইলে অনেকেই রেভারেণ্ড দে সাহেবের বঙ্গীয় কৃষিজীবনমূলক উপন্যাস "গোবিন্দসামন্ত" হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকেন। ইহার কারণ দ্বিবিধ, প্রথমতঃ বঙ্গীয় উগ্রক্ষত্রিয়েরা সংখ্যার অল্পতা এবং বাসস্থানের সংকীর্ণতা হেতু জনসাধারণ সমীপে, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসীদিগের নিকট সুপরিচিত নহেন; দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং প্রোফেসার লালবিহারী, পুরস্কার প্রত্যাশায়, তাঁহার সতেজ লেখনী বলে তাঁহাদিগকে কৃষিজীবনের আদর্শ বানাইয়া, এরূপ এক প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন যে, সহজে আর কেহ তাঁহার বর্ণনাকে অপ্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। উপন্যাসলেখক নানাবিধ রঙ্গের দ্বারা তাঁহার কল্পিত বিষয়ের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে পারেন, কিন্তু সে সকল বিষয়কে সত্য মূলক বলিয়া বিশ্বাস করিলেই বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়। এই প্রকার ভ্রম হইতে সাধারণ পাঠকবর্গকে সাবধান করা আমাদিগের অপর এবং প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদিগের বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, সমালোচ্য গ্রন্থের প্রণয়ন বিষয়ে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বা আবশ্যকতা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার খ্যাতনামা জমিদার মৃত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, স্বকীয় সাহিত্যানুরাগের বশীভূত হইয়া, বঙ্গীয় কৃষিজীবনমূলক সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস-লেখককে ৫০ পৌণ্ড পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া অনেকেই অনেক পুস্তক রচনা করিলেন, কিন্তু প্রোফেসার লালবিহারী ব্যতীত আর কেহই পুরস্কার লাভের উপযুক্ত হইলেন না। এই "গোবিন্দ সামন্তই" তাঁহার সেই উদ্যমের ফল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "গোবিন্দ সামন্তের" সমালোচনা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কেবল যেখানে যেখানে গ্রন্থকার, অন্যের অপমান উদ্দেশে অথবা নিজের গৌরববৃদ্ধি মানসে গন্তব্য পথ ছাড়িয়া অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাই পাঠক সমক্ষে ধারণ করা আমাদের অভিপ্রায়। গোবিন্দ সামন্তের আচার ব্যবহার, গোবিন্দ সামন্তের রীতি-নীতি, গোবিন্দতেই নিবদ্ধ রাখিলে ভাল হইত, কিম্বা গোবিন্দের উর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষ এবং নিম্নতন ততোধিক পুরুষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত গরিব গোবিন্দকে উগ্রক্ষত্রিয়ের আদর্শ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া গ্রন্থকার কেবল নিজের অসদভিপ্রায়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কল্পিত কাঞ্চননগরের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "Ugra-Kshattryas, or Aguris, as they are called in common parlance, are all engaged in agricultural pursuits অর্থাৎ উগ্রক্ষত্রিয়েরা, যাহাদিগকে চলিত ভাষায় আগুরী বলে, তাহারা সকলেই কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে।" উপন্যাস লিখিতে গিয়া ইতিহাস-বেত্তার আসন গ্রহণ না করিলে কি চলিত না? আর যদি তাহাই ইচ্ছা ছিল, তবে জানিয়া শুনিয়া লিখিলেই ত ভাল হইত। কে তাঁহাকে বলিল যে সমস্ত উগ্রক্ষত্রিয়েরাই কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত? অথবা যদি কেবল নায়কের চরিত্র সুপরিস্ফুট করাই তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলেও ত কেবল সেই গ্রামের উগ্রক্ষত্রিয়দিগকে চাষজীবী বলিয়া উল্লেখ করিলে সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য নহে। কেন না আরও দুই এক স্থানে তিনি উগ্রক্ষত্রিয়দিগকে প্রকৃত চাষজীবী সপ্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। সে সকল স্থানও আমরা যথা সময়ে পাঠকের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টা করিব।

আমরা উগ্রক্ষত্রিয়, সুতরাং জাত্যভিমান বশতঃই এ কথার প্রতিবাদ করিতেছি, ইহা সকলেই বুঝিবেন। কিন্তু রেভারেণ্ড লালবিহারী দে জাতিচ্যুত হইয়াও, জাতিভেদ-পরিশূন্য আত্মাভিমান বিবর্জ্জিত খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও যে স্বজাতি-প্রেমিকতা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তাহাই আশ্চর্য্য, অথবা কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং। তাঁহার কল্পনা-প্রসূত কাঞ্চননগরের উৎপত্তি-কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সুবর্ণবণিক-বংশ-সম্ভূত লালবিহারী দে লিখিতেছেন যে, এই গ্রামে প্রভূত ধনসম্পন্ন সুবর্ণবণিকের বাস হেতু ইহাকে কাঞ্চন অর্থাৎ সুবর্ণপুর বলে। স্বজাতি-সমৃদ্ধি বর্ণনোৎসুক লালবিহারী এই পর্য্যন্ত বলিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সুবর্ণবণিক যে সোণার আকর এবং সোণাই তাহাদের ব্যবসা ইহাও ইঙ্গিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এরূপ প্রসঙ্গবহির্ভূত আলোচনায়, স্ব জাতি-বৎসলতা ব্যতীত অন্য কোন কারণ ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং লেখকের অভিপ্রায়ের উপর স্বতঃই সন্দেহ আইসে, এবং মনে হয় যে, উগ্রক্ষত্রিয়দিগের প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব বশতঃই উঁহাদিগের মধ্য হইতে তাঁহার কৃষিজীবনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

গোবিন্দকে পাঠশালায় পাঠাইবার পূর্ব্বে গোবিন্দের পিতা এবং পিতামহীর মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার একটু নমুনা দেখুন;—

Badan. "Don't you think mother, it would be a good thing to give Govin his *hate khade*? It is a great drawback that I can not either read or write. I can not read a *pátá* (pottah) or write a *kabuliyat*; I can not even sign my name: I am obliged, owing to my ignorance, to put a *dhenda*(a cross) for my signature. Though I have eyes, I can not see. I am at the mercy of every deceitful *gomostá*, and of every tyrannical Zamindar. Don't you think it would be a capital thing to teach Govin *lekha-pada* (writing and reading)?"

Alanga. "Oh Baba Badan! don't talk of lekha-pada, your elder brother was sent to Pathsálá (school) by your father, contrary to my wishes. And what was the consequence? The gods took him away from us after he had been to school only one year. Reading and writing do not suit poor

people like us. I fear the gods will take away Govin also (the son of Shashthi! may he live for ever!) if you send him to school."

Badan. "Oh, mother, what an idea! who ever heard of reading and writing killing a child? why are not Brháhman and Kayastha boys who learn reading and writing also killed?"

Alanga. "The gods do not become angry with Brhahman and Káyastha boys for learning, because that is their profession. But our business is to till the ground, and if we become so ambitious as to learn reading and writing, the gods will certainly become angry with us."

Badan. "But do you not know, mother, that some Aguris, men of our caste, know how to read and to write? Does not Nátábar Sàmantá read and write? Is not Madhu Sinha a moharir (writer)? why have the gods not killed them?"

অর্থ—বদন। গবিনের হাতে খড়ি দিলে ভাল হয় না মা? আমি লিখ্‌তে পড়্‌তে জানি না এটা বড়ই গরসুবিধা। আমি একখানি পাটা পড়্‌তে কি একখানি কবুলতি লিখ্‌তে পারি না; আমি আমার নামটী পর্য্যন্ত দস্তখত করিতে পারি না। কাযেই লিখ্‌তে না জানার দরুণ নাম দস্তখতের জায়গায় আমাকে ঢেরা সই করতে হয়। আমার চোক্ থাকতেও আমি দেখ্‌তে পাই না। আমাকে প্রত্যেক অত্যাচারী জমিদার ও প্রবঞ্চক গোমস্তার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। তুমি এটা বিবেচনা করে দেখ্‌ছ না, এরূপ অবস্থায় গবিন্‌কে লেখাপড়া শিখালে কত বড় একটা কাজ্ হবে?

অলঙ্গ। আ বাবা বদন! লেখা পড়ার কথা আর বলিস্‌না। আমার অমতে, তোর বাবা তোর বড় দাদাকে পাঠশালা পাঠিয়েছিল। তার ফল কি ফলেছিল জানিস্? পাঠশালা যাওয়ার এক বৎসর পরেই বিধাতা তাহাকে আমাদের কোল ছাড়া করেছিল। আমাদের মতন গরিব লোকের লেখাপড়া শয়না বাবা! ষষ্টীর দাস গোবিন চিরজীবী হ'ক; তুমি তাহাকে পাঠশালা পাঠালে বিধাতা পাছে তাকেও কেড়ে লয়, আমার এই ভয়।

বদন। মা বল কি! লেখা পড়া শিখ্‌লে ছেলে মরে যায়, এ কথা কি কেও কখন শুনেছে? যদি তাই হয় তবে ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মরে না কেন?

অলঙ্গ। ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলেরা লেখাপড়া শিখ্‌লে দেবতারা তাদের উপর রাগ করেন না। কারণ লেখাপড়াই তাদের পেশা। কিন্তু আমাদের কেবল চাস করাই ব্যবসা, তাতে আমরা যদি লেখা পড়া শিখ্‌বার ইচ্ছা করি, তাহলে দেবতারা আমাদের উপর নিশ্চয় রাগ করবেন।

বদন। আচ্ছা মা তাই যদি হয়, তা হলে তুমি কি শুন নাই, আমাদের আগুরীর মধ্যেও কেও কেও লেখা পড়া জানে? নটবর সামন্ত কি লিখ্‌তে পড়্‌তে জানে না? মধু সিংহ কি একজন মুহুরি নয়? তারা কেন মরে নাই?

এই মাতা পুত্রের কথোপকথনের মধ্যে তাহাদিগের জাতিকে টানিয়া আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? গোবিন্দের কোন পুরুষের সহিত বর্ণমালার পরিচয় হয় নাই, এই পর্য্যন্ত লিখিলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া গ্রন্থকার বদনের মুখ দিয়া মধুসিংহকে শিক্ষিত উগ্রক্ষত্রিয়ের আদর্শ করিয়া দেখাইলেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে ইহারা মুহুরী বা গোমস্তা অপেক্ষা উচ্চতর পদবীর আকাঙ্ক্ষী নহে!

আবার দেখুন, গোবিন্দের বন্ধুবান্ধবের কথা বলিতে গিয়া, গ্রন্থকার বলিতেছেন,—

An Aguri may have a *Goala*(milk-man), or a Sadgopa (agricultural caste) or a man of any other caste as his most intimate friend &.

অর্থাৎ গোয়ালা, সদ্‌গোপ (চাষা) অথবা অন্য কোন শ্রেণীর লোকও আগুরীর পরম বন্ধু হইতে পারে।

এখানে "আগুরি" কথা উল্লেখের প্রয়োজন কি? চাষজীবী গোবিন্দের যে সকল লোকের সহিত বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব, তাহা ত গ্রন্থকার বেশই দেখাইয়াছেন। নন্দ কামার, কপিল ছুতর, রসময় ময়রা, মদন মুদী, চতুর নাপিত এবং বোকারাম তাঁতী,—এই কয়জন বা এই শ্রেণীর লোক ব্যতীত অন্য লোকের সহিত গোবিন্দের বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করিলে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক হইত। "চাষা" আর কোন কালে ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সহিত বন্ধুত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে পারে? কিন্তু গোয়ালা বা সদ্‌গোপকে উগ্রক্ষত্রিয়ের বন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ অসত্য এবং অসদভিপ্রায়ের পরিচায়ক। এ কথা বলি না যে, সদ্‌গোপ প্রভৃতির মধ্যে কোন উগ্রক্ষত্রিয়ের বন্ধু থাকিতে পারে না, কিন্তু ঐ সকল জাতির সহিত উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বিশেষভাবে বন্ধুত্ব থাকার কথা বলিলে উগ্রক্ষত্রিয়দিগকে ঐ শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। সমব্যবসায়ীর মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব থাকাই স্বাভাবিক, তাহাতে জাতির কথা উঠিতে পারে না। একজন নিরক্ষর মূর্খ ব্রাহ্মণের সহিতও একজন গোয়ালাপুত্র বা চাষার প্রণয় থাকিতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কি বলা উচিত যে, ব্রাহ্মণের গোয়ালা প্রভৃতিই পরম বন্ধু? কোন চাষজীবী উগ্রক্ষত্রিয়ের গোয়ালা বন্ধু থাকা যেমন ঠিক, শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন উগ্রক্ষত্রিয়ের সহিত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়স্থের বন্ধুত্ব থাকা কি সেইরূপ ঠিক নহে? গোবিন্দসামন্তের যে কোন স্থলই আলোচনা করা যাউক না, দেখা যাইবে যে,উগ্রক্ষত্রিয় জাতিকে নিম্ন শ্রেণীভুক্ত করাই গ্রন্থকারের একান্ত অভিপ্রায়। শাস্ত্রানভিজ্ঞ একদেশদর্শী ম্লেচ্ছভাবাপন্ন বণিক পুত্র দে সাহেবের এ অভিপ্রায় কি নীচতা-ব্যঞ্জক দূরভিসন্ধিমূলক নহে?

বণিকপুত্র দে সাহেব এক দিকে যেমন উগ্রক্ষত্রিয়দিগকে হীনাবস্থাপন্ন কৃষক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত, অপর দিকে তেমনি সুবর্ণবণিকদিগকে উজ্জ্বলতর রঙ্গে চিত্রিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত। রায় পুকুরের ঘাটে সুবর্ণ বণিকার সহিত ব্রাহ্মণীর আলাপের মধ্যে পূর্ব্বোক্তার অস্পৃশ্যতার কোন আভাস না দিয়া, বরং দেখাইয়াছেন যে, সুবর্ণ বণিকস্পৃষ্ট দ্রব্যাদির পান ভোজনে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির কোন আপত্তি নাই। গ্রন্থকার কি জানেন না যে,পল্লীগ্রামে সামাজিকতায় সুবর্ণ বণিকের কি স্থান? সুবর্ণ বণিকপ্রস্তুত কোন আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, কোন নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকও,তাহাদিগের সহিত একঘাটে,এক পুকুরে স্নানাদি করণেও জাতিভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা করে। কিন্তু গ্রন্থকার যত্নতঃ সে ভাব গোপন করিয়াছেন এবং পুস্তকের নানা স্থানে সুবর্ণ বণিকের কথা উল্লেখ করিয়া

দেখাইয়াছেন যে, সমাজে তাহারাও অন্যান্য সৎশূদ্রের ন্যায় পরিগণিত।

আর এক স্থানে সুবর্ণ বণিকের কিরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে দেখুন,—

Golaka Poddar, for that was the name of Govind's Mahajan, was by caste a Suvarna Vanika, that is, the banker caste, though of a lower order than that to which the Malliks of Calcutta, and the Làhàs, Silas and Mandals of Chinsura belong.

অর্থাৎ গোবিন্দ সামন্তের মহাজনের নাম গোলক পোদ্দার। ইনি জাতিতে সুবর্ণবণিক, কিন্তু কলিকাতার মল্লিক, চুঁচুড়ার লাহা, শীল এবং মণ্ডল প্রভৃতি সুবর্ণবণিকদিগের অপেক্ষা জাত্যংশে কিছু হীনমর্য্যাদ।

সুবর্ণবণিকেরা যে কেবলই মহাজনী এবং স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবসায় করিয়া থাকেন তাহা নহে, তাহাদিগের মধ্যে কলিকাতার মল্লিক এবং চুঁচুড়ার শীল,মণ্ডল প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় জমিদার এবং কুটীওয়ালাও আছেন, ইহাই প্রকাশ করা স্বজাতি-গৌরব-বর্দ্ধনোৎসুক রেভা-রেণ্ড লালবিহারী দের প্রধান উদ্দেশ্য। অথবা ইহাতে আরও কোন গূঢ়তর অভিসন্ধি থাকিবে। পাছে পল্লীগ্রামবাসী দশ বিশ হাজার টাকার অধিপতি গোলক পোদ্দারকে কেহ আদর্শ সুবর্ণ বণিক বলিয়া গ্রহণ করে,এই আশঙ্কায় দে মহাশয় বলিলেন, হাঁ—এ ব্যক্তি সুবর্ণবণিক বটে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর। পাঠক, বলুন দেখি, সুবর্ণ বণিকের অর্থপ্রাচুর্য্য এবং সামাজিক খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রকাশ করা ব্যতীত, এরূপ অপ্রাসঙ্গিক তুলনার অন্য কোন কারণ কি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়।

এইরূপ আরও দুই এক স্থানে অনাবশ্যকীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের লাভ নাই। গ্রন্থকার যে সরল বিশ্বাসে উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মধ্য হইতে তাঁহার নায়ক গ্রহণ করেন নাই, তাহা স্থিরনিশ্চয়। এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তির দ্বারা আমরাও, বোধ হয়, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে উগ্রক্ষত্রিয় চাষজীবী জাতি নহে। আমরা উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া যে, এ কথা বলিতেছি তাহা নহে, অনুসন্ধান করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, এই জাতির মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই গোবিন্দের সহিত সমাবস্থাপন্ন। প্রবলপ্রতাপ জমিদারের অত্যাচার প্রপীড়িত, সহায়সম্পত্তিবিহীন, নিরক্ষর, অন্নক্লিষ্ট গোবিন্দের যে চিত্র গ্রন্থকার উপসংহারে প্রদান করিয়াছেন, তাহা কদাচ কোন কৃষকের বংশে সম্ভবে না। বঙ্গের কৃষকগণ চিরকালই পদদলিত, সুতরাং আত্মমর্য্যাদা বিবর্জ্জিত। উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যদি কেহ অবস্থার হীনতা বশতঃ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করে, তাহা হইলেও জাত্যভিমান কখন তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় না। গ্রন্থকার অবশ্য সত্যানুরোধেই উক্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকিবেন, নচেৎ এতদ্দেশীয় কৃষিজীবনের মধ্যে অস্বাভাবিক আত্মমর্য্যাদার ভাব কখনই সন্নিবেশিত করিতেন না। যাহাই হউক, সে চিত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরাও আমাদের প্রবন্ধের এ অংশ শেষ করিব ;—

There was therefore nothing left for him (Govind) but to go to Burdwan, where Maharaja Mahtap Chand Bahadur—the greatest landholder in Bengal – was, with his characteristic benevolence, creating work for about two thousand labourers every day, with a view only to give them relief. It was with a heavy heart, and with tears in his eyes, that Govind left his home and wended his way towards Burdwan. He had never in his life,hired himself out as a day labourer. He had always tilled his paternal acres, and lived upon their produce. But now, in mature life, he had to stoop to the degradation of becoming a coolie. This thought dried up his life's blood. Like other labourers, he certainly worked on the Maharaja'hs relief works and got his daily wages. But the thought of his degradation haunted him by day and by night. It preyed upon his spirits. He wept day and night over his wretched lot. His health visibly declined. He was reduced to a skeleton. His heart was broken. And one morning he was found dead in his miserable hovel, far from his home and from those he loved.

অর্থাৎ, তখন গোবিন্দের বর্দ্ধমান যাওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর রহিল না। সেই সময় বঙ্গের প্রধানতম ভূস্বামী মহারাজা মহাতাপ চাঁদ্ বাহাদুর তাঁহার অসাধারণ স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতাগুণে দৈনিক দুই সহস্র শ্রমজীবীকে তাহাদের উপযোগী কার্য্য দিয়া সাহায্য করিতেছিলেন। গোবিন্দ সজল নয়নে ব্যথিত চিত্তে গৃহ ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিল। গোবিন্দ কখন জীবনে অপরের জন খাটে নাই। সে কেবলমাত্র পৈতৃক জমি

চাষ করিয়া তদুৎপন্ন শস্যে জীবীকা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু হায়! এই প্রবীণ বয়সে তাহাকে কুলিগিরিরূপ নীচতা স্বীকার করিতে হইল! এই চিন্তাতেই তাহার শরীরের রক্ত শুকাইতে লাগিল। সেও অন্যান্য শ্রমজীবীদের ন্যায় মহারাজার রিলিফ কার্য্যে খাটিয়া তাহার দৈনিক বেতন লইত; কিন্তু তাহার এই অবনতি জনিত দারুণ চিন্তায় দিন রাত তাহাকে যাতনা দিতে লাগিল। এই চিন্তাই তাহার অন্তরকে জর্জ্জরিত করিল। গোবিন্দ তাহার এই দুরদৃষ্টের জন্য দিবা রাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিল, তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গেল, এবং শরীর কঙ্কালাবশিষ্ট হইল। তাহার হৃদয় ভগ্ন হইয়া পড়িল এবং একদিন প্রাতে তাহার প্রিয় আত্মীয়স্বজন ও গৃহ হইতে দূরস্থিত কোন দারিদ্র্যপূর্ণ কুটীরে তাহাকে মৃতাবস্থায় দেখা গেল।

গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল তাহা একপ্রকার শেষ হইল। এক্ষণে গ্রন্থের অসারগ্রাহী পাঠকবর্গকে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। রেভারেণ্ড দে সাহেবের লিপিকৌশলে অনেকেই "গোবিন্দ সামন্তের" ঔপন্যাসিকত্ব ভুলিয়া গিয়া ইহাকে প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া স্থির করেন। যে সে লোকের কথা বলি না, অনেক বিজ্ঞ বুদ্ধিমান লোকও এ ভ্রম অতিক্রম করিতে পারেন না। ছোটলাটের সেক্রেটরী স্বয়ং মিষ্টার রিজ্‌লী তাঁহার সংগৃহীত বঙ্গদেশস্থ জাতিনিচয়ের বিবরণ মালায় উগ্রক্ষত্রিয়দিগের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, A woman of proved unchastity is turned out of the caste and usually takes refuge among the Bairagi Vaisnavas or some similar religious sect. অর্থাৎ এই জাতির স্ত্রীলোকেরা অসতী হইলে

জাতিচ্যুত হয় এবং গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া বৈরাগী বৈষ্ণব অথবা তদ্রূপ অপর কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। এরূপ বৃত্তান্ত তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি যে তাঁহাকে এ অমূলক সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহার জন্য সম্ভবতঃ তিনি গোবিন্দসামন্তের নিকট ঋণী। সম্ভবতঃ বলিলাম এই জন্য যে, এক ফল নানা কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। (The same effect may arise from a plurality of causes.) কিন্তু উল্লিখিত বিবরণটী যে গোবিন্দসামন্ত হইতে গৃহীত তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অনাথিনী আদুরীর তীর্থপর্য্যটন ব্যপদেশে অগ্রদ্বীপে গমন এবং তথায় তাহার পূর্ব্বপরিচিত প্রেমভক্ত বৈরাগীর সহিত সম্মিলনে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া সমাজতত্ত্ব অনভিজ্ঞ রিজ্‌লী সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইহাদিগের কুলকলঙ্কিনীগণ গৃহ বহিষ্কৃতা হইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আশ্রয়ভাগিনী হয়।

আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তের আর এক কারণ আছে। উগ্রক্ষত্রিয়েরা সমাজে কোন্ স্থান অধিকার করে,এ কথার মীমাংসা করিতে গিয়া, সাহেব লিখিতেছেন, In Burdwan and Western Bangal, where Aguris are numerous, they take rank with the Nava-sakhas. অর্থাৎ, বর্দ্ধমান এবং পশ্চিম বঙ্গে, যেখানে বহুসংখ্যক উগ্রক্ষত্রিয় বাস করে, তাহারা সমাজমর্য্যাদায় নবশাকের তুল্য। সাহেবের এ বৃত্তান্তটীও গোবিন্দসামন্তমূলক; কেন না, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে উগ্রক্ষত্রিয়েরা স্থিরনিশ্চয়রূপে নবশাক অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিলেও, সাহেব যে উভয় জাতিকে সামাজিকতার এক শ্রেণীভুক্ত করিলেন, তাহার কারণ, লালবিহারী বাবু নবশাকদিগের সহিতই গোবিন্দের বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ রিজ্‌লী-সাহেব সংকলিত উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ পাঠ করিলে, স্বতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, উক্ত বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে সাহেব বাহাদুর অন্ততঃ একবারও গোবিন্দসামন্তের পাতাগুলি উল্টাইয়া ছিলেন।

এই ত গেল গবর্ণমেণ্টের এক জন উচ্চপদস্থ এবং গুরুতর কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কথা। আবার দেখুন, আর এক মহাত্মা সম্পাদকীয় গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া কিরূপ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বিগত১০ই মাঘের "প্রকৃতি"তে "বঙ্গীয় রাজপুত" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে অপরাপর কপোলকল্পিত বিষয়ের মধ্যে লিখিত আছে যে, "কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা উপলক্ষে একজন রাজপুত বীর চারি পাঁচ জন উগ্রক্ষত্রিয়ের সাহায্যে একশত অস্ত্রধারী পাঠান এবং বহুসংখ্যক অসিধারী ব্রজবাসীকে পরাভব করিয়াছিলেন। উগ্রক্ষত্রিয়দিগের বীরত্বের পরিচয় লালবিহারী বাবু তাঁহার "গোবিন্দ সামন্তে" কথঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছেন।" এখন বলুন আমাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক কি না? আরও কত লোক এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আজ ইনি বীরত্ব প্রমাণের জন্য গোবিন্দসামন্ত উদ্ধৃত করিলেন, কাল তিনি সামাজিক অবস্থা দেখাইবার জন্য গোবিন্দ সামন্তের দোহাই দিলেন, এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ "গোবিন্দসামন্ত" দ্বিতীয় মনুসংহিতা বা লালবিহারী-সংহিতা হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাই বলি, পাঠকগণ, গোবিন্দ সামন্ত পাঠের সময় একটু সাবধান হইবেন, আর হে পণ্ডিতম্মন্য লেখকগণ! আপনাদিগকেও অনুনয় করি যে,কোন গুরুতর বিষয় লিখিবার সময়, উপন্যাস হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া সাধারণ পাঠকবর্গকে প্রবঞ্চিত এবং আপনাদিগকে হাস্যাস্পদ করিবেন না।

কেনচিৎ উগ্রক্ষত্রিয়েণ।

সাময়িক প্রসঙ্গ। *

আমাদের পাঠকবর্গ অবগত আছেন, সভাবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সমুদ্রযাত্রা লইয়া দেশ মধ্যে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। ইতি মধ্যে সভাবাজারের রাজ বাটীতে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ছাঁকা সংস্কৃতজ্ঞ ও এ্যাংলোসংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নিভাজ ও ভেজাল ইংরাজি-বাঙ্গালা-এলেমওয়ালা সাহেব ও বাবু, শ্বেত-কৃষ্ণ,হিন্দু-অহিন্দু, সরকারী-বেসরকারী, উকীল-মোক্তার, শিক্ষক-অধ্যাপক, সম্পাদক-লেখক, সিভিলিয়ান-ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বহুসংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তি উক্ত সভামণ্ডপে উপনীত হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনের নাম উল্লিখিত হইল। মহারাজ বাহাদুর স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ, কে, সি, এস, আই, মহারাজা কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, অনারেবল জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই, পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, রায় কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, রায় দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, রায় হেমচন্দ্র কর বাহাদুর, রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বাবু শরৎচন্দ্র দাস, সি, আই, ই, ন্যায়ালঙ্কার নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মিঃ, মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, এটর্ণি, কবিরাজ কালী প্রসন্ন সেনগুপ্ত কবিরত্ন, কবিরাজ গোপালকৃষ্ণ দেব কবিচিন্তামণি, পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, বি, এ, বাবু শিবচন্দ্র গুঁই, এম, এ, বি, এল, বাবু মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী, অনরেবল মিঃ, এচ, এচ, রিজ্‌লী, এবং রেভারেণ্ড হোয়াইটহেড প্রভৃতি। বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্র, বচন, প্রমাণ, যুক্তি, তর্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সমুদয় বিষয়েরই আলোচনা হইতে বাকি থাকে নাই এবং সভ্য ও বক্তাগণ সাধ্যানুসারে বিলাত যাওয়ায় অনুকূলে মত প্রদান করিতে ত্রুটী করেন নাই। পরিশেষে সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, "হিন্দুয়ানি" রক্ষা করিয়া

*কারণ বশতঃ প্রতিনিধি প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হওয়ায়, অসাময়িক হইলেও, আমরা আষাঢ়ের সংখ্যাতেই কয়েকটী প্রধান প্রধান প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

উ, প্র, স।

সমুদ্রযাত্রা চলিতে পারে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেশাচার বিরুদ্ধ নহে। বর্ত্তমান সমাজের মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিবর্গ যে বিষয়ের মীমাংসা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধির কোন মত প্রকাশ করিতে যাওয়া পাগ্‌লামি মাত্র। কিন্তু পাগলের জল্পনা হইতেও সুধীগণ সার গ্রহণ করিয়া থাকেন, এই ভরসাতেই এ গুরুতর বিষয়ে কিছু বলা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। মনুষ্যমাত্রেরই দুইটী প্রয়োজন আছে। ১ম জীবন ধারণ, ২য় জীবনের উন্নতি। এই দ্বিবিধ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই বিদ্যার আবশ্যক। প্রয়োজনভেদে আবার বিদ্যাও দ্বিবিধ—অর্থকরী ও তত্ত্ববিদ্যা। যে বিদ্যা বলে আমরা জীবন ধারণোপযোগী বিষয় সকল আয়ত্বাধীনে আনয়ন করিতে পারি, তাহার নাম অর্থকরী বিদ্যা। শিল্প, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিদ্যাই অর্থকরী নামে অভিহিত। আর যে বিদ্যা অভ্যাস করিলে মানব জীবনের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, আত্মার পুষ্টি হয়, মানুষ দেবত্ব লাভ করিয়া পরমাত্মারূপী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাঁহারই নাম তত্ত্ববিদ্যা। ইহারই নামান্তর অধ্যাত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। ভারতবর্ষ এই উভয় বিদ্যার নিদানভূমি হইলেও এবং পুরাকালে এই অধঃপতিত ভারতে উক্ত দ্বিবিধ বিদ্যার চরমোৎকর্ষ সাধন হইলেও ইংরেজরাজত্বে দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমরা ধর্ম্মে না হইলেও কর্ম্মে ইংরেজের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের প্রাচীন কালে অর্থকরী বিদ্যারও যতই কেন উন্নতি হউক না, একমাত্র বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ার মাহাত্ম্যে ইংরেজ ও মার্কিণ প্রভৃতি জাতিরা আপনাদের জীবনধারণোপযোগী অবস্থা এত উন্নত করিয়াছে যে, তদ্দর্শনে আমরা তাহাদিগকে আর গুরুর আসন না দিয়া থাকিতে পারি না। বৈদেশিক শিল্পযন্ত্রের কল্যাণে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় ভারতবাসীর জীবনোপায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। বাণিজ্যেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি। বিদেশীয়গণের অবাধ বাণিজ্যের একটানা স্রোত যেরূপ ভাবে বহিতেছে, ইহার যদি কোনরূপ প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে অচিরেই আমাদের দেশের "শ্রীবৃদ্ধির" পূর্ব্বে "বি" -নামক উপসর্গের সংযোগ হইয়া যাইবে। বাণিজ্য ব্যপদেশে যদি ভারতের শস্যাদি বিদেশে চলিয়া না যাইত, তখন অন্য কথা ছিল, কিন্তু যখন তাহা যাইবেই, তখন তাহা রক্ষার উপায় দেখিতে হইবে। তাহা দেখিতে গেলে দুইটী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রথম উপায়—বাণিজ্যের বিনিময়ে বাণিজ্য। দ্বিতীয় উপায়—যে সকল বস্তুর অভাবে আমরা আমাদের জীবনোপায় সারশস্য বিদেশীয়গণকে দিতে বাধ্য হই, দেশে সেই সমুদয় অভাব নিবারণ। এই দুইটী উপায় অবলম্বন করিতে গেলেই বর্ত্তমান অবস্থানুসারে কেবলমাত্র মানবীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। শিল্পযন্ত্র অর্থাৎ কলকারখানার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। আবার বিদেশ হইতে সেই সকল কলকারখানা কিনিয়া আনিলে চলিবে না, শিল্পযন্ত্র-নির্ম্মাণ শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এ সকলের মূল বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান বলেই বিলাত ও মার্কিন আজ জগতে ধনী, মানী, জ্ঞানী, এমন কি, সাধারণের চক্ষে দেবতা। স্বার্থের ব্যাঘাতের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, বিদেশীয়গণ বিজ্ঞান ও শিল্পযন্ত্র-নির্ম্মাণ-শিক্ষার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা এদেশে করেন নাই। সুতরাং এই দ্বিবিধ শিক্ষার জন্য

এবং বাণিজ্য উদ্দেশে আমাদের সাত সমুদ্রের নদী পার বিলাত বা আমেরিকা গমন প্রকরূপ কতকটা আবশ্যকের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে; নচেৎ সিবিলিয়ান বা ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাওয়া, তত গুরুতর বা সার্ব্বজনিক প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয় না। ভুল কথা তত্ত্ববিদ্যারজন্য দরকার না হইলেও অর্থকরী বিদ্যার নিমিত্ত সমুদ্র পারে যাওয়া আবশ্যক হইয়াছে। সমুদ্র-যাত্রার প্রধান এবং গুরুতর প্রতিবন্ধক—জাহাজে ও ম্লেচ্ছ দেশে বিজাতীয় সংস্রবে আহার ব্যবহারে "জাতিযাওয়া।" কিন্তু যতই দুরবস্থা হউক না কেন, আর যতই কেন লাভের আশা থাকুকনা, জাতি খোয়াইয়া—হিন্দুয়ানী নষ্ট করিয়া সমুদ্র পারে যাইতে হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুর দেশাচার এবং হিন্দুগণ কখনই অনুমোদন করিবে না—করা উচিত নহে; আমরাও করি না। জাতিত্বই হিন্দুর প্রাণ—হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দু কি তাহা পার্থির সুখাশায় বিসর্জ্জন দিতে পারে? কদাপি নহে। অগ্রে জাতি রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া তারপর বিলাত যাওয়ার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এখন কথা হইতেছে, এই সমুদ্র-যাত্রার-আন্দোলনকারীগণ যেরূপে সভা সমিতি করিয়া, শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, সংবাদপত্রে আন্দোলন করিয়া, বিলাতযাত্রা সমাজে প্রচলিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, এ রূপে কি তাঁহাদের সে উদ্যম পুর্ণ হইবে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ, শাস্ত্রব্যবসায়ীর মত এবং আধুনিক শিক্ষিত ও গণ্য মান্য ব্যক্তির "ভোট" সংগ্রহ কিছু কঠিন ব্যাপার নহে, কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই, তাহা রাশি-রাশি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের এই দেশাচারপ্রবল দেশে তাহা দ্বারা কি কিছু ফল লাভের সম্ভাবনা আছে? বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত করিতে কম চেষ্টা করেন্ নাই; কিন্তু সেই বিধবা বিবাহের দশা কি দাঁড়াইয়াছে? সমগ্র সমাজের মতানুসারে যদি ঐ বিধি প্রচলিত করা হইত, তবে আর বিধবা-বিবাহে এ কেলেঙ্কারী ঘটিত না। সমুদ্র-যাত্রার ব্যবস্থাও যদি এইরূপ সার্ব্বজনিক মতের উপর নির্ভর না করে, তাহা হইলে উহাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের দশা প্রাপ্ত হইবে। আমাদের মতে কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর যেরূপে সমুদ্র যাত্রা চলিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন ওরূপ উপায়ে কোন কার্য্য হইবে না। বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল প্রধান প্রধান জাতি আছে, সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ জাতির নেতাগণকে অর্থাৎ যাঁহাদের মতে তাঁহাদের সমাজ পরিচালিত হয় তাহাদিগকে লইয়া সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, একদিন কার্য্যোদ্ধারের আশা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে প্রধানত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, উগ্রক্ষত্রিয়, তিলি, তামুলী, গন্ধ ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি কয়েকটী জাতি লইয়াই হিন্দুসমাজ। প্রথমতঃ সমুদ্র যাত্রার অনুকূল মন্বাদি স্মৃতি-শাস্ত্রের মত সংগ্রহ করিয়া প্রধান প্রধান নিঃস্বার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা ও সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপর উল্লিখিত প্রত্যেক জাতির মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিবর্গের মত ও সহানুভূতি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, তবে যদি সমাজে উক্ত বিধির প্রচলন হয়। নচেৎ স্বার্থ পরায়ণ দু দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থায় এবং "শিক্ষিত" ও "গণ্য মান্যের" "ভোটে" বা বিরাট সভায় লম্বা চৌড়া বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ দ্বারা এ সব গুরুতর কার্য্য সাধিত হইবার নহে।

স্বর্গে পৃথিবীস্থ পাপীদের কথা উঠে কি না জানি না। পাপীদের সুখ দুঃখের কথা দেব

সভার আলোচ্য কি না, তাহাও পাপীদের জানিবার উপায় নাই। পুণ্যাশ্রম স্বর্গের সভা-সমিতিতে, বাদ-বিতণ্ডায়, আন্দোলন-আলোচনায়, শোভা-সৌন্দর্য্যে, উত্থান-পতনে পার্থিব পাপীবৃন্দের কোন সংস্রব ও স্বার্থ নাই বলিয়াই অনুমিত হয়। স্বর্গের কথায় কেবলমাত্র পুণ্যবানের অধিকার। কিন্তু তা বলিলে কি হয়? পাপীবর্গের কোন অধিকার না থাকিলেও তাহারা স্বর্গের খবরাখবর জানিতে সদাই উৎসুক। তাই সমগ্র মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্রে স্বর্গের চিত্র পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত, তাই স্বর্গীয় দেব সভার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে শাস্ত্রগ্রন্থ পরিপূর্ণ। আবার তাই শাস্ত্রের পাঠকও অগণিত। যুগ মাহাত্ম্যে এবং বিধির বিধানে মোক্ষভূমি, দেবস্থান, বীরপ্রসবিনী ভারতমাতা আজ পর পদানত; সুতরাং পদানত মাতার সন্তানগণও মাতৃদশাপন্ন। জগতের চক্ষে ভারতবাসী এক্ষণে পাপী বলিয়াই গণ্য। আধুনিক সভ্য ইংরেজ আজ ভারতের একছত্র অধীশ্বর; সুতরাং তাহারা দেবতা পদবাচ্য। ইংরেজের আবাসভূমি শ্বেতদ্বীপ (ইংলণ্ড) স্বর্গ স্থানীয় এবং লণ্ডন নগরী অমরাবতীর অনুকল্প। বলা বাহুল্য, মহাসভা পার্লামেণ্ট দেবসভা বলিয়া খ্যাত—অন্তত আমাদের তাহাই ধারণা করা কর্ত্তব্য। এ হেন দেবসভা পার্লামেণ্টে আজ কাল তুমুল আন্দোলন উপস্থিত। পার্লামেণ্টে ভারতবাসীর সুখ দুঃখের কোন কথাই বড় একটা আলোচনা হয় না; ইহার উত্থান পতনে—মন্ত্রী পরিবর্ত্তন ও পুনর্নিয়োগে আমাদের লাভালাভ কিছুই নাই, তথাপি আমরা এই পার্লামেণ্টের সংবাদ জানিতে সদাই সমুৎসুক। বিশেষতঃ অন্য বারাপেক্ষা এবারে জানিবার সম্বন্ধে একটু নূতনত্ব—চমৎকারিত্ব আছে বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি। তাই সংবাদপত্র সমূহের কলেবর পার্লামেণ্ট-কাহিনীতে পরিপূর্ণ; সেই কাহিনী পাঠ করিবার জন্য পাঠকবর্গের এত আগ্রহ। আমরাও আমাদের পাঠক গণকে সে দেবকাহিনীর সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিলাম। প্রায় সকলেই জানেন, ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড স্কটলণ্ড ও ওয়েলস এই প্রদেশ চতুষ্টয়ের সাধারণ নাম ব্রিটন ও ইহার অধিবাসিবর্গ ব্রিটিস বলিয়া খ্যাত। আমাদের ভারতের রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া এই ব্রিটনের কুইন বা রাণী। কুইন ভিক্টোরিয়া ধনে মানে ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীস্থ সমগ্র রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিলেও তাঁহার নিজের মতে রাজ কার্য্য সম্পন্ন হয় না অর্থাৎ রাজ্য পরিচালনে তাঁহার কোন স্বাধীনতা নাই। যে সভার মন্ত্রণা বা আদেশ ক্রমে, ইংরেজ রাজত্বের শাসনদণ্ড পরিচালিত হয়, সেই মহাসভার নামই "পার্লামেণ্ট।" শ্বেতদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অথবা ভিন্ন ভিন্ন কাউণ্টী বা পল্লীর অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দই এই মহাসভার সভ্য। এই মহাসভা দুই অংশে বিভক্ত। লর্ডসভা (House of Lords) ও কমন্স সভা (House of Commons)। বড় বড় উচ্চ বংশীয় রাজ রাজড়ার ছেলেরা যে সভার সভ্য, তাহারই নাম লর্ডসভা ও সাধারণ প্রজাবর্গের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত সভার নামই কমন্সসভা। এই সভার সভ্য সংখ্যা অপর সভা অপেক্ষা অনেক অধিক এবং কার্য্যতঃ কমন্স সভাই লর্ডসভা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী। লর্ডসভার সভ্যেরা একরূপ আসর-শোভা-বর্দ্ধনকারী সাক্ষীগোপাল মাত্র। মৃত্যু ও স্বেচ্ছাত্যাগ এই দুইটী হেতু ব্যতীত উক্ত সভার সভ্য প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হয় না। উক্ত দুই অংশে মিলিত মহাসভা যে সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, তাহার নাম মন্ত্রীসভা।

সকলেই অবগত আছেন, বিলাতে প্রধানতঃ দুইটী সম্প্রদায় আছে। তাঁহাদের এক সম্প্রদায়ের নাম লিবারেল (Liberal) বা পরিবর্ত্তনশীল দল; অপর সম্প্রদায়ের নাম কন্সারভেটিব (Conservative) বা স্থিতিশীল দল। এই দুইটী সম্প্রদায়ের অপর নাম টোরি ও হুইগ্। বলা বাহুল্য পার্লামেণ্ট মহাসভায় এই উভয় দলের সভ্যই বর্ত্তমান আছেন। মধ্যে মধ্যে এই মহাসভা ভঙ্গ হইয়া আবার পুনর্গঠিত হয়। পার্লামেণ্টের পুনর্গঠন সময়ে উক্ত উভয় দলের মধ্যে যে দলের সভ্য সংখ্যা অধিক নির্ব্বাচিত হয় অর্থাৎ যখন যে দলের আধিপত্য হয়, সেই দলের হস্তেই মন্ত্রীত্ব-ভার ন্যস্ত হইয়া থাকে। আজ প্রায় ৭ বৎসর পরে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠিত হইল। ইতি পূর্ব্বে কন্সারভেটিভ দলের হস্তে মন্ত্রীত্ব ছিল। এই দলের নেতা লর্ড সেলিস্‌বেরী ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। এবার কার নির্ব্বাচনে লিবারেল দলের জয় হইয়াছে; সুতরাং রাজশক্তি বা মন্ত্রীত্ব-ভার এবার লিবারেল দলের হাতে পড়িয়াছে। নিম্নলিখিত ভাগ্যধরদের লইয়া মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। ১। লিবারেল দলের নেতা স্বনামখ্যাত বৃদ্ধবর মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন—প্রধান সচিব, কোষাধ্যক্ষ এবং লর্ড প্রিবিশীল, ২। লর্ড হার্সেল—লর্ড চান্সেলর, ৩। লর্ড কিম্বার্লি—ভারত সেক্রেটারি এবং কৌন্সিলের সভাপতি, ৪। মিঃ জি, ডবলু, ই, রাসেল—অণ্ডার সেক্রেটারি (কার্য্যত এই দুই মহাভাগই ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা), ৫। সার উইলিয়ম্ হারকোর্ট—চান্সেলর অব দি একসচেকার, ৬। লর্ড রোজবেরি—পররাষ্ট্র সচিব, ৭। মেঃ ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান—সমর সচিব, ৮। লর্ড রিপণ—ঔপনিবেশিক সচিব, ৯। মেঃ এসকুইথ—স্বরাষ্ট্র সচিব, ১০। আরল স্পেন্সার—নৌবিভাগের অধ্যক্ষ, ১১। মেঃ এ, মর্লে—পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, ১২। মেঃ জন মর্লে—আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারী, ১৩। মেঃ মণ্ডেলা—বাণিজ্য বিভাগের সভাপতি ১৪। মেঃ ফাউলার—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের সভাপতি, ১৫। মেঃ আক্‌লণ্ড—শিক্ষা কৌন্সিলের সহকারী সভাপতি ১৬। সার জর্জ ট্রেবিলিয়ান—স্কটলণ্ডের সেক্রেটারী, ১৭। লর্ড হফ্‌টন—আয়র্লণ্ডের লর্ড লেফটেনাণ্ট, ১৮। মেঃ বক্সটন—উপনিবেশ সমূহের অণ্ডার সেক্রেটারী, ১৯। মেঃ হার্বার্ট গ্লাড্‌ষ্টোন স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী, ২০। সার ইউ কে, শটলওয়ার্থ—নৌবিভাগের সেক্রেটারী, ২১। মেঃ বের্ট—বাণিজ্য বোর্ডের রাজনৈতিক সেক্রেটারী, ২২। মেঃ ফষ্টার—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের সেক্রেটরী, ২৩। মেঃ ম্যাকার্থর—রাজকোষের তৃতীয় লর্ড, ২৪। লর্ড সাণ্ডহষ্ট—সমর বিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারী, ২৫। মেঃ হিবার্ট—ট্রেজারির ফিনানসিয়াল সেক্রেটারী, ২৬। মার্জরিবেঙ্কস্—সুপারিস বিভাগের সেক্রেটারি, ১৭ সার, ই, গ্রে—পররাষ্ট্র বিভাগের অন্তর সেক্রেটারী। এই ত গেল দেবসভার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। এইরূপ মন্ত্রী পরিবর্ত্তনে শ্বেতকায়দিগের যথেষ্ট লাভালাভ থাকিতে পারে এবং আছেও, কিন্তু আমাদের ইহাতে কোন ইষ্টানিষ্ট আছে বলিয়া বোধ হয় না। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত এইরূপ মন্ত্রী পরিবর্ত্তনে ভারত বাসীদিগের ভাগ্যের কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই; সুতরাং ইহাতে আমাদের আনন্দ নিরানন্দের কথা কিছু নাই। আমরা উপন্যাসের অঙ্গুরীর মত। যখন যিনি মালিক হইবেন, তিনি অঙ্গুলীতে ধারণ করুন বা না করুন, অঙ্গুরী তাহারই। আমাদের সুখ দুঃখের কথা মন্ত্রী-সভার আলোচ্য হউক বা না হউক, যখন যে দলের হাতে রাজশক্তি যাইবে, আমরা সেই দলেরই জয় ঘোষণা

করিব এবং অবনত মস্তকে তাঁহাদেরই প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিব। আমরা সচেতন হইয়াও অঙ্গুরীয়ের ন্যায় জড়বৎ। মন্ত্রী পরিবর্ত্তনে আনন্দ নিরানন্দের কথা না থাকিলেও এবার পার্লামেণ্টের পুনর্গঠনে কিছু নূতনত্ব আছে। সে জন্য কোন সুফল লাভের বা স্বার্থের আশাজনক আনন্দ প্রকাশের কারণ না থাকিলেও ভারতবাসীর মনে স্বতই একটী আনন্দের উদয় হইতেছে! এ কাল পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টে শ্বেতকায় ব্যতীত কোন কালা আদ্‌মি সভ্যরূপে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। বিলাত, সাম্য-স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হইলেও, এতদিন এ বিষয়ে কার্য্যতঃ তাহার পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই। ইতি পূর্ব্বে কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালী বাবু লালমোহন ঘোষ ও বোম্বাই পার্শী মিঃ দাদা ভাই নৌরোজি, সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবারে দাদাভাই নৌরোজির পক্ষে সেই সুযোগ ঘটিয়াছে—তিনি মহাসভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যেখানে বড় বড় শ্বেতাঙ্গগণ সভ্য হইতে গিয়া বিফলমনোরথ হন, সেখানে বিজিত কৃষ্ণকায়ের কৃতকার্য্য হওয়া কম গৌরবের কথা নহে। জাতিভেদ ভুলিয়া ফিনিস্‌বরির ইংরেজ অধিবাসিগণ আপনাদের প্রতিনিধি স্বরূপে আজ দেব দুর্ল্লভ পদে বিদেশীয়কে বরণ করিয়াছে, ইহাতে ইংরেজের মহত্ব ও নৌরোজির বাহাদুরী চিন্তা করিয়াই আমরা আনন্দিত। নচেৎ দাদাভাই নৌরোজি মহাসভার সভ্য হইয়া স্বার্থপরায়ণ ইংরেজ জাতির নিকট হইতে ভারতের কোন উপকার করিতে সক্ষম হইবেন, সে আশা আমাদের নাই, সুতরাং সে জন্যও আমরা আনন্দিত হই নাই। যাহা হউক নানা কারণে আমরা এই ঘটনায় সুখী হইয়াছি।

জগতের ইতিহাস ও প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জগতের যাহা কিছু ধর্ম্ম, ন্যায়, নীতি, বিধি, ব্যবস্থা, আইন, কানুন সে সমুদয়ই যেন দুর্ব্বলের জন্য। দুর্ব্বলই ঐ সকল প্রতিপালন করিতে বাধ্য; প্রবলের যেন এ সব মানিবার কোনই প্রয়োজন নাই। 'জোর যার মুলুক তার' এই একমাত্র নীতিই যেন প্রবলের পালনীয়; অপর কোন নীতি তাঁহারা মানিতে বাধ্য কি না, সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। দুর্ব্বল প্রজা পরস্ব হরণ করিলে শাস্তি পাইবে, অপহৃত বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু প্রবল রাজা যদি পরস্ব গ্রহণ করেন,তবে কি তিনি তাহা ফিরিয়া দিতে বাধ্য হন, না তজ্জন্য তাঁহাকে কোন শাস্তি ভোগ করিতে হয়? পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"। ইহার সরল অর্থ কি এই নয় যে, "জোর যার মুলুক তার"। ভাগ্য বলেই হউক আর পুরুষকারের সহায়তাতেই হউক, সদুপায়ে লব্ধই হউক আর অসদুপায়েই হউক, ভারত সাম্রাজ্য এখন ইংরাজরাজের সম্পত্তি; ইংরেজ এখন ভারতের একছত্র রাজা। বলিতে গেলে, ইহার সমুদয় অন্তর্ব্বিপ্লব ঘুচিয়া গিয়াছে, শান্তি সর্ব্বত্র বিরাজিত। এহেন শান্তি-সুখ-পরিপূর্ণ, নিষ্কণ্টক, ধনৈশ্বর্য্যশালী সোণার ভারত ইংরেজরাজের অধীন। ভারতের ন্যায় রত্নপ্রসূ ভূমি পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; সর্ব্ব বিষয়েই ভারতবর্ষ অদ্বিতীয়। এহেন ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়াই ইংরজেরাজের এত গৌরব,এত মান। এ মান এ গৌরবের ভাগী হইতে পৃথিবীস্থ নৃপতিবৃন্দের সকলেরই প্রবল ইচ্ছা। সে

ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে যদি ন্যায়-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হয়, ক্ষতি নাই; স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অসংখ্য নর-শোণিতে ধরা প্লাবিত করিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত। কিন্তু একমাত্র সুযোগ ও শক্তির অভাব বশতই কাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবার উপায় নাই। যাহার শক্তি আছে তাহার সুযোগ নাই, যাহার সুযোগ আছে তাহার শক্তি নাই। "কালে কিছুই থাকিবে না" একথা ছাড়িয়া দিলে, সুচতুর প্রবলশক্তি ব্রিটিস-সিংহের কবল হইতে প্রকৃতি দেবীর অনুগ্রহে সুরক্ষিত ভারত সাম্রাজ্য অপহৃত হইবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত বলিয়াই বোধ হয়। ইংরেজ অপেক্ষা প্রবল শক্তিসম্পন্ন রাজা থাকিলেও সুযোগ অভাবেই হউক আর যে কোন কারণেই হউক, একমাত্র রুষরাজ ব্যতীত আর কেহ ভারত লাভে উৎসুক ও সচেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। অতীত কালের কার্য্যপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে, ভারত গ্রহণে রুষের ইচ্ছা ও চেষ্টা ভয়ঙ্কর বলবতী বলিইয়াই বিশ্বাস হয়। ভারতের অন্যান্য দিকে রুষের কোন সংশ্রব ও সুযোগ না থাকায়,একমাত্র উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা দিয়াই রুষের ভারত আক্রমণের সুযোগ ও চেষ্টা অধিক। কার্য্যতঃ রুষ ঐ দিক দিয়াই সুযোগ অনুসন্ধান ও চেষ্টা করিতেছেন। রুষের চেষ্টা অক্ষুণ্ণ হইলেও, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা দিয়া যে রুষের ভারত আক্রমণের বেশ সুযোগ আছে, একথা বলা যায় না; যেহেতু ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমাতেই ঠিক আফগানিস্থান। আফগানিস্থান স্বাধীন রাজ্য, আমীর আবদুর রহমান উহার স্বাধীন রাজা। আফগানিস্থানের পশ্চিম সীমাতেই রুষের অধিকার। তথায় চীন সম্রাটেরও কিছু অধিকার আছে। রুষকে ভারতে আসিতে হইলে, চীনের খণ্ড রাজ্য ও সমগ্র আফগানিস্থান জয় করিতে হইবে; তবে যদি তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তবে "যত্নেন কিমসাধ্যম্" (যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই) কথাটি বড়ই সত্য। রুষেরও যত্নের ত্রুটী নাই। তাহাতেই আশঙ্কা হয়,কালে বা রুষের ইচ্ছা পূর্ণ হয়! প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে রুষের অধিকার আফগানিস্থান হইতে সহস্র মাইল দূরে ছিল, তাহাই আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাঁচদে" নামক স্থানে সরিয়া আসিয়াছিল, আবার গত বর্ষে কাবুলের অতি সন্নিহিত প্রদেশ "পামীরে" আসিয়া সেই সীমানা ঠেকিয়াছে। এ কি রুষের কম চেষ্টার ফল! সুচতুর ইংরেজ রাজ বহুকাল হইতেই রুষের এই দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়াছেন। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতের সহিত রুষের এখনও কোনই সংঘর্ষ ঘটে নাই, তথাপি "পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত" এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই এবং মনে মনে রুষাতঙ্ক জাগিয়াছে বলিয়াই,ইংরেজরাজ প্রান্ত সীমা সংরক্ষণে বিশেষরূপ মনোযোগী হইয়াছেন। বহুদিন হইতেই অন্তরে অন্তরে এ চেষ্টা জাগরুক হইলেও আজ ১০।১২ বৎসর হইতেই ইংরেজরাজ প্রান্ত সীমা সুদৃঢ় করণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইংরেজরাজ প্রান্ত সীমা সংরক্ষণে দুইটী উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। প্রান্তসীমায় দুর্গ সংস্থাপন করিয়া সেনা সন্নিবেশ একটী ও অপরটী আমীরকে সাহায্য করিয়া তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করা। এ দিকে বৃটিশসিংহ, ওদিকে রুষ-ঋক্ষ, মধ্যে আমীরের ক্ষুদ্র রাজ্য। রুষ যদি এই রাজ্য দখল করিতে পারেন, তবে তাঁহার ভারত আক্রমণের সুবিধা হইবে, আর ইংরেজ যদি সহায়তা দ্বারা আমীরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে ভারতের গাত্রে

একটী কণ্টকও বিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। রুষের সকল কাবুল গ্রাস,ইংরেজের চেষ্টা কাবুল রক্ষা—বিষম সমস্যা। আমীরের রাজ্য ও শক্তি যেরূপ ক্ষুদ্র, তাহাতে এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বয়ের আক্রমণ হইতে আমীরের রক্ষা পাইবার উপায় নাই। কিন্তু ঘটনা ক্ষেত্রে আমীরের সুবিধা হইয়াছে। আমীর রুষকে বলিতেছে, তুমি যদি আমার রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হও তবে ইংরেজকে নিজ রাজ্যে আনিয়া তোমাকে শাস্তি দিব; পক্ষান্তরে আবার ইংরেজকেও ঐ ভয়ে ভীত রাখিয়াছে। আমীরের ঘটনায় আমাদের একটী কথা মনে পড়িল। শান্তিপুরের এক তাঁতির তাঁত ও কয়েক বিঘা জমি ছিল। সে যখন তাঁত বুনিত তখন তাঁতের নিকট পশার বৃদ্ধির জন্য বলিত "দেখ তাঁত আমি কেবল তোমার ভরসা করি না, আমার জমি আছে জান ত?" আবার জমির নিকট গিয়াও ঐরূপে তাঁতের মাহাত্ম্য বাড়াইত। আমীরের ব্যবহার কার্য্যত তাঁতির অনুরূপ হইলেও বাহ্যতঃ আমীর ইংরেজের দিকে। ইংরেজ এজন্য আমীরকে বৎসর বৎসর ১২ লক্ষ মুদ্রা ও কত কি মহামূল্য দ্রব্যাদি ঘুস বা উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। এত দিয়াও, এত করিয়া মন যোগাইয়াও, আমীরের মন কিন্তু ইংরেজ প্রাপ্ত হন না; এমন কি আমীরের রাজ্য মধ্যে ইংরেজের একরূপ প্রবেশ নিষেধ। শুদ্ধ এটী আমীরের দোষ নহে; আমীরের প্রজাবর্গ ইংরেজের উপর হাড়ে চটা। ইংরেজ "সূচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হন" ইহা কাবুলীগণ বেশ বুঝিয়াছে বলিয়াই তাহারা ইংরেজকে ত্রিসীমানা মাড়াইতে দেয় না। যাহাই হউক এ পর্য্যন্ত আমীর ইংরেজের অথবা ইংরেজ আমীরের বন্ধু বলিয়াই পরিচিত। প্রান্ত সীমার ব্যাপার এইরূপেই চলিতেছিল, কিন্তু আবার এক বৎসর হইতে তথায় ভয়ানক গোলোযোগ উত্থিত হইয়াছে—রাজনৈতিকগগণে মেঘের উদয় হইয়াছে; ইংরেজের মনে পুনরায় রুষাতঙ্ক নূতন ভাবে জাগিয়াছে। আমরা ইংরেজরাজের প্রজা, আমাদের মনেও না জাগিয়াছে এরূপ নহে—বিপদ যে আমাদেরই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রুষ এটা দে,ওটা দে করিতে করিতে আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বল পূর্ব্বক আমীরের "পাঁচদে" দখল করিয়া লইয়াছিলেন। সে সময় ইংরেজও সীমা আমীন প্রভৃতি পাঠাইয়া অগত্যা রুষকে পাঁচদে দিয়া একরূপ যবনুব গোছের সোলে করিয়াছিলেন। আমীর ও ইংরেজ সেই সময় রুষকে একরূপ মাথার দিব্বি দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন "বাপু ন্যায় হউক আর অন্যায়ই হউক "পাঁচদে" তোমাকেই দেওয়া গেল, কিন্তু মাথার দিব্বি আর এদিকে আসিও না"। রুষও তাহাতে সম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, "রাধামাধব! সে কথা কি আর বলিতে হয়, আমি কাবুলের দিকে আর সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমি অগ্রসর হইবনা।" কিন্তু রুষের কথা হইল মনে এক, মুখে আর। সে কি চুপ্ করিয়া থাকিতে পারে? গত বর্ষে রুষ একদমে আফগানের উত্তর সীমায় আসিয়া জাঁতিয়া বসিয়াছেন। এই স্থানের নামই পামীর। পামীরে আসিয়াই রুষ ইংরেজসেনানী ইয়ংহাজব্যাণ্ডকে তথা হইতে বিতাড়িত করতঃ ইংরেজরাজকে অবমানিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। এখন ইংরেজ ও রুষের অধিকারদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান কেবলমাত্র আফগানিস্থান টুকু বলিলেও বলা যাইতে পারে। আমীরের রাজ্য বর্ত্তমানে নিরাপদ নহে; আফগানিস্থানে ভয়ানক অন্তর্ব্বিপ্লব চলিতেছে; প্রায় অধিকাংশ প্রজাই আমীরের বিদ্রোহাচরণে উদ্যত হইয়াছে। তাহাতে আবার রুষ ভিতরে ভিতরে এই সকল প্রজার সহিত যোগ দিয়া আরও আমীরের বিপদ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। রুষের সহিত না কি আমীর-সৈন্যের একরূপ যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। আমীরের প্রবল শত্রু সর্দ্দার মহম্মদ ইসাক্ খাঁ কাবুলের সিংহাসন প্রাপ্তির আশয়ে ফিরিতেছেন। রুষ যে ইহার পৃষ্ঠপোষক নহে, তাহাই বা কে বলিবে? রুষপক্ষের সহিত ইহার যেরূপ মিশামিশি, তাহাতে এ অনুমান মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। আমীর আবদুর রহমান এখন বিদ্রোহ দমনে প্রাণপণ চেষ্টায় নিযুক্ত। ইংরেজ আমীরের মিত্র, কিন্তু বজৌর ব্যাপারে এ সময় ইংরেজ আমীরের সহিত মিত্রের অনুরূপ পরিচয় দেন নাই। বজৌর জাতি ইংরেজের আশ্রিত। কোন কারণে তাহাদের সহিত আমীরের মনোবাদ ঘটে। আমীর-সেনাপতি গোলাম হায়দরের সহিত তাহাদের একটী সামান্যরূপ যুদ্ধ হয়, তাহাতে গোলাম হায়দর পরাজিত হন। আমীর তাহার প্রতিকার করিবার উদ্‌যোগ করিলে, ইংরেজ আমীরকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন,বজৌরে যেন কোনরূপ গোলযোগ করা না হয়। আমীর হাজারা প্রভৃতি বিদ্রোহ দমন করিতেই ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং ইংরেজের কথা শুনিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইচ্ছা সত্বেও আমীর এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিলেন না। যাহা হউক সম্প্রতি মিত্র আমীরের সাহায্যার্থেই হউক বা অন্যবিধ রাজনৈতিক পরামর্শ করিবার জন্যই হউক, ইংরেজরাজ আমীরের রাজ্যে প্রধান সেনাপতি সার রবার্টস্ প্রমুখ একটী মিশন পাঠাইতে ইচ্ছুক হইয়া আমীরের অনুমতি চাহিয়া পাঠান। আমীর কিন্তু মুখে সম্মতি-সূচক অভিপ্রায় জানাইয়াও কৌশল ক্রমে এক্ষণে ইংরেজকে আফগান রাজ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আমীর এত বিপদে পড়িয়াও ইংরেজকে দেশে ঢুকিতে দিতে চাহিতেছেন না, আর ইংরেজ আমীরের ক্ষমতাশালী মিত্র হইয়াও মন খুলিয়া আমীরের বিপদে সাহায্য করিতেছেন না—বাস্তবিক এ সব গভীরতর প্রহেলিকা—অতি কুটিল রাজনৈতিক রহস্য; ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা ইহার মর্ম্ম কি বুঝিব! আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক আর আমীরকে উপলক্ষ করিয়াই হউক, রুষ ও ইংরেজ এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের মধ্যে যদি কোনরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়,তবে আমাদের এই নির্জ্জীব দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভারতবাসীর প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিবে। প্রকৃত যুদ্ধ আজিও ঘটে নাই; অথচ এক একটা হুজুকেই ভারতের কোটি কোটি মুদ্রা উড়িয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। এক সীমান্ত রক্ষায়—দুর্গাদি নির্ম্মাণ ও আমীরকে দিতে, রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে; আরও যে কত যাইবে তাহার ইয়ত্তা কি? এই সব চিন্তা করিয়া আমাদের রক্ত জল হইয়া যাইতেছে! এক্ষণে দুইটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথমতঃ রুষ কোন অধিকার বলে, কোন ন্যায় অনুসারে ভারত লইতে চায়? রুষকে যদি এ কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে সে এক কথায় বলিয়া দিবে, "ইংরেজ যে অধিকার ও ন্যায়ের বলে ভারত লাভ করিয়াছেন, আমরাও সেই নীতি ও স্বত্বের দোহাই দিয়াই ভারত লইতে চাহি।" আমরাত বলিয়াছি, পর রাজ্য গ্রহণে কোন ন্যায়-নীতি নাই। ইহার একমাত্র কারণ—স্বার্থ, কার্য্য—জোর; ফল—জোর যার মুলুক তার। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই হইতে পারে যে, রুষ যদি ভারত অধিকার করে, তাতে ভারতবাসীর ক্ষতি কি? ভারত কিছু স্বাধীন নহে, আজ ইংরেজের অধীন আছে, কাল না হয় রুষের

অধীন হইবে। ভারতবাসীর পক্ষে ইংরেজও যা রুষও তাই। তবে আর তাহাদের বৃথা চিন্তা কেন? আমাদের মতে একথা ঠিক নহে—ইহা স্থূলদর্শীর কথা, দূরদর্শীর নহে। আমরা পরাধীন হইলেও, নানা কারণে আমরা ইংরেজ রাজের স্থায়িত্ব কামনা করি। ভারতবাসীর যখন স্বাধীন হইবার আশা ও উপায় নাই,তখন তাহারা আর দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব স্থাপন' করিবে না—সিংহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ভল্লুকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়া কত দীর্ঘকালে ভারতবাসী ইংরেজের কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে। ক্লাইব, হেষ্টিংস, বারওয়েল, বোণ্টস্ ও ইলাইজা ইম্পির নাম স্মৃতি-পথে উদয় হইলে ভারতবাসী আজিও চমকিয়া উঠে! রুষ ভারতের রাজা হইলে যে, প্রথম প্রথম বহুকাল ধরিয়া ক্লাইব, হেষ্টিংস, বারওয়েল, বোণ্টস্ ও ইম্পির ন্যায় কিম্বা ততোধিক অধর্ম্মের পূর্ণাবতার রাজপুরুষদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে, ভারতবাসী তাহা বিশেষরূপ অবগত আছে। এক রাজার অবসানে ও অন্য রাজার আগমন কালে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। আর কি সুখেই বা ভারতবাসী রুষের আশ্রয় কামনা করিবে? ইংরেজ ভারতবাসীকে ন্যায়সঙ্গত অধিকারে বঞ্চিত রাখিয়া স্বদেশীয়ের প্রতি আদর সম্মান প্রদর্শন করিতেছে,রুষ কি তাহা করিবে না? ইংরেজ ভারতবাসীর মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া স্বদেশীয়ের পেট ভরাইতেছে, রুষ কি তাহা ভরাইবে না? ইংরেজও বিদেশী, রুষও বিদেশী, ইংরেজের ভারতবাসীর প্রতি যেরূপ মায়া, রুষেরও সেইরূপই হইবে। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে,আমরা অনেক বিষয়ে ইংরেজের রাজত্বে সুখী হইয়াছি; অনেক অত্যাচার অনাচার ভোগ করিয়া ইংরেজের আশ্রয়ে বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। সুখের জন্যই হউক আর অভ্যাস বশতই হউক, সময়ে সময়ে অত্যাচার অবিচার ভোগ করিলেও, ইংরেজের আশ্রয় ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। ইংরেজের প্রকৃতি জানিয়াছি, এখন যে কিছু অত্যাচার অবিচার ভোগ করিতে হইতেছে, কালে হয় ত তাহাও হইবে, তাহা কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল রুষ যে কি হইবে তাহা কে জানে? রুষ ভারতের রাজা হইলে আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার যে কতদূর করিবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইংরাজের ন্যায় রক্ত শোষণ করিয়া দুর্ব্বল ভারতের যে অস্থিচর্ম্মসার করিবে, ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি। কারণ ইংরেজ হরিনামের ঝুলি হাতে করিয়া ভারতে অন্নছত্র স্থাপন করিতে আইসে নাই, রুষও ধর্ম্মের ছালা পিঠে বাঁধিয়া দান ধ্যান করিতে আসিবে না। উদ্দেশ্য ভারত শোষণ। নইলে রুষের ভারতের প্রতি এত সতৃষ্ণ দৃষ্টি কেন? বরং ভারত শোষণ করিয়া ইংরেজের অনেকটা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ক্ষুধাতুর রুষ আসিয়াই ত ভারতকে গোগ্রাসে গিলিবার চেষ্টা করিবে। এই সমুদয় কারণ পরম্পরা চিন্তা করিয়া, রাজভক্তির জন্যই হউক আর স্বার্থ ও শান্তির জন্যই হউক, আমরা ইংরেজরাজের আশ্রয় ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি। ভগবান যেন সেরূপ মতি আমাদের কখনও না দেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট ব্রিটিসরাজের মঙ্গল প্রার্থনা করি।

চৌকীদারি বিল আইনে পরিণত হইয়াছে। আমরা আগামীবারে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী (৭)।

তত্ত এই প্রাচীন প্রয়োগের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। এবম্ভূত প্রয়োগের বর্ত্তমান কালেও সমধিক প্রচলন দেখা যায়। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই অদ্যাপিও অপাদানার্থে 'সে' অপেক্ষা 'তে'ই অধিকতর ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাতিয়ালার মহারাজার অন্যতম সভাপণ্ডিত মদীয় অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দিগ্বিজয়ী মহাশয় ত'তে' ভিন্ন ভ্রমেও কখন 'সে' ব্যবহার করেন না। তাঁহার মত, 'তে'র অপভ্রংশেই 'সে' হইয়াছে। যথাসাধ্য অপভ্রষ্ট শব্দের ব্যবহার পরিহার করাই কর্ত্তব্য। ঈদৃশ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কথায় আস্থাবান্ হইতে হইলে অবশ্যই 'তে' হইতেই 'সে' হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ, এ যুক্তিও কিছু অপ্রামাণিক নহে। যাহা হউক, 'আজ' হইতে 'জে' তৎপরে 'সে', অথবা 'তঃ' হইতে 'তে' তৎপরে 'সে', উভয়ই তুল্যসত্ত্ব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে, পাঠকবর্গ যদি পারস্যভাষার ঐ আপাদানীয় 'আজ' কোথা হইতে আসিল, একথা জিজ্ঞাসা করেন, তজ্জন্য তাহার উত্তরও এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি। সংস্কতের পঞ্চমীর বিভক্তি 'ঙস্'। 'ঙসে'র 'ঙ' ইৎ, থাকে 'অস্'। ঐ 'অস্'ই পারস্য ভাষায় আলেফ দ্বারা লিখিত হওয়ায় 'আস্' হইয়া কালক্রমে 'আজ' হইয়াছে। সুতরাং, উহারও মূল সংস্কৃত মধ্যে আনিয়া রাখিবেন। পৃথিবীতেত সংস্কৃতই আদিম ভাষা। যাবতীয় ভাষার মূলেই যে সংস্কৃত আছে, তাহা আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি।

পারসীক ভাষা অতি প্রাচীন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন এবং নব্য। প্রাচীন পারসিক ভাষা এক্ষণে জেন্দ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। উহা বৈদিক ও নব্য সংস্কৃত হইতে সমুৎপন্ন। নব্য পারসীক সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে সংগঠিত। বোধ হয়, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নব্য পারসীক ভাষার জন্ম হইয়া থাকিবে। তৎকালে উহা পারসীক নামে আখ্যাত হইত কি না বলিতে পারি না। উক্ত ভাষার তাৎকালিক কোন গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তজ্জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তৎকালে উহা কেবল মৌখিক ভাষাই ছিল। গ্রন্থাদি হওয়া দূরে থাকুক, লিপিকার্য্যের নিমিত্ত পারস্যভাষার বর্ণমালাও তৎকালে প্রচলিত হয় নাই। কারণ পারসীর আলেফ, বে, পে, তে, ছে, আরবীর আলেফ, বে, তে, ছে হইতে সংগৃহীত, এবং আরবীয় আলেফ, বে, তে, ছে, ইরাণী বা হিব্রু ভাষার আলেফ, বেত, ভেত, গিমেল, ড্যালেথ হইতে সমানীত,তাহা একেবারে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। হিব্রুর বর্ণমালা হইতে আরবীর বর্ণমালা সমুৎপন্ন হইলে, তাহাতেই দুই চারিটী অধিক বর্ণ সংযুক্ত করিয়া * পারসীর

* পারসিক ভাষায় پ (পে), چ (চে), ও ژ (জে), এই তিনটি বর্ণ অধিক আছে। আরবিক ভাষায় নাই। পারসী সংস্কৃতজাত বলিয়া তত্তদুচ্চারণ বিশিষ্ট বহুল শব্দের সমাবেশ প্রযুক্ত উহাতে ঐ তিনটি বর্ণের অবতারণা ঘটিয়াছিল। হিব্রু ভাষায় פ (পে) আছে। কিন্তু উহা হইতে আরবীতে না আসার কারণ কিছু বুঝা যায় না। চে বা জে এইরূপ উচ্চারণের বর্ণ হিব্রুতেও নাই। সুতরাং আরবীতেও আইসে নাই। হিব্রুর আলেফ, বেত, ভেথ, গিমেল হইতে গ্রীক ভাষার আলফা, বিটা, গম্মা, ডেল্টা গৃহীত, কি গ্রীক হইতে হিব্রু গৃহীত, তাহার এখনও স্থির নিশ্চয় হয় নাই; তবে অনেকের অনুমান যে হিব্রুই প্রাচীন।

কথিত হইত। তদবধি উক্ত ভাষা ঐ বর্ণমালায় লিখিত হইয়া স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। কিন্তু এই সময় কখন, তাহার নির্ণয় করাই সুকঠিন। অনেকে আরবিক ভাষার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দীর অধিক স্বীকার করেন না। আবার, কেহ কেহ বলেন, উহার বয়ঃক্রমও পারসীর ন্যায় দুই সহস্র বৎসর হইতে পারে। তবে মহম্মদের সময় হইতেই উহার বহুল প্রচার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে সুসৌষ্ঠব পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা একথা স্বীকার করিলেও করিতে পারি, তবে আপত্তি এই যে, আরবী ভাষা সকদি,সকজি, ফারসী, পহেলভী. জাবলী, দরি, আরবী ও তকি প্রভৃতি আটটি ভাষার সংমিশ্রণে সংগঠিত, ইহা সুবিজ্ঞ মৌলভীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই কথার উপর নির্ভর করিলে ঐ সকল ভাষার বয়ঃক্রম আরও অধিক, এমন কি আড়াই হাজার বৎসরও হইতে পারে। ঐ সকল ভাষা অত পুরাতন নহে; আমরা কোন ক্রমেই আরবীকেও অত পুরাতন বলিতে সাহস করি না। পনর কি ষোল শত বৎসর হইলেই যথেষ্ট। ইহার দুই চারি শত বৎসর পূর্ব্বে পারসিক জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল লোকের মুখে মুখেই থাকিত; না হয় ত জেন্দ বর্ণমালায় সুশোভিত হইয়া গ্রন্থাদিতে বিরাজ করিত, ইহাই আমাদের ধারণা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত হইতে পারসিক ভাষার উৎপত্তি। আমাদের এতাদৃশ বাক্যে হয় ত অনেকে বিস্মিত হইয়া বলিবেন, যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তবে পারসীতে সংস্কৃতেতর উচ্চারণ কোথা হইতে আসিল? ﺙ থে, ﺫ জাদ, ﺫ জাল, ﻉ আয়েন, ﻍ গায়েন, ﻕ কাফ, ইত্যাদির উচ্চারণ ত সংস্কৃত ভাষায় নাই। এতৎ-প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যে, যদিও তদ্রূপ উচ্চারণ সংস্কৃত মধ্যে নাই সত্য, কিন্তু আরবী বর্ণমালার উক্তরূপ উচ্চারণ বিশিষ্ট কোন কোন বর্ণ থাকায়, সংস্কৃত শব্দগুলি সেই সেই বর্ণে লিখিত হইয়া কালক্রমে সেই আরবীয় বর্ণেরই উচ্চারণ পাইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটী শব্দ প্রদর্শন করা গেল, তদ্দর্শনে আমাদের বাক্য কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। পারসিক জাদ (Zad) শব্দ সংস্কৃত জাত হইতে গৃহীত*। সংস্কৃত বর্গীয় জকার ও পারসিক জিম উভয়ের উচ্চারণ একরূপ। এক্ষণে উক্ত জাদ শব্দটী ج জিম দ্বারা লিখিত হইলেই সংস্কৃতের ন্যায় উচ্চারণ হইত বটে, কিন্তু, তাহাতে ﺽ (জাদ), ﺫ(জাল),ﻅ (জো) প্রভৃতি বর্ণের কোন স্বার্থকতা থাকে না; এজন্য কতকগুলি বর্গীয় জকারাদি সংস্কৃত শব্দও পারসীতে ﺽ (জাদ) প্রভৃতি দ্বারা লিখিত হইয়া, কালক্রমে তত্তৎ বর্ণেরই উচ্চারণ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাকৃতপ্রকাশাদি গ্রন্থে 'ক্রী' ধাতুর 'খরিদন' আদেশ দেখা যায়। ঐ 'খরিদন' পারসীতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক খরিদনের'উচ্চারণ পারসীর ﮐ (কাফ) ও ﺧ (হের) ন্যায়। কিন্তু এইস্থলেও উক্ত দুই বর্ণ দ্বারা লিখিত না হইয়া পূর্ব্ব-কারণ-বশতই ﺥ (খের) দ্বারা লিখিত হইয়াছে। পারসীতে সংস্কৃতেতর উচ্চারণ হইবার এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই।

আমরা, ইতিপূর্ব্বেই পারসিক বিভক্তিগুলি

* সংস্কৃত 'জ্ঞত' হইতে প্রাকৃত 'জাদ' উক্ত 'জাদ' পারসীতে কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইয়া অবিকল ব্যবহৃত হয়। অতএব, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে পারসিক ভাষার উৎপত্তি, এই 'জাদ' শব্দটী তাহার অন্যতম উদাহরণ।

সংস্কৃত নিরুক্তি আছে বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি। এক্ষণে নিম্নে কতকগুলি শব্দ প্রদর্শন করা যাইতেছে; তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন, উহারা কোন্ কোন্ সংস্কৃত শব্দ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

সংস্কৃত			পারসী
যুবন্	...	...	জুআন
নর	...	...	নর
ঘর্ম্ম	...	...	গরম
অপ্	...	...	অস্প
আপ	...	...	আব
নাম	...	...	নাম
পাদ	...	...	পদ
শুষ্ক	...	...	খুশ্ক
জাত	...	...	জাদ
ঘাত	...	...	বাদ
বাহু	...	...	বাজু
নৌ	...	...	নাও
এক	...	...	এক
দ্বি	...	...	দো
পঞ্চ	...	...	পঞ্জ
ষষ্	...	...	ষষ্
সপ্ত	...	...	হপ্ত
দূর	...	...	দুর
অষ্ট	...	...	হষ্ট
দশন্	...	...	দহ
বিংশৎ	...	...	বিসট্
জার	...	...	য়ার
দব্	...	...	ডব
পক্কান	...	...	পাক্তান
বিদার	...	...	ওদা
শকুন	...	...	শাকুল
শোক	...	...	সোগ
হার	...	...	হার

সংস্কৃত			পারসী
স্থান	...	...	স্তাদন
পচন	...	...	পুকতন
মর্দ্দন	...	...	মরদন
দাস	...	...	দাদন
চরণ	...	...	চরিদন
দমন	...	...	দবিদন
দরণ	...	...	দরিদন
শ্রুবণ	...	...	শুনুদন
গ্রহণ	...	...	গ্রফতন
ভবন	...	...	ভুদন
করণ	...	...	করদন
কুর্দ্দন	...	...	কুদিদন
ঘর্ষণ	...	...	ঘসিদন
প্রচ্ছন	...	...	পুরছিদন
তপন	...	...	তপিদন
রোহণ	...	...	রুহিদন
*	...	...	খরিদন
খনন	...	...	খনিদন
কর্ষণ	...	...	কসিদন
আপন	...	...	য়াপতন
বর্ষণ	...	..	বরশতন
পারণ	..	...	পারিদন
পরার্চ্চন	...	...	পরস্তিদন
ত্রসন	...	...	তরসিদন
গ্রন্থন	...	...	গ্রথিদন
বেতন	...	...	চেত্তিদন

এইবার আমরা পারস্যভাষার কতকগুলি ধাতু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে উহাদের কতদূর ঘনিষ্ঠতা তাহা পার্শ্বস্থ সংস্কৃত ধাতু দর্শন করিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে।

BLEED THROUGH

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ধাতু আছে, যাহার সংস্কৃত বা প্রাকৃতের সহিত ঐক্য হয়, বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকলের নির্দ্দেশে বিরত হইলাম; এক্ষণে প্রত্যয় বা সমাসাদিতেও ইহার সহিত সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কত দূর সৈকট্য আছে, তাহাও প্রদর্শন করা যাইতেছে।

১। সংস্কৃত অস্ত্যর্থক মৎ প্রাকৃতে মন্ত হয়; উহা হইতে পারসীতে মন্দ হইয়াছে। যথা, আকলমন্দ, দৌলতমন্দ, হোশমন্দ, ইত্যাদি।

২। সংস্কৃত ঈয় প্রত্যয় পারসীতে ঈ হইয়া থাকে। যথা, দেশীয়=দেশী, বেলাভীয়=বেলাতী, বনারসীয়=বনারসী, দানাপুরীয়—দানাপুরী।

৩। সংস্কৃত বৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে 'বৎ' স্থানে 'বান্' হয়। পারসীতে ঐ 'বান্' দ্বারা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা—কোচবান্, দরবান্, গাড়ীবান্ ইত্যাদি।

৪। সংস্কৃত সূত্র রজ আদের্বলঃ।

অর্থাৎ, রজস্ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর বল প্রত্যয় হয়। ঐ 'বল' পারসীতে 'বালা' হইয়া থাকে। যথা, কেতববালা, বলাইবালা ইত্যাদি। ইহার প্রয়োগ আজ কাল উর্দ্দুতেই বেশী বেশী দেখা যায়।

৫। সংস্কৃতে কর্ত্তৃবাচ্যে কৃ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ করিয়া 'কার' নিষ্পন্ন হয়। যথা, কুম্ভকার। উক্ত 'কার' ঠিক ঐ অর্থে পারসীতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, পেশকার, বদকার, পায়কার। ঐ 'কার'ই আবার স্থানবিশেষে 'গার' বা 'গর' হয়। যথা, খেদমতগার, গোনহগার, কারিগর ইত্যাদি।

৬। সংস্কৃত ন ও বি পারসীতে না ও বে হয়। যথা, না-তমাম, না রাজ, না-দোরস্ত, বে-হদ্দ, বে-আন্দাজ, বে-হোশ। ঐ 'না' কোথাও কোথাও 'না' হয়। যথা, না-চার, না-জবাব, না-পরোআ।

এইবার সমাসপ্রকরণের বিষয় উল্লেখ করা যাউক।

১। সংস্কৃতে যেরূপে দ্বন্দ্বসমাস হইয়া থাকে, পারসীতেও ঠিক তদ্রূপে হয়; যথা, রাতদেন; সোবেহ-শাম; খায়ের-খয়রাত; আশক-মাশুক ইত্যাদি।

২। কর্ম্মধারয় সমাসও ঠিক সংস্কৃতবৎ; যথা, খোশ-খত; সোফেদ-গাও; শেকেস্ত-হাল; বদ-নসীব ইত্যাদি।

৩। বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ সংস্কৃতে বিশেষণ; পারসীতেও তাহাই। যথা, হুরশকল; গুল-বদন; খর-গোস; নেক-বখত ইত্যাদি।

৪। সংস্কৃতের ন্যায় পারসীতেও তৎপুরুষ সমাসের দ্বিতীয়া-তৃতীয়াদি বিভাগ আছে; প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ না করিয়া আমরা কেবলমাত্র কয়েকটী তৎপুরুষের উদাহরণ দিতেছি। যথা, খোদা-পরস্ত, দুর-বীন, নেশা-খোর; জর-বফত; হারাম-জাদ, শাহ-জহান; গাও-খানা; খানা-জাদ ইত্যাদি।

৫। সংস্কৃতের বীপ্সার্থক অব্যয়ীভাবও পারসীতে বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়; যথা, দস্ত-ব-দস্ত, কেসত-ব-কেসত, তরহ-ব-তরহ; রঙ্গ-ব-রঙ্গ ইত্যাদি।

পারসী কায়দা বিষয়ে আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। সম্প্রতি অল্পরূপ দুই চারিটী সমতা প্রদর্শন করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব। পারসী ভাষার নিম্নলিখিত ব্যাক্যাংশের সহিত সংস্কৃতের সমতা প্রদর্শিত হইতেছে।

পারসী	সংস্কৃত	উর্দ্দু অর্থ
অজিজত	অজিজ-তে	অজিজ তেরা
নগশৎ	নাগচ্ছৎ	না গিয়া

পারসী	সংস্কৃত	উর্দ্দু অর্থ
মকুন	মা কুন (প্রা)	ন কর
মবাশ	মা ভূস্,	মাত হো
আয়মন	অয়ি মনঃ	রে মন
কুনদ	কুর্ণদ (প্রা)	করে
নিস্ত	নাস্তি	নাহি
অস্ত	অস্তি	হৈ
নামশ	নাম-অস্য	নাম উসকা
রোজগারশ	রোজগারোস্য	রোজগার উসকা
আয় বছর	অয়ি বচ্ছর (প্রা)	অয় লড়কা
নয়াইদ	নায়াতি	ন আতা
করদ	(অ)করোৎ	কিয়া
য়াবদ	আপৎ	পাবে

সংস্কৃত হইতে যে পারসিক ভাষার উৎপত্তি তাহাত এক রকমে প্রতিপন্ন হইল। পারসিক বিভক্তি হইতে হিন্দির বিভক্তি গৃহীত,তাহারও কয়েকটী প্রদর্শন করা গিয়াছে; এক্ষণে অবশিষ্ট গুলি প্রদর্শিত হইতেছে।

হিন্দিতে ষষ্ঠীর 'কে' পারসিক 'এ' হইতে হইয়াছে। সম্বন্ধ অর্থ বুঝাইলে পারস্য ভাষায় তদ্বোধক শব্দের পূর্ব্বে 'এ' বৈসে। উহা কোন অক্ষর দ্বারা লিখিত নয়; একটী চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত; উহাকে এজাফত বলে। যথা, 'কমন্দে হবা' ইহার অর্থ, হাওয়া কা ফাঁদ। 'রাহে খতা' ইহার অর্থ,খতা কে রাহ; 'বাজিয়ে রোজগার,' ইহার অর্থ, রোজগার কা বাজী।

এই 'এ' কেবল চিহ্নমাত্র বলিয়া অনেক সময় পাঠাদিতে ব্যতিক্রম ঘটিত,এজন্য প্রথমে হিন্দিতে উহার সহিত বর্ণমালার প্রথম অক্ষর 'ক' যোজনা করিয়া 'কে' হইল। যেমন, আপ কে লিয়ে। তদবধি উহা হিন্দির সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং উহার 'কা' 'কী' তেদও উহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ক্রমশঃ উহা হইতেই নানা ভাষার নানারূপ সম্বন্ধচিহ্ন হইয়াছে, তাহা আমরা উত্তরে প্রকাশিত করিব।

পারসিক ভাষার এই 'এ' প্রাকৃত ভাষার ষষ্ঠীস্থানীয় 'এ' হইতে গৃহীত। যথা, অজ্জাএ সদ্দাএ; দেবদাএ; গিহীদাএ ইত্যাদি। অতএব হিন্দির সম্বন্ধার্থক 'কে'র মূল প্রাকৃত বা পারসিক যে কোন ভাষাকে বলা যাইতে পারে।

পারস্য ভাষার সপ্তমীতে কোন কোন স্থানে 'দর' ও কোন কোন স্থানে 'বর' এবং কোথাও বা 'পর' হয়। যথা, 'বর উমর' ইহার অর্থ, উমর পর; 'দর জহান' ইহার অর্থ,জহান মে; 'দর করম' ইহার অর্থ,করম মে: 'পরতো' ইহার অর্থ, তুপর। উক্ত 'দর' ও 'বর' হইতেই হিন্দির 'পর' বলিলেও বলা যায়। তদ্ব্যতীত 'পর'ও পারস্য ভাষায় আছে। উহাই হিন্দিতে সাক্ষাৎরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার, হিন্দিতে কোন কোন স্থানে সপ্তমী স্থলে 'মে' হইয়া থাকে। উক্ত 'মে'ও পারস্য ভাষা হইতে সংগৃহীত। 'দর' ও 'বর' ভিন্ন পারস্য ভাষায় সপ্তমীতে কোন কোন স্থানে 'ব' হয়; যথা, 'ব নামে' ইহার অর্থ, নাম মে; 'ব দরগা' ইহার অর্থ দরগা মে; 'ব থাক' ইহার অর্থ থাক মে। উক্ত 'ব' 'বে' হইতে জাত বলিয়া ঐ 'বে' হইতেই 'মে' হইয়াছে। অথবা, প্রাকৃত সূত্র 'ঙেম্মি' দ্বারা প্রাকৃতে সপ্তমী স্থানে 'মি' হয়; উহা হইতেও হিন্দির 'মে' হইতে পারে। এবমাদিক বহুবিধ কারণ দৃষ্টে জানা যায়, যে, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পারসিক ভাষা মিলিয়া হিন্দি ভাষা হইয়াছে।

আমরাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে অধস্তন ভাষায় প্রাক্তন ভাষার শব্দাদির নানারূপ চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোন ক্রমেই এই নিয়মের অন্যথা হইবার জো নাই। এই অপরি-

হার্য্য নিয়মানুরোধেই পারসী আরবী সংস্কৃত, প্রাকৃত, ও হিন্দিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পারসী তিনেরই বহুতর লক্ষণ সম্মারেশ পরিলক্ষিত হইতেছে। অতএব, হিন্দী উক্ত ভাষা ত্রয়জাত বটে, তাহাতে সংশয় নাই।

প্রথম প্রথম হিন্দি ভাষায় দুই চারিটী সংস্কৃতধাতুঘটিত সংস্কৃত পদও দৃষ্টিগোচর হইত, কিন্তু কালক্রমে সেগুলি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা, কবি তুলসীদাসকৃত রামায়ণে দেখিতে পাই।

সহিত বিদেহ বিলোকহি রাণী।
সিন্ধু সম প্রীতি ন জাতি বখানি॥
রামহিং চিতব ভাব জেহি সীয়া।
সো সনেহ সুখ নহি কথনীয়া॥
উর অনুভবতি ন কহি সক সোউ।
কবন প্রকার কহৈ কবি কোউ॥

ইত্যাদি স্থলে জাতি (রাত্তি), কথনীয়া, অনুভবতি সংস্কৃতধাতুঘটিত সংস্কৃত পদ। হিন্দিতে উপমাবাচক সংস্কৃত ইব শব্দও কোথাও কোথাও দেখা যায়; যথা,

'কংদুক ইব ব্রহ্মাণ্ড উঠাউং'॥ সকোং মেরু মূলক ইব তোরী॥ ইত্যাদি। আবার,

জীতহ সমর সহিত দৌ 'ভাই'॥ 'পদ সরোজ মেলে দৌ ভাউ'॥ ইত্যাদি স্থলে দুটি 'দৌ' পদ অবিকল সংস্কৃত।

'তু হুল বিনয় করসি কর জোরে'।

এ স্থলে 'করসি'কে সংস্কৃত 'করোষি' বলিলেও চলে। এগুলি হিন্দির সংস্কৃত অংশের পরিচয়স্থানীয়।

প্রাচীন হিন্দিতে কেবলমাত্র পারসিক বিভক্তিগুলি যাইত, উহার শব্দগুলি অধিকাংশই সংস্কৃত ও অল্প প্রাকৃত। কিন্তু অধুনা হিন্দিতে তুরি ভূরি পারসী ও আরবী শব্দ মিশ্রিত হইয়াছে। সম্প্রতি সাজরালকার হিন্দিতে আবার বহুসংখ্যক ইংরাজি শব্দও প্রবেশ লাভ করিতেছে। প্রাচীন হিন্দি গ্রন্থের মধ্যে তুলসীকৃত রামায়ণ, লল্লুজী প্রণীত প্রেমসাগর, ব্রজবাসীদাস রচিত ব্রজবিলাস, প্রিয়দাস বিরচিত ভক্তমাল, বেতাল পঞ্চবিংশতি, তুলসী সতসই প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা বিভক্তি শূন্য সংস্কৃত বলিলেও চলে। আমরা প্রত্যেক গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

তুলসী কৃত রামায়ণ—

দেব দনুজ ভূপতি ভট নানা।
সমবল অধিক হউ বলবানা॥
জয় রঘুবংশ বনজবন ভানু।
গহন দনুজকুল দহন কৃসানু॥
জয় সুর বিপ্র ধেনু হিতকারী।
জয় মদমোহ কোহ ভ্রমহারী॥

* * *

অতি গহগহে বাজনে বাজে।
সবহি মনোহর মঙ্গল সাজে॥
যুথ যুথ মিল সুমুখি সুনয়নী।
করহি গান কলকোকিল বয়নী॥
সুখ বিদেহ কর বরনি ন জাই।
জন্ম দরিদ্র মনহুং নিধি পাই॥

* * * *

সরদ চংদ নিংদক মুখতীকে।
নীরজ নয়ন ভাবতে জীকে॥
চিতবন চারু মার মদ হরনী।
ভাবতি হৃদয় জায় নহিং বরনী॥
কল কপোল শ্রুতি কুণ্ডল লোলা।
চিবুক অধর সুন্দর মৃদুবোলা॥
কুমুদ বন্ধুকর নিন্দক হাসা।
কুটিল বিকট ভ্রুনোহর পাসা॥

প্রেমসাগর—

ইতনী কথা কহ শ্রীশুকদেবজী খোলে, কি মহারাজ! জিউনে রথ হাথী, ঘোড়ে ঔ রাক্ষস উস খেত মে রহে থে, তিছে পবন নে তো সমেত ইকট্ঠা কিয়া, ঔর অগ্নিনে পলভর মে সবকো জলায় ভস্ম কর দিয়া; পাংচ তত্ত্ব পাংচ তত্ত্ব মে মিল গয়ে; উন্হোং আতে তো সবনে দেখা, পর জাতে কিসীনে ন দেখা কি কিধর গয়ে; ঐসে অসুরোং কো মার, ভূমি কা ভার উতার, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ভক্তহিতকারী, উগ্রসেন কে পাস আয় দংডবত কর হাথ জোড় খোলে কি মহারাজ! আপকে পূর্ণ প্রতাপ সে অসুরদল মার ভগায়া, অব নির্ভয় রাজ কীজে, ঔ প্রজা কে সুখ দীজে। ইতনা বচন ইনকে মুখ সে নিকলতে হি রাজা উগ্রসেন নে অতি আনন্দ মান রাজ করনে লগে। ইস মে কিতনে একদিন পীছে ফির জরাসন্ধ উতনী হি সেনা লে চঢ়ি আয়া; ঔ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব জীনে পুনি ত্যোং হি মার ভগায়া। ঐসে তেইস তেইস অক্ষৌহিণী লে জরাসংধ সত্রহ বার বের চড়ি আয়া; ঔ প্রভু নে মার মার হটায়া॥

ব্রজবিলাস—

বিঘনবিনাশন শুভকরন হরনতাপত্রয়শূল।
চরিত ললিত নন্দনন্দনকে সকল সুখনকে মূল॥
সম্বত শুভ পুরাণ শত জানৌ।
তাপর ঔরন নক্ষত্র আনৌ॥
মাঘ সুমাস পক্ষ উজিআরা।
তিথি পঞ্চমী সুভগ শশীবারা॥
শ্রীবসন্ত উৎসব দিন জানী।
সকল বিশ্বমন আনন্দদানী॥
মন মে করি আনন্দ হুলাসা।
ব্রজবিলাস জো কহৈ প্রকাশা॥

ভক্তমাল—

শ্রীরামানুজ উদ্ধার সুধানিধি অবনি কল্পতরু।
বিষ্ণুস্বামী রোহিত সিন্ধু সংসার পার কুরু॥
মধ্বাচারজ মেষ ভক্তি শয়ন সর ভরিয়া।
নিম্বাদিত্য আদিত্য কুহর অজ্ঞান জুহরিয়া॥

* * *

ভক্তিভক্ত ভগবংত গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদরজ বংদন করত নাসৈ বিঘ্ন অনেক

বেতালপঞ্চবিংশতি—

মহারাজ! ধর্ম্ম কী বিচার শুনিয়ে; জো জো কোই কিসীকা জী লেতা বহ ঔর জন্ম মে উসকা ভী জী লেতা হৈ; ইস পাপ সে সংসার মে অনেক মনুষ্য জন্ম লেতা হৈ, ঔর মরতা হৈ; ইসসে জগত মে জন্ম পাকে ধর্ম্ম বটোরনা মনুষ্যকো উচিত হৈ; দেখিয়ে কাম ক্রোধ লোভ মোহ বশ হো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব কিসু ন কিসু তৌর সে সংসার মে অবতার লে লে আতা হৈ। কিন্তু উনসে গায় আচ্ছি হৈ, জো রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধ লোভ সে রহিত হৈ।

বেতালপঞ্চবিংশতির রচনার অন্যান্য স্থলে অনেক পারসী শব্দও মিশ্রিত আছে।

তুলসী সতসই—

নমো নমো শ্রীরাম প্রভু পরমাতম্ পরধাম।
জেহি সুমিরত সিধি হোতহৈ তুলসী জনমকাম॥
রাম বামদিশি জানকী লখন দাহিজে ঔর।
ধ্যান সকল মঙ্গল করন সুরতরু তুলসী তৌর॥
পরম পুরুষ পরধাম পুর ব্যাপক ব্যাপ্য ন আন।
তুলসী জো সমুঝত সুমত রাম সোই নির্ব্বান।
সকল সুখদ গুন জানু সো রামচরনমনলীন॥
সকল কামপ্রদ সর্ব্বহিত তুলসী কহহি প্রবীন।
জাকে রোম রোমপ্রতি অমিত অমিত ব্রহ্মাণ্ড
সো দেখত তুলসী প্রগট অবধ সু অচল অখণ্ড॥

জগত জননী শ্রীজানকী জনক রাম-তত্ত্বরূপ।
আত্মকৃপা অতি অমহরন করন বিবেক অনূপ॥

* * *

আদিচন্দ্র চঞ্চল সহিত ভজু তুলসী ত্যজি কাম।
অঘগঞ্জন রঞ্জন সুজন ভবভঞ্জন সুখ ধাম॥

হিন্দি ও সংস্কৃতের সম্বন্ধ একরূপ দেখান গেল। এইবার আমরা প্রাকৃত ও হিন্দির সম্বন্ধ প্রদর্শন করিব। প্রাকৃতে একমাত্র দন্ত্যসকার ব্যবহৃত হয়, হিন্দিতেও কেবল দন্ত্যসকার প্রচলিত। তবে আজ কাল, কেহ কেহ শকারাদির যথা প্রয়োগ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তুলসীদাসপ্রমুখ প্রাচীন কবিগণ সর্ব্বত্রই দন্ত্যসকার প্রয়োগ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা কতিপয়গ্রন্থের কতিপয় পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

জিনকে জস প্রতাপকে আগে।
সসী মলিন রবি সীতল লাগে॥
কুংজরমনি কণ্ঠা কলিত উর তুলসী কী মাল।
বৃষভকংধ কে হরি ঠবনি বলনিধি বাহু বিসাল॥

* * * * *

গুন সাগর নাগর বর বীরা।
সুংদর স্যামল গৌর সরীরা॥

* * * *

যহ সুনি অপর ভুপ মুসুকানে।
ধর্ম্মসীল হরি ভক্ত সয়ানে।

* * * *

রাবন বান মহাভট ভারে।
দেখি সরাসন গবহি সিধারে॥

* * * *

বিস্বামিত্র সময় সুভ জানী।
বোলে অতি সনেহ মৃদু বাণী॥

রামায়ণ, বালকাণ্ড।

প্রেমসাগরপ্রণেতা লল্লূজী কবি কোথাও কোথাও তালব্য শকার স্থানে দন্ত্য সকার লিখিয়াছেন; আবার কোথাও বা তালব্য শকারই রাখিয়াছেন। যথা;

ইতনী বাত সুনতেহি হুরসেন ভীমে পুরোহিত বুলায়'। 'অতি আনন্দ রহে জগদীস'। 'নিরখি হরখি সব দেহিং অসীস।' ইত্যাদি স্থলে শকার বিচার করেন নাই; আবার, শুক্ল, দেশ, বিদেশ, শোভা ইত্যাদি স্থলে শকার বিচার করিয়াছেন।

অন্যান্য গ্রন্থেরও শকার বিচার নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

পানীমে নিসদিন রহে জাকে হাড় ন মাস।
কাম করৈ তলবার কো ফির পানীমে বাস॥
স্যামবরণ পর হরি নহীং জটা ধরে নহীং ঈস।
না জানুং পিয়া কৌন হৈ পংক লগাএ সীস॥

সভাবিলাস।

লগত সুগত সীতল কিরণ
নিস দিন সুখ অবগাহি।
মাংহ সসী ভ্রম সুরত্যোং
রহত চকোর চাহি॥
কো কহি সকৈ বড়েন সোং
বড়ে বংস কী খানি।
ভলো ভলো সবহী করৈ
ধুআং অগর কো জানি॥
সিরস কুসুম মড়রাত
অলি ঝুপি ঝপট লপটাত।
দরসত অতি সুকুমারতা
পরসত মন ন পত্যাত॥

বিহারী কী সত সই।

সুখ দুখ এক সমান হৈ
হরখ সোক নাহি ব্যাপ।
পর উপকার নিহকামতা
উপজে ছোহ ন তাপ॥
ঐসী বানী বোলিয়ে
মন কা আপা খোয়।
ঔরন কো সীতল করে
আপো সীতল হোয়॥

কবীর কী সাখী

রবিবংসী যাদব বংস
কুসুম পরমার সদাবর।
চাহবান চালুক্য হংদক
সীসার জাতীয়র॥
ধান্যপালক নিকুংভবর
রাজপাল কবনীস।
কানহুরকৈ আদি দে
বরনে বংস ছতীস॥

রাজপুত বংস বর্ণন।

কাত্তিক সরদ চংদ উজিয়ারা।
জগ সীতল মোহি বিরহিন জারা॥
পরবত মেঘ দিনেস সসী।
সহি ন সকহি বহ অগি॥

পদমাবত।

সূকর স্বান কে জন্ম ধরঈ।
জো গুরুকেরী নিন্দা করঈ॥

কবীর রেখতা।

সুর প্রভু অংগ অংগ ছবি
কহাং পায়ো কেহি কেরে।

সুরসাগর।

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে অনেক স্থলেই তালব্য শকারস্থানে দন্ত্য সকার প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা স্পষ্ট করিয়া নিম্নে সেই সকল স্থল নির্দ্দেশ করিতেছি।

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ গুলিতে নিস, স্যাম, ঈস, সীতল, সসী, বংস, সিরস, দরসত, পরসত, সোক, ছতিস, সরদ, দিনেস, সকহি সূকর, স্বান, সুর প্রভৃতিতে শকারবিচার দেখা যায় না। এগুলি যে প্রাকৃত-সম্ভব, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এইত গেল এক প্রমাণ; দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, প্রাকৃতে যেমন অন্তঃস্থ বকার স্থলে সর্ব্বত্রই বর্গীয় জ ব্যবহৃত হয়, প্রাচীন হিন্দিতেও তেমনি সর্ব্বত্রই বর্গীয় জকার ব্যবহৃত হইত। এখনও পদমধ্যে বা পদান্তে অন্তঃস্থ বকার পরিদৃষ্ট হইলেও পদাদৌ উহার প্রয়োগ অতীব অল্প। নিম্নে তাহার কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

মিলটহিং বিজকরি জানহুং মোহি।
মৈং জস বিপ্র সুনাউং তোহি॥
ক্যোং কীজৈ ঐসো জতন
জাতেং কাজ ন হোয়॥
পরবতপৈ খোদৈ কুআ
কৈসে নিকসৈ তোয়॥
সীস জটা পোথী গহৈ
সেত বসন গল মাহিং।
জোগী জঙ্গম হৈ নহীং
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাহিং॥
সোহত সংগ সমান সোং
যহৈ কহৈ সব লোগ।
পান পীক ওংঠ ন বনৈ
কাজর নৈন ন জোগ॥
জদ্যপি হম কায়র কুটিল
খরে চাকরী চোর।
তদ্যপি কৃপা ন ছাড়িয়ো
চিতৈ আপনী ওর॥

পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত স্থল গুলিতে জস, জতন, কাজ, জোগী, জোগ, জদ্যপি প্রভৃতিতে অন্তঃস্থ যকার স্থানে বর্গীয় জকার ব্যবহৃত হইয়াছে। এগুলিও যে প্রাকৃতসম্ভব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার কোন কোন স্থলে ঐ শব্দ গুলি অন্তঃস্থ যকারেও পরিলক্ষিত হয়, তখন উহাদিগকে সংস্কৃত জাত বলিলেই চলিতে পারে; কারণ, হিন্দিতে সংস্কৃতও আছে। তৃতীয় প্রমাণ এই যে—

প্রাকৃতে যেমন দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য দ্বিবিধ নকারের একতর অর্থাৎ কেবলই মূর্দ্ধণ্য ণকার ব্যবহৃত হয়, হিন্দিতেও তদ্রূপ উহাদের একতর

অর্থাৎ সর্ব্বত্রই দন্ত্য নকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লখন, গুন, পানি, গন, তুখন, প্রান, পন, পুরান, রাবন, বান, বানী, প্রবীন, কৃপন, প্রনাম, করন, কারন ইত্যাদি এবং আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত অনেকানেক স্থলেই পাঠকবর্গ মূর্দ্ধণ্য ণকার স্থলে কেবলই দন্ত্য নকার দেখিতে পাইবেন। এতদ্ব্যতীত প্রাকৃত অনেক শব্দই হিন্দিতে দেখা যায়। নিম্নে তাহার একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রাকৃত	হিন্দি
জঠেরা	জঠেরা
কহেহি	কহেহি
সনেহ	সনেহ
থল	থল
সুমরণ	সুমরন
সুণণ	সুনন
পুছণ	পুছন
দহি	দহি
মুরদি	মুরতি
লহু	লহু
সোহা	সোহা
তজন	তজন
জদ	জদ (জব)
ধাবই	ধাবই
সীয়	সিয়, সীয়
দোউ	দোউ
আয়াদি	আয়াই (আয়ে)
বি	ভী
ভোদি	ভয় (হোয়)
অহুবানা	অহুখানা
আক	আরু
বহু	বহু
কবহু	কবহু
অপ্পণো	অপনা

প্রাকৃত	হিন্দি
আন (অন্য)	আন
কেহিং	কেহিং
তুমং	তুম
কো	কো
বি (অপ্যর্থক)	বি
জং	জো
সঅং	সও
কডুঅ	কডুআ
সোহণ	সোহন
চন্দ	চন্দ
পিঅ	পিঅ
হিঅঅ	হিঅঅ
তুহ	তুহ
সচ্চং	সাংচ
সেজ্জা	সেজ
নেউর	নেপুর
চোত্থী	চৌথী
পত্থর	পত্থর
দুহা	দুহা
বিচ্ছুও	বিচ্ছু
কিসণ	কিসন
চইত্ত	চইত
বারহ	বারহ
তেরহ	তেরহ
সংঝা	সাংজ
তলাও	তলাও
মেহ	মেহ
লট্টী	লাট্টী
লছমী	লছমী
জুব্বাণ	জুআন

এতদতিরিক্ত আরও বহুসংখ্যক প্রাকৃত শব্দ হিন্দিতে প্রচলিত আছে, সে সকলের নির্দ্দেশে প্রয়োজন নাই।

হিন্দি ভাষার প্রাকৃত-সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে উহার বয়ঃক্রম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। হিন্দি ভাষার বয়ঃক্রম সম্বন্ধে সাহেবদের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎ বিসদৃশ। তাঁহারা বলেন, উহার প্রচলন সহস্র বৎসরের অধিক হয় নাই। আমাদেরত অনুমান উহা ১৫। ১৬ শত বৎসরের হইবে। এতৎ-পোষণার্থ আমরা ইবন বটুআর তারণা-ভ্রমণ-বিষয়ক কথা গুলি এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

'আমি আলা-উল মুলকের সহিত তারণা নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। স্থানটী প্রশস্ত, রমণীয় এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। এই সুপ্রশস্ত চত্বর মধ্যে মনুষ্যাদি জীব-জন্তুর পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তি সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। নগরের মধ্যস্থলে এক সুবৃহৎ সৌধ মধ্যে শিলাময় কোন মহাপুরুষ মঞ্চোপরি সমাসীন। আলা-উল মুলক বলিলেন, এক সময়ে এই স্থানটী সুসমৃদ্ধ নগরী ছিল। কর্ম্মদোষে অধিবাসীরা সকলেই এককালে পাষাণময় হইয়াছে। ঐ ইহার ধ্বংসকাহিনী হিন্দি ভাষায় অট্টালিকাগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, দেখ। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যাপারের সংঘটন হইয়াছিল।'

ইবন বটুআ ৫৬৬ বৎসর পূর্ব্বে ভ্রমণব্যপদেশে উক্ত তারণা নামক স্থানে গিয়াছিলেন। তাহারও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দি ভাষায় প্রচলন থাকিলে, উহার বয়ঃক্রম ১৫।১৬ শত বৎসর বলা নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই। আমাদের মতে ঐরূপই উহার প্রচলন কাল।

প্রাকৃত ও হিন্দীর সম্বন্ধপ্রদর্শন সমাধা হইল। কিন্তু পালীর সহিত হিন্দীর সংস্রবকথা আদৌ উল্লিখিত হইল না। ইহার কারণ এই, প্রাকৃত ও পালীতে প্রভেদ অতি অল্প; সুতরাং, প্রাকৃতের সহিত হিন্দীর যে যে সম্বন্ধ পালীর সহিতও প্রায় সেই সেই সম্বন্ধ। তবে কোথাও কোথাও কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য মধ্যেই গণ্য নহে।

হিন্দি ভাষার প্রচলন হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে মারহাটী ও গুজরাটী ভাষা প্রচলিত হয়। উহারা হিন্দিরই একবিধ শাখামাত্র; শব্দ সকল প্রায়ই এক। কেবল কারকাদি বিভক্তি এবং ক্রিয়া প্রকরণে বর্ত্তমানাদিকাল প্রয়োগে অত্যল্প বিশেষ দেখা যায়। মারহাটী ভাষার 'মী উঠেং', 'আম্হী উঠুং', 'তুং উঠস্', 'তুম্হী উঠ,' 'মী করি', 'আম্হী করুং',ইত্যাদি বাক্য হইতে যে বাঙ্গালায় 'আমি,' 'তুমি' হইয়াছে, ইহা প্রায়ই একরূপ স্থির নিশ্চয়। তবে উৎকল ভাষাতেও 'আম্বে দেখুঁ', 'তুম্বে দেখ' ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। উহাদের কোন্‌টী হইতে বাঙ্গালা ভাষার 'আমি' 'তুমি' হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। সংস্কৃত 'অহং' হইতে বাঙ্গালায় একেবারে 'আমি' হইতে পারে না। অস্মদ ও যুষ্মদ শব্দের রূপ নানা ভাষায় নিম্নে দেওয়া গেল।

অস্মদ।

	একবচন	বহুবচন
সংস্কৃত	অহম্	বয়ম্
প্রাকৃত	অহম্	অম্হ
হিন্দি	হাম	হামে
গুজরাটী	হুং	হমে
মৈথিলী	হম	হমনী, হমরা
মারহাটী	মী	আম্হী
ভোজপুরী	হম	হমনী
উৎকল	আম্বে	আম্বেমানে
ব্রজভাষা	হাম	হমরা

যুষ্মদ।

	একবচন	বহুবচন
সংস্কৃত	ত্বম্	যুয়ম্

	একবচন	বহুবচন
প্রাকৃত	তুম	তুম্হে
হিন্দী	তোম	তোমে
গুজরাটী	তুং	তুহনী
মৈথিলী	তুংহ	তুহনী, তোহরা
মারহাটী	তু	তুম্হী
ভোজপুরী	তুংহ	তোহনী
উৎকল	তুম্বে	তুম্বমানে
ব্রজভাষা	তুহঁ	তুহরা

পূর্ব্বোক্ত সকল উদাহরণ গুলিতে বাঙ্গালার 'আমি' 'তুমি' হইতে কিছু না কিছু বিশেষ প্রায়ই আছে। সুতরাং, কোনটী হইতে বাঙ্গালার 'আমি' 'তুমি' জাত; তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করি, যে উৎকল ভাষার ক্রিয়ার অনেক পদই বাঙ্গালায় সন্নিবেশিত হইয়াছে, তজ্জন্য ঔৎকলীয় 'আম্বে' 'তুম্বে' হইতেই বঙ্গীয় 'আমি' 'তুমি' সমুৎপন্ন, এইরূপ বলাই যুক্তি-সঙ্গত। অধিকন্তু মাহারাষ্ট্রীয় আম্হী 'তুম্হী' বহুবচনের পদ, একবচনে মী আর তু হইয়া থাকে। উৎকল ভাষায়ও অসম্ভ্রম স্থলে 'মু' ও 'তু' ব্যবহৃত হয়। তাহা হইতেই বোধ হয় বাঙ্গালায় 'মুই' 'তুই হইয়া থাকিবে।

মারহাটী ভাষার করণকারকে এ, করুন ও নে হয়। করুন শব্দের অর্থ 'করিয়া'; যথা, 'হস্ত করুন', ইহার অর্থ—হাতে করিয়া। আমাদের দেশেও করণকারকে 'করিয়া' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, হাতে করিয়া জল আন। লাঠি করিয়া মার। এই 'করিয়া' কোথা হইতে আসিল, তাহা আমরা অতঃপরই প্রকাশ করিব। কিন্তু, কাহারও কাহারও ধারণা যে 'কর্ত্তৃক' হইতে অস্মদ্দেশীয় করণের চিহ্ন 'করিয়া' হইয়াছে। এটী তাঁহাদের নিতান্তই অসঙ্গত ধারণা। কেন না, প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষায় 'কর্ত্তৃক' কোন পদ বা শব্দই হইতে পারে না। সমস্ত পদ স্থলে যেখানে যেখানে 'কর্ত্তৃক' দেখা যায়, তথায় তাহার কর্ত্তৃত্ব আছে; কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কোথাওই 'কর্ত্তৃক' পদ প্রযুক্ত হয় না। 'বিষ্ণু শর্ম্ম কর্ত্তৃক বিরচিত'; 'হরিহর কর্ত্তৃক সম্পাদিত'; 'রামেশ্বর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত' ইত্যাদি স্থলে সকল গুলিরই কর্ত্তৃত্ব আছে; সুতরাং, এতৎ স্থলে 'কর্ত্তৃক' ব্যবহৃত হইতে পারে; নতুবা 'হস্তে করিয়া জল আনিলাম', 'যষ্টি করিয়া প্রহার করিল' ইত্যাদি স্থলে 'হস্ত কর্ত্তৃক' বা 'যষ্টি কর্ত্তৃক' এবম্বিধ প্রয়োগ একেবারেই হইতে পারে না, কারণ, তত্তৎস্থলে হস্ত বা যষ্টির কর্ত্তৃত্ব নাই। 'লোক করিয়া আনাইলাম' বা 'লোক কর্ত্তৃক আনাইলাম' এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে; কারণ, 'আনান' ণিজন্ত ক্রিয়া-পদ হওয়াতে 'লোক' এই প্রযোজ্য কর্ত্তার তৃতীয়া হইলে কর্ত্তৃত্ব হেতু 'লোক কর্ত্তৃক' হইতে পারে। তা বলিয়া যেখানে করণকারকে করিয়া হয়, সেই খানেই যে 'কর্ত্তৃক' প্রযুক্ত হইবে, এরূপ ধারণাই অতীব গর্হিত। যাহা হউক, বাঙ্গালার করণকারকের 'করিয়া' পূর্ব্বকথিত মাহারাষ্ট্রী ভাষার 'করুন' হইতেই আসিয়াছে, কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গতও নহে।

আমরা কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সুন্দর নিদর্শন পাইয়াছি; সংস্কৃত 'কৃত্বা' প্রাকৃতে 'করিঅ' হইয়া বাঙ্গালায় 'করিয়া' হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ইহার সাম্য পরিদৃষ্ট হইতেছে; উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাউক; যথা, সংস্কৃত 'হস্তে কৃত্বা' প্রাকৃত 'হত্থে করিঅ' বাঙ্গালা 'হাতে করিয়া'। বোধ করি, উক্ত প্রাকৃতিক 'করিঅ' অত্যল্প বিকৃত হইয়া প্রাচীন মারহাটীতে 'করুঅ' হইয়া ক্রমশঃ 'করুন' হইয়া থাকিবে। অতএব মারহাটী 'করুন'-এর সহিত বাঙ্গালার 'করিয়া'র বিলিষ্ট ঘনিষ্টতা

না থাকিলেও মারহাটী 'করুঅ' বা প্রাকৃত 'করিঅ' ইহাদের সহিতই উহার ঘনিষ্টতা অধিক, সকলেই একথায় অনুমোদন করিবেন।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, প্রাচীন মাহারাষ্ট্রীয় উক্ত 'করুঅ' ভোজপুরীতে 'করুআ' হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্ববৎ অসমাপিকা ক্রিয়া হইতে ভোজপুরি ভূরি ভূরি শব্দই 'উআ' উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, বেটা-বেটুআ; ঘর—ঘরুআ; বকস—বকসুআ; খেত—খেতুআ; আম-আমুআ। জলপ্রবাহের ন্যায় ভাষাপ্রবাহ প্রতিহত না হইলে চারিদিকেই গমন করিতে পারে। কোথায় প্রতিহত হইল না হইল তাহা স্থির করাই দুঃসাধ্য।

মারহাটী ভাষায় করণকারকের 'এ' বাঙ্গালাতেও ব্যবহৃত হয়। সম্বন্ধপদের চা, চী, চে হিন্দির 'কা, কী, কে' হইতে গৃহীত। অধিকরণে ই, অন্ত ও মধ্য ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার অধিকরণেও ঐগুলির ব্যবহার দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন মারহাটী ভাষায় করণ কারকে 'নে'ও প্রচলিত আছে। সংস্কৃত নীত্বা, প্রাকৃত নীঅ হইতে মারহাটীর 'নে'র সংঘটন বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালায় করণ স্থলে 'নিয়া' বা 'লইয়া'র সমধিক প্রয়োগ না থাকিলেও 'হস্তে করিয়া' বা 'হস্তে লইয়া' এতদুভয়ের পার্থক্য বেশী বলিয়া বোধই হয় না। যথা, 'হাতে করে ঢাল' বা 'হাতে নিয়া ঢাল'।

গুজরাটী ভাষার অপাদানে থী ও থকী হইয়া থাকে, বোধ হয়, উহা হইতেই আমাদের থাকিয়া বা থেকে হইয়াছে। আমাদিগের 'থাকিয়া' ও গুজরাটীর 'থকী' উভয়েই একার্থ-বাচক। উহাদিগের 'ঘর থকী' এবং আমাদিগের 'ঘর থেকে'র অর্থ একই। অধিকন্তু, গুজরাটী ভাষার 'মাহারো' 'তুহারো,' ইত্যাদি সম্বন্ধ বাচক পদ আছে, উহা হইতেই বাঙ্গালার 'আমার' 'তোমার' উৎপন্ন, এইরূপ বলিতেও কোন আপত্তি দেখা যায় না। অথবা খুরী বোলী 'তিহার' হইতে ব্রজভাষায় 'তুহার' হইয়া কালক্রমে 'তুমার' এবং তাহা হইতেই 'তোমার' হইয়াছে।

ত্রৈলিঙ্গী বা তেলেগু ভাষার উপকরণেই উড়িয়া ভাষা সংগঠিত। তেলেগু হইতে তামিল ভাষাও উৎপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তেলেগু ও তামিলকে আর্য্যভাষার মধ্যে (Aryan language) পরিগণিত করেন না। যদি বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দি, মারহাটী ও গুজরাটী প্রভৃতি ভাষা আর্য্য ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে উহাদেরই বা দোষ কি? তাঁহারা অনুমান করেন, যে সংস্কৃতের বহুকাল পূর্ব্বে তেলেগু ভাষার প্রচলন ছিল; উহা অতি প্রাচীন ভাষা। উহার বর্ণমালা দেব নাগর হইতে উৎপন্ন নহে। তেলেগুর অ, আ, ক, খ ও দেবনাগরের অ, আ, ক, খ প্রভৃতিতে ভূয়িষ্ঠ আকৃতিক বৈষম্য বিদ্যমান আছে। আর তেলেগু ভাষায় ভূরি ভূরি সংস্কৃত শব্দ পরিলক্ষিত হইলেও সেগুলি অধস্তনকালে কোনরূপে উক্ত ভাষার সহিত সংমিশ্রিত *। নতুবা সংস্কৃতের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই।

আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এইরূপ সিদ্ধান্তে কোন প্রকারেই অনুমোদন করিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষে বাঙ্গালা, হিন্দি, মারহাটী, গুজরাটী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরি, নেপালী, ভুটানী, আসামী, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, কার্ণাটী এবং ভারতবর্ষের বহির্ভাগে, ফার্সী, বার্মিজ, টিবেটী, সিংহলী প্রভৃতি সকল ভাষাই সংস্কৃত হইতে জাত। কি বর্ণমালা, কি

* See preface Telegu Grammar, by A. D. Campbell.

শব্দ নিচয়, কি সমাস-পদ্ধতি, কি সন্ধি-প্রকরণ, কি প্রকৃতি-প্রত্যয়, কি কারক-বিভক্তি সকল বিষয়েই অল্পাধিক সাম্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়। বোধ হয়, প্রাকৃতের প্রচলন কালে তেলেগু ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। যৎকালে অন্ধ্রবংশীয় ভূপালগণ গোদাবরীর দক্ষিণস্থ ভূভাগসমূহের অধিনায়ক ছিলেন, তৎকাল হইতেই উহার সূচনা দেখা যায়। অন্ধ্রবংশীয়গণ শৈব ছিলেন। ইষ্টদেবের উপাসনার জন্য তাঁহারা স্বীয় রাজ্য মধ্যে ত্রিলিঙ্গ নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করত সমগ্র রাজ্যকে ত্রিলিঙ্গম্ বলিয়া আখ্যাত করিয়া ছিলেন। তদ্দেশজাত বলিয়া উক্ত ভাষার 'ত্রৈলিঙ্গী' বা 'তৈলিঙ্গী' নাম হয়। এক্ষণকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহার 'তেলেগু' নাম দিয়াছেন।

প্রাকৃতের পর অন্য কোন ভাষার মধ্য দিয়া তেলেগু ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল কিনা, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ভাষার ও বর্ণমালার বৈষম্য দেখিয়া আপাতত এইরূপ মনে হয়, উহাদের মধ্যে অন্য কোন ভাষা ছিল, এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। আরও এইরূপ প্রবাদ আছে, যে আন্ধ্রীয়গণ আপনাদের ভাষাকে প্রাকৃত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিবার বাসনা করিয়াছিলেন,তজ্জন্য দেবনাগরে ও তেলেগু বর্ণমালায় আদৌ সাম্য পরিলক্ষিত হয় না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে তেলেগু ভাষাকে অনার্য্য ভাষা বলিয়াছেন, তাহারত এই মাত্র কারণ আমাদের বোধগম্য হয় যে, উক্ত ভাষায় ౙpr(ts)ও ౘpr (dz) দুই বর্ণ অধিক আছে। বাস্তবিক ভারতীয় কোন ভাষাতেই পারসিক বা আরবিক ذ (dzal), ز (za), ض (zad) ظ (zo),প্রভৃতির সমোচ্চারণের কোন অক্ষরই নাই তেলেগু ভাষায় এইনূতনত্ব কোথা হইতে আসিল আমাদিগের অনুমান, এই সন্দেহ বশতঃই সাহেবগণ উহাকে অনার্য্য ভাষা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। খস, গদ, প্রভৃতি অনার্য্য ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ বিশিষ্ট অনেক শব্দ আছে।

আমাদের বোধ হয়, আন্ধ্রীয়গণ আপনাদের ভাষাকে যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রকরণেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন; ঐ দুইটী অক্ষরও তাহার অন্যতম প্রমাণ। দেবনাগরের তদ্রূপ বর্ণনা থাকায়, তাঁহারা হয় ত পারসীক বা অন্য কোন ভাষা হইতে উহাদিগকে আনয়ন করিয়া থাকিবেন। তেলেগু বর্ণমালার সর্ব্বশেষে আর একটী অক্ষর আছে। তাহার নাম ఌ (loo) লু। ইহার উচ্চারণ ঠিক লকারের মত। একবিধ উচ্চারণ বিশিষ্ট দুইটি অক্ষরেরই বা কি আবশ্যক ছিল, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। তদ্ব্যতীত ইহার দুইটী রকার। তন্মধ্যে ఠ রেফের কার্য্য করে। আর ఱ রকারের মত প্রযুক্ত হয়। বোধ হয়, ইহাও স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তেলুগু ভাষার আরও এক স্বাতন্ত্র এই, যে উহার স্বরবর্ণ মধ্যে দুইটি একার ও দুইটি ওকার আছে। একটি হ্রস্ব ও অপরটি দীর্ঘ। সংস্কৃত ব্যাকরণে ত 'স্বএজ্‌নাস্তি' অর্থাৎ এ, ঐ, ও, ঔ ইহাদের হ্রস্ব নাই, এইরূপ লিখিত আছে। আন্ধ্রীয়গণ হ্রস্ব একার ও হ্রস্ব ওকার প্রবর্ত্তিত করিয়া শুদ্ধ বর্ণমালায় নয়, ব্যাকরণেও স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণে ঋকার ও ঌকার এই দুটি হ্রস্ব রি, দীর্ঘ রী, হ্রস্ব লি ও দীর্ঘ লী এইরূপে পঠিত হইয়া থাকে। তেলেগু ভাষায় উহারা রু, রূ, লু, লূ, এইরূপে উচ্চারিত হয়। এস্থলেও উচ্চারণের অন্যথা স্বতন্ত্রতা-প্রদর্শক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু,তেলুগু ভাষায় স্বরবর্ণ সকল পঠিত হইবার সময় উহাদের প্রত্যেকের নামের পর 'কারমু' উচ্চারণ করিতে

হয়; যথা, 'অকারমু'; 'আকারমু'; ইত্যাদি। কারমু কি, তাহা অবশ্য পাঠকবর্গের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। তজ্জন্য এস্থলে তাহার বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে। সংস্কৃত সকল বর্ণের পর, 'কার' বলিবার রীতি আছে; যথা, অকার, আকার, ইকার, ঈকার, উকার ইত্যাদি। ত্রৈলিঙ্গীগণ সংস্কৃত অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ সকল স্ত্রীবলিঙ্গ করিয়া উচ্চারণ করেন। তাহা হইলেই সংস্কৃত 'অকার' তাঁহাদের নিকট 'অকারম্'এইরূপে উচ্চারিত হইবে। ঐ 'অকারম্' 'আকারম্' ইত্যাদি হইতেই 'অকারমু' 'আকারমু' হইয়াছে। হঠাৎ শুনিলেই বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ফলে উহা সংস্কৃতজাতই বটে। আর ব্যঞ্জনবর্ণ সকল কু, খু, গু, ঘু ইত্যাদিরূপে পঠিত হইয়া থাকে। এবমাদিক নানাকারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তেলুগু ভাষাকে অনার্য্য ভাষা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা বলি, এ সব স্বাতন্ত্র কৃত্রিম; লৌকিক এষিতার পরিচয়; যখন মূল বিষয় অভিন্ন, তখন উহাকে সংস্কৃত জাত বলা ও অনার্য্য ভাষা মধ্যে গণ্য না করাই বিধেয়।

তেলুগুর বর্ণমালার সঙ্গে ঔৎকলীয় বর্ণমালার অনেক সাদৃশ্য আছে। অক্ষরের ছাঁদ উভয়েই সমান। উভয়েই গোল গোল। উৎকলের ୦ ঠ ও তেলুগুর ఠ র প্রায়ই একরূপ। এক বর্ণমালা হইতে অন্য বর্ণমালা উৎপাদনসময়ে প্রয়োজনীয় বৈষম্যের অভাব হইলেই তদ্বর্ণকে অন্য নামে আখ্যাত করিতে হয়। সে জন্যই একের র অন্যের ঠ হইয়াছে। উৎকলের ଢ (ড)ঢ় ও তেলুগুর(ড)ఢ় একাকার সন্নিবেশে অত্যল্প বিভিন্নতা মাত্র। তেলেগু ভাষায় রু, রূ, লু, লূ বলে; উৎকল ভাষায়ও রু, রূ, লু, লূ বলিবার রীতি আছে। তেলেগু কর্ম্মকারকের ও সম্প্রদানের 'কু' উৎকলেও ব্যবহৃত হয়। উহার অপাদানের 'দু'হইতে উৎকলের রু হইয়াছে।

তেলেগুর অত্যল্প বিভিন্নতাতেই যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহাকে অনার্য্য ভাষা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন; তখন তাঁহারা তামিল ভাষাকেও যে অনার্য্যভাষা বলিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? সাহেবদের মতে তামিলও অনার্য্য ভাষা। উহা সংস্কৃতের বহুকাল পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল। যেহেতু উহার সংস্কৃতেতর উপাদানই অধিক। এতদ্বিষয়ে আমরা, সাহেবদের বড় দোষ দিতে পারি না। কারণ, প্রথমেইত উহার বর্ণমালার নাম শুনিলেই অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। তামিল ভাষায় স্বরবর্ণ মোটে বারটি। ব্যঞ্জনবর্ণ আঠারটি। স্বরের নাম যথা, অনা, আওনা, ইনা, ঈওনা, উনা, ঊওনা, এনা, এওনা, ঐওনা,ওনা,ওওনা, ঔওনা। ইহাতেও তেলেগুর ন্যায় হ্রস্ব একার, দীর্ঘ একার ও হ্রস্ব ওকার, দীর্ঘ ওকার আছে। ব্যঞ্জনের নাম যথা—কনা, ঙনা, চনা, ঞনা ডনা, ণনা, পনা, মনা, য়না রনা, লনা, বনা, অড়ানা, ইড়ানা, অরানা, অনানা। সংস্কৃতের চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশটী ব্যঞ্জন স্থলে মোটে আঠারটি, প্রায় অর্দ্ধেক। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণ আদৌ নাই। ইহাতেও যদি সাহেবগণ উহাকে অনার্য্য ভাষা না বলিবেন ত বলিবেন কাকে? যাহা হউক, আমরা ত আর ভারতবাসী হইয়া দ্রাবিড়ীভাষাকে অনার্য্যভাষা বলিতে সাহস করি না; উহা ত প্রাকৃতের অন্যতম শাখা, তাহা কাহার অবিদিত? তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপভ্রংশ কাণ্ড উহাতে যেমন ঘটিয়াছে, এমন আর কুত্রাপি ঘটে নাই। এমন কি সংস্কৃত বর্ণমালার প্রায় অর্দ্ধেক বর্ণের

উচ্চারণ উক্ত ভাষা হইতে কোথায় পলাইয়াছে; ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের কথা আর কি হইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, লবণাম্বুধির জলদোষে তত্তীরবাসী লোকদিগের বাক্যের অধিকাংশ বর্ণই ডকারে পরিণত হইয়াছিল; তাই তামিল ভাষায় তিনটি ডকার। ডনা, ড়ানা ও ইড়ানা। ইহাদের কোনওটির ডকারবৎ,কোনওটির ড়কারবৎ উচ্চারণ হয়। অড়ি, পড়ি, বড়ি, ইড়ি, তেড়ি ইত্যাদি শব্দে সংস্কৃতের অন্যান্য বর্ণ আছে, তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি, তজ্জন্য আমরা উহাদের অনার্য্যভাষা বলিতে সাহস করিলাম না।

মৈথিলী হিন্দি উৎপন্ন হইলে উৎকল ভাষা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে। সংস্কৃত তদ্, যদ্ কিম্, অদস্, প্রভৃতি শব্দ মৈথিলীতে যেরূপ আকৃতি ধারণ করিয়াছে, উৎকলেও প্রায় তদ্রূপ দেখা যায়। উহা হইতেই বাঙ্গালায় আসিয়াছে। যে, কে, কিএ, আপন, কেহি এগুলির মৈথিলের সহিত অধিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। উৎকলের যেতে, তেহে, কেতেবেলে নোহিলে এ গুলিও মৈথিলী-জাত। মৈথিলীয় 'দেখিবাক ইচ্ছা অছি' ও উৎকলের'দেখিবারু ইচ্ছা অছি' এদুইটীর প্রভেদ নাই বলিলেও বলা যায়। তবে এস্থলে প্রার্থক্য নাই বলিয়া উভয় ভাষাই যে এক,তাহা নহে,অন্যত্র বহুল পার্থক্য থাকিলেও নৈকট্যও অনেক। তজ্জন্য মৈথিলীর পরে উৎকলের জন্ম বলা গিয়াছে। ক্রিয়া প্রকরণের সাম্য, আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিব।

পরবর্ত্তী ভাষাতে পূর্ব্বতন ভাষার বিভক্তি, কারক ও শব্দাদিতে অনেক সাম্য থাকে, এই নিয়মানুসারেই আমরা যে যে ভাষা হইতে যে যে ভাষার উৎপত্তি, তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন করিলাম। এক্ষণে ঐ সকল ভাষা হইতে কিরূপে বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তদ্বিবরণ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অগ্রে আমরা উক্ত ভাষার বয়োনির্দ্ধারণ করিতেছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।

উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতি।

৬ষ্ঠ অধিবেশন।

(১৭ই। ১৮ই শ্রাবণ-রবি ও সোমবার ১২৯৯ সাল।)

উপস্থিত।

১। শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী।
২। ,, কালিদাস চৌধুরী।
৩। ,, হারাধন তা।
৪। ,, বনয়ারীলাল হাটী।
৫। ,, বিনোদবিহারী চৌধুরী।
৬। ,, কুমুদবিহারী সামন্ত।
৭। ,, হরিদাস সাঁই।
৮। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী।
৯। ,, রাধাগোবিন্দ চৌধুরী।
১০। ,, শ্রীশচন্দ্র তা।
১১। ,, বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু।
১২। ,, প্রতাপনারায়ণ সোম।
১৩। ,, সূর্য্যনারায়ণ দত্ত।

মন্তব্য।

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে পুনর্নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী মহাশয় উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে পুনর্নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত বনয়ারীলাল হাটী মহাশয় উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। সর্ব্বসম্মতিক্রমে পুনর্নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চৌধুরী মহাশয় উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী সামন্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

৪। সমিতির আগামী অধিবেশনে কার্য্যকরী সভা পুনর্গঠিত ও সমিতি সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী সংশোধিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইবে।

৫। সমিতির নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী সংস্কৃত হইয়া বিধিবদ্ধ হইল।

(ক) জাতীয় সমাজ মধ্যে শিক্ষাবিস্তার।
(খ) জাতীয় ধনভাণ্ডার সঞ্চয়।
(গ) শিল্প, কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
(ঘ) জাতিমধ্যে একতা সংস্থাপন।
(ঙ) একখানি জাতীয় পত্র প্রচার।

৬। উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র তা মহাশয় "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" উগ্রক্ষত্রিয় সমিতিতে অর্পণ করায় অতঃপর সমিতি হইতে উক্ত উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি প্রকাশিত হইবে।

৭। উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বনয়ারীলাল হাটী মহাশয় কর্ত্তৃক সমিতি সংক্রান্ত যাবতীয় অর্থ সংগৃহীত হইবে এবং তিনি উক্ত অর্থ কার্য্যকরী সমিতির অনুমতি ক্রমে ব্যয় করিতে পারিবেন।

৮। উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি সংক্রান্ত যাবতীয় অর্থ সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সামন্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইবে এবং তিনি প্রতিনিধি সংক্রান্ত আয়ব্যয়ের হিসাবাদি রক্ষা করিবেন।

৯। যিনি উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির সভ্য হইবেন, তাঁহাকে বৎসরে সমিতির ভাণ্ডারে ১৲ টাকা করিয়া দান করিতে হইবে।

১০। সভ্যগণকে দানের টাকা, সমিতির কোষাধ্যক্ষের নিকট এবং স্ব স্ব মন্তব্য সহ নাম ধাম, সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

১১। মাননীয় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত এইচ, এইচ,রিস্‌লি সাহেব বাহাদুর যে জাতিমালা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাহাতে উগ্রক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। উক্ত পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ কালে যাহাতে ঐ ভ্রম সংশোধিত হয়, সেজন্য সাহেব বাহাদুরের সংগৃহীত বিবরণের যথার্থ প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে অবগত করা নিতান্ত আবশ্যক। ঐ প্রতিবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ভার শ্রীযুক্ত হরিদাস সাঁই মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল।

১২। অদ্যকার সভার কার্য্য বিবরণ উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধিতে প্রকাশার্থ প্রেরিত হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী।
সভাপতি, "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি।"

স্বর্গীয় রামলোচন তা (১)।

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear ;
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air."

GREY.

মানব-সমাজ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলে মহাত্মা গ্রের উল্লিখিত বাক্যটীর অভ্রান্ততা বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না। সাগরের অন্ধকারময় নীরব গর্ভে অগণিত বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বলতম মণিসমূহ উৎপন্ন হয়, মরুভূমে অসংখ্য ফুল লোকচক্ষুর অগোচরে ফুটিয়া আপনার সৌন্দর্য্য বিস্তার করতঃ মরুবায়ুতে সৌগন্ধ হারায়—এ কথায় কাহার অবিশ্বাস আছে? মানবসমাজের অজ্ঞাত প্রদেশে কত শত নরমণি জন্মগ্রহণ করে, কত শত পুরুষ-পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়া আপন মনে আপন কীর্ত্তি-সৌন্দর্য্য বিস্তার করতঃ অজ্ঞাতসারে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া থাকে,একদেশদর্শী মানব তাহার কয়টীর তত্ত্ব রাখিয়া থাকেন? জগতের ইতিহাসে, জীবনচরিতে, সংবাদপত্রের কলেবরে অসংখ্য অসংখ্য মহাপুরুষের নাম পরিলক্ষিত হইলেও, এখনও যে কতশত পুরুষরত্নের নাম ও কীর্ত্তিকাহিনী লেখনী মুখে বিবৃত হইতে বাকী আছে,কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? মানব, উদ্যানস্থিত কুসুমের সৌন্দর্য্যে মোহিত, সৌগন্ধে বিভোর, বনফুলের তত্ত্ব লইতে তাহার অবসর বা স্পৃহা নাই। না থাকুক, কিন্তু নিবিড় অরণ্যেও সুন্দর ফুল ফুটে, এটা জানিয়া রাখিতে হানি কি? আমরা অদ্য একটী ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর বনফুলের চিত্র পাঠকবর্গের সমক্ষে ধারণ করিব। পাঠক মহোদয়গণ! ক্ষুদ্র আমাদের ক্ষুদ্র জীবনীর ক্ষুদ্র কাহিনী শুনিবেন কি?

কুষ্টিয়া, নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রকাণ্ড মহকুমা। কুষ্টিয়ার পশ্চিম সীমায় "মাথাভাঙ্গা রিভার" নামে একটী অনতিবৃহৎ নদী প্রবাহিত। মাথাভাঙ্গা, বিখ্যাত পদ্মানদীর একটী শাখা। পদ্মা হইতে উৎপন্ন মাথাভাঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হওতঃ, স্থানবিশেষে হাউলিয়া, কুমার, পাঙাসি, চুর্ণী, কঙ্কণা প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়া হরধামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। নদীয়া জেলার অন্যতম মহকুমা মেহেরপুর ও কুষ্টিয়ার সীমা যে স্থলে এই নদীর দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানের নাম হাউলিয়া। হাউলিয়ার পূর্ব্ব সীমায় কুষ্টিয়া ও পশ্চিম সীমায় মেহেরপুরের এলাকা। হাউলিয়ার পূর্ব্ব পারে নদীর কিনারায় উত্তর দক্ষিণ লম্বা একখানি গণ্ডগ্রাম দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এই গ্রামের নাম খলিসাকুণ্ডী। খলিসাকুণ্ডীর ২ মাইল ঈশান কোণে আন্দিয়া অবস্থিত। আন্দিয়া একটী ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা তখন ইহার অবস্থা সর্ব্ব বিষয়েই শত গুণে উন্নত ছিল। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র সাধকেন্দ্র রাজা রামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি ব্যতীত এই ক্ষুদ্র পল্লীতে উল্লেখ যোগ্য কোন কীর্ত্তিচিহ্ন পরিলক্ষিত

হয় না। রামকৃষ্ণের অধিকার কালে একখানি খড়োঘরে প্রতি বৎসর কালী-মাতার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা হইত। পরে টাকীর বিখ্যাত মুন্সীবাবুদিগের সময়ে খড়োঘর দালানে পরিণত এবং পাষাণময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি সেই মূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছে। মুন্সীবাবুদিগের আমলে কালিকাদেবীর বহুল পরিমাণে ভূমি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং মহা সমারোহের সহিত পূজাক্রিয়া সম্পন্ন হইত। দুর্দ্দান্ত নীলকর আই, টমাস, কেনি সাহেবের পত্তনি আমলে কালীমাতার ভূ-বৃত্তি অনেক পরিমাণে বাজেয়াপ্ত হইলেও, আমরা বাল্যকালে ইহার বাৎসরিক পূজায় যেরূপ ধুমধাম দেখিয়াছি, এখন তাহার কণামাত্রও পরিদৃষ্ট হয় না। আন্দিয়া এখন স্যার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই বাহাদুরের মালিকী জমিদারীর অধীন। তিলিজাতীয় সাহা বাবুরা এখন ইহার পত্তনীদার। জমিদারী হস্তান্তরিত হইলেও মুন্সীবাবুদিগের বংশধর, "গোঁড়া হিন্দু ও দাতা" বলিয়া খ্যাত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহোদয় এখনও ইহার সেবাইত। তিনি ইহার নিত্য সেবা চালাইতে ও বাৎসরিক রটন্তি পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। কালীমাতার যে কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল, তাহা নানাকারণে নানা রাহু কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া গিয়াছে। কোনমতে বাস্ত ভিটায় জীর্ণ দালানের ভগ্ন কুটীরে মা এক সন্ধ্যা দুটী বেলপাতা ও চারিটী শুষ্ক আতপ তণ্ডুল ভোজন করিয়া কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছেন। তবে নাকি মা লক্ষ বলি খাইয়াছেন বলিয়া শরীরে কিছু পূর্ব্বরক্ত সঞ্চিত আছে, আর সহস্র সহস্র জনের মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়া পূর্ব্বে মা আমার নানাবিধ মানসিক ভোগ রাগে ভোগদেহের যথেষ্ট পরিমাণে স্থূলতা সম্পাদন করিয়া লইয়াছিলেন, তাই আজিও বাতাহারেও মায়ের কাঠামখানি খাড়া আছে। ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভৈরববেশী শিব ঠাকুর কেবল মাত্র বিল্বপত্রের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন। একে বৃদ্ধ, তাতে পাতাহার, শরীরে আর কিরূপে বল থাকিতে পারে? নইলে ক্রোধোন্মত্ত রক্ষকুলপতি রাবণের বজ্রসার বাহুর বজ্রমুষ্টিতে যে মহাদেবের মস্তকের সামান্য একখানি অস্থিও ভগ্ন হয় নাই, ভগ্ন দালানের জীর্ণ কড়িকাঠের আঘাতে সেই মহাদেবের দেহটা একেবারে আওলাইয়া গিয়াছে, একি সামান্য বিস্ময়ের কথা! হায়! যে মহারাজার বদান্যতা গুণে কতশত লোকের পাকা ঘর, কত অনাথা বিধবার অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতেছে, যে সাহা বাবুদের বালকবালিকাদিগের প্রাতরাশের জন্য দৈনিক তিন মণ দুগ্ধের ব্যয় হইয়া থাকে, যে যতীন্দ্রনাথের ঘোড়ার সহিসের ও কোচম্যানের বেতন ব্যয়ে একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে,সেই সকল হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অর্থশালী মহাত্মাদের অধীনে থাকিয়া জগত-পিতা ও জগন্মাতার আজ মাথা রাখিবার একটু স্থান নাই, অর্থাভাবে সেবা চলে না, সেবাইতপুরোহিত ঋণগ্রস্ত, অর্দ্ধাশনে শীর্ণকলেবর ; একি কম আক্ষেপের কথা! অল্প ক্ষোভের বিষয়! কালীমন্দিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ও মায়ের সেবার অবস্থা ভাবিলে চক্ষে জল আসে, এই সকল ধনিবর্গের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়, ইঁহাদের ধনে শত ধিক্কার দিতে বাঞ্ছা জন্মে।

আন্দিয়া গ্রামখানি বহুকালের প্রাচীন না হইলেও দুইশত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরেজ

রাজত্বের কল্যাণে এবং কালমাহাত্ম্যে দেশের অবস্থা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—ভূমি যেরূপ উর্ব্বরা শক্তি হারাইয়াছে, দ্রব্য সকল যেরূপ দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ডসনের বুট মল্লিক নেফিউএর সার্ট,"যমুনা পুলিনে বসে কান্দে রাধা বিনোদিনী" পেড়ে বিলাতী ধুতি এলোকেশী গামছা, মুক্তকেশী চিরুণী হাসিখুসি আয়না, হ্যাট কোট, কলার কম্পর্টার, তোয়ালে রুমাল, ষ্টকিং প্রিজারভার, বডি জ্যাকেট, সেমিজ কামিজ, পমেটম সাবান, ল্যাভেণ্ডার অডোটিরোজ, দুল এয়ারিং, অনন্ত বালা, গঙ্গাযমুনা মল, দেলখোস বাগান, কি বাহার সূর্য্যহার, গোঁপহার দড়াহার প্রভৃতি অভিনব অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব পদার্থনিচয়ের বর্ত্তমানকালে যেরূপ দিগন্তব্যাপী ছড়াছড়ি হইয়াছে, পূর্ব্বকালে ইহার নাম গন্ধ না থাকিলেও, দেশে এখনকার মত অন্নবস্ত্রের কষ্ট ছিল না। বিশেষতঃ আমরা দেশের যে অংশের বিষয় বর্ণন করিতেছি তথায় ঘৃত দুগ্ধ, মৎস্য মাংস, শাক সবজী এবং শস্যাদি এত প্রচুর পরিমাণে মিলিত যে, এখন সে সব বিষয় চিন্তা করিলে স্বপ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। টাকায় ১৬ সের তৈল, ৮ সের ঘৃত, ২ মণ দুগ্ধ ৩ মণ চাউল, ২ মণ দাইল,৪ মণ ধান্য, এক পয়সায় বা বিনা পয়সায় প্রচুর মৎস্য বঙ্গদেশের আর কোন অংশে পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। এক টাকা করে ১০ বিঘা ১২ বিঘা (এখনকার ১৬।২০ বিঘা) জমি রাণী ভবানীর জমিদারী ব্যতীত অন্যত্র সম্ভবে না। এই সকল কারণে নানা দেশ হইতে অনেকে আসিয়া এ অঞ্চলে বসবাস করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ এদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কায়স্থই রাঢ়ী শ্রেণীভুক্ত। দেশের এখন আর সে অবস্থা নাই। আমাদের বর্ণিত আন্দিয়া উল্লিখিত সম্পদে আদর্শস্থানীয় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীনদের কথা দূরে থাকুক, আমরা ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে বাল্যকালে আন্দিয়ার অবস্থা যাহা দেখিয়াছি এখন তাহার কণামাত্র দৃষ্ট হয় না। সোণার আন্দিয়া এক্ষণে নানাপ্রকারে দারিদ্র্যভারে পীড়িত।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের শক্তিগড় ষ্টেসনের ৩ মাইল দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রাম। এই গ্রাম হইতে প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে মহাদেব হাজরা নামক জনৈক উগ্রক্ষত্রিয় আসিয়া আন্দিয়াতে বাস করেন। তাঁহার পূর্ব্বে নদীয়া জেলাতে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বাস ছিল না এবং অদ্যাপি আন্দিয়া ও খালিসাকুণ্ডী ব্যতীত নদীয়া জেলার অন্যত্র উগ্রক্ষত্রিয়ের বাস নাই। এদেশে মহাদেব হাজরাই উগ্রক্ষত্রিয়বংশের আদিপুরুষ। এদেশে স্বজাতির অভাব নিবন্ধন মহাদেব, বর্দ্ধমান জেলাস্থ বর্দ্ধমান নগরীর উত্তরস্থিত কলিগ্রাম হইতে পাত্র আনিয়া স্বীয় ভগিনীর বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করতঃ তাঁহাকে এই খানেই বাস করিতে বাধ্য করেন। এই পাত্রের নাম সাফলরাম তা। ইনিই এখানকার তা বংশের আদিপুরুষ। বর্ত্তমানে এখানে তা ও হাজরা বংশীয় ব্যতীত অন্য কোন উগ্রক্ষত্রিয় নাই। পরবর্ত্তী কালে বর্গির হাঙ্গামে নবাব আলিবর্দ্দির আমলে, কোঙার ও রায় এবং তাহারও বহুকাল পরে দত্ত বংশীয় ২।৪ ঘর উগ্রক্ষত্রিয় আসিয়া বাস করিলেও কালক্রমে অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাঁহারা সকলেই এবং তা ও হাজরা বংশীয় কেহ কেহ পূর্ব্ব জন্মভূমি বর্দ্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ও রাজসাহীতে গিয়া বাস করিয়াছেন। এখন আন্দিয়াতে যে ২ ঘর হাজরা ১ ঘর তা ও খলিসা কুণ্ডীতে ২ ঘর তা ও ১ ঘর হাজরা বংশীয়

উগ্রক্ষত্রিয় বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই হাদেব ও সাফলরামের বংশধর।

উগ্রক্ষত্রিয়েরা এদেশে আসিয়া কোন হীন ত্তি অবলম্বন করেন নাই। আচার ব্যবহারে ও ক্রিয়াকাণ্ডে ইঁহারা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন । জোত জমা নিষ্কর ভূমি চাকরী তেজারতি সামান্যরূপ ব্যবসাই ইঁহাদের জীবিকা র্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। কৃষি-ব্যবসায় যমন বর্দ্ধমান জেলার সকল জাতিরই মধ্যে ধানরূপে প্রচলিত, এদেশীয় ভদ্রলোকদের ধ্যে সেরূপ কৃষিকার্য্যের প্রচলন নাই। তবে কহ কেহ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন টে কিন্তু উহা দেশাচার নহে। পূর্ব্বকালে খানকার উগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেহ কেহ ষি ব্যবসায় করিতেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে ূমির উপস্বত্বভোগ ও চাকরী ব্যতীত াহাকেও উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে দেখা ায় না। এদেশে ইঁহারা যে পূর্ব্বে অবস্থাপন্ন ও সম্মানিত ছিলেন, রাণী ভবানী ও নবাব আলিবর্দ্দি প্রদত্ত বহুল পরিমাণে নিষ্কর ভূমি বৃত্তির সনন্দই তাহার প্রধানতম প্রমাণ। মান সম্ভ্রম পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকিলেও দেশের অবস্থার সহিত ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হীন হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কলিগ্রাম হইতে সাফলরাম বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আন্দিয়া আসিয়া বাস করেন। দেশের তাৎকালিক অবস্থা দৃষ্টেই সাফলরাম জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া এদেশে বাস করিতে বাধ্য হন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যাহাহউক, কালক্রমে সাফলরামের ৪টী সন্তান জন্মে। প্রবন্ধের বিস্তৃতি ভয়ে আমরা অপর তিন পুত্রের এবং তাঁহাদের বংশধরগণের বিষয় উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। সাফলরামের দ্বিতীয় পুত্র লীলাম্বর তা। ইঁহারও চারি পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাকান্ত আন্দিয়াতেই বাস করেন। দ্বিতীয় সনাতনের সন্তানগণ এক্ষণে বর্দ্ধমানের ১ মাইল উত্তর মুজাপুরে ও চতুর্থ গৌরের পুত্র প্রথমে গোবিন্দপুরে ও এক্ষণে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজসাহী জেলার অন্তর্গত জয়পুর গ্রামে বাস করিতেছেন; তৃতীয় রূপ উদাসীন হইয়া দেশত্যাগী হন। রমাকান্ত বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কুলীনপ্রধান মল্লিকপুর গ্রামের গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর শ্রীমতী নাম্নী প্রথমা দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। রমাকান্তের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। মা সরস্বতীর সহিত তাঁহার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে চাকরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে বড় সহজ ছিল না। উপযুক্ত জমিজমাও ছিল না,যাহার আয়ে তাঁহার সংসার চলিতে পারে। দেশাচারগুণে এবং বংশমর্য্যাদার খাতিরে রমাকান্ত কোন নীচবৃত্তিও অবলম্বন করিতে পারেন নাই। এরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া রমাকান্তের পরিবার প্রতিপালন করা কত বড় কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিয়া লউন। পাঠক বলিতে পারেন, তবে কি উপায় অবলম্বন করিয়া রমাকান্ত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তৎকালে দেশের অবস্থা ভাল ছিল; এমন "নাই নাই খাই খাই" অবস্থা ছিল না। রমাকান্ত সামান্য পুঁজি লইয়া ব্যবসায় করিতেন। ভিন্ন গ্রাম হইতে সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিয়া নিজ গ্রামে এবং নিজ গ্রাম হইতে খরিদ করিয়া ভিন্ন গ্রামে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু লভ্য প্রাপ্ত হইতেন,তদ্দ্বারাই কোন মতে তাঁহার পরিবারের জোলাটে কাপড় ও আশুধানের অন্নের

সংস্থান হইত। মাথায় করিয়া পণ্যদ্রব্য বহন করা ভদ্রলোকের পক্ষে অপমানের কথা। এ অপমান স্বীকার করা ভাল কি মন্দ, তাহা আমরা বলিতে চাহি না। তবে দেখিতে পাই, যে স্থলে সাধারণ জাতি এক টাকা পুঁজিতে পান সুপারি বা তত্তুল্য কোন দ্রব্য খরিদ করিয়া মাথায় করিয়া বহন করতঃ বিক্রয় করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেছে, ভদ্র আখ্যা-ধারী নিরক্ষর পুরুষরত্ন সেই স্থলে স্বীয় জননী ও স্ত্রীপুত্রকে অন্ন বস্ত্রের কষ্টে মৃতপ্রায় দেখি-য়াও অপমান ভয়ে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠানুভব করিয়া স্বীয় ভদ্রত্ব বজায় রাখিতেছেন। রমাকান্ত এরূপ অপমান স্বীকার করিতেন কি না জানিনা, কিন্তু তাঁহার এই ক্ষুদ্র বাণিজ্যের ক্ষুদ্র আমদানি রপ্তানি কার্য্য নির্ব্বা-হের জন্য একটী হৃষ্টপুষ্ট বলিবর্দ্দ নিযুক্ত ছিল। যাহাহউক এরূপ সামান্য ব্যবসায় দ্বারা রমাকান্ত স্বীয় পরিবার প্রতিপালন করিতেন। এরূপ দরিদ্র অবস্থার মধ্যে ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র কুটীরে সন ১২০১ সালের বৈশাখ মাসে রমা-কান্তের ঔরষে তাঁহার পত্নী শ্রীমতীর গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। এই পুত্রই আমাদের ক্ষুদ্র প্রবন্ধের ক্ষুদ্র নায়ক মহাত্মা রামলোচন তা। রামলোচনের জন্মের পর,কাল-ক্রমে রমাকান্তের রামধন, রামরতন নামে আর দুইটী পুত্র সন্তান এবং চারিটী কন্যা জন্মে। এই সপ্ত ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে এখন কেহই জীবিত নাই। তিন সহোদরের বংশধরেরা এক্ষণে দুই পরিবারে বিভক্ত হইয়া আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত খলিসাকুণ্ডীতে বাস করিতেছেন।

রামলোচন তা ইহ সংসার হইতে অনেক দিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ১২৮০ সালের ফাল্গুন মাসের ২৮শে তারিখে ৺ শ্রীবৃন্দাবনধামে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। আজ প্রায় বিংশ বর্ষ অতীত হইতে চলিল রামলোচনে জড় দেহ মানব চক্ষুর অগোচর হইয়াছে, কি "রামলোচন তা" এই নামটী আজিও জীবি ব্যক্তির ন্যায় লোকের অন্তঃকরণে দেদীপ্যমা রহিয়াছে। নিজ জেলাস্থ সমগ্র কুষ্টিয়া, মেহে পুর, চুঁয়াডেঙ্গা মহকুমার উত্তরাংশ, পাব জেলায় পশ্চিম দক্ষিণে প্রায় বার আনা অং রাজসাহীর পূর্ব্বোত্তর প্রদেশ, মুর্শিদাবাদে পূর্ব্বাংশ এবং যশোহরের উত্তর এই সমুদ প্রদেশের অধিবাসিবর্গের নিকট মহা রামলোচন তা স্বীয় কার্য্য গুণে সুপরিচিত ৩০।৩৫ বৎসরের নব্য যুবকদিগের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের ৪০ বৎ সরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে বি রামলোচন তায়ের নাম অবগত নহেন, এরূ ব্যক্তি অতি বিরল। কার্য্যবশতঃ আমর এই প্রদেশের নানাস্থানে গমন করিয়া জানি পারিয়াছি এবং বিশ্বস্ত প্রাচীন ভদ্রদিগে মুখেও শুনিয়াছি, কি বিচারালয়ে উকি আমলাদিগের মধ্যে কি বিবাহাদি সমারো ব্যাপারের মজলিসে, কি দরিদ্রের কুটীরে, কি ধনী জমিদারের দরবারে, এমন স্থল এম দিন নাই যেখানে বা যে দিনে কোন না কো প্রকারে মহাত্মা রামলোচনের গুণাবলী ও নাম কীর্ত্তিত না হয়। আমরা উপরে যে বিস্তৃত ভূভাগের উল্লেখ করিলাম, ইহার মধ্যে কুত্রাপি উগ্রক্ষত্রিয়ের বসতি নাই। এই প্রদেশে উগ্রক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া পরিচয় দিলে অনেকেই বুঝিতে পারে না। কিন্তু রামলোচন তায়ের জাতি বলিয়া পরিচয় দিলে, উগ্রক্ষত্রিয় মাত্রেই বিশেষ আগ্রহ ও সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়া থাকেন। মহাদেব হাজরা এ দেশের উগ্র-ক্ষত্রিয়বংশের স্থাপয়িতা বটেন, কিন্তু রামলোচন তা কর্ত্তৃকই এ দেশে উগ্রক্ষত্রিয়দিগের পরিচয়,

গৌরব ও সম্মান লব্ধপ্রসর হইয়াছে ইহাতে বোধ হয় কাহার দ্বিমত নাই। সমগ্র বর্দ্ধমান জেলার স্বজাতীয় সমাজে রামলোচনের নাম সুপরিচিত না হইলেও, কাটোয়া, কালনা, এবং নিজ বর্দ্ধমান সদরের এলাকাস্থ নানা স্থানের উচ্চবংশীয় উগ্রক্ষত্রিয়দিগের সহিত রামলোচনের কুটুম্বিতা থাকায় তত্তত সমাজে রামলোচনের সুনাম ও সুযশ সম্যক্‌রূপে পরিব্যাপ্ত। কি স্বজাতি কি ভিন্ন জাতি, কি ধনী কি নির্ধন, কি রাজা কি প্রজা, কি পণ্ডিত কি মূর্খ যাঁহারই সহিত রামলোচ-নের একবার পরিচয় হইয়াছে তিনিই আজী-বন তাঁহার নাম বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রামলোচনের গুণের অধিক কি পরিচয় দিব, এতদঞ্চলের অনেক সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ভদ্রলোক "আমি রামলোচন তায়ের সাকুরেত" "তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন" এই বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন।

রামলোচনের ধারাবাহিক জীবনী প্রকাশ করিতে গেলে হয়ত স্থলবিশেষে বিস্মৃতি প্রযুক্ত অসত্যের আশ্রয় লইতে হইবে। ইঁহার জীবনী মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র স্থান পায়, ইহা আমা-দের অভিপ্রেত নহে। আর সেরূপ ধারাবাহিক জীবনী পাঠ করিয়া পাঠকবর্গেরও কোন লাভ নাই, হয়ত তাহা বিরক্তিজনকই হইয়া উঠিবে। যে সকল গুণে রামলোচন এ প্রদেশে সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত, যে গুণাবলীর জন্য তিনি এ অঞ্চলে অমরত্ব লাভ করিয়া অদ্যাপি আপামর সাধারণের নিকট দেবতাবৎ পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতে-ছেন, সেই সকল কীর্ত্তিকাহিনী আমরা নিজে যতদূর অবগত আছি এবং তাঁহার প্রাচীন বিশ্বস্ত বন্ধু ও পারিষদবৃন্দের নিকট শ্রবণ করিয়া যতদূর স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছি, তাহাই আমরা ক্রমশঃ প্রিয় পাঠকবর্গের সমক্ষে প্রকাশ করিব।

সুন্দরী।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী রামায়ণ পড়িতেছে; নির্নিমেষনেত্রে একাগ্রমনে পড়িতেছে। যেখানে পিতৃসত্য পালনে বনবাসী রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বত চূড়ায় আরোহণ করিতেছেন, পশ্চাতে জনকনন্দিনী, কঠিন শিলাখণ্ডে কোমল-চরণতল ছিন্ন হইয়া শোণিত-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে বেদনা নাই, কাতরতা নাই;—নীরবে স্বামীর অনুগমন করিতেছে; তৎপশ্চাৎ ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ দৃঢ়পাদ-বিক্ষেপে চলিয়াছে; সুন্দরী রামা-য়ণের সেই স্থানটী পড়িতেছে। কখন মুখ-মণ্ডল রক্তিমাভ হইতেছে, কখন শুষ্ক ভাব ধারণ করিতেছে; কখন নয়ন-কোণে জল আসিতেছে কখন বা অধর-প্রান্তে হাস্য-রেখা দেখা যাইতেছে।

এমন সময় সত্যচরণ আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সুন্দরীকে তদ্‌গত চিত্তে পড়িতে দেখিয়া বলিল "এত রাত্রি হইয়াছে, এখনও পড়িতেছ?"

সুন্দরী। তোমার যে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাতেই ত পড়িতে ছিলাম।

সত্য। কেন, আমি না থাকিলে কি তোমার ঘুম আইসে না?

সুন্দরী। এখনও যে খাওয়া হয় নাই।

সত্য। কেন?

সুন্দরী। তুমি না খাইলে, কেমন করিয়া খাইব?

সত্য। কেন, এখন হাল আইনমতে তাতে ত দোষ নাই।

সুন্দরী। দোষ না থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যে হাল আইনের বাহিরে।

সত্য। বেশ; তবে আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি খাও।

সুন্দরী। তুমি খাইবে না?

সত্য। আমার যে আজ নিমন্ত্রণ ছিল, এ কথাত বলিয়া গিয়াছিলাম।

সুন্দরী। কই, তা আমি জানি না। তুমি বাহিরে বারেন্দায় গিয়ে বোস গে; আমি খাই।

সত্য। তা যাইতেছি; তত নিবিষ্টমনে কি পড়া হইতে ছিল?

সুন্দরী। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

সত্য। রামায়ণের আজ ত বড় ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখ্‌ছি?

সুন্দরী। কেন?

সত্য। সহসা রামায়ণ পড়ায় তোমার এত রতিমতি হলো; তাতেই বলিতেছি, রামায়ণের আজ ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

সুন্দরী। রামায়ণের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়, আমারই ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এমন রামায়ণ থাকিতে, কেন যে এতদিন কতকগুলো ভুতের বোঝা নাটক নভেল পুড়ে মর্‌ছিলেম, তা জানি না! এক রামায়ণেই যে শত শত নাটক, সহস্র সহস্র নভেল্ আছে, তা একদিনের পড়াতেই বুঝ্‌তে পেরেছি।

সত্য। একদিনেই এত পরিবর্ত্তন?

সুন্দরী। যখন হয়, তখন এইরূপেই হইয়া থাকে। সুন্দরী আজ্ নূতন হইয়াছে।

সত্য। সুন্দরী চিরকালই সুন্দরী, আজ নূতন হইবে কেন?

সুন্দরী। এখন বাহিরে যাও; রাত্রি হইয়াছে।

সত্য। তোমার ঘুম-পাড়ান-ধন ত আসিয়াছে, তবে আর ভয় কি?

এই বলিয়া সত্যচরণ বাহিরে গিয়া বারান্দায় বেড়াইতে লাগিল। সুন্দরী ভোজনে বসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হুগলীতে রামরতন মুখোপাধ্যায়ের বাস। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন সম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত লোক। পিতৃপুরুষ সঞ্চিত অর্থের আয়ের উপর গৃহে বসিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার পরিবারে তাঁহার স্ত্রী, দুই কন্যা, এক পুত্র, এবং পিতৃ-স্বসা ঠাকুরাণী; তদ্ভিন্ন দাস দাসী, পাচিকা, দ্বারবানাদি যেরূপ প্রয়োজন, তাহার সকলই আছে। দুই কন্যা, সুশীলাসুন্দরী ও সরলাসুন্দরী। সুশীলা অষ্টাদশ বর্ষীয়া, সরলার বয়স পঞ্চদশ বৎসর; পুত্র প্রবোধচন্দ্র সর্ব্ব কনিষ্ঠ, বয়স তিন বৎসর।

এই সরলা সুন্দরীই আমাদের আখ্যায়িকার "সুন্দরী"। নামের দীর্ঘতা পরিহার বশতঃই অথবা সরলার স্বকীয় সৌন্দর্য্যের জন্যই হউক, সকলে তাহাকে "সুন্দরী" বলিয়া ডাকিত। সকলের ন্যায় আমরাও তাহাকে "সুন্দরী" বলিয়াই ডাকিব।

সুশীলার বিবাহ ধনবানের গৃহে হইয়াছিল; কিন্তু সুন্দরীর অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। কন্যা দুইটী জন্মিবার বহুদিন পরেও আর সন্তানাদি না হওয়ায়, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী ঠাকুরাণী উভয়েই পুত্র-মুখ-দর্শন-আশায় একবারে হতাশ হইয়া

পড়িয়াছিলেন। ক্রমে সুন্দরী আট বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল; হিন্দু-কন্যা বিবাহের যোগ্যা হইল। আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার সময় নাই, এক দিন সন্ধ্যার সময় রামরতন বাবু তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন "তাইত, বড় ভাবনা হইয়াছে; সুন্দরী বিবাহের যোগ্যা হইল, কি করা যায়।" গৃহিণী ঠাকুরাণী একটুকু হাসিয়া বলিলেন "তাতেই তুমি কয় দিন আহার করিতে পার নাই বটে? তা কি আমি জানি! রতন বাবু একটুকু বিরক্তির সহ বলিলেন "উপহাসের কথা নয়, যথার্থই ভাবনা হইয়াছে।"

গৃহিণী। পাত্র স্থির করিয়া বিবাহ দিলেইত হইল, তার জন্য আর এত ভাবনা কিসের? তোমাকে ত আর টাকার ভাবনা ভাবিতে হইবে না।

রতন। সে ভাবনা থাকিলে তোমায় বলিতে আসিতাম না। কথাটা এই, আর যে আমাদের সন্তান হইবে, সে আশা কিছুমাত্র নাই। সুশীলার বিবাহ যেরূপ বড় লোকের ঘরে দিয়াছি, সুন্দরীর বিবাহও যদি সেইরূপেই দিই, তাহা হইলে পিতা পিতামহের ভিটায় যে সন্ধ্যা পড়িবে, সে আশা আর থাকিবে না। কারণ, আমরা কিছু চিরকাল বাঁচিব না; বড় লোকের সন্তানেরা আসিয়া যে এখানে বাস করিবে, সে কথা নিতান্ত অসম্ভব। আমরাও মরিব, তাহারাও আসিয়া যাহা কিছু আছে, সমস্তই বিক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে; সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার প্রদীপও বন্ধ হইবে। এই আমার ভাবনা।

গৃহিণী। তুমি ভাবিয়া কি স্থির করিলে?

রতন। পাঁচ জন বিচক্ষণ বন্ধুবান্ধবকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহারা সকলেই বলেন যে "যথাযোগ্য গৃহে সুন্দরীর বিবাহ দিয়া, তুমি একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ কর।" এ বিষয়ে তোমার মত কি?

গৃহিণী। আমার মত? দেবতার ধন যে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নষ্ট হইবে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না। আমার দুই মেয়ে থাকিতে যে পরের ছেলে আসিয়া আমার ধন ভোগ করিবে, প্রাণ থাকিতে তাহা হইতে দিব না।

রতন। তবে তুমিই এ বিষয়ে একটা পরামর্শ দাও।

গৃহিণী। কেন, একটী দরিদ্র কুলীনের সন্তান আনিয়া সুন্দরীর বিবাহ দাও, এবং সুন্দরীর নামে সমস্ত বিষয়াদি লেখাপড়া করিয়া দিয়া, জামাইকে বাড়িতে রাখিয়া দাও না; তা'হলেইত সকল দিক বজায় থাকিবে।

পাঁচ জন বিচক্ষণের বিচক্ষণতা সামান্য অবলা-বুদ্ধির নিকট পরাস্ত হইল। গৃহিণীর বাক্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বড়ই আশ্বস্ত হইলেন, মনে মনে বলিলেন "মূর্খ আমি, গৃহে এমন মন্ত্রী থাকিতে কাহার কাছে মন্ত্রণা লইতে গিয়াছিলাম!"

গৃহিণীর পরামর্শই গৃহীত হইল। নবম বর্ষে দরিদ্র-সন্তান সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সুন্দরীর শুভ পরিণয় কার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়া গেল। এইরূপে ধনবানের পুত্রবধূ হওয়া সুন্দরীর ভাগ্যে ঘটে নাই।

কিন্তু এ দিন আর বেশী দিন রহিল না। নূতন জামাতার সৌভাগ্য বশতঃই হউক আর দুর্ভাগ্য ক্রমেই হউক, মুখোপাধ্যায়-দম্পতীর প্রতি বিধাতা সদয় হইলেন। সুন্দরীর বিবাহের তিন বৎসর পরে শেষ বয়সে, মুখোপাধ্যায়-পত্নী একটী সোণার চাঁদ পুত্র প্রসব করিলেন। রামরতনবাবুর অন্ধকারময় গৃহে পূর্ণিমার কৌমুদীরাশি হাসিয়া উঠিল।

এখন পাঠক, বলুন দেখি, সত্যচরণের অদৃষ্টাকাশে অমাবশ্যার উদয় হইল, কি অমা-রজনীর অন্ধকার অপসৃত হইয়া শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ দেখা দিল ?

উনবিংশতি বৎসর বয়সে সত্যচরণের বিবাহ হইয়াছিল। গ্রাম্য পাঠশালায় ছাত্র-বৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া, অবস্থার প্রতিকূলতায় ইংরাজি শিক্ষা-লাভ হয় নাই। বিবাহের পর রামরতন বাবু গৃহে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া জামাতাকে সামান্য ইংরাজি লেখা পড়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। পুত্রটী জন্মিবার কিছুকাল পরে, একদিন সুন্দরীর জননী ঠাকুরাণী কর্ত্তাকে বলিলেন, "সুন্দরীর এখন কিরূপ কি করিবে ?" কর্ত্তা মহাশয় ঈষৎ চিন্তিত ভাবে বলিলেন "আফিসে সত্যচরণের একটী কর্ম্ম করিয়া দিই, তাতেই তার বাড়ির খরচ চলিবে। পরে সুন্দরীর সন্তানাদি হ'লে, তখন একটী বাড়ী করিয়া দিয়া, যাহাতে স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, এরূপ একটা ব্যবস্থা করিয়া দিব"।

রামরতন বাবুর অনেক কর্ম্মচারী বন্ধুবান্ধব ছিল, তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়া শীঘ্রই হুগলীর আদালতে জামাতার একটী কর্ম্ম করিয়া দিলেন। সত্যচরণের ইচ্ছা, যদি কর্ম্মই করিতে হয়, তবে অন্যত্র গিয়া করিব, শ্বশুরালয়ে থাকিয়া করিবনা। কিন্তু সুন্দরী তাহার সে ইচ্ছায় বাধা দিল, বলিল না, তা হইবেনা ; আমি তোমায় অন্য কোথাও যাইতে দিব না। সত্যচরণ তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিল, কিন্তু সুন্দরী কোন কথাই বুঝিলনা। অগত্যা সত্যচরণকে শ্বশুরালয়ে থাকিয়াই কর্ম্ম করিতে হইল। বেতন যাহা পাইত, মাসে মাসে গৃহে মাতা ঠাকুরাণীকে পাঠাইয়া দিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শুনিয়াছি ও দেখিতেছি, মনুষ্যের শ্বশুরালয়ে বাস, যেন বিধাতার একটা অভিশপ্ত সামগ্রী ; বিশেষতঃ দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে। শ্বশুর-গৃহবাসী জামাতা মনুষ্য হইয়াও যেন মনুষ্যত্ববিহীন। তাহার শ্বশুরালয় অবস্থিতিতে পারিবারিক সে উৎসাহ নাই, ব্যস্ততা নাই, সেরূপ আদর নাই, সম্ভ্রম নাই ; দাস-দাসী গণের সেরূপ কার্য্যতৎপরতার প্রয়োজন নাই। সকলেরই যেন একটা তাচ্ছিল্য ভাব ; সে বুঝি জামাই নয়, কে-যেন-কে এক জন। সত্যচরণ নিঃস্ব দরিদ্র-সন্তান, বার মাস শ্বশুর-গৃহে বাস ; তাহার পক্ষে কি, বিধির এ বিধির অন্যথাচরণ হইতে পারে ?

দিবাবসানে সত্যচরণ কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আইসে। হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্য একটু জলের আবশ্যক, শ্বশুরের গৃহে দাস-দাসীর অভাব নাই, কিন্তু তাহা না থাকিলেও, সকল দিন সত্যচরণ যথা সময়ে জল পায় না। দুই চারিবার ডাকিলে, তবে হয়ত একজন পরিচারিকা আসিয়া জল দিয়া যায় ; যে দিন সুন্দরী শুনিতে পায়, সে কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, তাড়াতাড়ি স্বয়ং জল আনিয়া পা ধুইয়া দেয়। নয়টার সময় আহার করিয়া আফিসে যাইতে হইবে, পাচিকা-ঠাকুরাণীর ততটা গা-গোছ নাই ; প্রায়ই সত্যকে যেন তেন প্রকারে উদর পরিতুষ্ট করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। একটা পান খাইয়া আর একটা পান চাহিলে, কোন দিন হয়ত পাওয়াও যায়, কোন দিন বা "আর বুঝি পানসাজা নাই" বলিয়া দাসীরা সারিয়া দেয়। সকল কার্য্যেই এইরূপ ; এবং এইরূপই যে হইবে, সত্যচরণ তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল, সেই জন্যই শ্বশুরালয়ে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। সত্যচরণ বুঝিয়া ছিল বটে, কিন্তু সুন্দরী সরল মনে কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

কথাটা বুঝিতে আর অধিক দিন লাগিল না। সুশীলার স্বামী হরিমোহন আসিয়াছেন। তাঁহার পিতা পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ ; তিনি পিতার কাছে যাইতেছেন। শনি রবি দুই দিন শ্বশুরগৃহে যাপন করিয়া সোমবার পূর্ণিয়া গমন করিবেন। হরিমোহন ধনবানের পুত্র, পিতার একমাত্র সন্তান, বড় আদরের ধন, তাহাতে আবার কতদিনের পর শ্বশুরালয়ে আগমন ; আজ্ যে মুখোপাধ্যায়-গৃহে অশ্বমেধের আয়োজন হইবে, এ কথা কি আর বলিতে হয়! দাসদাসীগণের আজ আর বসিবার অবকাশ নাই ; কেহ বাজারে গিয়াছে, কেহ গোয়ালাবাড়ি ছুটীয়াছে, কেহ বাগানে ফল মূল অন্বেষণ করিতেছে, কেহ শয্যা রচনা করিতেছে, কেহ জল বহিতেছে, কোন নবীনা বা অন্তরালে বস্ত্রাঞ্চলে আপনার স্বেদযুক্ত মুখ খানি মুছিয়া লইয়া অনন্যমনে রূপার ফর্সীতে জল করিতেছে। আর পাচিকা মহাশয়া—তাহার ত আজ্ বড় বিষম দিন উপস্থিত! তাহাকে আজ শাকরন্ধনে অমৃতের আস্বাদ ফলাইতে হইবে—ভক্তিসহকারে তেত্রিশ কোটী দেবতাকে পূজা করিয়া তবে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়াছে। রতনবাবুর পিসিমা ঠাকুরাণী সুশীলাকে লইয়াই ব্যস্ত ; কিরূপে আজ্ তাহার বেশভূষার পারিপাট্য করিয়া তাহাকে মনমোহিনী সাজাইয়া দিবে। জামাতার শ্বাশুড়ীঠাকুরাণীও নিশ্চিন্তা নাই, স্বহস্তে সোণা রূপার বাসন বাহির করিয়া জলযোগের উদ্যোগ করিতেছেন। সুন্দরী ছোট ভাইটীকে কোলে লইয়া মায়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

বৈশাখের দিন, বড় বেলা। অনেক ক্ষণ আয়োজনের পর জামাতার বৈকালিক ভোগ প্রস্তুত হইল। হরিমোহন জল খাইতে বসিলেন। সে জলযোগের উপাদান অবগত হওয়া বড় আয়াসসাধ্য। চন্দ্রের পার্শ্বে নক্ষত্র-রাজির গণনায় যদিও সক্ষম হওয়া যায়, কিন্তু সেই লুচী কচুরি-আদি-পরিশোভিত কস্তুরিকার চারি পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র পাত্র সমূহের সংখ্যা নির্ণয় সম্পূর্ণই আমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত। তাহাতে আঙ্গুর, বেদানা, পেস্তাদি কাবুল আমদানি মেওয়া ফল, ভূমির তরমুজ হইতে গাছের ডাব পর্য্যন্ত সকল দেশীয় ফল ; এলাইচ দানা হইতে আতাবি পর্য্যন্ত মোদকসাধ্য সকল মিষ্টান্ন, ক্ষীর ছানাদি দুগ্ধপ্রস্তুত রসনারাম সকল জিনিসই আছে। হরিমোহন জল খাইতে বসিয়া কোন পাত্র স্পর্শ করিলেন, কোনটী বা নাও করিলেন ; দুই পাঁচটা হইতে একটু একটু খাইতেই উদর পূর্ণ হইয়া গেল।

প্রায় অপরাহ্ণ ছয়টার সময় আফিস হইতে সত্যচরণ বাড়ী আসিলেন। শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুন্দরী বসিয়া আছে। সুন্দরীকে দেখিয়া সত্যচরণ বলিলেন "আজ তোমাদের বাড়ীতে এত ধূমধাম কিসের গা ?" সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল "হরিমোহন এসেছেন।" সত্যচরণ আফিসের পোষাক পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন" তোমার দিদির কপালটা এবার ফিরিয়া গিয়াছে দেখ্‌ছি ; ভগ্নিপতি তোমার আপনাআপনি আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছেন। এমন সময়ে সত্যচরণের জল খাবার আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্যচরণ বারমেসে জামাই, তাহার জল খাবারও বারমাস যেরূপ হয়, সেই রূপই ; তবে আজ তাহার উপর কিছু বেশী বেশী। সত্যচরণ জল খাইতে বসিয়া সুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "আজ উদ্যোগটা কিছু কিছু বেশী। হরিদাদা যদি মাসে মাসে দুই একবার আসেন, তা'হ'লে আমাদের খাওয়া দাওয়াটা

ভালরূপই হয়"। কথাটা সুন্দরী শুনিল বটে, কিন্তু কি জানি কিসের জন্য তাহার মনের ভিতর একটা কেমন গোলযোগ উপস্থিত হইল, এবং তাহার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও উত্থিত হইল।

আমোদ আহ্লাদে সে দিন সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। পর দিন রবিবার আফিস্ বন্ধ, সত্যচরণ বাড়ীতে আছেন। হরিমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রভাত হইতেই প্রতিবাসী সমবয়সী যুবকগণ সমাগত হইতে লাগিল। নানারূপ কথাবার্ত্তার পর, স্নানান্তে পুনর্ব্বার সকলে একত্র মিলিত হইয়া রতন বাবুর বৈঠকখানায় খেলা আরম্ভ করিল। কত উৎসাহ বাক্য, কত আনন্দ সূচক করতালি ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, আবার ক্ষণেকের মধ্যে আকাশ ক্রোড়ে লয় পাইতেছে। যুবকগণ ক্রীড়ামোদে আত্মহারা!

এমন সময় অন্তপুরে মধ্যাহ্নের উদ্যোগ হইল। জামাতৃদ্বয়ের শ্বশ্রূঠাকুরাণী একজন পরিচারিকাকে বলিল "যাগো, জামাইদিগে ডেকে আন।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার পিসি শ্বাশুড়ী সেই গমনোদ্যত পরিচারিকাকে বলিলেন "না, না, বেলা কিছু বেশী হয় নাই, সত্য চরণ পরে খা'বে, আগে হরিমোহনকে ডেকে আন্, সে যার তার সঙ্গে খেতে ভাল বাসেনা"। কথাটায় আর কেহ কিছু বলিল না। তিনি দেখেন নাই যে, সেখানে সুন্দরী বসিয়া আছে, কিম্বা দেখিয়াও ইহা ভাবেন নাই যে, সত্যচরণ সুন্দরীর "যার তার" মধ্যে একজন নহে। সত্যচরণ সুন্দরীর স্বামী—তাহার নারী জীবনের দেবতার দেবতা। "যার তার সঙ্গে" কথাটা সুন্দরীর বক্ষস্থলে নিদারুণ আঘাত করিল, অবলার কোমল বক্ষস্থলে যেন একবারে শতবজ্রে আঘাত করিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়-পারাবারে ভীষণ আবেগময় তুফান উঠিল। নয়ন প্রান্ত হইতে উষ্ণ অশ্রু বিন্দু পতিত হইয়া কপোল-দেশ অভিষিক্ত করিল; কেহ দেখিতে পাইল না। সুন্দরী ধীরে ধীরে আপনার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

বৈঠকখানায় খেলা হইতেছিল। একজন ভৃত্য আসিয়া হরিমোহনকে বলিল "বাবু বাড়ীর ভিতর যান্।" আহারের সময় উপস্থিত দেখিয়া খেলা ভাঙ্গিয়া গেল, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। হরিমোহনও বাড়ীর ভিতর উঠিয়া গেলেন। সত্যচরণ একা বসিয়া রহিল। সেই সময়ে রতনবাবু বাহিরে আসিলেন, সত্যচরণকে সেইরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন "এখনও বসিয়া রহিয়াছ, আহার করিতে যাও নাই? যাও যাও।" সত্যচরণ বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া ভিতর বাড়িতে চলিয়া গেল। গিয়া দেখে, হরিমোহন আহার করিতেছেন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে সুন্দরীর গৃহে প্রবেশ করিল। সুন্দরী তখনও উপাধানে মুখখানি ন্যস্ত করিয়া পড়িয়া আছে। সুন্দরীকে সে অসময়ে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "এখন যে শুইয়াছ, অসুখ হইয়াছে না কি?"

সুন্দরী উঠিয়া বসিল। তাহার চক্ষু দুইটী ছল্ ছল্ করিতেছিল; অশ্রু যেন বেগে বাহির হইয়া আসিতেছে, বহু যত্নে সে অশ্রুস্রোত বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে; এখনি হয়ত উচ্ছলিত হইয়া পড়িবে! সত্যচরণ বুঝিল যে, সুন্দরী কাঁদিতেছিল। সুন্দরীর এই প্রথম রোদন, সত্যচরণও সুন্দরীকে এই প্রথম রোদন করিতে দেখিল; মনে কত ভাবের উদয় হইল; ঈষৎ চিন্তা-বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "একি, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"। "কাঁদি নাই" বলিয়া

সুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইল; বাঁধ কিন্তু আর টিকিল না, ভাঙ্গিয়া গেল। তর তর বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল; সুন্দরী কাঁদিল। সত্যচরণও কাঁদিয়া ফেলিল।

জানিনা, কেন সত্যচরণ কাঁদিল। পাঠক এরূপ অবস্থায় কখনও পড়িয়াছিলেন কি? তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, সত্যচরণ কেন কাঁদিল। পাচিকা আসিয়া ভাতের থালা ধরিয়া দিয়া গেল। সত্যচরণ আহারে বসিল, কিন্তু আহার আর সে দিন হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। সুন্দর শশাঙ্ক-ছবি সুনীল আকাশ ক্রোড়ে ধীরে ধীরে পদ-বিক্ষেপ করিয়া সন্ধ্যাদেবীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিল, সন্ধ্যা-দেবী হাসিয়া উঠিল। তুষার ধবলিত পর্ব্বত-শৃঙ্গে চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে, পর্ব্বত হাসিতেছে; নদী পুলিনে সিকতাপুঞ্জ সৌধ-কর-লাবণ্যে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, স্রোতস্বিনী হাসিতেছে; বৈশাখের নব-বল্লরী-বিশোভিত তরুশির রশ্মি-জালে জড়িত হইয়া চক্ চক্ করিতেছে, তরু-রাজি হাসিতেছে; অমৃত-নিষ্যন্দিনী চন্দ্রিকার শীতল স্পর্শে কুসুম-আভরণা নবীনা লতিকা সুধীর-সমীর-ভরে দুলিতেছে, লতিকা হাসিতেছে। বনে উপবনে, তড়াগে প্রান্তরে, দিগ দিগন্তরে হাস্যলহরী উত্থিত হইতেছে—প্রকৃতি আজ হাস্যময়ী।

কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ, তোমার এই মুখভরা জগৎ-হাসান হাসিতে কি সকলেই হাসিয়া থাকে? ঐ দেখ সরসী মাঝে একদিকে কৌমুদী আসিয়া কুমুদিনীর সহিত কৌতুক করিতেছে, কুমুদিনী হাসিতেছে; আবার দেখ, অন্যদিকে রবি-বিরহ-বিধুরা মলিনা কমলিনী কাঁদিতেছে। এত গেল প্রকৃতি রাজ্যে; একবার মানব-সমাজে এস দেখি। ঐ দেখ, রতনবাবুর অন্তঃপুরে এক প্রকোষ্ঠে শয্যার উপর হরিমোহন উপবিষ্ট, তিনি হাসিতেছেন; বামে সুশীলা সুন্দরী, সেও হাসিতেছে, সম্মুখে রতন বাবুর পিসি ঠাকুরাণী থাকিয়া থাকিয়া, হাসিয়া হাসিয়া কত কথাই না কহিতেছেন, অদূরে গবাক্ষ পথে সুশীলার গর্ভধারিণী অন্তরালে দাঁড়াইয়া সেই সুখের প্রসঙ্গ শুনিতেছেন, তাঁহারও অধর-প্রান্ত হাস্য রেখায় রঞ্জিত। কিন্তু সুন্দরী কই? ঐ দেখ, সেই সরল-হৃদয়া মর্ম্মাহতা বালিকা নিষাদ-নিক্ষিপ্ত-শর-বিদ্ধ-হরিণীর ন্যায় নিভৃত কক্ষে উপবিষ্টা হইয়া নয়ন জলে মনের জ্বালা জুড়াইতেছে। তবে নিশানাথ, যাহারা হাসিয়া থাকে, তাহাদিগকেই তুমি হাসাইতে পার; কিন্তু ক্রন্দনই যাহাদের জীবন ধারণে প্রধান কার্য্য,তাহাদিগকে হাসাইবার ক্ষমতা তোমাতে নাই। অথবা, থাকিলেও, দুঃখীর মুখের প্রতি তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করনা। তুমিও কি মানুষের মত?

সুন্দরী কাঁদিতেছিল। অশ্রুসিক্ত মুখখানি মুছিতে মুছিতে বলিল "তিনিত থাকিতে চাহেন নাই, আমিই যে রাখিয়াছিলাম। তিনি সকলই বুঝিতে পারিয়াছেন; কত মনে কষ্টই না পাইয়াছেন। মন্দভাগিনী আমি, জন্মিয়াই মরি নাই কেন।" সত্যচরণ গৃহে আসিল, দেখিল, সুন্দরীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল ম্লান, প্রভাতী চন্দ্রকলার ন্যায় চক্ষু দুইটী রক্তিমাভ, জলে ভাসিতেছে; বলিল "সুন্দরি, তোমার কি হয়েছে, সারাদিন কাঁদ্‌ছ কেন? আমাকে বলিতে কি কোন দোষ আছে? এতে আমার মনে কি কষ্ট হয় না?"। সুন্দরী এখন মনকে বুঝাইতে পারিয়াছে, হৃদয়কে দৃঢ় করিয়াছে। সে পূর্ব্বের মত আর "কাঁদি নাই" বলিয়া

কাঁদিয়া ফেলিল না, স্থিরকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল "আমাকে লইয়া চল"।

সত্য। কোথায় সুন্দরী?

সুন্দরী। শ্বশুর বাড়ি।

সত্য। কেন সুন্দরি?

সুন্দরী। কেন আর কি; হিন্দুর মেয়ে বিবাহ হয়েছে, শ্বশুর বাড়ি যাইব; চিরকালই যে বাপের বাড়িতে থাকিতে হইবে; এমন ত কোন কথা নাই? কেন, শ্বশুর বাড়ি যাইতে কি আমায় কোনরূপ নিষেধ আছে?

সত্য। কথাটা আজ নূতন শুনছি কি না, তাতেই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

সুন্দরী। শ্বশুর বাড়ি যে কেমন, তা এত দিন বুঝিতে পারি নাই। বুঝি নাই যে, বাপের বাড়ির ক্ষীর সন্দেশ অপেক্ষা শ্বশুর বাড়ির শাক অন্ন অধিক মিষ্ট। শ্বাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা না করিতে পাইলে, স্ত্রীলোকের সে জন্মটা বৃথায় কাটিয়া যায়।

সত্যচরণ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; ভাবিল, একি, সহসা এতদূর পরিবর্ত্তন! "যখন হয়, তখন এইরূপেই হইয়া থাকে"। সুন্দরীর সে দিনকার সেই রামায়ণ পড়ার রাত্রের কথা মনে হইল; পরে হাসিতে হাসিতে বলিল "আমি যে তোমার দরিদ্র স্বামী, সেখানে গিয়া খা'বে কি?"

সুন্দরী। খাইতে না দিতে পার, উপবাস করিয়া থাকিব।

সত্য। উপবাসে যদি প্রাণ বাঁচিত, তবে আর এত ঝন্‌ঝট কিসের?

সুন্দরী। শুনেছি তোমাদের বাড়িতে দেবসেবা আছে, সেখানে অতিথি-ভোজন হয়; আমি সেই ঠাকুর বাড়ির কাজ-কর্ম্ম করিব, তাতেও কি চার্‌টী খেতে পাব না?

সত্যচরণ নির্ব্বাক হইয়া পড়িল। হৃদয় মধ্যে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের উদয় হইল; ভাবিল, আমি কি সুন্দরীর সহিত কথা কহিতেছি? না সুন্দরীরূপে কোন দেবী আসিয়া আমার সহিত ছলনা করিতেছ? একবার তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; চক্ষে জল আসিল; একটু অগ্রসর হইয়া সুন্দরীর সুকুমার কর দুখানি ধারণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "ঈশ্বর করুন, তা যেন কখন তোমায় করিতে না হয়; তিনি নিরাপদে রাখুন, আমি তোমায় ভিক্ষা করিয়া আনিয়া খাওয়াইব"। হাত ছাড়িয়া দিয়া মনে মনে বলিল "তোমায় লইয়া বনে যাইলেও অন্ন মিলিবে"।

সুন্দরী আশ্বস্তা হইল; তাহার মনের সে দুর্ভর ভার যেন অনেকটা বিদূরীত হইয়া গেল; বলিল "ক্ষণকালের জন্যও আর আমার এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই; যত শীঘ্র পার, আমায় ল'য়ে চল"।

"কাল্ বাড়ি যাই, সেখান হতে ফিরিয়া আসিয়াই তোমায় লইয়া যাইব।" এই কথা বলিতে বলিতে সত্যচরণ শয়ন করিল। (ক্রমশঃ)।

শ্রীধনকৃষ্ণ সেন।

রাজা ও প্রজা (৪)।

প্রজাপালনই একমাত্র রাজধর্ম্ম ও রাজকর্ম্ম। উহার মূল এক কিন্তু শাখা অনন্ত। অবস্থা পর্য্যবেক্ষণই মূল কাণ্ড। কাহার কি অভাব বা কোথায় কি প্রাচুর্য্য, তাহা পরম্পরায় বিশ্বস্তভাবে বা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে সম্যক্‌রূপে কখনই তাহার প্রতিবিধান সম্ভবপর নয়। অবস্থা না দেখিয়া বা তাহার প্রকৃতি অবগত না হইয়া ঔষধ প্রদান করিলে, তাহা কি কখন আরোগ্যপ্রদ হয়? যাহাদের অভাব, তাহাদের নিকট সেই করণীয় বিষয় অপ্রতারিতভাবে অবগত হইয়াই হউক বা চারাদি যোগে গুপ্তানুসন্ধান দ্বারাই হউক কিম্বা স্বয়ং নেত্রের বিষয়ীভূত করিয়াই হউক, উহা বিশিষ্টরূপে অবগত হওয়া নরপালকের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। সেই পরিদর্শন কালে বহুমুখ না হইয়া বহুদৃষ্টি হইলে অনেক রহস্যের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত হয়। এইরূপে বিবিধ উপায়ে যে অভাবের নির্ণয় হয়, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। অভাবের যাথার্থতা নির্ণীত হইলেই তাহা নিবারণ হয় না। উহা দূর করিবার জন্য আবশ্যক মত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। আরও প্রতীকার পন্থা অবলম্বন না করিলে, ভবিষ্যতে হয় ত তাঁহাকে ঐ কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হইতে হয়। সকল কার্য্যের যে কেবল বাক্য মাত্রে প্রতিবিধান হয় তাহাও নয়। আর অভাব দূরীকরণ দুঃসাধ্য কিন্তু তা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা নৃপতির উচিত নয়। কার্য্য সঙ্কটে উদাসীন থাকা ভূমিপতির দুষ্পরিণাম মাত্র। এরূপ স্থলে সময়ে সময়ে এরূপও দেখা যায় যে, লোকে প্রকৃত অবস্থা ছদ্মবেশে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে বিষম ভ্রমে পাতিত করে। যথার্থ ঘটনাও গুপ্ত থাকে। কোন্ কার্য্য দ্বারা অনুরাগ বা অপরাগ হয়, কোন্ কার্য্য হিতকর বা অহিতকর, কোন্ কার্য্য পোষণের বা পীড়নের অনুগত, কোন্ কার্য্য রাজা-প্রজার শুভাবহ বা শুষ্ক-বৈর-বর্দ্ধক, তাহার নির্ণয়ক্রিয়া রাজা বা রাজপুরুষের বহু পরিদর্শন ও গভীর আলোচনার উপর নির্ভর করে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা কপটের কাপট্য, চতুরের চাতুর্য্য, দুষ্টের দোষ, সরলের সারল্য নির্ণয় করিতে না পারিলে রাজকার্য্যে নানারূপ ব্যাঘাত ঘটে। এই সকল বিষয় অনুসন্ধান ও নিরূপণ এবং লক্ষ্য করিবার জন্যই অভিজ্ঞ সম্রাটেরা চারাদি নিয়োগের পক্ষপাতী।

কার্য্য বিশেষ সময় বিশেষে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নূতন বা পুরাতন হয়। কিন্তু রাজা ও রাজপুরুষদিগের পক্ষে অতি প্রাচীন কার্য্যও অচিরসঞ্জাতের ন্যায় বিদ্যমান থাকে; এবং এই স্থানেই রাজা ও রাজপুরুষদিগের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সর্প যেমন উপমাংস অর্থাৎ কঞ্চুক পরিত্যাগ না করিলে প্রাচীন দেহের নবীনত্ব সম্পাদন করিয়া শরীর রক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ নরপতি ও রাজপুরুষগণ প্রাচীন বিধি হইতে অভিনব তত্ত্ব নিষ্কাশন করিতে না পারিলে তৎসংসৃষ্ট নব নব অবদান পরম্পরায় প্রকৃতিবর্গের নবানুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন না। আবার রাজা যদি বুঝিতে পারেন যে, প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার প্রকৃত অনুগত—সম্পদ ও বিপদে অদ্বিতীয় সহায়, রাজা বা রাজ্যের জন্য ধন প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্‌গ্রীব রাজাজ্ঞার প্রকৃত অনুসরণকারী, তাহা হইলে তিনি কখনই প্রজাগণের বিরক্তিকর কার্য্যের ছন্দাংশেও দৃষ্টিপাত করেন না।

রাজাই প্রজা-তরুর মূল। মূলে জলসেক না হইলে শাখা পল্লবাদি রসাভাবে এবং প্রবল তাপে শুষ্ক হইতে থাকে। রাজাজ্ঞা উপযুক্ত মতে প্রতিপালন ও অনুজ্ঞাই প্রজাদিগের কর্ত্তব্য। উহা যদি অপকার জনক হয়, তবে সেই অপকারিতা নিষ্কপটচিত্তে ধীরভাবে রাজগোচর করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান হয়। তেজ বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা সে ভ্রম নিরশন করা কখনই উচিত নয়। আবার রাজাজ্ঞা যখন প্রজার ক্ষেমঙ্কর, তখন উহার

দূষণা বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা রক্ষার জন্য সনির্ব্বন্ধভাবে যত্ন করা নরপতির পক্ষেও কখনই শুভাবহ নহে। দোষ উচ্চগামী হইলেই যে শিরোধার্য্য এবং গুণ অধোগামী হইলেই যে পদদলিত হইবে তাহা কখন আশা করা যায় না।

স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপং
হিতান্ন যঃ সংশৃণুতে স কিং প্রভুঃ।

৫ ১ম সর্গ। কিরাত।

যিনি প্রভুকে সৎ পরামর্শ না দেন, তিনি সাধুপদবাচ্য নহেন, আর যিনি হিতার্থ যুক্তি-যুক্ত কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তিনিও অযোগ্য প্রভু।

রাজদণ্ড ধারণ ও চালনে রাজা ভিন্ন আর কাহারও অধিকার নাই এবং উহা স্বভাবেরও বিরুদ্ধ। আর ঐরূপ আকাঙ্ক্ষাও দুরাকাঙ্ক্ষা, বাতুলতা এবং নিয়মেরও বহির্ভূত। কিন্তু হিতোপদেশ দিবার অধিকার সাধারণ বিধি। যাহাতে রাজ্যের অকল্যাণ প্রশমিত হয়, যাহাতে প্রজার ভ্রম দূরীভূত হইয়া জ্ঞানালোক-জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়, যাহাতে প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হয়, যাহাতে বিনাপীড়নে রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়, যাহাতে প্রতিপাল্যের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,যাহাতে শিল্পদ্বার উন্মুক্ত হয়, যাহাতে বাণিজ্যের বৃদ্ধির দ্বারা পণ্যের সহিত জ্ঞানেরও বৃদ্ধি সংঘটিত হয়, যাহাতে মানীর মান রক্ষা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সম্পাদিত হয়, ইত্যাকার পরামর্শ অপক্ষপাতে দিবার অধিকার কাহারও অনায়ত্ত নহে।

অপিচ রাজাও ভাগ্যক্রমেই প্রকৃতিবর্গের পিতৃস্থানীয়। সুরূপে প্রজাপালন ও হিতের জন্য সৎ পরামর্শ শ্রবণ ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার মর্য্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং প্রভুত্ব দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয় আর অধিকারও অক্ষুণ্ণ এবং নিরাপদ থাকে। ইহার অন্যথায় তিনিও ঐ দেবদুর্লভ গৌরব হইতে পরিভ্রষ্ট হন। যিনি হিতার্থে কোন সৎ কথা না শুনিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আদেশ প্রদান করিতে অগ্রসর হন, যিনি সম্যক্ মীমাংসিত ও যুক্তির অনুকূল উপদেশে অসন্তুষ্ট প্রদর্শন করেন, যিনি স্বীয় মতই অখণ্ডনীয় ও অভ্রান্ত বিধি বলিয়া চিত্ত-শিলায় অঙ্কিত করিয়া রাখেন, তাঁহার কার্য্য কলাপ কখনই বিজ্ঞ জনের বিশুদ্ধ চিত্তে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতি-ফলিত হয় না। বরং তিনি ঐরূপ আচরণ দ্বারাই ক্রমশঃ হেয় হইতে থাকেন। ধীর ভাবে, স্থির চিত্তে, নিষ্পক্ষান্তঃকরণে এবং রাগ-দ্বেষাদি পরিশূন্য হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণই সাধারণ বিধি।

উত্তমই হউক আর অধমই হউক, পূজ্যই হউক আর অপূজ্যই হউক,বালকই হউক আর বৃদ্ধই হউক রাজা কখন কাহারও সদুপদেশ পরিত্যাগ করেন না। প্রবল-পরাক্রান্ত দেব-গণেরও তেজঃখর্ব্বকারী মহাশক্তিমান্ মহারাজ দশানন জটাধারী বানরসহায় দশরথাত্মজের সমর-চাতুরীর নিকট মস্তক অবনত করতঃ ক্লান্ত হইয়া মহা ভীতিদায়িনী রণ ভূমিতে নিপতিত! লব্ধজয়শ্রী রঘুকুলধুরন্ধর রামচন্দ্র, রাজ-নীতি শিক্ষার্থ অনুজের সহিত সেই স্থানে জয়োল্লাস-লজ্জা-সংবলিত অপূর্ব্বভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত। রণপণ্ডিত পৌলস্ত্যের হর-নেত্রে দাশরথির দিকে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রূকুটীযোগে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিলেন "প্রভু, শুভস্য শীঘ্রং" ইহাই প্রধান রাজনীতি। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যাহা শুভ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা অনতিবিলম্বে সম্পাদন করাই বিধেয়। উহাতে

শুভদিন শুভক্ষণ বা শুভযোগের অপেক্ষা করিতে নাই। কি জানি সেই শুভ কার্য্যে অলক্ষিতে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিঘ্নরাশি আসিয়া তাহার সেই স্বভাবসুলভ দৈব শুভত্ব বিনাশ করিতে পারে। আর তথাকথিত কাল ব্যতীত সেই সেই অক্লিষ্ট উদ্যম ও সেই সেই প্রবল চিত্তগতি ও উৎসাহ বিচলিত হইতে পারে। তখন সেই সঙ্কল্পিত ও সমীচীন বিধি, উপবিধি যোগে এরূপ বিকৃত ও ক্ষতাঙ্গ হইয়া যাইতে পারে যে, তাহার পূর্ব্বের সেই অনুকূল গতি প্রতিকূলগামিনী হওয়াও অসম্ভব নয়।" এইরূপ বলিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে অবস্থান পূর্ব্বক অপগত শক্তির কথঞ্চিৎ সঞ্চয় এবং যুগপৎ জৃম্ভন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন "দেব, অশুভস্য কাল হরণং" অশুভ কার্য্যে কাল হরণই উত্তম সঙ্কল্প। যাহা রাজ্যের কোন অঙ্গের বিন্দুমাত্র কুশল পম্পা-দন না করিয়া কেবল অকল্যাণের হেতুরূপে বিদ্যমান থাকে, এরূপ কার্য্য সুকর হইলেও কাল প্রতীক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কালে তাহা মঙ্গল ফলপ্রসূ হইলেও হইতে পারে। এই সংক্ষিপ্ত বিধিদ্বয়ের গতি আমার কার্য্যেই প্রমেয়। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আমার নখদর্পণবৎ, শাসিত প্রকৃতিপুঞ্জ আমার পরিবার সদৃশ, দেবগণ আমার আদেশের অনুগত—এমন কি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বরুণও আমার শাসন লঙ্ঘন করিতে শঙ্কাতুর—আমার হুঙ্কারে সকলেরই কার্য্য বিপর্য্যয় ঘটিত। কিন্তু হায়! মদুক্ত ঐ নীতি দ্বয়ের অপপ্রয়োগেই সে সমস্ত কেন্দ্রী-ভূত বল একবারে বিলয়প্রাপ্ত—সমস্ত সঙ্কল্প অতল জলধি-তলগত। যাহা স্বপ্নেরও অগো-চর ও কল্পনারও অবিষয়,—আমি সেই ভক্ষ্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট।"

উদ্যতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতাংশ্ছিন্নন্
শিশূন্ বর্দ্ধয়ন্ প্রোন্নতুঙ্গান্নময়ন্নতান্
সমুন্নয়ন্ বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্।
ক্ষুদ্রান্ কণ্টকিনো বহির্নিরময়ন্
ম্লানান্ মুহুঃ সেচয়ন্ মালাকার
ইব প্রয়োগ নিপুণো রাজা চিরং জীবতু॥

* নবরত্ন। ৯।

কার্য্য বিশেষে রাজা উদ্যানপালকের সহিত সমতুল। যাহার মূল উৎপাটিত হই-য়াছে তাহার পুনঃ সংস্থাপন, কুসুমিতের পুষ্প চয়ন, সযত্নে শিশুর বর্দ্ধন, অতি উচ্চের নম্রতা সাধন, নম্রের উন্নতি বিধান, সমবায়িতের পৃথক করণ, ক্ষুদ্র অনিষ্টকর কণ্টকের বহিষ্করণ, ম্লানের প্রতি জল সেচন, ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োগ-নিপুণ রাজার রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয়। কোথায় কোন্ সামান্য প্রজা দৈব বিপাকে সমূলে উৎ-পাটিত হইয়া বিতাড়িত হইতেছে, কোথায় কোন্ প্রজা সামান্য অর্থাগমেই ভূপতিরও শাসন উল্লঙ্ঘন করিতেছে, কোথায় কোন্ প্রজা, অপরিণত বয়স্ক ও অপ্রাপ্তব্যবহার হেতু দোষানুসন্ধানকারীর ভক্ষ্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, কোথায় কোন্ কোন্ প্রজা, রাজা রাজ্য ও প্রজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে মিলিত হইয়াছে, কে কাহার ক্ষুদ্র শত্রু হইয়া অবিরত যাতনার হেতুভূত হইয়াছে, কে জীবিকা অভাবে মৃতকল্প হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়

* বঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার মৃত মহাত্মা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রজাদিগকে ইক্ষুর সহিত তুলনা করিতেন। অসময়ে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে ইক্ষু হইতে যেমন মিষ্ট রস পাওয়া দুর্ঘট, সেইরূপ অভাবাদিতে তাহার সম্যক্ প্রতীকার না করিলে প্রজার নিকট কর গ্রহণ দুষ্কট। সকল সময়ে নিষ্পীড়ন করিলে ইক্ষু হইতে কি মিষ্ট রস নির্গত হয়?

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারণ ও তাহার সম্যক প্রতিবিধান করিতে পারিলে, তবে রাজশক্তি যথাযথ প্রয়োগ করা হয়। ভয়, মৈত্রী, দান বা গ্রহণ সমস্তই ঐ রত্নাকর-প্রসূত নীতির অন্তর্নিবিষ্ট।

চপলমতি, স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর এবং অপরিণাম ও অদূরদর্শী রাজপুরুষের দোষে নিরীহ প্রকৃতিবর্গ সময়ে২ অকারণে নিপীড়িত হইয়া থাকে। ঐ রাজপুরুষেরা রাজা বা বিধির স্কন্ধে স্ব স্ব দোষ অর্পণ করিয়া আপনারা অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবিমৃষ্যকারী, অবদ্ধপ্রতিজ্ঞ, অঙ্গাঙ্গিভাবসম্পন্ন বা সাঙ্গতিক-সূত্রে-জড়িত রাজপুরুষদিগের দ্বারাই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। তাঁহাদিগের দ্বারা মানীর মানভঙ্গ ও সৎলোক অসৎভাবে দণ্ডিত হয়। নিরপরাধী বিদ্রোহ-দোষে দুষ্ট হয় ও অন্যের উৎপীড়নে অধস্তন কর্ম্মচারিগণ বিষম প্রশ্রয় পায়। নিয়ম তাহাদের অনুগমন করে। আবার সাধুপ্রকৃতি ভূপতির সদয় ব্যবহারে, অশিষ্ট প্রজাও স্বীয় দোষ পরিহার পূর্ব্বক বশগের ন্যায় রাজবৃত্তির অনুসরণ করে। বস্তুতঃ রাজপুরুষের দোষ গুণের প্রতিই প্রজারও বিরাগ অনুরাগ সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে।

যদ্বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজাঃ।

রাজা যেরূপ ভাব অবলম্বন করিবেন, প্রজাও সেইরূপভাবে তাঁহার অনুগমন করিবে।

সময়ে সময়ে এ দৃশ্যও বিরল নয় যে, পালন সূত্রে ভীষণ পীড়ন হইয়া থাকে। কিন্তু পালন ও পীড়ন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্ম্ম। সু রাজা কিন্তু উভয়ের সমন্বয় করিয়া প্রজাপালন-জনিত নির্ম্মল যশে ও সুখে নিমগ্ন হন। পীড়নের পরিণাম পালন না হইয়া, পালন ব্যপদেশে কেবল পীড়ন হইলে, তাহা অন্তরে দৃঢ়বিদ্ধ বষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী হইয়া থাকে। ইতিহাস তাহা ভাবী বংশের জন্য স্বীয় দেহে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখে। পালন করিতে হইলেই যে পীড়ন করিতে হইবে, তাহাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাসে দেখা যায়, কতশত রাজা পীড়ন করা দূরে থাক্, প্রজাপালন জন্য স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। পীড়নেরও সীমা আছে।

রাজপুরুষের দোষে রাজাপ্রজা ও রাজ্যের দুষ্পরিণাম ঘটিয়া থাকে। নীতিশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতপ্রবর চাণক্য বলিয়াছেন—

ভৃত্যদোষে হতঃ প্রভুঃ।

ভৃত্যের দোষেই প্রভুর নাশ ঘটে। যে হেতু অনেক রাজপ্রসাদ-ভাগী, ভূপতির নাম সংযোগে স্বেচ্ছামতে অকথিত অপথে পদার্পণ করেন; স্বীয় দোষ ক্ষালনের জন্য সরল রাজবিধি কুটিল ব্যাখ্যায় অলঙ্কৃত করেন। রাজপুরুষগণ কিরূপ ধাতুর লোক হওয়া উচিত, তাহা জ্ঞানিগণের চিন্তাসমষ্টি-নীতিশাস্ত্রে বিশুদ্ধভাবে অঙ্কিত আছে। রাজপুরুষের কথা আমরা মহামতি ধৌম্যের উপদেশ হইতে দুই চারিটী গ্রহণ করিলাম।

ধৌম্য কহিলেন, "রাজন্! (যুধিষ্ঠির) প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও রাজসংসারে থাকা কঠিন ব্যাপার। * * * * জিজ্ঞাসিত না হইয়া রাজাকে কোন উপদেশ কথা কহিবে না। * অনর্থক প্রলাপ বলিলে মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত অবজ্ঞাত হইয়া থাকেন। * * অতি লঘু কার্য্যও রাজার জ্ঞাতসারে করা উচিত। * অতি উচ্চপদস্থ হইলেও জিজ্ঞাসিত বা নিয়োজিত না হইয়া আপন পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। * রাজার মর্য্যাদা কখনই ভঙ্গ করিবে না। অগ্নি ও দেবতার ন্যায় যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিবে। মিথ্যা উপচার দ্বারা রাজার পরিতোষ করা অবিধেয়।

রাজ নিয়োগে প্রমাদ, গর্ব্ব ও কোপ পরিত্যাগ করিবে। * * প্রভু কর্ত্তৃক কোন প্রসঙ্গ হইলে, কখন অহিতকর কথা কহিবে না প্রবীণ ব্যক্তিও আমি রাজার প্রিয় নহি, এই মনে করিয়া রাজসেবা করিবেন। * * কোন গোপনীয় বিষয় ইতঃস্তত জল্পনা বা রাজার ভ্রমপ্রমাদ লইয়া আন্দোলন করিবে না। * * যে লাভে হৃষ্ট বা অপমানে ব্যথিত না হয়, সেই যথার্থ রাজপুরুষ। * * বলে কখন রাজাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিবে না। * * স্বীয় লাভ দেখিয়া রাজার শত্রুর সহিত বিবাদ ঘটাইবে না। * * কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া উৎকোচ স্বরূপ কিছুই গ্রহণ করিবে না। * * রাজা প্রসন্ন হইয়া যাহা দেন, তাহারই যথেষ্ট আদর করিবে।"

যাঁহার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা পরিচালনের উপর রক্ষিত প্রজাগণের জীবন নির্ভর করে, যাঁহার রসনা পরিচালনের উপর লোকের ধন, মান, ক্রিয়া ও আচার নির্ভর করে, তাঁহার প্রকৃতি কত উন্নত, কত গম্ভীর ও কত মহৎ হওয়া উচিত তাহা বলা যায় না। সামান্য জনের ন্যায় পক্ষপাত বা অজিতেন্দ্রিয়তা তাঁহার পক্ষে মহান্ দূষণীয় ও সমূহ অনিষ্টকর। অগুরু কার্য্যেও চিত্তবৈকল্য বা লঘুতা প্রকাশ তাঁহার পক্ষে মার্জ্জনীয় নয়। উহা তাঁহার ব্যসনের মধ্যে গণ্য করাই বিধেয়। অকারণ ক্রোধ বা হেতুশূন্য দ্বেষের বশীভূত হইয়া কার্য্য করা বা অবিবেচকের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করা বিষম বিপদ্-জনক। বিশেষতঃ কার্য্যাকার্য্যের ভূত, ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পূর্ণ বিবেচনা পূর্ব্বক ইপ্সিত পথে পদক্ষেপ করাই বিধেয়। অকারণে বিরাগভাজন বা অবজ্ঞার আস্পদ হইয়া বিড়ম্বিত হওয়া অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? যখন হিতসাধনই চক্রবর্ত্তীর অন্তশ্চক্রের নিয়ামক, তখন তাহার কার্য্যনেমি প্রশস্ত অবন্ধুর কল্যাণপথে নিয়মিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত তুরঙ্গম, রাজবিধি সুদৃঢ় কশা, রাজকার্য্য রশ্মি, রাজা সারথি, রাজপুরুষ পথদর্শক, সদাচার অস্খলিত সুখসম্পদের সমতল রাজপথ এবং কাল নেমি স্বরূপ। ইহার মধ্যে প্রথম ব্যতীত কাহারও স্বকীয় গুণ না থাকিলে অবশিষ্ট সকলেরই পতন অবশ্যম্ভাবী।

ভারতভূমি যেমন রত্নগর্ভা, হিন্দু প্রজাও সেইরূপ রাজাকে ঐহিক পারলৌকিক সুখের আকর বলিয়া দেখেন। হিন্দু, রাজাকে দেববৎ ও পিতৃবৎ পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকে, ইহা চিরন্তন প্রথা। শাস্ত্রও সেই শাসন স্বীয় অঙ্গে দৃঢ়রূপে জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজা পালনই করুন বা পীড়নই করুন, শোষণই করুন আর পোষণই করুন, সরলই হউন আর কুটিলই হউন, শত্রুই ভাবুন আর মিত্রই ভাবুন, কিছুতেই সে পূজার ব্যতিক্রম ঘটে না। হিন্দু অদৃষ্টবাদী সুতরাং পালনে পীড়ন ঘটিলেও তাহা সেই ভাগ্য লিপির সহিত সংযুক্ত হয়। প্রতিপালকের অনুবৃত্তি করাই হিন্দুর যথার্থ লক্ষণ। কার্য্যক্ষেত্রে যেমন রাজার শুভকামনা হিন্দুপ্রজার লক্ষণ, গার্হস্থ্য প্রণালীতেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রজা পিতৃলোকের পারলৌকিক শুভ কামনায় তাঁহাদের উদ্দেশে অন্ন জল দান করিবেন কিন্তু অগ্রে ভূপতির লোকান্তরিত পিতৃপুরুষের শুভকামনা না করিয়া স্বীয় পিতৃপুরুষগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। পঞ্চদেবতার ন্যায় রাজাও হিন্দুপ্রজার গৃহ দেবতা। এ নিত্য ঘটনা। পুরাণ শাস্ত্রের শাসন এই—

পিণ্ডং পিত্রে ভুবোর্ভক্ত্বা ন প্রদায় চ মানবঃ।
শ্রাদ্ধং করোতি যো মূঢ়ো নরকং যাতি নিশ্চিতং॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ভূমিপতির লোকান্তর গত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড না দিয়া যে মূঢ় ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, সে নরকগামী হয়। ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টবাদীর শাসনবাক্য আর কি হইতে পারে? আর ঐরূপ ঐহিক পারত্রিক প্রভৃতি ক্রিয়ায় আর অধিক পূজা কি হইতে পারে? মহাত্মা শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন সৎ কর্ম্মের ন্যায় অসৎ কার্য্যের বা পাপেরও ষষ্টাংশ রাজভোগ্য। সুতরাং প্রজার পক্ষে রাজভক্তির যেমন আদেশ, রাজার পক্ষেও প্রজাপালন সেইরূপ স্নেহের অনুমতি।

সকল অবস্থাতে ও সর্ব্ব দেশেই দেখা যায় যে, রাজবিধি বড় অপূর্ব্ব বস্তু। উহা বজ্র হইতেও কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল, সমুদ্র হইতেও গভীর এবং গগন হইতেও অনন্ত, উহার প্রকৃতি অতি দুর্জ্ঞেয়। উহা কেবল প্রজারই নিয়ামক নয়, উহাতে রাজশক্তিও সংযত। উহার প্রয়োগ অত্যন্ত বিবেচনা-সাপেক্ষ। দূরবীক্ষণে সামান্য বস্তু যেরূপ প্রকাণ্ড আকারে দৃষ্টিপথে পতিত হয়,উহাতেও সেইরূপ সামান্য দোষ বা গুণ বৃহৎ আকারে প্রকাশ পায়। হিন্দু প্রজার পক্ষে রাজা এইরূপ দেবতা স্থানীয় হইলেও, এইরূপ প্রজার নিয়ন্তা হইলেও,তিনি সকল অবস্থাতেই নগ্নদেহ, হীন বেশ, মুক্তকেশ ও স্থিরপ্রজ্ঞ ঋষিগণের ভৃত্য—কৃতদাস। তাঁহারা ভ্রূভঙ্গীতে যাহা আদেশ করিতেন, রাজা অবিচারিত চিত্তে তাহা শিরে ধারণ করিতেন। উহাতে বিচার বিতর্ক ছিলনা। পক্ষান্তে তপনতেজা, লোকহিতকামী ধার্ম্মিক ঋষিপ্রবরেরাও কখন অযথা আদেশ করিতেন না। তাঁহারা মূল উদ্দেশ্য হইতে কখন বিপথ-গামী হন নাই। যে ঋষিরা স্বকীয় পিতৃ-শ্রাদ্ধে অরণ্যে রোদন ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রজার অসময়ের হিতকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থা বিশেষে রাজাকে দানমূল বিবিধ যজ্ঞের উপদেশ দিয়াছেন। এবং তাহা অকরণে পাপের ভাগী করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। রাজা বা রাজপুরুষগণ অবিচার করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি মনু অবিচারকারী রাজা ও রাজপুরুষের জন্য ইহকালে যশঃ-নাশ ও পরকালের জন্য নরক-কারার প্রকোষ্ঠ বিশেষ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। * মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ইহকালে সদ্য পাপনাশেরও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন "যদি রাজা বা রাজপুরুষ প্রমাদ বশে অন্যায় পূর্ব্বক বিচারে কাহারও দণ্ড বিধান করেন, তবে বরুণদেবের উদ্দেশে সেই দণ্ডের ত্রিশগুণ অর্থ সৎপাত্রসাৎ করিবেন এবং দণ্ডিতের দণ্ড প্রত্যর্পণ করিবেন। (ক) তিনি আরও বলেন রাগ, লোভ বা ভয় প্রযুক্ত বিচারে নিযুক্ত সভ্যেরা অনাচার বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিচার করিলে পরাজিতের যাহা দণ্ড হয়, প্রত্যেক সভ্যের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। (খ) মহর্ষি বশিষ্ঠ ও পরাশর বলিয়াছেন "রাজা অদণ্ড্যের দণ্ড করিলে স্বয়ং প্রাজাপত্য ব্রত এবং সহকারিগণ ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন।" এই সকল বিধির সমন্বয় করিলে দেখা যায়, রাজপুরুষের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। দণ্ডনীতি প্রজারক্ষা পক্ষে মন্ত্রণার ন্যায়ই মূল নীতি। এই জন্য মহামতি শাস্ত্রকারগণ উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ কঠোর বিধির প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

রাজপদ অভূতপূর্ব্ব বিপদের ও অসুখেরও আস্পদ। ইষ্টলাভ হইলে প্রাণিমাত্রেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু রাজধর্ম্ম ইহার বিপরীত। রাজার যত ইষ্টলাভ হয়, ক্রমে তিনি তদনুযায়ী গুরু হইতে গুরুতর বিপজ্জালে জড়িত হইতে থাকেন। নূতন রাজ্যলাভ হইলেই তৎসহ নূতন নূতন আপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। অভিনব রীতি নীতি, অভিনব অভিযোগ, অভিনব অভাব, অভিনব স্বভাব ও আচার ব্যবহারের পর্য্যালোচনা অভিনব বিধি, অভিনব কার্য্য প্রণালী ও অভিনব ব্যবহার তাঁহার চিত্তকে একবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। দৈবী বিপদ্ উপস্থিত হইলে বিপন্ন অপেক্ষা রক্ষকের চিন্তা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; মানুষী আপদ্ ঘটিলে সেই অনিষ্ট নিবারণ করিবার জন্য স্বীয় জীবনেও জলাঞ্জলি দিতে হয়। অজ্ঞাত বিপদ্ পরম্পরায় নরপতির জীবন নিমেষ মাত্রও সুস্থ হইতে দেয় না। অনন্ত বিপদে যাঁহার অনন্ত বিধির প্রয়োজন, রক্ষিবর্গ ব্যতীত যাঁহার পদক্ষেপ করিবার উপায় নাই, বিপদ্ চিন্তায় যাঁহার চিত্ত সকল সময়েই কবলিত থাকে, যিনি রক্ষণীয়ের ব্যাধি স্বীয় দেহে সংক্রমণ করিয়া লন, অতি তুচ্ছ অকরণ জন্য যাঁহার বিপুল যশঃ অতল অখ্যাতি-জলে নিমগ্ন হয়, পদে পদে যাঁহার জীবন নাশের সম্ভাবনা, পরের চিত্তের অনুবর্ত্তনই যাঁহার প্রধান কার্য্য, দুর্লক্ষ্য কারণ যাঁহার আয়ুর্দীপে ঝঞ্ঝাবাতের কার্য্য করে,যিনি ধনে পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকাবৎ আচরণ করিতে বাধ্য, অন্যের রক্ষার জন্য যিনি স্বহস্তে আত্মীয় স্বজনের দণ্ড বিধান করিতে নিয়মিত ও স্নেহ-মমতা-সুখ যাঁহার নিকট স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান যাহার শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ পূরণ করে, যিনি অন্যের শ্রবণে শ্রবণ ও অন্যের দর্শনে দর্শন করিয়া পরিচিতের ন্যায় কার্য্য করেন,যিনি বধ্যকেও ভ্রূকুটী কুটিল মুখে দর্শন করিতে অপারগ, যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যেও ক্ষণকালমাত্র নিশ্চিন্ত মনে ও নিরাপদে যাপন করিতে অসমর্থ, অসন্তোষই যাঁহার নীতি, দম্ভ যাঁহার সহচর, তস্কর যাঁহার অনুগামী, চাটুকারে যাঁহার নিকট সত্য বিষয় সযত্নে গোপন করে, নিয়োজিতের অবিচারে যাঁহার কলঙ্ক, যিনি কূর্ম্মের ন্যায় অবিরত আত্মগোপ্তা ও সশঙ্ক, সেই সর্ব্ব-রক্ষণীয় রাজার বিপদ ভিন্ন সম্পদ কোথায়?

যাঁহার আদেশে অচিন্তনীয় ও অগম্য স্থান পাদপীঠবৎ এবং প্রাতঃসন্ধ্যার বিহারভূমি, যাঁহার আদেশে বসুমতীর উদর বিদীর্ণ হইয়া সুপ্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত, যাঁহার অমানুষ যত্নের ফলে সুদূরস্থিত সবিতার পরিমাপ ও প্রতিকৃতি সহ এই সৌর জগতের গ্রহাদির পরিমাণ, দূরত্ব, চিত্র, গতি, স্থিতি শিশুরও তুণ্ডাগ্রে বিদ্যমান এবং যাঁহার আদেশে জাতি, শ্রেণী, সমাজ,আচার,বিবাদ,ব্যবহার, মীমাংসা প্রভৃতি মানবীয় কার্য্য সংযত, যাঁহার ওষ্ঠপুটে অগ্নি ও জল উভয়ই একত্রে অবস্থান করে, যাঁহার সাহায্যে সাগরে সাগরে সংযোজিত, যাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া মানব নিরাতঙ্কে কাল যাপন করিতে সমর্থ, যাঁহার প্রতাপমাত্রে আততায়ীরও বৈরনির্য্যাতনে অন্তঃকরণ ভীত হয়, যাঁহার কার্য্যকলাপই তত্তৎ কালের ইতিহাস দেহের কঙ্কাল স্বরূপ, যিনি প্রজার নিকট পরমপূজ্য, যিনি বসুমতীর ন্যায় সকল উৎপাত সহ্য করিতে সমর্থ ও সকলের একমাত্র আশ্রয়, যিনি ফুৎকারে সমস্ত মানবীয় কার্য্য বিপর্য্যস্ত করিতে সক্ষম এবং পিতাপুত্রেরও যিনি মধ্যস্থ, ইত্যাকার কার্য্যকলাপের একটী মাত্র চিন্তা করিয়া তিনি, যে অতুল সুখে নিমগ্ন হন, তাহা সাধারণ মানবের অননুভবনীয়।

শ্রীরামশঙ্কর রায়।

*১২৮ ৮অ মনু। (ক) ৩১০।২অ।যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (খ) ৪।২অ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

কবিতা।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

১

ভুলেছ কি প্রিয়তমে, ভুলিতে কি পেরেছ ?
কেমনে সে স্নেহরজ্জু, বল দেখি ছিঁড়েছ ?
পূর্ব্বের সে ভালবাসা,
পূর্ব্বের সে স্নেহভাষা,
সেই প্রণয়েরি কথা সকলি কি ভুলেছ ?
বিস্মৃতি-সাগর-নীরে ভাষা'য়ে কি দিয়েছ ?
ভুলে থাক ভুলিয়াছ,
ভাল কাজ করিয়াছ,
আমি কিন্তু পারিবনা এ জীবন থাকিতে—
মোহিনী মুরতি তব না পারিব ভুলিতে।

২

প্রিয়ে !
এ সংসার মরুভূমি, তৃষিত পথিক আমি,
ছায়াজল পূর্ণ তুমি ওয়েসিস্ তায় ;
বিষয়-আতপ তাপে,
ক্ষীণ তনু যবে কাঁপে,
আশ্রয় পাইব প্রিয়ে তোমার ছায়ায়।
বহিঃ চক্ষু রুদ্ধ করি,
মানসে ও মুখ হেরি
তৃষায় সলিল পাই—সুখের সাগরে ভাসি,
স্বার্থ-প্রণোদিত প্রিয়ে তাই এত ভালবাসি।

৩

পীনোন্নতপয়োধরা সুরূপা ললনাকুল,
সুষমা-আধার-ভূত দেখেছি কতই ফুল ;
সুনীল আকাশ কোলে ভুবনমোহন
দেখেছি শারদ চাঁদ রজত বরণ ;
সজল-জলদ-মালা,
দেখেছি দামিনী খেলা ;
কিন্তু বড় সুখ পাই, দেখে ও অতুল হাসি।
স্বার্থপ্রণোদিত প্রিয়ে তাই এত ভালবাসি।

৪

সুখনিধি পাব আশে,
দুশ্ছেদ্য প্রণয়-পাশে,
শৈশবেই স্ব-ইচ্ছায় এ পরাণ বেঁধেছি
এ জনমে ছিঁড়িব না,
ছিঁড়িতেও পারিব না,
পারিলেও ছিঁড়িব না,
অধীনতো হইয়াছি, অধীনই থাকিব,
সুখ পাই নাহি পাই, আশা কেন ছাড়িব ?

৫

স্বার্থপ্রণোদিত তাই,
স্বাধীনতা নাহি চাই,
অধীনত্বে আশা যদি হয় সম্পূরণ ;
স্ব ইচ্ছার অধীনতা সুখের কারণ।
রত্ন আশে রত্নাকরে দিয়েছি লম্ফন ;
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,"

শ্রীরাখালচন্দ্র দে।

এই কি শ্মশান ?

১

এই কি শ্মশান ?
সাঙ্গ কি জীবন-লীলা হয় এই খানে ?
জননী-স্নেহ-পুতলি,
প্রণয়ি-হৃদয়-ডালি,
পিতা মাতা ভ্রাতা আদি—সংসার বন্ধনে
গ্রন্থি যারা, সব কিরে লুকায় এখানে—
এই কি শ্মশানে ?

২

আগুনের তাপমাত্র লাগিলে সন্তানে,
জননী তাহার তরে
কতই ভাবিয়া মরে,
কিন্তু শেষ দিনে তারে আনিয়া এখানে,
চিতা সাজাইয়া হায় ! পোড়ায় আগুনে—
এই কি শ্মশানে ?

৩

যে প্রণয়ী লয়ে তার হৃদয় রতনে,
দিবা নিশি হৃদি'পরে
রাখিত যতন ক'রে,
নিবিলে জীবন-দীপ, তারে এই স্থানে
চিতানলে ভস্ম করি যায় শূন্য প্রাণে—
এই কি শ্মশানে ?

৪

যে পিতা মাতারে পুত্র পরম যতনে
দেবতা সমান ভেবে,
পূজিত ভকতি ভাবে,
জীবনের যবনিকা পতনের সনে,
দাহ করি যায় চ'লে চিতার আগুনে—
এই কি শ্মশানে ?

৫

সহোদর-সহোদরা যাহাদের সনে,
শৈশবের রঙ্গালয়ে,
নব নব অভিনয়ে
কাটায়েছে দিন ; হায় ! শেষদিনে
সে সবে আহুতি দিয়া যায় চিতাগুনে—
এই কি শ্মশানে ?

৬

ওই যে রে চিতানল জ্বলিছে ওখানে !
দেখ কি বলিছে হায় !
"জীবনের অভিনয়
হবে সাঙ্গ হে মানব ! শেষের সে দিনে,
সব আশা ফুরাইবে এমনি আগুনে—
এই সে শ্মশানে।

৭

"অহঙ্কার অভিমান ফুরাবে সে দিনে
স্নেহ-ভক্তি-ভালবাসা,
মনের অনন্ত তৃষা,
হিংসা-দ্বেষ-লোভ আদি সব এক দিনে
ফুরা'বে জনম মত এমনি আগুনে—
এই সে শ্মশানে।

৮

"ধনী-দীন সুধী-মূর্খ, সৎ-পাপীজনে
এখানে আসিলে পরে
বৈষম্য থাকিতে নারে,
সাম্য ভাব বিরাজিত এই পুণ্য স্থানে।
এক পরিণাম হবে এমনি আগুনে—
এই সে শ্মশানে।

৯

"এই মহা শিক্ষা-স্থান মানব-জীবনে !
মত্ত যারা অহঙ্কারে,
তুচ্ছ ভাবে ধরণীরে,
ভাবে আর সমকক্ষ নাহি ত্রিভুবনে।
দেখুক সে অহঙ্কার মিশাবে কেমনে—
এই সে শ্মশানে।

১০

"হে বিলাসি ! দেখ আসি এই শিক্ষাস্থানে,
যে শরীর অবিরত
সাজা'তে রয়েছ রত,
সুবাসিত কর যাহা সুগন্ধ লেপনে ;
সে শরীর এক দিন মিশাবে কেমনে—
এই সে শ্মশানে।

১১

"হে ধনিন্ ! বৃথা কেন মত্ত তুচ্ছ ধনে ?
এক বার দেখ আসি,
ওই তব ধন-রাশি
কোথায় পড়িয়া রবে সে ভীষণ দিনে,
আসিবে হে যবে তুমি এই শিক্ষাস্থানে—
এই সে শ্মশানে।

১২

"স্নেহ-ভক্তি-প্রণয়ের সুদৃঢ় বন্ধনে
বাঁধা যারা পরস্পরে,
ভাবে বুঝি এ সংসারে
হবেনা বিরহ কভু এ সুখ-মিলনে ;
দেখুক ! সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিবে কেমনে—
এই সে শ্মশানে"।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

কবিতা।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

১

ভুলেছ কি প্রিয়তমে, ভুলিতে কি পেরেছ ?
কেমনে সে স্নেহরজ্জু, বল দেখি ছিঁড়েছ ?
পূর্ব্বের সে ভালবাসা,
পূর্ব্বের সে স্নেহভাষা,
সেই প্রণয়েরি কথা সকলি কি ভুলেছ ?
বিস্মৃতি-সাগর-নীরে ভাষা'য়ে কি দিয়েছ ?
ভুলে থাক ভুলিয়াছ,
ভাল কাজ করিয়াছ,
আমি কিন্তু পারিবনা এ জীবন থাকিতে—
মোহিনী মুরতি তব না পারিব ভুলিতে।

২

প্রিয়ে !
এ সংসার মরুভূমি, তৃষিত পথিক আমি,
ছায়াজল পূর্ণ তুমি ওয়েসিস্ তায় ;
বিষয়-আতপ তাপে,
ক্ষীণ তনু যবে কাঁপে,
আশ্রয় পাইব প্রিয়ে তোমার ছায়ায়।
বহিঃ চক্ষু রুদ্ধ করি,
মানসে ও মুখ হেরি
তৃষায় সলিল পাই—সুখের সাগরে ভাসি,
স্বার্থ-প্রণোদিত প্রিয়ে তাই এত ভালবাসি।

৩

পীনোন্নতপয়োধরা সুরূপা ললনাকুল,
সুষমা-আধার-ভূত দেখেছি কতই ফুল ;
সুনীল আকাশ কোলে ভুবনমোহন
দেখেছি শারদ চাঁদ রজত বরণ ;
সজল-জলদ-মালা,
দেখেছি দামিনী খেলা ;
কিন্তু বড় সুখ পাই, দেখে ও অতুল হাসি।
স্বার্থপ্রণোদিত প্রিয়ে তাই এত ভালবাসি।

৪

সুখনিধি পাব আশে,
দুশ্ছেদ্য প্রণয়-পাশে,
শৈশবেই স্ব-ইচ্ছায় এ পরাণ বেঁধেছি
এ জনমে ছিঁড়িব না,
ছিঁড়িতেও পারিব না,
পারিলেও ছিঁড়িব না,
অধীনতো হইয়াছি, অধীনই থাকিব,
সুখ পাই নাহি পাই, আশা কেন ছাড়িব ?

৫

স্বার্থপ্রণোদিত তাই,
স্বাধীনতা নাহি চাই,
অধীনত্বে আশা যদি হয় সম্পূরণ ;
স্ব ইচ্ছার অধীনতা সুখের কারণ।
রত্ন আশে রত্নাকরে দিয়েছি লম্ফন ;
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,"

শ্রীরাখালচন্দ্র দে।

এই কি শ্মশান ?

১

এই কি শ্মশান ?
সাঙ্গ কি জীবন-লীলা হয় এই খানে ?
জননী-স্নেহ-পুতলি,
প্রণয়ি-হৃদয়-ডালি,
পিতা মাতা ভ্রাতা আদি—সংসার বন্ধনে
গ্রন্থি যারা, সব কিরে লুকায় এখানে—
এই কি শ্মশানে ?

২

আগুনের তাপমাত্র লাগিলে সন্তানে,
জননী তাহার তরে
কতই ভাবিয়া মরে,
কিন্তু শেষ দিনে তারে আনিয়া এখানে,
চিতা সাজাইয়া হায় ! পোড়ায় আগুনে—
এই কি শ্মশানে ?

৩

যে প্রণয়ী লয়ে তার হৃদয় রতনে,
দিবা নিশি হৃদি'পরে
রাখিত যতন ক'রে,
নিবিলে জীবন-দীপ, তারে-এই স্থানে
চিতানলে ভস্ম করি যায় শূন্য প্রাণে—
এই কি শ্মশানে ?

৪

যে পিতা মাতারে পুত্র পরম যতনে
দেবতা সমান ভেবে,
পূজিত ভকতি ভাবে,
জীবনের যবনিকা পতনের সনে,
দাহ করি যায় চ'লে চিতার আগুনে—
এই কি শ্মশানে ?

৫

সহোদর-সহোদরা যাহাদের সনে,
শৈশবের রঙ্গালয়ে,
নব নব অভিনয়ে
কাটায়েছে দিন ; হায় ! শেষদিনে
সে সবে আহুতি দিয়া যায় চিতাগুনে—
এই কি শ্মশানে ?

৬

ওই যে রে চিতানল জ্বলিছে ওখানে !
দেখ কি বলিছে হায় !
"জীবনের অভিনয়
হবে সাঙ্গ হে মানব ! শেষের সে দিনে,
সব আশা ফুরাইবে এমনি আগুনে—
এই সে শ্মশানে।

৭

"অহঙ্কার অভিমান ফুরাবে সে দিনে
স্নেহ-ভক্তি-ভালবাসা,
মনের অনন্ত তৃষা,
হিংসা-দ্বেষ-লোভ আদি সব এক দিনে
ফুরা'বে জনম মত এমনি আগুনে—
এই সে শ্মশানে।

৮

"ধনী-দীন সুধী-মূর্খ, সৎ-পাপীজনে
এখানে আসিলে পরে
বৈষম্য থাকিতে নারে,
সাম্য ভাব বিরাজিত এই পুণ্য স্থানে।
এক পরিণাম হবে এমনি আগুনে—
এই সে শ্মশানে।

৯

"এই মহা শিক্ষা-স্থান মানব-জীবনে !
মত্ত যারা অহঙ্কারে,
তুচ্ছ ভাবে ধরণীরে,
ভাবে আর সমকক্ষ নাহি ত্রিভুবনে।
দেখুক সে অহঙ্কার মিশাবে কেমনে—
এই সে শ্মশানে।

১০

"হে বিলাসি ! দেখ আসি এই শিক্ষাস্থানে,
যে শরীর অবিরত
সাজা'তে রয়েছ রত,
সুবাসিত কর যাহা সুগন্ধ লেপনে ;
সে শরীর এক দিন মিশাবে কেমনে—
এই সে শ্মশানে।

১১

"হে ধনিন্ ! বৃথা কেন মত্ত তুচ্ছ ধনে ?
এক বার দেখ আসি,
ওই তব ধন-রাশি
কোথায় পড়িয়া রবে সে ভীষণ দিনে,
আসিবে হে যবে তুমি এই শিক্ষাস্থানে—
এই সে শ্মশানে।

১২

"স্নেহ-ভক্তি-প্রণয়ের সুদৃঢ় বন্ধনে
বাঁধা যারা পরস্পরে,
ভাবে বুঝি এ সংসারে
হবেনা বিরহ কভু এ সুখ-মিলনে ;
দেখুক ! সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিবে কেমনে—
এই সে শ্মশানে"।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

ঘুড়ি।

আশ্বিন মাসের দিবা অবসান প্রায়,
পশ্চিম গগনে লাল রবি অস্ত যায়।
বাহিরিনু প্রকৃতির শোভা দেখিবারে,
পশিলাম অন্য মনে কানন ভিতরে।
দেখিলাম শূন্য পথে মস্তক উপরে,
উড়ে যায় ঘুড়ি এক সূত্র ছিন্ন ক'রে।
আশে পাশে কত ঘুড়ি করে সন্তরণ,
নীল, লাল, সাদা, কাল নয়ন-রঞ্জন।
দীর্ঘ সূত্রে বাঁধা সবে চারিদিকে ধায়,
হৃদয়েতে সূত্র বাঁধি ঘুরিয়া বেড়ায়।
অন্য মনে স্থির চক্ষে লাগিনু দেখিতে,
কতই কৌশলে ঘুড়ি ওড়ে গগনেতে।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ আপনা ভুলিনু।
জ্ঞান চক্ষে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিনু
অনন্ত আকাশ পটে আমি একধারে,
উড়িতেছি অনিবার বদ্ধ মায়া-ডোরে।
কেবল আমিই কেন? প্রত্যেক মানব
পাইয়াছে দেখিলাম ঘুড়ি অবয়ব।
এক মায়া-সূত্রে সবে রহিয়াছি বাঁধা,
মনে করি উড়ে যাই ত্যজি ঘোর ধাঁধাঁ।
পারিনাত উড়ে যেতে মায়া ডোরে টানে,
স্বার্থ নামে 'লাটায়ে'তে জড়াইয়া আনে।
লাটায়ের নিকটেতে থাকে যেই জন,
তার নাহি হয় কভু দূর দরশন।
যে জন লাটাই হতে বহু দূরে যায়,
অভিনব কত বস্তু দেখিতে সে পায়।
অনেকেই চেষ্টা করে লাটাই ত্যজিতে;
কিন্তু হায় কোথা যাবে বদ্ধ যে মায়াতে!
সাধুসঙ্গ 'সুবাতাস' পায় যেই জন,
উচ্চে উঠে মন-সুখে করে বিচরণ।
উঠিবার কালে কেহ ঘুরে ঘুরে পড়ে,
গুরুদত্ত মন্ত্র 'কান্নে' লভি পুনঃ ওড়ে।
কদাচ কখন কালে দুই একজন,
উর্দ্ধে উঠি সূত্র ছিঁড়ি করে পলায়ন।
মায়া-সূত্র পড়ে রয় ঘুড়ি যায় চলে,
নাচিতে নাচিতে নীল আকাশের কোলে।
দৃষ্টি পথ ছাড়ি দূরে হয় অন্তর্দ্ধান,
কোথা যায় কেহ তার না পায় সন্ধান।
পূর্ব্বকালে কত ঘুড়ি ছিড়িয়া বন্ধন,
হইতেন মুনি ঋষি বিখ্যাত ভুবন।
মনে হয় ঘুড়ি এক নারদ নামেতে,
সূত্র ছিঁড়ি উড়ে ছিল আকাশ তলেতে।
সযতনে বহুধ্যানে ছিঁড়ি মায়াসূত্র,
ঋষি নামে খ্যাত হয়েছিলা বিশ্বামিত্র।
শুক ব্যাশ সনকাদি কতশত ঘুড়ি,
হইয়াছে যত্নে মুক্ত মায়া-সূতা ছিঁড়ি।
রাজ্যরূপ মায়াসূতা ছিঁড়ি শাক্যমুনি,
হয়েছেন বুদ্ধদেব বিখ্যাত অবনী।
যিশু নামে ঘুড়ি এক পশ্চিম আকাশে,
ছিঁড়ে ছিল মায়া-ডোর মজি শান্তিরসে।
চারিশত বর্ষ প্রায় হইল বিগত,
চৈতন্য নামেতে ঘুড়ি গগনে উড়িত।
সাংসারিক মায়া সূতা ছিঁড়ি ধীরে ধীরে,
উড়ে গেল সেই ঘুড়ি বহু বহু দূরে।
তাঁর সনে কত ঘুড়ি মায়া ডোর ছিঁড়ি,
নাচিতে নাচিতে গেছে আকাশেতে উড়ি।
প্রসাদ নামেতে এক ঘুড়ি পুনর্ব্বার,
কালী নামে মত্ত হয়ে ছেঁড়ে মায়া-হার।
সে দিনও দেখিনু ঘুড়ি ওড়ে অগণন,
তার মাঝে সূতা ছিঁড়ে যায় রামমোহন।
কেশব নামেতে ঘুড়ি ছিঁড়ে ছিল তার,
যশোলোভ-ডোরে বাঁধা পড়ে পুনর্ব্বার।
এইরূপে উড়ে পুড়ে সংখ্যা নাহি হয়,
যেখানেই যাক্ চলে মায়া পিছে রয়।
ভাবিতে ভাবিতে ফিরি আইলাম ঘরে,
মানুষ মাত্রেই ঘুড়ি বুঝিনু অন্তরে।

শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়।

সময় ও প্রবৃত্তি।

সময় অনাদি ও অনন্ত; কালস্রোতও অনাদি ও অনন্ত। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্লাবনকারী কালস্রোত বিশ্বপতির অনন্ত মঙ্গলময় ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আপন প্রবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও সংহার কার্য্যে নিযুক্ত। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এই মহাকাল-স্রোতে উঠিতেছে ও আবার ইহাতেই মিশিয়া যাইতেছে। এ মানব-জীবন এ মহাতরঙ্গ মধ্যে সামান্য ঊর্ম্মিমালার ন্যায় উঠিতেছে ও আবার লীন হইতেছে—কত আশা, ভরসা, ভালবাসা, প্রেম, উৎসাহ এই তরঙ্গ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে কে বলিতে পারে? মহাশক্তি সম্ভূত এই মহাতরঙ্গ অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে। কেন চলিতেছে বা কোন্ মহাসাগর উদ্দেশে চলিতেছে কে বলিতে পারে? এই মহাকাল-স্রোতে পড়িয়া কত জগৎ লোপ পাইতেছে, আবার কত নব নব জগতের আবির্ভাব হইতেছে। জগতের মধ্যে আজ যে স্থান ফল-পুষ্প-ভূষিত-বৃক্ষরাজি-পূর্ণ-অত্যুচ্চ অদ্রিশ্রেণীতে পরিশোভিত, কাল হয়ত কালের বশে সে স্থান মহা-সমুদ্রের অতল জলে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। অদ্য যে স্থান সুরম্য-হর্ম্ম্যরাজি-পরিপূর্ণ-নয়নাভিরাম-প্রমোদোদ্যান-পরিশোভিত-বহুজন-সমাকীর্ণ মানব-সমাজের আবাস-ভূমি, কাল হয়ত সে স্থান নিবিড় অরণ্য রাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া পশু পক্ষিপ্রভৃতি বহুবিধ হিংস্র জন্তুর লীলা-ক্ষেত্র হইয়া পড়িবে। পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি প্রাণিগণ হইতে অশেষ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন মানবজাতি পর্য্যন্ত এই মহাকালের অনন্ত বিচিত্র শক্তির বশবর্ত্তী। এই উত্তাল তরঙ্গরাশি-পরিপূর্ণ অনন্ত কাল-বারিধিতে সান্ত মানব সামান্য বুদ্বুদের ন্যায় ভাসমান—কখনও উঠিতেছে, আবার কখন এই পয়োধি মধ্যেই মিশাইয়া যাইতেছে; কখন অনুকূল বাত্যার মৃদু সঞ্চালনে চালিত হইয়া গম্য স্থানের দিকে নীত হইতেছে, আবার কখন প্রতিকূল প্রভঞ্জনে বিতাড়িত হইয়া মহা-তরঙ্গ মধ্যে নিরাশায় নিমজ্জিত ও বিধ্বস্ত হইতেছে। এই উত্তাল তরঙ্গ ক্ষুদ্র মানব হৃদয়কে সর্ব্ব বিষয়েই নাচাইতেছে, ডুবাইতেছে ও উঠাইতেছে। এই খরপ্রবাহী কালস্রোতের মধ্যে মানবের প্রবৃত্তি যেন আপন সত্তা বজায় রাখিতে পারিতেছে না, কেবল যেন ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সময় ভেদে মানব প্রবৃত্তির কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

মানবজাতি যখন সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিক্ষা করে নাই, যখন তাহাদের এক একটী পরিবার এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের ন্যায় আপন শাসন ও নিয়মানুসারে চলিত, গৃহস্বামী যখন আপন ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যে আপন আজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিত—তাহার পুত্রকন্যা দাস দাসী তদাজ্ঞা পালনে বিমুখ হইতে পারিত না ও অন্য কোন রাজাজ্ঞা তাহারা জানিত না, পিতার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তখন এবম্বিধ সমাজে শারীরিক বল একটা বিশেষ আবশ্যকীয় বস্তু ও বিশেষ প্রশংসার সামগ্রী ছিল। মানবজাতি তখন দলবদ্ধ হইয়া নগরে বা গ্রামে বাস করিতে শিখে নাই। প্রায়ই তাহাদিগকে অসভ্যাবস্থায় হিংস্র জন্তুদিগের মধ্যে বাস করিতে হইত। তজ্জন্য তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষার নিমিত্ত ও অপরাপর অত্যাচার হইতে নিজ পরিবার বর্গকে নিরাপদ করিবার জন্য শারিরিক বল ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। কারণ

দেশে রাজা নাই। রাজশাসন নাই বা রাজ নিয়ম প্রচলিত নাই যে, রাজশাসন বা নিয়মের সকলে বাধ্য হইবে বা অন্যায় অত্যাচার করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে; সকলেই স্ব স্ব প্রধান। তজ্জন্যই আপন প্রাধান্য বা মান বজায় রাখিতে হইলে শারীরিক বল ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই সকল কারণে মানুষের প্রবৃত্তিও শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধন জন্য তদনুকূলে ক্রিয়া করিত (তখন শরীরের উৎকর্ষ সাধন জন্য নানা প্রকার ব্যায়াম ও ক্রীড়ার আবিষ্কার হইয়াছিল)। তখন সকলেই প্রায় মানসিক উন্নতি কি নৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল বাহুবল কি উপায় দ্বারা বৃদ্ধি হইবে তাহারই চেষ্টাতে সতত নিযুক্ত থাকিত। এখনও সাঁওতাল ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এরূপ ভাব পরিলক্ষিত হয়।

তদনন্তর মানব সমাজে সামাজিক সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণ জন্য এক একটী পরিবার একত্রীভূত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী বা রাজ্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইল। পারিবারিক নিয়মাদি ও শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল; রাজনিয়ম ও রাজশাসন তাহার স্থান অধিকার করিল। যিনি শারীরিক বল ও তেজস্বিতায় শ্রেষ্ঠ হইলেন, তিনিই রাজ্যেশ্বর রাজা হইলেন। অর্দ্ধশিক্ষিত সামান্য ব্যক্তিগণ এমন রাজার উপর দৈবশক্তির আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হইত না, বরং কেবলমাত্র বাহুবলের প্রাচুর্য্য হেতু এবং অসাধারণ তেজস্বিতা ও সাহসের জন্য রাজাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা অর্চ্চনা পর্য্যন্ত করিত। যদিও সামান্য ব্যক্তিবর্গ মধ্যে বাহুবল তত প্রয়োজনীয় ছিল না, (কারণ তখন তাহারা অনেকাংশে রাজশক্তির আশ্রয় পাইয়াছিল) কিন্তু রাজাদিগের মধ্যে বাহুবল সমধিক প্রশংসার সামগ্রী ছিল। যাঁহার বাহুবল অধিক, সৈন্যবল অধিক, তিনিই রাজচক্রবর্ত্তী হইতেন। জনসমাজও তখন সেই দৈহিক শক্তি বা বীরত্বের পূজা করিতে ত্রুটী করিত না। মানব প্রবৃত্তিও তাহার অনুসরণ করিত। এই জন্যই রামায়ণাদি পুরাণে কথিত আছে যে, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বরুণাদি দেবগণ ভুবনবিজয়ী লঙ্কাধিপতি দশাননের বাহুবল বা বীরত্বে পরাজিত হইয়া তাহার কাছে সামান্য দাসের ন্যায় আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতেন। তখন এমনই বাহুবলের মর্য্যাদা ছিল। এই রূপ বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ হরধনুভঙ্গ, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি পণ রক্ষিত হইয়া রাজকন্যাদিগের স্বয়ম্বর ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইত। মানবপ্রবৃত্তিও এ সময়ে বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল বা নৈতিকবলের প্রাধান্য সাধারণতঃ স্বীকার করিত না।

ক্রমশঃ যখন নৃপতিদিগের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও যুদ্ধবিগ্রহাদির হ্রাস হইতে লাগিল, সামান্য সামান্য রাজ্য লোপ পাইয়া একজন রাজার শাসনাধীনে আসায়, সাধারণতঃ রাজ্য মধ্যে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, তখন সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী (হিন্দুসমাজে) আপন আপন বিদ্যাচর্চ্চার সুবিধা পাইয়া জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমশঃ পার্থিব বিভবাদির নশ্বরতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। কাব্য দর্শন ধর্ম্মশাস্ত্রাদির সৃষ্টি হইতে লাগিল। ভূপতিগণও পণ্ডিতদিগের নিকট অবনতমস্তক হইয়া আপন আপন সভামধ্যে উচ্চ স্থান প্রদান করতঃ তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য শুনিতে পাওয়া যায় হিন্দুরাজাদিগের রাজসভা বশিষ্টাদি মহর্ষিবর্গ কর্ত্তৃক আলোকিত হইত। জ্ঞানের এইরূপ প্রাধান্য বশতই রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত হইয়াও রাজবংশোচিত

অস্ত্রবিদ্যা পরিহার পূর্ব্বক বিদ্যালোচনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডার সমগ্র পৃথিবী করতলগত করিয়াও প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডায়োজিনিসের নিকট অবনতমস্তক হইয়াছিলেন, তাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ চিত্তপ্রসাদ দেখিয়া নিজ অতুল সাম্রাজ্যকেও তুচ্ছ বিবেচনা করিয়াছিলেন। * কালমাহাত্ম্যে এমনই প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, রাজকন্যাদিগের স্বয়ম্বরে আর হরধনুভঙ্গ কি লক্ষ্যভেদ পণ নাই। এখন বিদুষী রাজকন্যারা আপনা-আপনি পণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদিগকে যাঁহারা পরাজিত করিতে পারিবেন, তাঁহারা তাঁহাদেরই অঙ্কশোভিনী হইবেন। মহিলাদিগের মধ্যেও বিদ্যাচর্চ্চার বেশ প্রাদুর্ভাব ছিল। তজ্জন্যই আমরা লীলাবতী খনা প্রভৃতি বিদুষী মহিলাবর্গের নাম শুনিতে পাই। এবম্প্রকারে পাশব শক্তি বিদ্যারূপ দেবশক্তির নিকট পরাভূত হইতে লাগিল; মানবের প্রবৃত্তিও ভিন্ন স্রোতাভিমুখিনী হইয়া নানারূপ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ করিল। মানুষ এখন পূর্ব্বের ন্যায় আত্মরক্ষার জন্য আর নিজ বাহুবলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না; অসাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগে ও বিজ্ঞানপ্রভাবে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া সে কার্য্য অতি সংক্ষেপে সমাধা করিয়া থাকে। একজন সামান্য দুর্ব্বল ব্যক্তি একটীমাত্র কামানের সাহায্যে বোধ হয় শত শত বলশালী লোকের সম্মুখীন হইতে পারে। এমনই বিদ্যার মহিমা! বিজ্ঞান দ্বারা সমাজের এবম্ভূত সুবিধা হওয়াতে সাধারণ প্রবৃত্তিও বিজ্ঞানচর্চ্চার অনুসরণ করিল ও তাহার ফলে নানাবিধ কলকৌশলের আবিষ্কার হইতে লাগিল।

অধুনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ, এখন মানবের প্রবৃত্তি আর পূর্ব্বের ন্যায় শারীরিক কি মানসিক কি বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিকে প্রধাবিত হইতেছে না, মানবপ্রবৃত্তি এখন সাধারণতঃ বৈষয়িক উন্নতির জন্যই সর্ব্বদা লালায়িত। মানুষ দেখিতেছে যে, কি বিজ্ঞানশক্তি, কি মানসিক শক্তি, কি শারীরিক শক্তি সকল শক্তিই এখন অর্থশক্তির মুখাপেক্ষী। বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া যদি তোমার অর্থাভাব হইল, তবে সব বিদ্যাবুদ্ধিই ঊষর ক্ষেত্রে উপ্ত বীজের ন্যায় বৃথায় শুখাইয়া গেল। তাই আজকাল মানবের প্রবৃত্তিসমূহ সবেগে ধনোপার্জ্জনের লালসায় প্রধাবিত।

এই বঙ্গ সমাজেই দেখিতে পাই যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিদ্যার জাহাজ হইয়াও নিরক্ষর ধনী সন্তানের নিকট এক মুষ্টি উদরান্নের জন্য লালায়িত! ইহা দেখিয়া কি অজ্ঞ ব্যক্তি বলিবে না যে, যাহার টাকা আছে সেই সমাজের পূজ্য? এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একজন গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতের এ সম্বন্ধে একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা বিখ্যাত পণ্ডিত ডায়োজিনিসকে এক ব্যক্তি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আপনি এতবড় পণ্ডিত হইয়া সামান্য অর্থের জন্য ধনীর নিকট হীনতা স্বীকার করিতেছেন"? তাহাতে পণ্ডিতবর উত্তর করিয়াছিলেন যে, "যেহেতু একজন নিজের আবশ্যক জানে, অপর ব্যক্তি (ধনী) তাহার নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়ে অজ্ঞ। (১) এইরূপ অবস্থাতে

* "Were I not Alexander, I would wish to be Diogenes."

(১) "How it came to pass that philosophers were the followers of rich men and not rich men of philosophers?"

পণ্ডিত আরিষ্টিপাস আরও বিদ্রূপাত্মক উত্তর দিয়াছিলেন। একদা তিনি অর্থের জন্য রাজার পদতলে পতিত হইয়াছিলেন। অন্যে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে ঈদৃশী হীনতার জন্য ধিকার দিলে তিনি বলিয়াছিলেন, যে "এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন দোষ নাই; ইহা রাজারই দোষ, কারণ তিনি পদের দ্বারা শ্রবণ করিয়া থাকেন" (২)। যাহা হউক ইহা পণ্ডিতদিগের পণ্ডিতোচিত উক্তি হইলেও আপাততঃ অর্থেরই প্রাধান্য বলিতে হইবে। বিদ্যা বল বুদ্ধি বল কিছুতেই কিছু হয় না—এ সংসারে মান্যবান হইতে হইলে টাকা চাই। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে, "অমুক ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভুরভুরি হইয়াও পেটের ভাত যোগাড় করিতে পারেনা, নিজ স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণে অসমর্থ। আর অমুক মণ্ডল নাম দস্তখৎ করিতে শিখিয়াই প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে।" এখন সে বিদ্যা বিদ্যাই নয় যাহাতে অর্থ পাওয়া যায়না। এখন আর বিদ্যার জন্য বিদ্যা চর্চ্চা হয় না, অর্থের জন্য বিদ্যাচর্চ্চা হয়

অবস্থা ও সময়ানুসারে প্রবৃত্তি এতদূর পরিবর্ত্তিত হয় যে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করা অতি সুকঠিন। মানবপ্রবৃত্তি পরিবর্ত্তনের কারণও নানাবিধ। সামান্য সামান্য ঘটনায় মানবপ্রবৃত্তির প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন হইয়া যায়। একটী প্রকৃত ঘটনা শুনিয়াছিলাম। কোন ধনবান সম্ভ্রান্ত লোকের দুইটী সন্তান ছিল। তাহারা উভয়েই প্রথমাবস্থা হইতে একরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছিল। ঘটনা ক্রমে যৌবনের প্রারম্ভে একদিন জ্যেষ্ঠ সহোদর "ধর্ম্মোন্নতি-বিধায়িনী সভার কোন বিখ্যাত বক্তার বক্তৃতা শুনিতে গেল এবং কনিষ্ঠ সহোদরও সেই দিন কোন রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে গমন করিল। তথায় "মৃণালিনীর" অভিনয় হইতেছিল। অভিনেত্রীর হাবভাব ও মধুর তানলয়যুক্ত সুললিত সঙ্গীত শ্রবণে যুবকের কোমল হৃদয় একবারে দ্রব হইয়া গেল। সেই দিন হইতে সে সঙ্গীতের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। বাটীতে আসিয়াই ভাল ভাল ওস্তাদ্ রাখিয়া গান বাজনা শিক্ষা আরম্ভ করিল। কোন কোন বিলাসী বন্ধুও তাহার প্রধূমিত সেই প্রবৃত্তিবহ্নিতে ফুৎকার দিয়া বলিতে লাগিল 'নবিদ্যা সংগীতাৎ পরা"। সংসারানভিজ্ঞ ঐ যুবকের হৃদয়ও বন্ধুর উত্তেজনায় নাচিয়া উঠিল। সেই অবধি ঐ ব্যক্তি ভদ্রাভদ্র জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। যেখানে কোন ভাল গায়কের নাম শুনে সেইখানেই ছুটিয়া যায়; সেই গায়ক অতি নীচ হইলেও তাহার সহবাসে অধিকতর আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপে কনিষ্ঠ সহোদর সংসারের গুরুতর কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া নীচ আমোদ, নীচ তামাসায় মূল্যবান জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। আর দিকে জ্যেষ্ঠ সহোদর ধর্ম্মসভায় বক্তার হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ বক্তৃতা ও সভামধ্যে বক্তার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইল। যুবকের প্রবৃত্তিও স্বতঃই তদনুকরণে অনুধাবিত হইল। সেই অবধি তিনি সজ্জন সহবাসে বিশেষ সুখ উপলব্ধি করিতেন। ভাল ভাল গ্রন্থনিচয় পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন ও সাধুপ্রসঙ্গে সময়াতিবাহিত করিতেন। ক্রমে আপনিও একজন জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইব, সুবক্তা হইব—এরূপ চেষ্টা প্রতিনিয়ত করিতে লাগিলেন। কালে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, তিনি একজন বিশেষ গণ্য মান্য ব্যক্তি বলিয়া সমাজে পরিগণিত হইলেন। দেখ একদিনকার সামান্য মাত্র ঘটনায় একইরূপ দুইটী মানব প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন পথানুসরণ করিয়া কিরূপ ভিন্ন ভাব ধারণ করিল।

বঙ্গভূমে ইংরাজী শিক্ষা যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়,তখন শুনা যায়, জনকতক মাত্র হিন্দু কালেজের ছাত্র হইতে হিন্দু সমাজে নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলতার সূত্রপাত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষা গুণে তাহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন (?) হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম সমাজের বৃদ্ধ সম্প্রদায় তাহাদের অনাচার জন্য আক্ষেপ করিত বা কোথাও কাহাকে সমাজচ্যুত করিত। কিন্তু সেই সব বৃদ্ধগণ অনন্তকালের অঙ্কে শায়িত হইলে যখন সেই সব যুবক সম্প্রদায় সমাজের নেতা হইল, তখন সেই অঙ্কুরোদ্ভিন্ন কুপ্রবৃত্তি সময়ের গুণে পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহের আকার ধারণ করিল। ক্রমশঃ বালক সম্প্রদায়ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল এবং পুরাকালের হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে উদ্যত হইল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উচ্ছৃঙ্খল বঙ্গ সমাজ রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাজে প্রবর্ত্তিত করিলেন। তাৎকালিক সাধারণ মানবপ্রবৃত্তিও সে বিষয়ে ফুৎকার দিতে ত্রুটী করিল না। সেই ফুৎকারের ফলে কালক্রমে রামমোহনের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম রূপান্তরিত হইয়া গেল, হিন্দুসমাজবিপ্লবকারী ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হইল। ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী হইয়া হিন্দুসমাজের অযথা নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ হিন্দু সমাজ তাহাদের অত্যাচার অনাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল ও ধ্বংশাভিমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ি দেখিয়া জন কতক শাস্ত্রজ্ঞ হৃদয়বান্ মহোদয় ব্যক্তি হিন্দুসমাজের দুর্দ্দশা দর্শনে উহার পুনরুদ্ধার মানসে কালের গতি অনুযায়ী হিন্দুর আচার ব্যবহারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইয়া ভিন্ন স্রোতাভিমুখিনী উচ্ছৃঙ্খল মানবপ্রবৃত্তিকে অন্যদিকে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, হুজুগে বাঙ্গালীর প্রবৃত্তিও সেই দিকে ধাবিত হইল। আমরা "আর্য্য, আমাদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, আমাদের শাস্ত্র অভ্রান্ত' ইত্যাদি রবে আকাশ পাতাল ফাটাইতে লাগিল, হাততালির পর হাততালি, বাহবার পর বাহবা পড়িয়া গেল; বক্তৃতার চোটে সভা সমিতি তোলপাড় হইয়া উঠিল। কেবল শাস্ত্র, কেবল আধ্যাত্মিকতা। আমরা সভা মধ্যে হিন্দুর ভোজনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিলাম, শয়নের শাস্ত্রিয়তা শুনিলাম, মাতৃপূজার ব্যাখ্যা শুনিলাম। কিন্তু হায়! সেই সভা মধ্যেই সব ফুরাইল! আচার্য্য মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ পুরুষত্ব সপ্রমাণ করিয়া, অখাদ্য ভক্ষণের অশাস্ত্রিয়তা ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে উইলসনের হোটেলে ঢুকিলেন, আমরাও গৃহে আসিয়া গৃহিণীর মন রক্ষার জন্য মাতাকে গৃহের বাহির করিলাম ও কুখাদ্য ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম। উপস্থিত এসব বিষয়ে দোষ নাই। কারণ আমি ত জানি যে, আমাদের হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমি ত জানি যে আমাদের শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা কুত্রাপি নাই, আমি ত জানি যে, শ্রীকৃষ্ণ

Dioge nes answerd soberly and yet sharply "Because the one sorts know what they had need of and the other did not."

(২) "Aristippus answered, "It was not his fault but it was the fault of Dionysius tha he had his ears in his feet"—Vide Bacon's, advanecement of learning— pp. 26-27.

আদর্শ পুরুষ; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। আমি কার্য্যে যাহাই করিনা কেন,বাক্যে ব্যভিচার না করিলেই হইল। ধন্য রে মানবপ্রকৃতি! ধন্য তোর "আর্য্যামী",ধন্য আমাদের অনুকরণ-প্রিয়তা! আর ধন্যরে তুই কালস্রোত!

শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে বঙ্গসমাজে একদিন লোকেরা নিজের মান সম্ভ্রম বিষয় বিভব প্রভৃতির দিকে তত দৃষ্টিপাত করিত না। তখন দান ধ্যান প্রভৃতি পরোপকারে অধিকতর ঝোঁক ছিল। যদি কোন লোক দশ টাকা উপায় করিতে পারিত, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণ, দীনদরিদ্রদিগকে দান, পূজা অর্চ্চনা, দেউল জাঙ্গাল নির্ম্মাণ প্রভৃতি সৎকার্য্যে সেই টাকা ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত। একজনের দেখাদেখি দশজনও সেইরূপ কার্য্যে আকৃষ্ট হইত। তৎকালে স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদিগের সদিচ্ছার অনুকরণে অথিতি সৎকারে পটুতা, রন্ধনকার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিত, বেশ-ভূষা অলঙ্কারাদির জন্য লালায়িত হইত না; সকলেই সরল হৃদয়ে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অনুরক্তা হইত। বিলাসিতা ও গৃহকর্ম্মে শিথিলতা বড় একটা দেখা যাইত না। সে কালের মেয়েদের অপেক্ষা এ কালের মেয়েরা আভ্যন্তরিক বিষয়ে উন্নতি করিয়াছে কি না জানি না, কিন্তু বাহ্য বেশ-ভূষার পারিপাট্যে ও বাক্-চাতুর্য্যে যে অনেক উন্নতি করিয়াছে,তাহার আর সন্দেহ নাই। বালিকারাও তৎকালে স্বধর্ম্মানুরক্তা হইয়া "পুণ্যপুকুর" "সাঁঝ-পূজনি" ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিত; পিতা মাতা আত্মীয়-স্বজন বর্গের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাদের সেবায় সতত নিযুক্ত থাকিত। এখনও পল্লীগ্রামে এ ভাব কতক পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু হায়! সে সব দিন গিয়াছে—গুপ্ত কবির ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো,
ব্রতকর্ম্ম কর্ত্তো সবে।
এক বেথুন এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন এ, বি, শিখে বিবি সেজে,
বিলিতি বোল্ কবেই কবে।
এখন্ আর কি তারা, সাজী নিয়ে
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে?
সব কাঁটা চামুচে ধোর্ব্বে শেষে,
পিড়ে পেতে আর কি খাবে?
ও ভাই আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবেই দেখ্‌তে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥"

মানবপ্রবৃত্তি এখন ভিন্ন স্রোতাভিমুখিনী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আর আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে আগ্রহতা নাই। আত্মীয় স্বজনকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি,দীনদরিদ্র চক্ষুঃশূল হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ এখন অর্থনীতির অপব্যবহার, অনন্যোপায় আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ স্বাবলম্বন নীতির মূলে কুঠারাঘাত, দীনদরিদ্রকে দান এখন ধরার ভার বৃদ্ধি—এবম্বিধ নানারূপ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা পূর্ব্বনীতি সবই পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। কোন প্রকার চাকুরী করিয়া নিজের ভরণপোষণ ও বাবুগিরি এবং স্ত্রীপুত্রদিগের পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদির যোগাড় করিতে পারিলেই মনে মনে "করুণানিধান বিশ্বপতির সকল ইচ্ছাই সম্পাদন করিলাম—ভবে আমা

আজ সার্থক হইল" ভাবিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া মানি। আত্মোন্নতিই জগতের উন্নতি! বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া বলিয়া থাকি, বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত মহামতি হব্‌স্ বলিয়াছেন যে অহংত্ব (Egoism) ব্যতীত পরার্থপরতা Altraism) বাতুলের কথা। নিজের সুখ না হইলে কোন প্রকার সুখই হইতে পারে না—এইতো গেল উনবিংশ শতাব্দীর ধ্বজাধারী নরপুঙ্গবদিগের আত্মকথা! আবার তাহাদের দেখাদেখি তাহাদের শ্রীমতীরাও আর পূর্ব্বের ন্যায় আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগের ভরণপোষণে সন্তুষ্টা হন না। বরং কুঞ্চিতনাসা হইয়া মনে করিয়া থাকেন, আমার স্বামীর উপায়-উপার্জ্জন বারভূতে খাইয়া ফেলিল। রন্ধননৈপুণ্যে আর প্রশংসা নাই; এখন উহা অঙ্গসৌষ্ঠব শ্রীহীন করিয়া থাকে—আরক্তিম ফুটন্ত গোলাপী রঙ্গের বর্ণে কালিমা দিয়া থাকে বলিয়া সভ্যসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন হইয়াছে কে কেমন স্বামীর জন্য ভাল কারপেট্ বুনিতে শিখিয়াছে তাহারই আন্দোলন আলোচনা। কেহ বলিয়া থাকে "অমুকের স্বামী বড় চাকুরী করিয়া তাহার ভার্য্যাকে নানাবিধ অলঙ্কারাদিতে ভূষিত করিয়াছে, আমি এমন দুর্ভাগার হাতে পড়িয়াছি যে, একখানি গহনাও চক্ষে দেখিতে পাইলাম না; নিমন্ত্রণে খাইতে যাইতে লজ্জা করে" ইত্যাদি ইত্যাদি। এবম্বিধা শ্রীমতির স্বামী মহাশয়ও দিবারাত্র মুটেমজুরের মত খাটিয়া অর্দ্ধাশনে দিনপাত করতঃ কোন প্রকারে শ্রীমতীর মানভঞ্জন পালা শেষ করেন। সেই হতভাগ্য কি এই খরস্রোতবাহী কালস্রোতে পড়িয়া পরহিতচিন্তা, ধর্ম্মচিন্তা করিতে অবসর পায়। আজকাল পল্লীগ্রামস্থ বৃদ্ধসম্প্রদায়ও আর পূর্ব্বের ন্যায় সরলহৃদয় উদারচেতা নাই—এখন গ্রাম্যদলাদলী প্রভৃতির দ্বারা পরপীড়নে আনন্দ অনুভব করিতে তাহারাও ব্যস্ত।

এ কালমহাতরঙ্গের আবর্ত্ত বড়ই ভয়ানক! যখন সমাজ মধ্যে কুপ্রবৃত্তি-স্রোত খরতর বেগে বহিতে থাকে, তখন প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মের দিকে লইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার হয়। যিনি ধার্ম্মিক, ধর্ম্মবলে বলীয়ান, যাঁহার নৈতিক বল পাশব বলকে আয়ত্বাধীন করিয়াছে এবং যিনি প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম, তিনিই এই বাসনারূপ উত্তালতরঙ্গরাশি পরিপূর্ণ পঙ্কিল কুপ্রবৃত্তি-স্রোত হইতে আপন জীবনতরি খানি ভিন্ন স্রোতাভিমুখী করিয়া অনুকূল বাত্যার মৃদু সঞ্চালনে নিজ গন্তব্য স্থানে চালাইতে পারেন। ভগবান মনু বলিয়াছেন "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্ নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে পারিলেই মহৎ ফল লাভ হয়।

কোন মহর্ষি বলিয়াছেন ;—

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি
র্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

অর্থাৎ আমি ধর্ম্ম জানি কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, আমি অধর্ম্মও জানি কিন্তু তাহাতে আমার নিবৃত্তি নাই—হৃদিস্থিত হৃষীকেশ যাহা করাইবেন তাহাই করিব। এই মহাজন উক্তির তখনই সার্থকতা হইবে, যখন তুমি আত্মপর ভেদাভেদশূন্য হইয়া পরহিত ধর্ম্মে "তুমিত্ব" বিসর্জ্জন দিয়া সাগ্রহে ভক্তি সহকারে হৃষীকেশকে ডাকিলে, তাঁহার অপার করুণাগুণে তিনি যখন সুপ্রবৃত্তি বন্যা প্রবাহিত করিবেন, তখন তোমার ক্ষুদ্র কুপ্রবৃত্তি পরিপূর্ণ পঙ্কিল হৃদয় কূপও সেই প্রবাহে মিশিয়া গিয়া "কু" "সু" এ পরিণত হইবে। নচেৎ তাঁহার কৃপা বিনা তুমিও কুপ্রবৃত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি

লাভ করিতে পারিবে না। আর প্রবৃত্তির দাস সত্ত্বে তোমার "সোঽহং" কথা "আমিই তিনি" কথা কেবল মুখে মুখেই থাকিয়া যাইবে এবং তুমিও সময়ের একটানা স্রোতে পড়িয়া প্রবৃত্তি-কূলে নিমগ্নপ্রায় হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকিবে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র হুই।

মেঘদূত।

২৬

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসে স্তত্র বিশ্রামহেতো
স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণা
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥

"নীচৈঃ ভূধরে সখে করো অবস্থান
ফুটিলে কদম্ব যথা তব সন্নিধানে
লোমাঞ্চিত গিরি দেহ হবে শোভমান,
হয় যথা নরে প্রিয় মিত্র আলিঙ্গনে।
যুবজন মনোহর
বারাঙ্গনা নিরন্তর,
যে গিরি কন্দর-দেশে ভ্রমে অবিরাম
সেই গিরি শিরে সখে লভিও আরাম ॥

২৭

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্রান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাং ॥

"দেখিবে তথায় সখে সুন্দরী রমণী
সুন্দর যূথিকা পুষ্প করিয়া চয়ন
পরিশ্রমে ম্লানমুখী যত নিতম্বিনী,
সে সবারে স্নিগ্ধ ছায়া করো সখে দান।
নব নীর বরিষণে
তুষ্ট করো তরুগণে ;
প্রাণসখে পার যদি মিটাইয়া আশা
কামিনীকুলের নাম করিও জিজ্ঞাসা ॥

২৮

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্মভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥

"উজ্জয়িনী যেতে সখে ভু'লনা কখন,
যদিও সে নহে তব গমনের পথ।
তথাপি আমার সখে রাখিও বচন,
হইবে তথায় তুমি পূর্ণমনোরথ।
তোমার বিজলী হেরি
চমকিয়া যত নারী
কটাক্ষ করিবে ঘন বিজলী রসম,
সে কটাক্ষ না হেরিলে বিফল নয়ন॥

২৯

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ।
নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু॥

নির্ব্বন্ধ্যা নামেতে নদী নয়নে তোমার
পড়িলে, হৃদয় সখে ছাড়িও না তারে,
প্রীত মনে তার সনে করিও বিহার,
ভীষণ আবর্ত্ত-নাভী যার কলেবরে,
ধবল মরাল মালা
যার অঙ্গে করে খেলা
কাঞ্চি সম, জলধর জানিও নিশ্চয়
সতীর বিলাস চিহ্ন প্রকাশে প্রণয় ॥

৩০

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ॥

তোমার বিরহে এবে ক্ষীণ কলেবরা
সোহাগিনী স্রোতস্বিনী বেণীর আকার
হইয়াছে, পাণ্ডুবর্ণা বিচ্ছেদ বিধুরা
সহিতে না পারি যেন বিরহ তোমার।
সলিল বর্ষণ করে
পরিপূর্ণ করো তারে
প্রাণ পণে তার পুষ্ট করো হে সাধন।
পতিরতা সতী নারী পতির ভূষণ।

৩১

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাম্
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎখণ্ডমেকম্॥

স্থবির সকল যথা অবন্তি দেশেতে
উদয়ন-গুণ কথা করিছে কীর্ত্তন,
তথায় যাইয়া সখে অতি বিনয়েতে
জিজ্ঞাসিও উজ্জয়িনী পথবিবরণ।
ধন্য উজ্জয়িনী নাম !
ভূলোকে গোলকধাম,
সুন্দর প্রাসাদ যাহে শোভে মনোহর ;
কে বলিবে স্বর্গ নাই পৃথিবী ভিতর।

৩২

দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ॥

উজ্জয়িনী পাদদেশে শিপ্রা কল্লোলিনী
ছুটিছে আনন্দে মাতি কল কল স্বরে,
ঢালিছে সৌরভ-ভার নব কমলিনী,
সারস সারসী সুখে যথা কেলী করে।

ক্রান্ত পুরনারী দলে
অবগাহি যার জলে
ভুলিছে বিহার ক্লেশ, মধুর বচনে
ভোলে যথা বামাদল কান্ত-আলিঙ্গনে।

৩৩

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্ম্যেষস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথাঃ
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু॥

গৃহছাদে বসি সখে দেখিয়া তোমায়
উন্মত্ত ময়ূরকুল নাচিবে হরষে।
পরিপুষ্ট দেহ তব হইবে তথায়
সুগন্ধ ধূপের ধূম উড়িলে আকাশে।
লাক্ষারাগে সুরঞ্জিত
ফুল গন্ধে আমোদিত
প্রাসাদ নিচয় যার, সেই বিসালায়
অবস্থান করো সখে বিশ্রাম আশায়॥

৩৪

ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ॥

মহাকাল মহাদেব আছেন যথায়
তথায় হে প্রিয় মিত্র করিও গমন ;
গন্ধবতী নদী নীরে স্নানের আশায়
সুন্দরী যুবতী যথা আসে অগণন।
করি তোমা দরশন
নাচিবে প্রমথগণ ;
নীলকণ্ঠকণ্ঠ জিনি হেরিয়া বরণ,
হবে নাকি সখে তব আনন্দিত মন।

৩৫

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্॥

ওহে জলধর! তুমি মহাকাল পাশে
কভু যদি যাও বিনা প্রদোষ সময়,
যতক্ষণ দিবাকর পশ্চিম আকাশে
অস্তমিত নাহি হন, থাকিও নিশ্চয়।
সন্ধ্যা সমাগত হলে
জলধর কুতূহলে
গভীর গর্জ্জন করি ভুলা'ও মহেশে।
পটহ বাজয়ে যথা পশুপতি পাশে।

৩৬

পাদন্যাসৈঃ কণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্তত্তোনখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূন্
আমোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্॥

"রতন-ভূষিত করে আন্দোলি চামর—
মনোহর দণ্ড, যার কণক প্রভায়
বিজলী সমান খেলে মুনিমনোহর;
অথবা করিয়া নৃত্য অবসন্নকায়
ভ্রমিতেছে কুতূহলে
যথা বারাঙ্গনা দলে,
বিন্দু বিন্দু বারিপাত করিও তথায়;
সুন্দর কটাক্ষে সবে হেরিবে তোমায়।

৩৭

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা॥

"ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য করিলে শঙ্কর
জবা সম রক্ত বর্ণ করিয়া ধারণ,
দীর্ঘ তরুবর শিরে যাইও সত্বর
হর-কর সমতরু যথা অগণন।
গজাসুরে সংহারিয়ে
রক্তাক্ত অজিন লয়ে,
ঊর্দ্ধবাহু নেচে ছিল শঙ্কর যেমতি
তরুশিরে চর্ম্ম প্রায় শোভিবে তেমতি।

৩৮

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্মভূ র্ব্বিক্লবাস্তাঃ॥

"প্রগাঢ় তামসি নিশি হইলে আগত
বাহিরিবে বামাদল কান্তসম্মিলনে;
বিজলীতে রাজপথ করি আলোকিত
দেখাইও বর্ত্ম সবে বিনা গরজনে।
করিলে হে গরজন
চমকিয়া ভীতমন
হবে তারা, তাই তোমা করি নিবারণ,
অন্ধকারে পথভ্রান্ত হইবে যখন।

৩৯

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যঃ॥

বার বার বিজলীরে করিয়া প্রকাশ
ক্লান্ত যবে হবে তুমি সমীরবাহন,
হর্ম্ম্যছাদে নিদ্রা গিয়া ভুলিবে আয়াস,
কপোত কপোতী যথা নিদ্রায় মগন।
প্রভাতিলে বিভাবরী
উঠি সখে ত্বরা করি,
অবশিষ্ট পথ পুনঃ করিও গমন।
করো সখে প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা পালন।

৪০

তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতোবর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি করুরুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ॥

কমলিনী সারা নিশি পতির বিহনে
কাঁদি কাঁদি অশ্রুকণা করিবে বর্ষণ,

প্রভাতে প্রাণেশ তার আসিয়া ষতনে
মুছাইবে অশ্রুধারা, করিবে চুম্বন।
সে সময় জলধর
লুকা'ও না দিবাকর,
মিনতি আমার রেখো—বন্ধুর বচন,
হইওনা দিনেশের বিরাগ ভাজন।

ক্রমশঃ—

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সুন্দরী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বর্দ্ধমান জেলায় দুর্গাপুর গ্রাম—সত্যচরণের পিতৃভূমি। গ্রামে অনেক গুলি ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয় ও কায়স্থাদি ভদ্র লোকের বাস। দুর্গাপুরের চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা বৃহৎ পরিবার, সম্ভ্রান্ত ও সৎকীর্ত্তিশালী লোক। তাঁহারা সাত পুরুষ পরম্পরায় এক পরিবারে ও একান্নে ছিলেন, দেশে খ্যাতি প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু চিরকাল কাহারও একভাবে যায় না, চট্টোপাধ্যায় পরিবারের এখন আর সে অবস্থা নাই—তাঁহারা পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন। মনুষ্যের অবস্থার প্রতিকূলতার সময় প্রায়ই এই রূপ ঘটিয়া থাকে। পাঁচ জনে একত্রে একান্নে আছেন, সকলে উপায় উপার্জ্জন করিতেছেন, সংসার সুখ-স্বচ্ছন্দে চলিতেছে, দশের কাছে মান সম্ভ্রমও বেশ রহিয়াছে। কিন্তু একটু সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া, হয়ত দুইটা কথা বার্ত্তার তর্ক বিতর্ক লইয়া, কিম্বা অকিঞ্চিৎকর স্বার্থের মোহ ত্যাগ করিতে না পারিয়া, সহসা তাঁহাদের মধ্যে মনোবিবাদ উপস্থিত হইল; তাঁহারা পৃথক হইয়া পড়িলেন। অদৃষ্ট দেবীও তাঁহাদের প্রতি বিমুখী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সে মান সম্ভ্রমও চলিয়া গেল। বিশেষতঃ আজ কাল পাশ্চাত্য-উন্নত-সভ্যতার বিষম বাত্যায় হিন্দুর সোণার সংসার ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

বহুকাল হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের গৃহে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁহার দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তি অনেক। তাঁহারা পৃথকান্ন হইয়া অন্যান্য বিষয়াদি বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু দেবোত্তর বিষয় সাধারণ সম্পত্তি-ভুক্তই আছে। সেই সম্পত্তির আয় হইতেই বিগ্রহের নিত্যসেবা সম্পন্ন হয় এবং একটী অতিথিশালার সমগ্র ব্যয়ই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তাতেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের এ দুর্দ্দিনেও, তাঁহাদের বাড়ি হইতে ক্ষুধাতুর আগন্তুক অতিথিগণ বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না। হায়রে! হিন্দুর এ মহিমাময়ী পৌক্তলিকতা কে বিসর্জ্জন দিতে বলে?

চট্টোপাধ্যায় পরিবার যখন পৃথক হইয়াছিল, তখন সত্যচরণের পিতা হারাধন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র উভয়ে একান্নে ছিলেন। হারাধন বঙ্গদেশীয় কোন বিখ্যাত ব্যবসাদারের পাটনার গদিতে কর্ম্ম করিতেন। তিনি সেই গদির কর্ত্তা ছিলেন, তদ্ভিন্ন ঐ দেশস্থ আরও অনেকগুলি গদির পর্য্যবেক্ষণ তাঁহাকে করিতে হইত। তিনি বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র গৃহে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন। ক্রমে সংসারের উন্নতি হইতে লাগিল—নূতন বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, পুষ্করিণী বাগিচাদি প্রস্তুত করাইলেন; ক্রমশঃ তাঁহারা

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের প্রধান হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা পৃথকের সময় মৃত্তিকার গৃহ পাইয়াছিলেন, এখন একটী নূতন বাড়ি ক্রয় করিয়া তাহাতে ইষ্টকের গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন। কিন্তু মনুষ্যের কখন যে কি হয় তাহার কিছুই বলা যায় না! নিয়তি-চক্রের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে হারাধনের সেই অর্দ্ধগ্রথিত অট্টালিকা সেই অবস্থায় পতিত রহিল, আর সম্পূর্ণ হইল না।

এক সময় তিনি পণ্য দ্রব্য খরিদ করিবার জন্য পাটনা হইতে মুজাফরপুর যাত্রা করেন। সঙ্গে একজন দ্বারবান ও দশ সহস্র টাকা; তন্মধ্যে ছয় সহস্র টাকার নম্বরওয়ারী নোট, বাকী খুচ্‌রা নোটে ও নগদে চারি সহস্র টাকা। তখন রেল হয় নাই, সুতরাং তিনি গো-শকটে যাইতেছিলেন। সে সময়ে অনেক মহাজনই মাল খরিদ করিবার জন্য মুজাফরপুর যাত্রা করিতেন এবং পথে অন্য লোকজনও অনেক পাওয়া যাইত, সেই জন্য তিনি অধিক লোক লওয়ার আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। একদিন যাত্রার পর দ্বিতীয় দিনে তাঁহার শকট খানি কোন এক স্থানে সঙ্গীছাড়া হইয়া পড়িল; সেই স্থানটী বড়ই ভয়াবহ। হিংস্র জন্তুর ভয়ে এবং হিংস্র হইতে আরও দুর্বৃত্ত দস্যুর ভয়ে পথিকগণ দলবদ্ধ ভিন্ন সে পথে কেহ একা চলিত না। হারাধন তাহা জানিতেন; আতঙ্কে তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি দস্যুর আগমনের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। যাহা ভাবিলেন, তাহাই উপস্থিত হইল—তিনি দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার দ্বারবান প্রাণপণে সেই নৃশংসগণের আক্রমণে বাধা প্রদান করিল। তিনি সেই অবসরে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। দস্যু-যুদ্ধে দ্বারবান নিহত হইল। দস্যুগণ সেই শকটস্থ সমস্ত অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া গেল। তিনি বহুকষ্টে পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময় তাঁহার প্রভু সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে আপনার অবস্থা অবগত করিয়া সকল কথাই বলিলেন; কিন্তু হায়! সবই বৃথা হইল। তিনি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, "ওরূপ আমি অনেক দেখিয়াছি, তুমি প্রবঞ্চনা করিয়া টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়াছ; যেখানে পাও টাকা আনিয়া দাও, নতুবা তোমাকে বিশেষ শাস্তি পাইতে হইবে"। বহুকষ্টে তিনি জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, তথাপি অনর্থক প্রভুর ধনক্ষয়ে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এখন আবার স্বীয় প্রভুর এই নির্দ্দয় ব্যবহারে তিনি আরও মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু উপায় নাই, তাঁহাকে সমস্ত টাকারই দায়ী হইতে হইল। বিধাতা প্রতিকূল হইলে সকলেই প্রতিকূল হয়!

তিনি বাড়ী আসিলেন। বাড়ী আসিয়া আপনার পিতৃব্য পুত্র মুরলীধরকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। কিন্তু হায়! এ দুঃসময়ে মুরলীধরও বাঁকিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন "যা করিতে হয় আপনি করুন, আপনার দায়ে আমার যথা সর্ব্বস্ব যাইবে কেন, আমি পৃথক হইব"। তিনি পৃথক হইলেন। হারাধন বুঝিলেন, এ সংসারে সুখের ভাগীই সকলে, দুঃখের ভাগী কেহই নহে।

তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আপনার গৃহ হইতে যাহা কিছু নগদ টাকা বাহির হইবে, তদ্ভিন্ন বাকী টাকা কাহারও নিকট কর্জ্জ করিয়া আপাততঃ এ দায় হইতে মুক্ত হইবেন, পরে ক্রমশঃ সে টাকা পরিশোধ করিবেন। কিন্তু এখন আর কে কোথায়। তিনি কাহারই নিকট

কোন আনুকূল্য পাইলেন না। লজ্জায় ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া স্ত্রী পুত্রের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিলেন, বাস করিবার বাড়ী খানি ভিন্ন সমস্ত বিষয়ই বন্ধক দিলেন, এবং আপনার নগদ সম্পত্তি প্রভৃতিতে দশ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া পাটনা যাইলেন। কিন্তু অবস্থার এরূপ আকস্মিক অবনতিতে তাঁহার দেহমন ভাঙ্গিয়া গেল। কয়জন সংসারী লোক অদৃষ্টচক্রের এরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন নিরুদ্বেগে সহ্য করিতে পারে? তিনি পীড়িত হইয়া গৃহে আসিলেন। চারি মাস শয্যাশায়ী থাকিয়া দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্রকে অকূল সংসার-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া এ সংসারের শোক তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা সকল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অনন্ত ধামে যাত্রা করিলেন।

সত্যচরণ তখন সহায়হীন বালক। তাহার পিতৃবিয়োগের কিছুদিন পরেই উত্তমর্ণগণ নালিশ করিয়া সমস্ত বন্ধকী বিষয় নিলাম করিয়া দিল। মুরলীধর, কোন প্রতিবিধান করা দূরে থাকুক, স্বয়ংই সমস্ত বিষয়গুলি ক্রয় করিয়া লইলেন। সত্যচরণ পথের ভিখারী হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজ দুই দিন হইল সত্যচরণ বাড়ী আসিয়াছে। তাহার পরিবারে তাহার জননী ঠাকুরাণী ও একমাত্র ভগ্নি চন্দনবালা। চন্দনবালা সধবা ও তাহার বয়ঃকনিষ্ঠা।

সুন্দরীকে আনিবার কথা সত্যচরণ তাহার মাকে জানাইল। শুনিয়া মায়ের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে দরদর; বেগে অশ্রু বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল; তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। বিষধরী পূর্ব্বস্মৃতি অনেককে অনেক সময় এইরূপ নিদারুণ দংশনই করিয়া থাকে। মনুষ্য যে কখন কোন্ অবস্থায় পতিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার কত আদরের ধন একমাত্র পুত্রবধূ গৃহে আসিবে, আজ তাঁহার কত আনন্দের দিন! কিন্তু হায়! এ হেন আনন্দের দিনে আজ তাঁহাকে কাঁদিতে হইল। মনুষ্য আবার এই অসার ধনের অহঙ্কার করে! তিনি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন "হ্যাঁ বাবা! এ সংসারে পুত্র-পুত্রবধূ লইয়া ঘর করিতে কা'র না সাধ হয়? বউমাকে আমি কত সাধ করিয়া আনিব, সে কথা কি আবার তোমায় আমাকে বলিতে হয়! আজ যদি সে সময় থাকিত, আজ যদি তিনি থাকিতেন—আর জন্মে আমি কত মহাপাপই করেছিলাম"—তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না, আবার চক্ষে জল আসিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। নিকটে চন্দনবালা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারও পিতাকে মনে পড়িল, সেও কান্দিল। পরে অশ্রু সম্বরণ করিয়া মায়ের চক্ষু মুছাইয়া দিল। মা আবার বলিলেন "বউমা আমার গৃহে আস্‌বে, আমার কত সুখের দিন; কিন্তু বাপ, বউমা আমার বড় লোকের মেয়ে, কখন ভাল বই মন্দ খায় নাই, ভাল বই মন্দ পরে নাই। এখানে আসিলে বাছার আমার কষ্ট হ'বে, তা আমি চক্ষে দেখতে পারিব না, সেই জন্যই আনিবার কথা এতদিন কিছু বলি নাই। তা নইলে আমি কি এত পাষাণী, যে আমার মনে কোন সাধই হয় না! তোরা যেখানেই থাকিস্, সুখে থাকলেই আমি সুখী।" মায়ের কথায় সত্যচরণ ধীরে ধীরে বলিল, "সে যে একান্তই আসিতে চাহে"।

পুত্রের কথা শুনিয়া জননীর মলিন মুখ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল, তিনি বলিলেন "আমার গৃহের লক্ষ্মী গৃহে আসিবে, তার আর

অন্য কথা কি আছে বাপ! একটী ভাল দিন দেখে মাকে আমার লইয়া আইস। জননীর অনুমতি পাইয়া সত্যচরণ অন্যত্র চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পল্লিগ্রামে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এরূপ একটা প্রথা আছে যে, তাহারা সমস্ত দিন সংসারের কাজ কর্ম্মের পর সন্ধ্যার সময় পাঁচজনে মিলিত হইয়া একটা মজলিস করিয়া থাকে। সত্যচরণের বাড়িতে এরূপ একটা পুরা মজ্‌লিস্ প্রায়ই হয়। সত্যচরণ বাড়িতে থাকিত না, বাড়িতে আর অন্য পুরুষও ছিল না, সেই জন্য সেই স্থানটা মজ্‌লিস্ করিবার বড়ই উপযোগী হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় একে একে অনেকগুলি প্রতিবেশিনী রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কত প্রকার কথা বার্ত্তার আলোচনা হইতে লাগিল। একজন বলিল "মিত্তিরদের মেজো বৌটার কি অহংকার গা; দুখানা গহনা গায়ে দিয়ে ধরা খানাকে যেন সরার মত মনে করে, মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করে না। কিন্তু বাপু গহনা কি আর চিরকাল থাকে? আমরাও একদিন অনেক গহনা গায়ে দিয়েছিলেম"। আর একজন বলিল "তাত বটেই, কিসের এত অহংকার গা; ওই তো রায়েদের কুসুম, তার ত আর গহনার অভাব নাই, কিন্তু যেই বিধবা হ'ল অমনি বাক্সর গহনা বাক্সতেই পড়ে রইল। তা মেয়ে মানুষের সোয়ামীই গহনা"। এইরূপ কত জনের নিন্দা, কত জনের প্রশংসা, কত লোকের প্রতি পরিহাস, কত হাসির উচ্ছ্বাস, কত ভূতের গল্প, কত উপকথা, কত পরামর্শ হইয়া গেল। পরে একজন প্রৌঢ়া সত্যচরণের মাকে জিজ্ঞাসা করিল "বউমাকে আন্‌বার কি হ'ল দিদি?

তিনি বলিলেন "এই মাসে একটী ভাল দিন দেখিয়া বউমাকে আনা হইবে"।

তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধা, না-শুনাভাবে বলিল "কিসের দিন গো, কে আসিবে?"

সত্যর মা বলিলেন "বউ মা আসিবে"।

সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিল "বেশ বেশ। তা আস্‌বে বইকি, বউ ঝি নইলে কি ঘর সাজে"।

বর্ষীয়সী আবার বলিল "কিন্তু বাপু সহরের বউঝীকে লইয়া বড় ঝঞ্ঝাট, তারা গেরস্থলীর কাজ কর্ম্ম কর্‌তে চায় না, কেবল বসে থাক্‌তে ভাল বাসে"।

অপরা একজন বলিল "তা বটে গো তা বটে, আমার বাপের বাড়ির বোসেদের ছেলের কল্‌কাতায় বিয়ে হয়েছে, সে বউটোর যদি রকম শোন—কাজ কর্ম্মের কাছ দিয়ে যায় না, কাজ করে শাশুড়ীর মুখ দিয়ে রক্ত উঠে যায় তা একবার চোখ্ মিলে দেখে না; কেবল বোসে বোসে একখানা কাপড় নিয়ে তাতে ফুল তোলে। তার আবার নবাবীর কথা কি বলবো; বাসীকরা কাপড় নইলে পরা হয় না, মুড়ি খেলে তার পেট্ ফাঁপে, কলাইয়ের ডেলে সর্দ্দী হয়। তা বাপু, গেরস্তোর ঘরে কি এত নবাবী চ'লে থাকে"।

তার সেই কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত বর্ষীয়সী বলিল "তা তার শাশুড়ী মাগী কিছু বলে না কেন"?

অপরা বলিল "বল্‌বে কি দিদি, ছেলের ভয়ে কিছু ব'ল্‌তে পারে না। বউ ছুঁড়ী ছেলেটাকে যেন ভেড়া করে রেখে দিয়েছে"।

কথার উপর কথা আসিয়া পড়িল। আবার একজন বলিল "তা হ'ক, কিন্তু সহরের বউঝী খুব লেখা পড়া জানে, তারা পত্র লিখ্‌তে পারে, কত রকম বই পড়ে"।

অপরা বলিল "তা পড়ুক, কিন্তু শুনেছি

তাদের লজ্জা নাই তারা সোয়ামীর সঙ্গে গাড়িতে চড়ে হাওয়া খেতে যায়"।

সেই কথা শুনিয়া একজন প্রৌঢ়া বিস্মিতভাবে বলিল "ওমা ওকি কথা! শুনেছি বিবিরাইতো সাহেবদের সঙ্গে হাওয়া খেতে যায়; বাঙ্গালীর মেয়ে ও সব কি কাজ গা! এইত এত বয়স হয়েছে তবু এখনও পুরুষের সাক্ষাতে বাহির হ'তে গা দুর্ দুর্ করে, লজ্জায় মরে যেতে হয়"।

সেখানে একজন সাম্যবাদিনী নবীনা ছিল; সে বলিল "তাতে আর দোষ কি, পুরুষ মানুষও মানুষ মেয়ে মানুষও মানুষ"।

সেই বর্ষীয়সী এতক্ষণ সকল কথাই শুনিতেছিল, কিন্তু এ কথাটা তার বড়ই অসহ্য হইল; সে একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিল "করিস্‌লো তোরা তাই করিস্। পুরুষ মানুষে যা কর্‌বে তোরা যদি তাই কর্‌বি, তবে মেয়ে হয়ে জন্মেছিলি কেন! মেয়ে পুরুষ নাম্ দুট কিসের জন্য লো"।

যাহা হউক আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ কথাটা আর বেশী দূর উঠিল না, এই খানেই শেষ হইল। আর একজন বলিল "মরুক্ যার যা ইচ্ছা সে তা কর্‌বে, পরের কথায় আমাদের কাজ কি। আমাদের বউমা আস্‌বে, রামায়ণ মহাভারত পড়্‌বে, আমরা ঠাকুর দেবতার কথা শুন্‌ব"। সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

আমরা বলি, এরূপ দুই একটী চরিত্র-সমালোচনী সভা থাকা ভাল। শুনিয়াছি, এরূপ সভার সমালোচনার অমোঘ মন্ত্রবলে দুই একজন নব বধূর স্কন্ধস্থিত প্রেতাত্মা পলায়ন করিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত। রামরতন বাবুর বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত, কেবল বারান্দায় বসিয়া একটী যুবক ও একটী যুবতী কথা বার্ত্তা কহিতেছে।

যুবতী বলিল "বাবাকে বলাতে, তিনি কি বলিলেন"? যুবক বলিল "তিনি যা বলিবার তাই বলিলেন। পাঠাতে তাঁর কিছুতেই মত নাই"।

যুবতী পুনর্ব্বার বলিল "আর আর সকলে কি বলিল"! যুবক উত্তর দিল "সকলেরই এক কথা। তোমার মা বলিলেন, না 'তা আমরা পাঠাতে পারিবনা'। অনেক জেদ করায় ঠাকরুণ দিদি বলিলেন "বেশ, বেশ, সুন্দরীর যদি যেতে মত হয় তবে লইয়া যাইও'। আমি তারপর তাদের নিকট হইতে যখন উঠিয়া আসি—আমি একটু আড়ালে আসিলে পর, তোমার দিদি বলিল "আহা, যে সুখের শ্বশুর বাড়ী, সেখানে আবার কি করিতে যাইবে"?

যুবক-যুবতীদ্বয় আমাদের সত্যচরণ ও সুন্দরী। সত্যচরণ আজ বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। রাত্রে গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায় বারান্দায় বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছে। সুন্দরী বলিল "কাল একবার আমায় লইয়া পড়িবে বোধ হয়"।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল; উভয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। রাত্রি আসিল, দেখিতে দেখিতে আবার চলিয়া গেল, মানব নিদ্রোত্থিত হইয়া বলিল "আ! আর একদিন আসিল"—ভাবিলনা যে, জীবন স্রোতের একটী প্রবাহ অনন্ত সময় সাগরে বিলীন হইয়া গেল।

প্রভাত হইয়াছে। নব অরুণের কিরণচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত! সুন্দরী শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিল। শুনিল, যে তাহার শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার কথা লইয়া আন্দোলন হইতেছে। সুন্দরী সেখানে যাইলনা। কথা পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। সুন্দরীর মাতা

ঠাকুরাণী তাহার পিসী শাশুড়ীকে বলিলেন "তুমি একবার সত্যকে বুঝাইয়া বল যে, "তোমার শ্বশুর শাশুড়ীর পাঠাইতে মত নাই। আর তিনি যে মানুষ, সুন্দরীকে লইয়া যাইবার কথা পুনর্ব্বার তাকে বলিলে রাগিয়া উঠিবেন। সকলের অমতে কি লইয়া যাওয়া ভাল হয়"? পিসী শাশুড়ী বলিলেন "আমি তাকে অনেক বলিয়াছি, সে কোন কথাই শুনিলনা; বলিল পঁচিশে পাঠাইতেই হইবে"।

"তবে আর আমি কি করিব, যা ইচ্ছা হয় তাই করুক"। এই বলিয়া সুন্দরীর মাতা ঠাকুরাণী পুত্রটীকে দুগ্ধ পান করাইতে বসিলেন।

সুশীলাও সেখানে ছিল। সে বলিল "কেন গা, এত জোর কিসের? কারও কথা যে গ্রাহ্য হইতেছেনা! তবু যদি লোকের মত বড়লোক হইত, তা হ'লে যে কি করিত বলা যায় না। সুন্দরীকে লইয়া যাইবে বুঝিলাম, কিন্তু খাওয়াইবে কি? সুন্দরী ত আর সেখানে গিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেনা, চাকর চাকুরাণী রাখ্‌বার ক্ষমতা হইয়াছে নাকি"?

সুন্দরী সকল কথা শুনিল। আর সেখানে না দাঁড়াইয়া তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুন্দরীকে আসিতে দেখিয়া তাহার মাতা ঠাকুরাণী গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরুণ দিদি হাসিতে হাসিতে সুন্দরীকে বলিলেন "কি সুন্দরী, শ্বশুর বাড়ী যাইবি, আমাদিগে সঙ্গে ক'রে লইয়া যাবি ত? সত্য যে ছাড়িতেছে না"। সুন্দরীও হাসিয়া বলিল "সেত সুখের কথা"।

ঠাকুরুণ দিদি। আমি তামাসা করি নাই।

সুন্দরী। আমিই কোন্ তামাসা কর্‌চি?

ঠাকুরুণদিদি। কোন্‌টা সুখের কথা, শ্বশুর বাড়ী যাও টা, না আমাদিগে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে যাও টা?

সুন্দরী। দুইটাই।

ঠাকুরুণ দিদি। তামাসা রাখ্‌, সত্য কথা বল্‌ দেখি, তোর এখন মত কি?

সুন্দরী। কিসের মত?

ঠাকুরুণ দিদি। শুনিস নাই কি, শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে যে?

সুন্দরী। যেতে হয় যাব?

ঠাকুরুণ দিদি। যেতে তোর মন আছে?

সুন্দরী। আমায় লইয়া যাইতে তাঁর ইচ্ছা হইয়াছে।

ঠাকরুণ দিদি। তাত জানি, কিন্তু তুই যাবনা বল্‌না কেন।

সুন্দরী। তিনি যে আমার স্বামী।

ঠাকরুণ দিদি। স্বামী নয়তো কি আর তোর সৎ ভাই। তা বলি নাই, বলি তুই অমত করলে সেতো আর লয়ে যেতে পারবে না।

সুন্দরী। স্বামীর কথায় অমত কে করতে পারে?

এতক্ষণ কথা গুলি হাসিতে হাসিতে হইতেছিল। কিন্তু সুন্দরীর কথা শুনিয়া সুশীলা একটু রাগিয়া বলিল "তোরও তবে যাইবার ইচ্ছা আছে বল"।

অগ্রজার কথায় সুন্দরীর হাস্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, বলিল স্বামীর যখন লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আমার যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও, অবশ্য ইচ্ছা আছে বই কি।

সুশীলা। আহা, যে ধনবানের ঘরে বিয়ে হয়েছে, সেখানে ত সুখের সীমা নাই।

সুন্দরী। সেই আমার ইন্দ্রালয়।

সুশীলা। আহা! ইন্দ্রালয়ই বটে; কিন্তু ইন্দ্রালয়ে গিয়ে খাবি কি?

সুন্দরী বলিতে পারিত যে, "ইন্দ্রালয়ে সুধা আছে, সেই সুধা সেবনেই ক্ষুধার উপশম

হইবে"। কিন্তু কথাটা তখন অন্যভাবে হইতেছিল, সেই জন্য সুন্দরী তত দূর যাইতে পারিল না; বলিল "সেখানে গিয়া ঘাসের বীজ খাইব"।

সুশীলা। ঘাসের বীজও মিলিলে ত?

সুন্দরী। শ্বশুরের গৃহে বসিয়া উপবাস করিয়া মরিব।

সুশীলা এতক্ষণ কথাগুলা বড় জোরে জোরে বলিতেছিল; কিন্তু যখন দেখিল যে, সুন্দরী বড় স্পষ্ট উত্তর দিলে—সুন্দরী এখন আর সে সুন্দরী নয়, তখন বিনীত হইয়া বাৎসল্যভাবে বলিল, বুঝিয়া দেখ্‌ দেখি, তুই দুঃখ পাইবি বলিয়াই তো আমরা যেতে বারণ কর্‌ছি"। সুন্দরীও ধীরে ধীরে বলিল, কি কর্‌ব দিদি, আমার কপালে যদি দুঃখ থাকে, তবে তা কে ঘুচাবে বল"? সুন্দরী জানিত যে, স্বামী তাহার দেবতা এবং দেবতাশ্রয়ে দুঃখের প্রবেশাধিকার নাই।

সুশীলা। কেন, বাপের বাড়ীর এত সুখ, মা বাপের এত আদর, তাতে বুঝি মন উঠিল না?

সুন্দরী। সমুদ্রে ত অনেক জল আছে, কিন্তু চাতক মেঘের জল চায় কেন?

সুশীলা। বেশ, বেশ, স্বামীর সোহাগ লয়েই থেক।

সুন্দরী। সুন্দরী তার বেশী কিছুই চাহে না।

সুশীলা। আমরাও তোকে আর চাহি না; কখন তোর মুখও দেখিব না।

সুন্দরী। কি কর্‌ব দিদি; মা বাপ যাঁ'র হাতে সঁপে দিয়েছেন, তিনি যেন দেখেন; আর যিনি ছোট বড় সকলকেই দেখেন, তিনি দেখিলেই হইল।

সুশীলা নির্ব্বাক হইয়া রহিল। সুন্দরী সেখান হইতে চলিয়া যাইবে, এমন সময় তাহার গর্ভধারিণী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "শোন্‌ মা, তুই যাইতে চাহিস্‌ না"। সুন্দরী নিরুত্তর। জননী আবার বলিলেন, "তোকে যেতে দিতে পার্‌ব না, তোকে না দেখ্‌লে কি আমরা এক দণ্ড থাকতে পারি"?

সুন্দরী বলিল, "কেন মা, দিদি রহিল, প্রবোধ রহিল, আমি নাই বা থাকিলাম"!

মায়ের চক্ষে জল আসিল, তিনি সুন্দরীর চিবুক ধরিয়া গদগদ স্বরে বলিলেন, "সেকি মা, মা বাপের প্রাণ সকল সন্তানকে না দেখিতে পাইলে কি সুখী হয়? মা বাপের সকল সন্তানই যে সমান"।

সুন্দরীর চক্ষেও জল আসিল। নিদারুণ অভিমানে তার মর্ম্ম স্থান আহত করিল, ধীরে ধীরে একটী নিশ্বাস ছাড়িয়া মনে মনে বলিল "তাইত জানিতাম, কিন্তু এ কপাল-দোষে বাৎসল্যেও যে বৈষম্য সংঘটিত হইল"। পরে মাকে মৃদুস্বরে বলিল "মেয়ে মানুষ ত আর চিরকাল বাপের বাড়ী থাকেনা। মা বাপ যেমন কন্যাকে কাছে রাখায় সুখী হয়, শ্বশুর শাশুড়ীরও তো সেইরূপ, পুত্রবধূকে দেখিতে সাধ যায়"।

মা নীরব হইলেন; মেয়ে চলিয়া গেলেন। সকলে বুঝিল যে, শ্বশুর বাড়ী যাইতে সুন্দরীর একান্ত ইচ্ছা এবং তাহাকে লইয়া যাইতে সত্য চরণের নিতান্ত জেদ্‌। আর কেহ কিছু বলিল না। সকলেই সুন্দরীকে পাঠাইবার বিষয়ে অমত করিতে রামরতন বাবুকে নিষেধ করিল। তিনি বড়লোক, মানের ভিখারী। তাঁহার দরিদ্র জামাতা তাঁহার কথা রক্ষা করিলনা, এ অপমান তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। তিনি বলিলেন "যাক্‌, ও মেয়ে জামায়ের কখন আর নামও করিবনা"।

বৈশাখের পঞ্চবিংশ দিবস উপস্থিত হইল, আজ সুন্দরীর শ্বশুর বাড়ী যাইবার দিন। কন্যার দ্বিরাগমন হিন্দু পিতামাতার পক্ষে একটা সামান্য ব্যাপার নহে। তাহার বিবাহের সময় পিতামাতাকে যেরূপ উদ্‌যোগ আয়োজন করিতে হয়, কন্যাকে প্রথম শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে হইলে, তত না হউক, অনেকটা সেইরূপ আয়োজনাদির আবশ্যক। সাধ্যানুসারে কন্যার সহিত কিছু না দিলে লোকত নিন্দা আছে। অনেক কন্যার পিতামাতা এইরূপ নিন্দার ভাগী হইয়াছে। অনেক নববধূ শ্বাশুড়ী ননদিনী এবং প্রতিবেশিনীগণের মুখ-নিঃসৃত তাহাদের পিতা মাতার প্রতি কঠোর উক্তি নীরবে সহ্য করিয়াছে। কিন্তু সুন্দরীর পিতা এ সব জানিয়া শুনিয়াও তাহার সঙ্গে কিছুই দিলেন না।

গমন সময় উপস্থিত। সুন্দরী আর আর সকলকে প্রণাম করিয়া আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "দেখো, মা বেশী দিন থেকনা; লোক গেলেই চলিয়া আসিও"। এই বলিয়া গোপনে সুন্দরীর হাতে পঞ্চাশটী টাকা দিল। টাকা লইতে সুন্দরীর ইচ্ছা ছিলনা; কিন্তু পাছে জননীর মনে দুঃখ হয়, এই ভাবিয়া টাকা কটী গ্রহণ করিল। মায়ের কাছ হইতে আসিয়া সুন্দরী পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় লইল। পিতা কন্যাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না।

সদর দরজায় শিবিকা প্রস্তুত। সুন্দরী পুনর্ব্বার মাকে প্রণাম করিয়া শিবিকায় উঠিল। মা কান্দিতে লাগিল, মেয়েও কান্দিল। হায়! বাৎসল্য-বন্ধন ছিন্ন করিতে এ সংসারে কে সহজে সক্ষম হয়?

বাহকেরা শিবিকায় উঠাইল। রতনবাবুর পিসী ঠাকুরাণী সত্যচরণকে বলিলেন, "দেখ ভাই, লোক যাইলেই যেন শীঘ্র সুন্দরীকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিও"। "এখন আনা হইবেনা, লোক পাঠাইবেন না" এই বলিয়া সত্যচরণ অগ্রগামী হইল; শিবিকাও চলিয়া গেল। সঙ্গে একজন মাত্র ঝী চলিল।

শিবিকা আসিয়া রাস্তায় পড়িল। সম্মুখে জাহ্নবী অনন্ত প্রবাহে বহিয়া যাইতেছে। সুন্দরী গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিল, বলিল "দেখিস্ মা সর্ব্বার্থসাধিকে, আমি পিতা মাতার আদরের কন্যা; যাঁর অনাদরে সে আদর বিষ তুল্য বোধ হইয়াছে, যেন তাঁর আদরে থাকিয়া, তাঁর কোলে মস্তক রাখিয়া এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধনকৃষ্ণ সেন।

উগ্রক্ষত্রিয়-বিধবা-বৃত্তিভাণ্ডার *।

প্রায় অনেকেই অবগত আছেন, কিছুদিন পূর্ব্বে স্যার মহারাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে.সি, এস, আই বাহাদুর একশত নিরাশ্রয়া বিধবার ভরণপোষণার্থ এককালীন এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এক লক্ষ টাকার সুদ বার্ষিক চারি সহস্র টাকা। যে সকল হিন্দুবিধবা আশ্রয়হীনা, যাঁহাদের ভরণপোষণ করিবার কেহই নাই এবং যাঁহারা বিধবা হইয়া স্বধর্ম্মে

* উগ্রক্ষত্রিয়-বিধবা-বৃত্তিভাণ্ডার সম্বন্ধে যাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য থাকে, তিনি তাহা আলিপুর লক হাঁসপাতাল ঠিকানায়, প্রবন্ধ-লেখকের নিকট পাঠাইবেন। উ, প্র, স।

থাকিয়া আপনার সতীত্ব রক্ষণে সক্ষমা, এরূপ এক শত বিধবা মহিলাকে উক্ত চারি সহস্র টাকা সুদ, মাসিক ৪৲ ও ৩৲ টাকা হিসাবে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। এরূপ নিঃস্বার্থ দানের উদ্দেশ্য কত মহৎ, ইহার ফল কত মধুর এবং এরূপ দাতার অন্তঃকরণ কিরূপ সাত্ত্বিক ভাবপরিপূর্ণ এবং তিনি সর্ব্বসাধারণের কতদূর ধন্যবাদের পাত্র, তাহা সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যে দানে হৃতসর্ব্বস্ব হিন্দুসমাজের গৌরব স্বরূপ হিন্দুবিধবার ধর্ম্ম, সতীত্ব ও প্রাণ রক্ষা হয়, তাহার তুল্য দান আর কিছু আছে কিনা জানি না! কাল মাহাত্ম্যে প্রবৃত্তি-স্রোতে হিন্দু সমাজের অনেক সার সম্পত্তিই ভাসিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। হিন্দু সমাজের এহেন দুর্দ্দিনে—এ হেন ভগ্ন দশায়, এ হেন অধঃপতনেও যদি হিন্দুর গৌরব-গরিমা করিবার কিছু থাকে, যদি বিলাসিতার রাজ্যে সংযমের চিহ্ন কিছু পরিলক্ষিত হয়, যদি স্বার্থের মরুভূমে পরার্থের প্রবাহ কিছু বহমান থাকে, তবে সে হিন্দুধর্ম্মরক্ষাকারিণী সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি, দয়ার আধার, নিষ্কামধর্ম্মিণী হিন্দুকুললক্ষ্মী হিন্দু বিধবা। হিন্দুর বিধবা হিন্দুর গৃহদেবতা। এই গৃহদেবীর সেবার ব্যবস্থা করিলে যে, ধর্ম্মেরই সেবা করা হয়—ধর্ম্মেরই মান রক্ষা করা হয়, তাহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। হিন্দুধর্ম্মরক্ষাকারিণী গৃহ দেবীর যে রক্ষক, আমরা তাহাকে নমস্কার করি।

আমাদের বিবেচনায় যদি হিন্দুসমাজের প্রত্যেক জাতি আপন আপন সমাজের নিরাশ্রয়া বিধবাকুলের সেবার ব্যবস্থার নিমিত্ত এক একটী করিয়া বৃত্তি ভাণ্ডার সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষেই হিন্দুসমাজের উপকার সাধিত হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের উচ্চ বর্ণের মধ্যে যাঁহাদের বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সতীত্ব রক্ষা করতঃ হিন্দুদিগের মুখ উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, বর্ত্তমান সময়ে, বিলাসিতার দাস অসংযত সমাজ কর্ত্তৃক তাঁহাদের অলৌকিক গুণের কোনরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা নাই। যে সকল নরপুঙ্গব লেখাপড়া শিখিয়া স্বার্থ সাধনেই ব্যস্ত রহিয়াছে ও থাকিবে এবং প্রায়শঃ অধিকাংশ স্থলেই সেই বিদ্যার প্রভাবে স্বধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে ও করিবে এবং যে সকল কুলবালা বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া বিদুষী হওতঃ পতিকে বিদূষক সাজাইয়াছে ও সাজাইবে এবং কার্পেট বুনিতে শিখিয়া রন্ধনাদি হিন্দু মহিলোচিত কর্ত্তব্য কার্য্য সকল অবহেলা করতঃ দাসীর কার্য্য শাশুড়ীর স্কন্ধে চাপাইয়া প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে ও দিবে, তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিবার জন্য যদি নানা প্রকার পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে, তবে যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষাকারিণী এবং যাঁহাদের জন্য হিন্দুর সংসার আজিও অনেকস্থলে শান্তি সুখের নিকেতন স্বরূপ হইয়া হিন্দুসমাজের বিদ্যমানতা রক্ষা করিতেছে, তাঁহাদের গুণের পুরস্কারের কোন ব্যবস্থা নাই কেন? হিন্দুর বিকৃত বুদ্ধিই ইহার একমাত্র কারণ নহে কি? হিন্দু-বিধবাদিগের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা উন্নত, জ্ঞান পরিপক্ক এবং যাঁহারা কর্ত্তব্যজ্ঞানে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী হইয়া কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করতঃ নিষ্কামধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্য আমরা এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। কিন্তু আমরা ইহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যে, যে সকল দুঃখিনী হিন্দুললনা, বিধবা হইয়া সামাজিক অত্যাচার-অনাচারে পেটের দায়ে কুপথে পদার্পণ করতঃ সমাজের অঙ্গে কলঙ্ক প্রদান করিয়া থাকে, তাহারা যদি অমূল্য সতীত্বরক্ষা রূপ উৎকট পরীক্ষা এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন জন্য কোন পুরস্কার প্রাপ্তির আশা পায়, যদি তাহাদিগকে উদরের অন্নের জন্য চক্ষে অন্ধকার দেখিতে না হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন স্বধর্ম্মে থাকিয়া হিন্দু সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হয়। হিন্দু ধর্ম্মের এ হেন হীন দশায়, হিন্দুদিগের এবম্প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য হিন্দুচিত মতিগতি হইবে কি?

আমরা ক্ষুদ্র। আমাদের শক্তি সামর্থ্যও ক্ষুদ্র, আমাদের উৎসাহ উদ্যমও ক্ষুদ্র। আমাদের ধনবলও ক্ষুদ্র সুতরাং আমাদের আকাঙ্ক্ষাও ক্ষুদ্র। আমরা সেই ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের নিকট আজ একটী প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইতেছি। প্রার্থনা আর কিছুই নহে। আসুন আমরা সকলে সমবেত হইয়া কিছু কিছু সংগ্রহ করতঃ একটী ভাণ্ডার সংস্থাপন করি। ঐ ভাণ্ডারের নাম হউক "উগ্রক্ষত্রিয়-বিধবা বৃত্তি-ভাণ্ডার, সাহায্য পাউক ঐ বৃত্তি-ভাণ্ডার হইতে আশ্রয়হীনা উগ্রক্ষত্রিয়-বিধবারা, রক্ষা হউক হিন্দুধর্ম্মের মান বৃদ্ধি হউক দয়ার মহিমা, পুরস্কৃত হউক ব্রহ্মচর্য্য ও সতীত্ব, উজ্জ্বল হউক উগ্রক্ষত্রিয়-সমাজের মুখ। মহারাজ যতীন্দ্রনাথের ন্যায় ধনী উগ্রক্ষত্রিয়-সমাজে নাই সত্য, তাই বলিয়া কি উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে এমন সহৃদয় উচ্চমনা ধনবান লোক নাই যে, যাঁহা'দের সমবেত চেষ্টা ও আনুকূল্যে অন্ততঃ ন্যূনকল্পে দশ সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়া একটী বৃত্তি ভাণ্ডার সংস্থাপিত হইতে পারে? অবশ্যই আছে। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি, আমাদের সমাজের কয়েকজন মাত্র ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে পারেন। বিশেষতঃ এক লক্ষ উগ্রক্ষত্রিয়ের মধ্যে বালক বালিকা স্ত্রী ও অক্ষমের সংখ্যা বাদ দিলের এমন দশ সহস্র লোক আছেন যাঁহারা গড়ে এক টাকা করিয়া দান করিলেও অনায়াসেই প্রস্তাবিত দশ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইতে পারে। আর বোধ হয় এরূপ সমাজ-হিতকর সাত্ত্বিক দান প্রদানে কাহারই অমত হইতে পারে না। তাই বলিতেছি বিজ্ঞ সমাজ হিতৈষিগণ, আসুন! বদ্ধপরিকর হউন এবং কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া যাহাতে এই বৃত্তি-ভাণ্ডারটী সংস্থাপিত হইতে পারে তাহার উপায় করুন! উদ্যোগিগণ! যদি উদ্যোগের সফলতা করিতে হয়, তবে এই খানে, উৎসাহিগণ! যদি উৎসাহ দেখাইতে হয়, তবে এই তাহার ক্ষেত্র, আন্দোলনকারিগণ! যদি আন্দোলন আলোচনা করিতে হয়, তবে এই তাহার সময়, দাতাগণ! যদি দানের সার্থকতা প্রদর্শন করিতে হয়, তবে এই অতি উৎকৃষ্ট অবসর, আর ধনিবৃন্দ! যদি ধনের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তবে এই একটী উৎকৃষ্ট সুযোগ নহে কি?

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়াই আমরা প্রথমত দশ সহস্র টাকা মূলধনে এই বৃত্তি-ভাণ্ডার সংস্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। দশ সহস্র টাকার বার্ষিক সুদ ৪০০৲ শত টাকা। প্রতি সহস্রের সুদে একজন বিধবার বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইলেও দশজন বিধবা মাসিক ৩।০ টাকা হারে বৃত্তি পাইতে পারিবে। যদি আমাদের সমাজের মধ্যে অন্ততঃ দশজন নিরাশ্রয়া বিধবাও এই বৃত্তি পায়, যদি আত্মীয় পরিত্যক্তা অন্নহীনাদিগের মধ্যে দশটীরও জীবন ধারণের উপায় বিধান হয়, উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়া যাহাদিগকে হীন বৃত্তি অবলম্বন বা অধর্ম্ম-পথ আশ্রয় করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে যদি অন্ততঃ দশ জনেরও ধর্ম্ম ও মান রক্ষিত হয়, তাহা হইলেও উগ্রক্ষাত্রিয় সমাজের মঙ্গল, গৌরব ও আনন্দের কথা বলিতে হইবে।

আমাদের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া আমাদের জনৈক সহৃদয় বন্ধু, প্রস্তাবিত মূলধনের অর্দ্ধেক সংগৃহীত হইলে, স্বয়ং দুই শত টাকা ঐ ভাণ্ডারে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভরসা করি, আমাদের এই বন্ধুর ন্যায়, হৃদয়বান মাত্রেই এ বিষয়ে মুক্তহস্ত হইবেন।

আমরা বিবেচনা করি, দুইটী উপায় অবলম্বিত হইলেই দশ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইতে পারে। প্রথম এককালীন দান, দ্বিতীয় বার্ষিক ও মাসিক চাঁদা। যাঁহারা নিয়মিত দানে বাধ্য হইতে চাহিবেন না, তাঁহারা যথাশক্তি এককালীন দান করিতে পারেন। আর যাঁহারা এককালীন দানে অসুবিধা বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে কিছু কিছু করিয়া দিলেই চলিতে পারিবে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমাদের সমাজ হইতে নানা প্রকারে বর্ষে বর্ষে দশ সহস্র টাকা অসদ্ব্যয়ে ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। সেই এক বৎসরের অপব্যয়টাও যদি সকলে এই ভাণ্ডারে প্রদান করেন, তাহা হইলেই একটী চিরস্থায়ী সৎকার্য্যের সূত্রপাত হইতে পারে। ভরসা করি বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক উগ্রক্ষত্রিয়মাত্রেই আমাদের এই ধর্ম্মার্থযুক্ত প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন।

শ্রীকুমুদবিহারী সামন্ত।

থাকে ছয়, অবশ্য তার কন্যা হয়। যদি থাকে শূন্য সাত, তবে নারীর গর্ভপাত।

৪ ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুন পতির পিতা। ভাদ্রমাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা॥ রাজ্য নাশে, গো নাশে, হয় অগাধ বাণি হাতে কাঠা গৃহী ফিরে কিনতে না পায় ধান।

৫। অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা, নামে নামে কর সমতা। তিন দিয়ে হরে আন, তাতে মরা বাঁচা জান। একে শূন্যে মরে পতি, দুই থাকিলে স্বয়ম্বরতী।

এগুলির রচনা খুব আধুনিক বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

আবার যদুগোপালের পদ্যপাঠের মত ভাষায়ও খনার বচনে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া গেল। যথা—

১। খনা বলে শুন কৃষকগণ, হাল লয়ে মাঠে যাইবে যখন। শুভক্ষণ দেখে করিবে যাত্রা, পথে যেন না হয় অশুভবার্ত্তা। মাঠে গিয়ে আগে দিক নিরূপণ, পূর্ব্বদিক্ হতে কর হলের চালন। তা হলে তোর সমস্ত আশয়, হইবে সফল নাহিক সংশয়।

এইবার মধ্যম গোছের খনার বচনেরও দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক।

১। শুনরে বাপু চাসার বেটা। মাটীর মধ্যে বেলে যেটা॥ তাতে যদি বুনিস পটল। তাতেই তোর আশার সফল॥

২। বলে গেছে বরাহের পো, দশটি মাস বেগুণ রো। চৈত্র বৈশাখ দিবি বাদ, ইথে নাই কোন বিবাদ। পোকা ধল্লে দিবি ছাই, এ হতে ভাল উপায় নাই। খরা ভুঁয়ে ভরবি জল, সকল মাসে পাবি ফল।

৩। খনা বলে শুন শুন, শরতের শেষে মূলো বুন। ফাগুনে না রুইলে ওল, শেষে হয় গণ্ডগোল।

এই সকল বচনদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, খনার বচনগুলি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই; তবে অন্য কোন ভাষা হইতে অনূদিত, তাহাও আবার এক সময়ে নহে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। আমরা শুনিয়াছি হিন্দী ও উৎকল ভাষায়ও ভূরি ভূরি খনার বচন আছে। সম্প্রতি সেগুলির যে কয়েকটী হস্তগত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে প্রকাশিত করা গেল।

হিন্দী যথা—

১। আষাঢ়ে কাড়ান নাম কে,
শাওনে কাড়ান ধান কে।
ভাদরে কাড়ান শীষ কে
আশিনে কাড়ান কীস্ কে।

২। করকট ছরকট সিংহে শুকা, কন্যা কাণে কাণ।
বিনি বাতে বরসে তুলা কহঁ। রাখবি ধান।

উৎকল যথা—

১। হাতো বিশো কোরি ফাঁক।
অম্ল কণ্ডুল পুতি রাখ॥
গছ গছলি ঘন হেব না।
গছ হেব ত ফল হেব না॥

২। যেঁউ মাসর যেঁউ রাশি,
তার সপ্তরে থাএ শশী।
যদি পাএ পুন্নমাসী,
অবশ্য রাহু চাঁদকু গ্রাসি।

অধিক আশ্চর্য্যের কথা আর কি বলিব, সংস্কৃত ও পারসী মিশ্রিত খনার বচনও পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে দুইটি দেওয়া গেল।

১। ধনস্থে কুমুদবন্ধৌ ভবেৎ খুব চেহারা;
হাজিরে হুজুরে ফুকারে লাখিবা॥
ইহযোগজাতো যদি পাজি আনা।
তদা রোজ বরুরোজ মিলে খুব খানা॥

২। সর্ব্বে গ্রহাশ্চতুঃ কেন্দ্রে ভবেৎ খুব নসিবা।
স্বক্ষেত্রীয়ে সর্ব্বগ্রহৈর্ভবেৎ সাহনপতিসা।

পারসী শব্দ মিশ্রিত বাঙ্গালা খনার বচনও অনেক পাওয়া যায়, নিম্নে দুই একটী প্রদর্শিত হইতেছে।

১। দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ, কমে না বাড়ে বার মাস।

২। পৌষ গরমি, বৈশাখে জাড়া, প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া। খনা বলে শুন হে স্বামি, শাওন ভাদরে না হবে পানি।

এইরূপ কত রকমের যে খনার বচন আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, সুতরাং, খনার বচন দ্বারাও বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইল না।

খনার বচনের ন্যায় ডাকের কথাও নানা কালের দেখা যায়। নিম্নে সব রকমেরই গুটিকতক দেখান যাইতেছে।

১। অতি দিঘলী হয় রাঁড়ি, নিধুনী হয় নেড়ামুড়ী। পিঙ্গলা আঁখি চপলমতি, ওষ্ঠ ডাগর অলক্ষণ অতি।

২। ঘরে আখা বাহিরে রাঁধে, অল্প কেশ ফুলিয়ে বাঁধে। ঘন ঘন চায় উল্‌টে ঘাড়, ডাক বলে এ নারী ঘর উজাড়।

৩। সজ্জন পীড়ে, গোরু মারে, পরের নারী স্থাপ্য হরে। বার বৎসর ভিক্ষা মাঙ্গে, শেষ ভ্রমিয়া নাহে গাঙ্গে। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যায়, যাহারি পাপ তাহারি গায়।

একটী উৎকল ভাষার ডাকের বচনও আমরা পাইয়াছি, নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

নিয়ড় পোখরি দূরে যাএ।
পথিক দেখি আউড়ে চাএ॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাকে বোলে এ নারী ঘররে ন টিকে॥

ডাকের বচনগুলিও নানাকালীন বলিয়া, তদ্দ্বারাও বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইল না।

এবার ইতুর কথার বিষয় আলোচনা করা যাউক। পাঠকগণ যদি ইতুর কথা না শুনিয়া থাকেন; অথবা শুনিলেও যদি স্মরণ না থাকে, তবে আর একবার কোন গতিকে শুনিয়া পরীক্ষা করিবেন। আমরাত উহাকে দুই চারি হাজার বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করিতেই পারি না। তবে দুই চারি শত বৎসরের প্রাচীন বলিতে পারি। সমস্ত কথার মধ্যেত কেবল 'উমনো', 'ঝুমনে','দারিদ্রি বেরাস্তন', 'সোনার চেঙড়া' 'মচর মচর পান খাওয়া' ইত্যাদি দুই চারিটী কথাই কিছু বিসদৃশ পারে, নতুবা সকলই ত সদৃশ। পূর্ব্বকালীন রচনার সকল শব্দই যে সার্থক, এরূপ বোধ হয় না। এজন্য প্রাচীন রচনার অনেক স্থানই দুর্ব্বোধ! সেগুলি প্রকৃত পক্ষে নিরর্থক হইলেও তদ্রূপ বলিতে আমাদের সাহস হয় না। কাজেই তত্তৎস্থলে আপনাদের অজ্ঞতা স্বীকার করি; অথবা যিনি বিদ্যাভিমানী, তিনি কূট কল্পনা বা উদ্ভাবনী শক্তিতে অর্থান্তর ঘটাইয়া থাকেন।০ আমার স্মরণ আছে, বাল্যকালে আমাদের দেশস্থ কোন লোক একটী ষেঁটুর গান তৈয়ারী করে। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

তিন তাক্ তোলাক্ তোলাক্
ভাজনা খোলা ভাঙ্গা কিবা ফুটো।
হলদে কানি গোবর ঠুলি
তায় ঘোংগা কড়ি দুটো।
ঠাকুরের মুক্তি দেখে কুক্তি ছোটে,
সঙ্গে যত খশো।
বেরুলেন ষেঁটুরায়, বসন্ত রায়ের মেসো॥

পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন দেখি, পূর্ব্বোক্ত স্থলে তিনতাক্, তোলাক্, তোলাক্, ঘোংগা, কুক্তি, প্রভৃতি শব্দ গুলির কি কিছু অর্থ আছে? উহাত বিশবৎসরের উর্দ্ধ রচিত হয় নাই। চাক্ষুষ না হইলে হয়ত আমরা উহাকে দুই তিন শত বৎসরের রচনা বলিয়া মনে করিতাম। তদ্রূপ সাঁজ পূজনী, যম পুকুর, ইতুর কথাতেও যদি দুই চারিটা নিরর্থক গোছের শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে যে, উহারা খুব প্রাচীন এরূপ কল্পনা করিবার কোনও কারণ দেখি না।

এবার সাঁজ পূজনীর কথারও একটু আভাস পাঠকবর্গের নিকট প্রদান করা যাউক।

সাঁজ পূজন সেঁজুতী, ষোল ঘরের ষোল বত্তি,
তার ঘরে আম বত্তি, বত্তি রেখে মানলুম বর,
ধন পুত্তুর মা বাপ নক্ষেশ্বর।
দোলায় আসি দোলায় যাই,
সোণার দপ্পন মুখ চাই,
দপ্পন পুজ জুবড়ু হয়ে, সাত ভায়ের বোন হয়ে,
সাবিত্তির সমান হয়ে॥
খাট পালঙ্গ নেপ নেহারী, গিদ্দে আসে পাশে,
রূপ যৈবন সদাই সুখী, সুয়ামী ভাল বাসে॥
সর সর সর, আমার ভাই গাঁয়ের বর,
বর বর ডাক পড়ে, গুও গাছে গুও ফলে।
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে,
অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায়॥

অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণ যে প্রকারে এই সকল আবৃত্তি করেন, আমরা সংশোধন না করিয়া, যথাযথ সেইগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

পাঠকগণ বলুন দেখি, পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে কি এমন কথা আছে, যাহাতে বাঙ্গালা ভাষাকে দুই চারি হাজার বৎসরের বলা যাইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী (৮)।

(বাঙ্গালা ভাষার বয়ঃক্রম বিচার।)

আমরা বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি-প্রসঙ্গে কথঞ্চিৎ আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে উহার বয়োনির্দ্ধারণেরও আবশ্যক দেখা যাইতেছে। যেমন কোনও এক নির্দ্দিষ্ট ভাষা হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি নহে,তেমনি কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দিনেও উহার জন্ম ঘটে নাই। তবে কোন্ শতাব্দী হইতে কোন্ শতাব্দী মধ্যে উহার জন্ম,কোন প্রকারে তাহার অনুমান করা নিতান্ত অসম্ভব নয়। অনেকের ধারণা, যে, মান্ধাতার কালাবধি উহার প্রচলন হইয়া আসিতেছে। এতৎ প্রতিপাদনার্থ তাঁহারা যে যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আমরা একে একে সে সকলের অপ্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব। তাঁহারা বলেন, এককালে 'হইতেছে', 'হউক' ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে 'হচ্ছে' 'হোগ' ব্যবহৃত হয়, উহা বহুকালসাপেক্ষ।

আমরা বলি, যৎকালে 'হইতেছে', 'হউক' ব্যবহৃত হইত, তৎকালেই প্রাকৃতভাবে 'হচ্ছে', 'হোগ' ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে কালসাপেক্ষতা কিছুই নাই। এখনও 'হইতেছে', 'হউক' বা 'হচ্ছে', 'হোগ' সবই স্থলবিশেষে প্রযোজিত হয়, তাহা সকলেই জানেন।

তাঁহারা আরও বলেন, 'মাঘের জাড়ে, মইষের শিঙ্ নড়ে' ইত্যাদি প্রবাদ-বাক্যেও বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব অনুমিত হইতেছে; কারণ, পূর্ব্বকালীন মাঘের যেরূপ শীত দেখিয়া ঐ প্রবাদ রচিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর সেরূপ শীত কোথায়? তবেই, ঐ প্রবাদটীও যেমন প্রাচীন, বাঙ্গালা ভাষাও ততোধিক প্রাচীন।

আমরা বলি, ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত না হইয়া বরং নব্যত্বই প্রমাণিত হইতেছে। কারণ, ঋতু-পরিবর্ত্তন আজকাল এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হইতেছে যে, তাহা ভাবিতে গেলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরাই বাল্যকালে যে বর্ষা যে শীত দেখিয়াছি, এই বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই তাহার এক চতুর্থাংশও আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং, আমাদের বাল্যকালে যেরূপ শীত ছিল, যদি তাহার আটগুণ বেশী শীতের সময়েও ঐ প্রবাদ রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহার বয়ঃক্রম দুই শতাব্দীর উর্দ্ধ হয় না। তাহা হইলে ত বাঙ্গালা ভাষা দুইতিন শত বৎসরের হইয়া পড়ে। সুতরাং, ঐ যুক্তি আদৌ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

অধিকন্তু, তাঁহারা আরও বলেন যে, খৃষ্টীয় শকারম্ভকালে রোমকেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আসিত, তাঁহাদের পুস্তকে বাণিজ্য-দ্রব্য এবং বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের যেরূপ নাম দেখা যায়, সেগুলি না সংস্কৃত না প্রাকৃত।

এতদুত্তরে আমরা বলি, তবে কি সে গুলি 'বাওয়া ডিমে'। কারণ, যাহা কোন পদার্থ হইতে জাত নহে, তাহাকেই 'বাওয়া ডিমে' বলিবার রীতি আছে। লেখক মহাশয় যদি তদ্রূপ দুই চারিটী শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেন, তাহা হইলে কোন গতিকে আমরা উহাদের মূলানুসন্ধানের চেষ্টা করিতাম। এস্থলে আমাদেরও জিজ্ঞাস্য এই, যদি সেগুলি সংস্কৃত বা প্রাকৃত নহে, তবে কি সেগুলি বাঙ্গালা শব্দ? তাহা স্বীকার না করিলেত আর বাঙ্গালার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় না। যদিই তাহাদিগকে বাঙ্গালা শব্দ বলেন, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, বাঙ্গালা কিছু স্বতঃসিদ্ধ ভাষা নহে, তবে উহারা কোথা হইতে আসিল? ইহারও উত্তরে যদি বলেন, যে সেগুলি বিজাতীয় লোকের সংমিশ্রণ ঘটিত, তাহা হইলে আমরাও বলিব যে, তৎকালে বাঙ্গালা ভাষা না থাকিলেও প্রাকৃতাদি যে কোন ভাষাই থাকুক, তাহাতেও তদ্রূপ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। অতএব, ইহাতেও বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইল না। বিশেষতঃ, আমরা দেখিতেছি যে, খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে ফাহিআন নামক চৈনিক পরিব্রাজক, তৎকালে বাঙ্গালায় মাগধী প্রাকৃত প্রচলিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং, তৎকালে যে বাঙ্গালা ভাষা হয় নাই, ইহাই আমাদের স্থির ধারণা।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব-প্রতিপাদনকারিদিগের অন্যতম প্রমাণ এই যে, আজ পর্য্যন্ত

এতদ্দেশে সাঁজপূজনী, যমপুকুর, ইতুর কথা, খনার বচনাদি যাহা প্রচলিত আছে, সে সকল অতি প্রাচীন। সুতরাং,বাঙ্গালা ভাষাও প্রাচীন

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে,পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির মধ্যে কেবল খনার বচনকেই প্রাচীন বলিতে হইবে। কেননা, ঐ গুলি যদি খনার স্বরচিত হয়, তবে কোন সময়ে খনা জীবিত ছিলেন, তাহার নির্দ্ধারণ হইলেই অবশ্য ঐ গুলিরও বয়োনির্দ্ধারণ হইতে পারে। খনা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন বরাহমিহিরের পত্নী। এ কারণ, বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক হইলে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে মালবান্তর্গত উজ্জয়িনীতে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত ছিল, ইহাত কাহারও ধারণাতেই আইসে না। অতএব, খনা যে বাঙ্গালা ভাষায় জ্যোতিষের বচন সকল রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রমাণ-প্রদর্শন প্রগল্‌ভতা-পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেকের ধারণা যে, তিনি জ্যোতিষ-সংক্রান্ত বচন সকল সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা করিয়াছিলেন, কালক্রমে উহারা বাঙ্গালা, হিন্দী, উৎকলাদি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কেহবা বলেন যে, তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না; জন্মাবধি রাক্ষসগৃহে প্রতিপালিত হইয়া রাক্ষসী ভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। বচনগুলিও সেই রাক্ষসী ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল; ক্রমে ক্রমে ভাষান্তরিত হইয়াছে। খনা রাক্ষসী-ভাষাজ্ঞ অথবা সংস্কৃতজ্ঞ যাহাই হউন, তদীয় বচন গুলিও যে এককালে বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হয় নাই, তাহা পাঠকগণ নিম্নলিখিত বচন গুলির তারতম্য অনুধাবন করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ॥

১। খালি ছাগলা, বৃষে চাঁদা, মিথুনে পূরিয়া বেদা। সিংহে বসু, কর কি বসে, আর সব পূরিবে দশে ॥

২। মাস নখতা, তিথিযুতা, ভা দিয়ে হররে পুতা। আঁধারে দশ আলোতে এগার, ইহা দিয়া নক্ষত্র সার ॥

৩। দ্বাদশ অঙ্গুলি কাঠি, সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি। রবি ঝুড়ি, সোমে ষোল, পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল। বুধ বৃহস্পতি এগার বায়, শুক্র শনি চৌদ্দ তের। হাঁচি জেঠি পড়ে যবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে ॥

৪। আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা, কি কর শ্বশুর লেখা জোখা। যদি বর্ষে কণা, ত পড়তে হয় কালহাবনা। যদি বর্ষে ঠায়, ত মেল মন্দার ভেসে যায় ॥ যদি হেসে সুয্যি বসে পাটে, ত চাষার গরু বিকোয় হাটে।

এই বচনটী অন্য রকমে শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা, কি কর শ্বশুর লেখা জোখা। যদি বর্ষে মুষলধারে, মাঝ সমুদুরে বগা চরে। যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা, পড়তে হয় মীনের ঘটা। যদি বর্ষে নিম্নি ঝিমি, শস্যের ভার না সহে মেদিনা। যদি হেসে সুয্যি বসে পাটে, চাষার গোরু বিকোয় হাটে ॥

৫। নগনচাঁদা বেদ বেখানে, না পড়িয়ে আঁকর চেনে ॥

৬। মানুষ মরে যাতে, গাছলা সারে তাতে। পচলা সরায় গাছলা সারে, গোঁধলা দিয়ে মানুষ মারে ॥

এই বচনগুলির রচনা যেন প্রাচীন প্রাচীন বোধ হয়। আবার—

১। সভার মধ্যে যে জন ভণে, তার মুখে জয় জন শুনে। তিথি বার করিয়ে এক, সাতে হরে আয়ু দেখ। দুই চার কিম্বা ছয়, এ রোগী জীবার নয়। এক তিন কিম্বা বাণ, যমঘরে হাত টেনে আন। অঙ্ক শূন্য পায় যবে, নিশ্চয় রোগী মরিবে তবে ॥

২। তিথি বার নক্ষত্র মাসের যতদিন। একত্র করিয়া সবে সাতে কর হীন ॥ একে শুভ দুয়ে লাভ তিনে শুক্র ক্ষয়। চতুর্থেতে কার্য্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয় ॥ ষষ্ঠেতে মরণ হয় শূন্যে হয় সুখ। এ দিনে করিলে যাত্রা কভু নহে দুখ ॥

৩। বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ, পেটের ছেলে গুণে আন। নামে মাসে করে এক, সাতে হরে সন্তান দেখ। এক তিন থাকে বাণ, তবে নারীর পুত্রজান। দুই চারি

দত্তাত্রেয় ও ভর্ত্তৃহরি-সংবাদ।

উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ ভর্ত্তৃহরি মৃগয়ার্থ এক বিজন কাননে উপস্থিত। সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা। গজের বৃংহতিতে, অশ্বের হ্রেসা-রবে, পদাতির কোলাহলে, রথের ঘর্ঘর ধ্বনিতে এবং পলায়িত মৃগের গমন শব্দ ও আর্ত্তনাদে বনভূমি বিকম্পিত। ব্যাপার অতি বৃহৎ! কাণ্ড অতিশয় তুমুল!! আয়োজন অতীব গুরুতর !!!

স্বয়ং মহারাজ ভর্ত্তৃহরি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া একটী মৃগের অনুসরণ করিয়াছেন। মৃগ প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুটিয়াছে; অশ্বও চালকের ইঙ্গিতানুসারে দ্রুতপদে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। মৃগবধে দৃঢ়সঙ্কল্প রাজা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রমশঃ যেই শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ বনের গহন হইতে গহনতর প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত! এমন সময়ে হঠাৎ লক্ষ্য দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইয়া পড়িল। ভর্ত্তৃহরি,মৃগের ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, সেই অরণ্যানীর নিবিড় প্রদেশে এক প্রকাণ্ড বনস্পতির প্রশস্ত মূলে এক সন্ন্যাসী যোগাসনে উপবিষ্ট! তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান বল্কল; চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত এবং তপস্তেজজনিত বিমল আভা মুখ মণ্ডলে প্রতিভাত—বদন প্রফুল্ল। দেখিলেই বোধ হয়, যেন, কোন অনির্ব্বচনীয় বিমলানন্দ হৃদয় উৎস হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া মুখবিবর দিয়া নির্গত হইতেছে। বিভূতি-জনিত অঙ্গরাগে শীর্ণ দেহের লাবণ্য দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত এবং ধর্ম্মের মহিমাময় ছটা ললাটদেশে প্রতিফলিত হওয়ায় সেই পুরুষপ্রবরের সৌম্যমূর্ত্তি জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের আধার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ভর্ত্তৃহরি, হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ এই বিজন কাননে এই মহাপুরুষকে একাকী বাস করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ক্রমে তাঁহার অন্তঃকরণে ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হইল; তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পাছে যোগিবরের যোগ ভঙ্গ হয়,এই ভয়ে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে ধীরে ধীরে তাঁহার সন্নিকটে উপনীত হইয়া বৃক্ষমূলের নিম্নভাগে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যোগী-পুরুষের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একজন রাজবেশধারী মনুষ্য; ঈষৎ চিন্তা-বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে"?

ভর্ত্তৃহরি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করতঃ অতি বিনীত ভাবে যোগীকে অভিবাদন করিয়া উত্তর করিলেন "আমি একজন পথভ্রান্ত পথিক"।

যোগী। এ শ্বাপদসঙ্কুল গহন কানন, এ ত কোন গন্তব্য স্থানের পথ নহে, তুমি এখানে আসিলে কেন?

ভর্ত্তৃহরি। মৃগয়া করিতে।

যোগী। তোমার আকার প্রকার ও বেশ-ভূষা দেখিয়া বোধ হইতেছে,তুমি কোন দেশের রাজা হইবে।

ভর্ত্তৃহরি। আজ্ঞা, আপনি যথার্থ অনুমানই করিয়াছেন।

যোগী। তোমার নাম কি?

ভর্ত্তৃহরি। আমার নাম ভর্ত্তৃহরি।

যোগী। তুমিই কি উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহা-রাজ ভর্ত্তৃহরি?

ভর্ত্তৃহরি। আজ্ঞা হাঁ! আমিই উজ্জয়িনীর প্রজাপালক ভর্ত্তৃহরি। দেব! আপনার পরিচয় পাইতে পারি কি?

যোগী। অবশ্যই পার; আমার নাম দত্তাত্রেয়।

ভর্ত্তৃহরি। আপনিই কি সেই সর্ব্বজন-

বিদিত যোগিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মা দত্তাত্রেয় ?

দত্তাত্রেয়। তুমি যদি কোন ব্রহ্মপদপ্রার্থী যোগধর্ম্মাবলম্বী দত্তাত্রেয়ের নাম শুনিয়া থাক, তবে আমাকে সেই দীনাত্মা দত্তাত্রেয় বলিয়াই জানিবে।

ভর্ত্তৃহরি। দেব! আমার মনে বড় বিস্ময়ের উদয় হইতেছে! আপনার কি এই গহন বনে একাকী থাকিতে ভয় করে না ?

দত্তাত্রেয়। কাহা হইতে ভয় হইবে ?

ভর্ত্তৃহরি। কেন, হিংস্র জন্তু হইতে!

দত্তাত্রেয়। হিংস্র জন্তু হইতে ভয় পাইব কেন ?

ভর্ত্তৃহরি। তাহারা যে হিংসা করিয়া থাকে।

দত্তাত্রেয়। আমি যখন তাহাদের হিংসা করিনা, তখন তাহারা আমার হিংসা করিবে কেন ?

ভর্ত্তৃহরি। হিংস্র জন্তুর স্বভাব হিংসা করা, তাহারা কি হিংসাকারী, কি অহিংসাকারী সকলকেই হিংসা করিবে।

দত্তাত্রেয়। তাহাদের স্বভাব হিংসাকারীর প্রতি হিংসা করা অহিংসাকারীর প্রতি নহে। যাহা হইতে তাহারা ভয় পাইবে না, তাহাকে তারা হিংসাও করিবে না।

ভর্ত্তৃহরি। তবে আপনি কি কাহা হইতেই ভয় পান না ?

দত্তাত্রেয়। পাই বই কি! আমারও ভয় করিবার শত্রু আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড় রিপু আমার যোগবিঘ্নকারী প্রবল অরি; আমিও তাহাদের বিনাশকামী চিরশত্রু। তাহারাও আমা হইতে ভয় পায়, আমিও তাহাদিগ হইতে ভয় পাই। এতদ্ব্যতীত জগতে আমারও কেহ শত্রু নাই, আমিও কাহার শত্রু নহি, সুতরাং অপর কেহ আমা হইতে ভয় পায় না, আমিও অপর কাহা হইতে ভয় পাইনা।

ভর্ত্তৃহরি। তবে আমার ন্যায় আপনারও শত্রু আছে!

দত্তাত্রেয়। আছে বই কি; তবে আমার শত্রুর সংখ্যা পরিমিত, আর তোমার অসংখ্য।

ভর্ত্তৃহরি। আমার যেমন অসংখ্য শত্রু আছে, সেইরূপ শত্রুভয় নিবারণের জন্য অসংখ্য সেনাবলও রহিয়াছে।

দত্তাত্রেয়। কৈ তুমিত এখন একক, তোমার সৈন্যগণ কোথায় ?

ভর্ত্তৃহরি। কেন বন প্রান্তে—শিবিরে।

দত্তাত্রেয়। এখন যদি তুমি কোন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হও, তবে তুমি তোমার সৈন্য সামন্ত হইতে কোন উপকার পাইবে কি ?

ভর্ত্তৃহরি। না।

দত্তাত্রেয়। তবে তোমার সেনাবল থাকা না থাকা সমান।

ভর্ত্তৃহরি। তাহা না হয় মানিলাম। কিন্তু কামক্রোধাদি রিপুগণ যদি আপনাকে আক্রমণ করে, তবে আপনার রক্ষার উপায় কি ?

দত্তাত্রেয়। আমারও সেনাবল রহিয়াছে।

ভর্ত্তৃহরি। থাকিতে পারে, কিন্তু এখন ত আপনি একাকী, এখন যদি আপনাকে আক্রমণ করে ?

দত্তাত্রেয়। রাজন! আমার সৈন্য সামন্ত আমার নিকটেই রহিয়াছে। ইহারা তোমার সৈন্যের ন্যায়, কখন ক্ষণেকের জন্যও আমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হয় না। এই দেখ বিবেক বৈরাগ্য, শম দম, ধৈর্য্য তিতিক্ষা, ক্ষমা শান্তি, নিস্পৃহতা, দিব্য জ্ঞান, বিনয় ও বিশ্বপ্রেম ইহারাই আমার সৈন্য সামন্ত ও প্রহরী। ইহারা বিদ্যমান থাকিতে সাধ্য কি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের, আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে!

ভর্ত্তৃহরি। আপনার সৈন্যের বল হইতে যদি কখন কাম-ক্রোধের বল অধিক হয়, তখন রক্ষার উপায় কি ? কামক্রোধাদিত অতি দুর্দ্দান্ত রিপু।

দত্তাত্রেয়। তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, কামক্রোধাদি রিপুনিচয় অতিশয় দুর্দ্দমনীয় এবং অত্যন্ত খল। পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে উহাদিগের হইতে সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়।

ভর্ত্তৃহরি। পূর্ব্ব সতর্কতা কিরূপে অবলম্বন করিতে হয় ?

দত্তাত্রেয়। হৃদয় রূপ দুর্গের দ্বারদেশ, সংযম রূপ কবাট দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; তাহা হইলে ঐ পাপিষ্ঠেরা আর প্রবেশ করিতে পারে না। সংযমের কবাট যদি কিছু মাত্র শিথিল থাকে, তাহা হইলে ঐ রিপুদিগের গুপ্তচর বিলাসিতা ও আসক্তি অলক্ষিতে হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উহার দ্বার প্রশস্তভাবে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তখন ঐ শত্রুবর্গ প্রবলবেগে পুরপ্রবেশ করিয়া হঠাৎ আক্রমণ করে।

ভর্ত্তৃহরি। তখন কি উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকেন ?

দত্তাত্রেয়। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া সভয় অন্তরে, "হরি রক্ষা কর" বলিয়া বিপদ-হারীর অভয়চরণে শরণ লই। রিপুদলন মধুসূদন তখন অসতর্ক সৈন্যসামন্তের দেহে দৈব বল প্রদান করেন।

ভর্ত্তৃহরি! এ কথা আমি সকল সময়ে মানিতে প্রস্তুত নহি। সকলেইত দুর্দ্দান্ত রিপুগণের দৌরাত্ম্যে কাতর হইয়া ভগবানকে ডাকে ? তবে কেন তিনি সকলকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করেন না ?

দত্তাত্রেয়। যে কামাদিকে শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করতঃ উহাদের আক্রমণে ভীত হইয়া হরির চরণে শরণ লয়, হরি তাহাকে রক্ষা করেন বই কি ? আর যে উহাদের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে, হরি তাহার ডাকে কর্ণপাত করিবেন কেন ?

ভর্ত্তৃহরি। কেহ কি কামাদি শত্রুর সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে ?

দত্তাত্রেয়। করে বই কি ?

ভর্ত্তৃহরি। কে ?

দত্তাত্রেয়। অসংযত বিলাসী।

ভর্ত্তৃহরি। কিরূপে ?

দত্তাত্রেয়। বল দেখি গৃহস্থের গৃহে চোর প্রবেশ করিলে, গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি ?

ভর্ত্তৃহরি। চোরকে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা।

দত্তাত্রেয়। যদি গৃহস্থ সে কার্য্যে স্বয়ং অক্ষম হয়, তখন তাহার কি করা উচিত।

ভর্ত্তৃহরি। প্রতিবেশিগণ ও নগররক্ষিবর্গকে আহ্বান।

দত্তাত্রেয়। তাহা হইলে কি হইবে ?

ভর্ত্তৃহরি। হয় চোর পলায়ন করিবে, নয় ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইবে।

দত্তাত্রেয়। যদি গৃহস্থ তাহার কিছুই না করিয়া, চোরকে দেখিবামাত্র সমাদরে আহ্বান করিয়া গুপ্তধন দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে চোর কি করিবে ?

ভর্ত্তৃহরি। সে অনায়াসে চুরি করিয়া পলায়ন করিবে।

দত্তাত্রেয়। এরূপ ঘটনা যদি নগররক্ষক জানিতে পারে, তবে সে কি তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় ?

ভর্ত্তৃহরি। কখনই নহে।

দত্তাত্রেয়। গৃহস্থ যদি তাহার সর্ব্বস্বাপহারী চোরের সহিত এবম্বিধ ব্যবহার করে, তবে সে চোরের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে কি না ?

ভর্ত্তৃহরি। অবশ্যই হইবে।

দত্তাত্রেয়। বেশ! তবে অসংযত বিলাসি-

গণ যদি কামক্রোধাদি রিপুর সহিত ঐরূপ ব্যবহার করে, তবে তাহারা কাম ক্রোধের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে, স্বীকার করিবে না কেন ?

ভর্ত্তৃহরি। আমি আপনার বাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

দত্তাত্রেয়। বিলাসীর মনে যদি কামের উদ্রেক হয়, তখন সে কি ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে ? না কাহার সাহায্য প্রার্থনা করে?

ভর্ত্তৃহরি। কখনই নহে।

দত্তাত্রেয়। তখন সে কি করে ?

ভর্ত্তৃহরি। সে তখন কামেরই বিষয় চিন্তা করিতে থাকে।

দত্তাত্রেয়। ফল কি হয় ?

ভর্ত্তৃহরি। ক্রমে মনসিজ তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া লয়।

দত্তাত্রেয়। তার পর ?

ভর্ত্তৃহরি। তার পর সে কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে : কামোদ্দীপক বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কাম ও কামভোগ্য বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বারাঙ্গনার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কামের সেবায় রত হয়।

দত্তাত্রেয়। কাম তখন কি করে ?

ভর্ত্তৃহরি। কাম তখন তস্করের ন্যায় তাহার চরিত্র, স্বাস্থ্য ও শ্রী হরণ করিয়া পলায়ন করে।

দত্তাত্রেয়। এখন বোধ হয় কামের সহিত বিলাসীর ব্যবহার বুঝিতে পারিয়াছ। রাজন্! বিলাসী নর কেবল মুখে কাম ক্রোধাদিকে রিপু বলিয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যে, তাহাদের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে। কামক্রোধ যখন হৃদয়ে উদয় হয়, তখন যদি মানব বিপন্ন হইয়া বিপদহারী হরিকে "ত্রাহিমাম্ মধুসূদন" বলিয়া ডাকে, তবে কাতর-ভয়-ভঞ্জন তখনই তাহার বিপদভঞ্জন করিয়া থাকেন। নইলে বৈরীর সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিলে, খল শত্রু ত সুযোগ পাইয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবেই, তখন মুখের কাল্পনিক ডাকা ডাকিলে অন্তর্যামী হরি শুনিবেন কি ?

ভর্ত্তৃহরি। তাহা শুনিবেন কেন ? দেব! এখন যথার্থই বুঝিলাম বিলাসী নর সত্যসত্যই রিপুর সহিত সখার ন্যায় ব্যবহার করিয়া হৃতসর্ব্বস্ব হয়।

দত্তাত্রেয়। তুমি বোধ হয় এখন স্বরাজ্যে গমন করিবে।

ভর্ত্তৃহরি। একাকী নহে ; আপনাকে সঙ্গে লইয়া।

দত্তাত্রেয়। আমি যাইব কেন ?

ভর্ত্তৃহরি। সুখভোগার্থ। আমি আপনাকে লইয়া গিয়া সুখী করিব।

দত্তাত্রেয়। কিরূপে সুখী করিবে ?

ভর্ত্তৃহরি। উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসন প্রদান করিয়া।

দত্তাত্রেয়। রাজপদে কি সুখ আছে ?

ভর্ত্তৃহরি। যদি রাজপদে সুখ নাই ত, সুখ আছে কিসে ?

দত্তাত্রেয়। সুখ আছে নির্জ্জনে বসিয়া পরব্রহ্মের আরাধনায় ?

ভর্ত্তৃহরি। থাকিতে পারে। কিন্তু রাজপদেও যদি সুখ না থাকে, তবে লোকে উহা প্রার্থনা করে কেন ?

দত্তাত্রেয়। অশান্তি ভোগ করিবার জন্য।

ভর্ত্তৃহরি। রাজপদ কি কেবলই অশান্তিময়?

দত্তাত্রেয়। রাজপদে কিঞ্চিৎ সুখ থাকিতে পারে, কিন্তু উহাতে ত শান্তির লেশমাত্র নাই।

ভর্ত্তৃহরি। শান্তি নাই সত্য, কিন্তু উহাতে প্রভুত্বজনিত সুখ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

দত্তাত্রেয়। হাঁ তা বটে, কিন্তু উহাতে সুখের পরিমাণ অপেক্ষা অশান্তি, দুশ্চিন্তা ও ভয়ের পরিমাণ শতগুণে অধিক বিদ্যমান।

ভর্ত্তৃহরি। তবে কি রাজপদ কেবলই দুঃখের আকর ?

দত্তাত্রেয়। আমি ত কেবলই দুঃখের আকর বলি নাই। উহাতে সুখও আছে বলিয়াছি।

ভর্ত্তৃহরি। যদি উহাতে সুখ আছে আপনি মানেন, তবে আপনি সেই সুখভোগার্থ কেন আমার সহিত গমন করিবেন না ?

দত্তাত্রেয়। রাজপদে যদি সুখ থাকে, তবে আমিও সে সুখে বঞ্চিত নহি। তবে আমার এ স্থল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন কি ?

ভর্ত্তৃহরি। আপনার রাজ্য কোথায় ?

দত্তাত্রেয়। এই বিস্তীর্ণ বনপ্রদেশই আমার বিশাল রাজ্য।

ভর্ত্তৃহরি। এরূপ প্রজাহীন, সিংহাসনশূন্য, রাজপ্রাসাদ-রহিত, মন্ত্রিবিহীন, সৈন্যসামন্তাভাব রাজ্যের রাজা হওয়ায় সুখ মন্দ নহে!

দত্তাত্রেয়। তোমার বুঝিবার ভ্রম হইয়াছে। যে সমুদয় রাজসম্পদের কথা উল্লেখ করিলে, আমার সে সকল কিছুরই অভাব নাই।

ভর্ত্তৃহরি। দেব, ক্ষমা করিবেন, আপনার বাক্যের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিতেছি না। আমি ত দেখিতে পাইতেছি, আপনার রাজ্যের মধ্যে এই গহন কানন, প্রজার মধ্যে হিংস্র জন্তু ও পশুপক্ষী, রাজপ্রাসাদের মধ্যে এই বনস্পতি, সিংহাসনের মধ্যে বৃক্ষমূল, রাজপরিচ্ছদের মধ্যে বৃক্ষের বল্কল, এবং রাজমুকুটের মধ্যে জটাকলাপ। এই সকল রাজৈশ্বর্য্যে যে কি সুখ, তাহা ত আমার সাধারণ বুদ্ধির গম্য নহে।

দত্তাত্রেয়। বিচার করিয়া দেখিলে সুখ আছে কি না বুঝিতে পারিবে।

ভর্ত্তৃহরি। বিচারে মীমাংসিত হইলে অবশ্যই পারিব।

দত্তাত্রেয়। প্রথমে রাজ্য লইয়াই বিচার করা যাউক, পরে ঐশ্বর্য্যের বিষয় আলোচিত হইবে। বল দেখি রাজ্যের প্রয়োজন কি নিমিত্ত?

ভর্ত্তৃহরি। প্রকৃতিবর্গ বসবাস করিবে বলিয়া।

দত্তাত্রেয়। উত্তম! তোমার প্রজাবর্গ মানব। বাসের নিমিত্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থান এবং জীবনোপায় শস্যোৎপাদনের জন্য উর্ব্বর ভূমি তাহাদের আবশ্যক। অবশ্যই তোমার রাজ্যে তাহার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তদ্বিপরীতে যদি তোমার রাজ্য নিবিড় অরণ্যাবৃত ও মরুময় হইত তাহা হইলে কি তোমার প্রকৃতিবর্গের বাসের উপযোগী হইত ?

ভর্ত্তৃহরি। কখনই নহে।

দত্তাত্রেয়। কেন ?

ভর্ত্তৃহরি। মানুষ কি কখন নিবিড় অরণ্যে ও মরুময় প্রদেশে বাস করিতে পারে ?

দত্তাত্রেয়। নিবিড় অরণ্য কাহাদের বাসের উপযোগী।

ভর্ত্তৃহরি। পশুপক্ষীদিগের।

দত্তাত্রেয়। পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তুই যখন আমার প্রজা, তখন এই গহন কাননই তাহাদের উপযুক্ত বাসের স্থল। তোমার প্রজাদিগের পক্ষে তোমার রাজ্য যেরূপ উপযোগী আমার প্রকৃতিবর্গের পক্ষেও আমার এই বন রাজ্য সেইরূপ উপযোগী। প্রয়োজন লইয়াই পদার্থের গৌরব। অতএব আবশ্যকতা বিষয়ে তোমার রাজ্য ও আমার রাজ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত হইল না। তবে প্রভেদের মধ্যে বহু ব্যয় ও শ্রমসাধ্য কৃত্রিম উপায় ও বিধি

দ্বারা তোমার রাজ্যের শোভাশান্তি সংবর্দ্ধিত, আমার রাজ্য প্রকৃতিদেবীর অনুগ্রহে রমণীয় ও শান্তিময়। আমার রাজ্য নিরাপদ, তোমার তাহা নহে। তোমার রাজ্য অপহরণ করিয়া লইবার জন্য শত্রুগণ সদাই উদ্যত, আমার রাজ্যের কেহ অপহর্ত্তা নাই। বল দেখি, কার রাজ্য ভাল ?

ভর্ত্তৃহরি। আপনার রাজ্য ভাল হইতে পারে, কিন্তু আপনার প্রকৃতিবর্গ যে, জ্ঞানশূন্য হিংস্র পশু। আমার প্রজা বুদ্ধিমান মানবের সহিত কি তাহাদের তুলনা হইতে পারে ?

দত্তাত্রেয়। খল বুদ্ধিমান মানব অপেক্ষা কি স্বভাবচালিত হিংস্র জন্তু ভাল নহে ?

ভর্ত্তৃহরি। কিরূপে ?

দত্তাত্রেয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তুমি যদি পশুদিগের হিংসা কর, তবে তাহারা তোমার হিংসা করিবে, তুমি তাহাদের হিংসা না করিলে তাহারা কখনই হিংসা করিবেনা। কিন্তু হিংসা করা দূরে থাকুক,তুমি যদি মানবের উপকার কর, তাহা হইলেও সে সুযোগ পাইলেই তোমার অপকার করিবে। পশুদিগের স্বভাব—তোমার শত্রুভাচরণ করিতে হইলে সে প্রকাশ্যভাবেই তোমাকে আক্রমণ করিবে, কিন্তু মানুষ মুখে তোমার সহিত মধুর আলাপ করিবে এবং অন্তরালে তোমার অনিষ্ট সাধন করিতে ত্রুটি করিবে না। এইত গেল হিংসা সম্বন্ধে। তার পর ঈশ্বর মনুষ্যকে সদসৎ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন বটে,কিন্তু তদনুসারে তাহারা চলে কৈ ? এই দেখ তোমার প্রজা মানব হিতাহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও, অযথা সময়ে স্ত্রীগমন করিয়া পাপের ভার বৃদ্ধি করে ; আমার প্রজা পশু, কখন প্রজাজনন সময় ব্যতীত স্ত্রীতে উপগত হয় না। তোমার প্রজা বুদ্ধিমান হইয়া সততই রাজবিধি ভঙ্গ করতঃ রাজ্যে অশান্তি উৎপাদন করে, আমার প্রজা জ্ঞানহীন হইয়াও কখন এই কাননের শান্তি ভঙ্গ করিয়া আমার তপস্যার বিঘ্ন করে না। তোমার প্রজা রাজদ্রোহী, আমার প্রজা রাজভক্ত। তোমার প্রজা মিথ্যাবাদী, আমার প্রজা কপটতাশূন্য। রাজন! তুমি মনে করিও না জীবের মধ্যে এক মানবই শ্রেষ্ঠ আর সকলেই অধম। ভাব দেখি পিতামাতা কত যত্নে কত কষ্টে সন্তানকে লালনপালন করে ; সেই সন্তান পরিণত বয়সে বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন এবং উপার্জ্জনক্ষম হইয়া অনেকস্থলেই সেই পরম পূজ্য পিতামাতাকে হতাদর করে এবং প্রায়ই তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে কুণ্ঠিত হয়। অন্য দিকে জ্ঞানহীন পশু হইয়াও গরু আমাদের কেমন উপকার সাধন করিয়া থাকে। বনের ঘাস খাইয়া এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াও আপন সন্তানকে বঞ্চনা করতঃ গাভী কেমন অমৃতকল্প দুগ্ধ প্রদান করে। বলিবর্দ্দ প্রখর রৌদ্রতাপে দগ্ধ ও কৃষক দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও হলাকর্ষণ করতঃ মানবের জীবনোপায় শস্য উৎপাদন করিয়া দেয়। তুমি কি ইহাদিগকে মানব অপেক্ষা অধম বলিতে চাও ?

ভর্ত্তৃহরি। কদাপি নহে।

দত্তাত্রেয়। তার পর রাজৈশ্বর্য্যের কথা। একে একে ধর। তোমার রাজপ্রাসাদ না হয় কারুকার্য্য সমন্বিত বৃহৎ অট্টালিকা,আমার রাজগৃহ না হয় এই ছায়াময় বনস্পতি। তুমি বিলাসী ও বহুপরিবার সম্পন্ন,তোমার বিচিত্র ও প্রশস্ত আবাসেরই আবশ্যক ; আমি বিলাসত্যাগী ও একক, সুতরাং আমার পক্ষে এই স্বভাবজাত নির্জ্জন বৃক্ষতলই যথেষ্ট। বাসের পক্ষে উভয়ের প্রয়োজনই সমান। তবে তোমার রাজপ্রাসাদ জনকোলাহলে পরিপূর্ণ ও রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর আলয় বলিয়া অশান্তির আবাসভূমি ; আর আমার এ বৃক্ষতল, জরামৃত্যুজনিত শোকমোহের সহিত নিঃসংস্রব বলিয়া শান্তি সুখের নিকেতন। তোমার রাজসিংহাসন কনকনির্ম্মিত, আমার রাজাসন বৃক্ষের মূল। সেও কঠিন এও কঠিন। বসিয়া তাহাতেও আরাম নাই, ইহাতেও আরাম নাই। জাগ্রতাবস্থায় সেই রত্নসিংহাসনে

বসিলে, কেবল লাভের মধ্যে মনে অহংকারের উদয় হয় ও দুশ্চিন্তা নিয়ত যাতনা দিতে থাকে এবং সদাই শত্রুর আক্রমণ ভয় অন্তরে উদিত হইয়া উষ্ণ শোণিত শীতল করিয়া ফেলে। আমার এ বৃক্ষমূলে সে সব কিছুরই উপদ্রব নাই। তবে নিদ্রিতাবস্থার কথা স্বতন্ত্র। ঘুমাইলে তোমারও রত্নসিংহাসন বলিয়া মনে থাকে না, আমারও বৃক্ষমূল বলিয়া মনে থাকে না। তার পর তোমার পরিধেয়—মহামূল্য বসনভূষণ, আমার পরিচ্ছদ বল্কল। পরিচ্ছদের মুখ্য উদ্দেশ্য লজ্জানিবারণ। তা তোমার ঐ মহামূল্য বসনও যেরূপ লজ্জানিবারণ করে, আমার এই সামান্য বল্কলেও সেইরূপ লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। তা তাতে আর প্রভেদ কি ? তবে প্রভেদের মধ্যে বসনভূষণের চাকচিক্যে তোমার মনে অহংকারের ভাব আনিয়া দেয়, আর বল্কলের মলিনতায় আমার মনে বিনয়ের উদ্রেক হয়। রাজমুকুট ! ওত শোভার জন্য। তা রত্নখচিত কিরীট তোমার মস্তকের যেরূপ শোভা সম্পাদন করে, আমার এই জটাকলাপ কি আমার উত্তমাঙ্গের সেইরূপ শ্রীবৃদ্ধি করে না? তোমারও মন্ত্রী রহিয়াছে, সৈন্য রহিয়াছে, আমারও মন্ত্রী রহিয়াছে সৈন্য সামন্ত রহিয়াছে। তোমার মন্ত্রী ভ্রান্ত মানব ; তাহার মন্ত্রণায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমার মন্ত্রী অভ্রান্ত বিবেক ও বৈরাগ্য;তাহাদের পরামর্শানুসারে চলিলে কখন বিপদের সম্ভাবনা নাই। তোমার সৈন্যসামন্ত দুর্ব্বল ও কলহপ্রিয় মানব, আমার সৈন্যসামন্ত বলশালী ও শান্তিকামী ধৈর্য্য তিতিক্ষা,শম দম, জ্ঞান ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রেম, দয়া ক্ষমা, নিস্পৃহতা, অহিংসা প্রভৃতি। অতএব রাজন! আমার রাজ্য ও রাজৈশ্বর্য্যের কিছুরই অভাব নাই;বিশেষতঃ এখানে আমি রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও যোগসাধনে সক্ষম হইতেছি—রাজপদের সুখ এবং তপস্যার আনন্দ ও শান্তি উভয়ই ভোগ করিতেছি। তোমার রাজ্যে গমন করিলে অকিঞ্চিৎকর রাজ্যভোগসুখ ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু সে জনকোলাহলে পরম ইষ্ট যোগসাধনের ব্যাঘাত হইবে এবং চরমে পরম পদ লাভেরও বিঘ্ন ঘটিবে। তবে আমি কি জন্য এই উৎকৃষ্টতর সুখ পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট সুখের জন্য তোমার সহিত গমন করিব ? অতএব তুমি একাকী রাজ্যে গমন কর। যোগিবরের এই সকল অমূল্যজ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে ভর্ত্তৃহরি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তদীয় অনুমতিক্রমে অশ্বে আরোহণ করতঃ বনপ্রান্তস্থিত শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া অচিরেই রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

বহুকাল গত হইয়াছে। মহর্ষি দত্তাত্রেয় তাঁহার প্রিয় শিষ্য মহারাজ ভর্ত্তৃহরির সহিত সাক্ষাৎ মানসে উজ্জয়িনী অভিমুখে গমন করিয়াছেন। দত্তাত্রেয় উজ্জয়িনীর প্রান্তভাগে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময়ে অনতিদূরে ক্রন্দনরোল পরিপূরিত একটী জনতা দেখিতে পাইলেন। জনতা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ক্রন্দনধ্বনি ততই সুস্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, ভয়ানক শোকে অভিভূত হইয়া স্বয়ং মহারাজ ভর্ত্তৃহরি, মন্ত্রী-পারিষদ ও রক্ষিবর্গ পরিবৃত হওত বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। তিনি ভর্ত্তৃহরিকে অকস্মাৎ এরূপ মোহের বশীভূত হইতে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। এবং তাঁহার শোকের কারণ অবগত হইয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিবার মানসে সত্বর নিকটস্থ কোন কুম্ভকারের বিপণি হইতে একটী সুন্দর হাঁড়ি ক্রয় করিয়াই হাঁড়িটী আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং এরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন যে, আগন্তুক ব্যক্তিমাত্রেই বিস্মিত হইয়া কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ভর্ত্তৃহরি দর্শন মাত্রেই গুরুদেবকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্রন্দন ভুলিয়া গেলেন এবং সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব আপনার এরূপ ক্রন্দনের হেতু কি ?

দত্তাত্রেয়। তুমি কান্দিতেছ কেন ?

ভর্ত্তৃহরি। আমার স্ত্রী মরিয়াছে।

দত্তাত্রেয়। আমার হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে।

ভর্ত্তৃহরি। হাঁড়ি ভাঙ্গিলে কি কেহ কান্দে ?

দত্তাত্রেয়। তোমার স্ত্রী মরিয়াছে তুমি কান্দিতেছ কেন ?

ভর্ত্তৃহরি। আমি কান্দিতেছি, আমার স্ত্রী অতিশয় গুণবতী ছিল বলিয়া।

দত্তাত্রেয়। আমি কান্দিতেছি আমার হাঁড়িটী বড় শক্ত ছিল বলিয়া।

ভর্ত্তৃহরি। আপনি ত কিনিলেই হাঁড়ি পাইবেন।

দত্তাত্রের। তুমিও ত বিবাহ করিলেই স্ত্রী পাইবে।

ভর্ত্তৃহরি। স্ত্রী পাইব বটে, কিন্তু ওরূপ গুণবতী স্ত্রী পাইবনা।

দত্তাত্রেয়। আমিও কি ওরূপ শক্ত হাঁড়ি আর পাইব?

ভর্ত্তৃহরি। আপনার হাঁড়িটী ত জীবনশূন্য সামান্য একটী ঘট মাত্র। উহার জন্য আবার শোক কি?

দত্তাত্রেয়। তোমার স্ত্রীর দেহ কি ঘট নহে, উহার কি এখন জীবন আছে? উহার জন্য তবে তুমি শোক করিতেছ কেন?

ভর্ত্তৃহরি। ঘট ও মনুষ্যে কি আপনি তুল্য করিতে চাহেন?

দত্তাত্রেয়। তুল্য বই কি? যাঁহার অভাবে আমার এ হাঁড়িটী ঘট ও যাঁহার সদ্ভাবে এই মৃত দেহ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মানব বলিয়া গণ্য ছিল, তাঁহার যখন অভাব হইয়াছে, তখ এ দেহ ঘট বই আর কি? বিচার করিয়া দেখিলে ঐ মৃত দেহ অপেক্ষা আমার এই ভা হাঁড়িটীর গৌরব অধিক। মৃত দেহ কিছুক্ষণ পরেই পচিয়া দুর্গন্ধ হইবে, আমার এ হাঁড়িটী শীঘ্র পচিবেনা। বৎস! শরীরের কি কেহ আদর করে? তাহা যদি করিত, তাহা হইলে তুমি তোমার প্রাণসমা পত্নীর দেহ কখনই শ্মশানে দগ্ধ করিতে যাইতে না! আদর আত্মার ও গুণের। আত্মা অবিনাশী, গুণও বিনষ্ট হইবার নহে। আত্মা, গুণরাশি ও জড়দেহের সমবায়ে তোমার স্ত্রীর অস্তিত্ব ছিল। আত্মা ও গু —যাহা চিন্তার বিষয়, যখন বিদ্যমান রহিল, তখন সামান্য ঘট সদৃশ বিনাশধর্ম্মী জড়দেহের জন্য শোক করিবার কোন হেতু নাই। তোমার ন্যায় জ্ঞানবানকে অজ্ঞানীর ন্যায় মোহাচ্ছন্ন দেখিয়াই আমি এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছি। যাও, গৃহে গমন কর। তোমার শ্মশানক্ষেত্রে যাইবার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া ভগবান দত্তাত্রেয় গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন; মহারাজ ভর্ত্তৃহরিও সদ্‌গুরুর কৃপায় মোহমুক্ত হইয়া রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

দারোগার দপ্তর। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ পুলিস কর্ম্মচারী বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দারোগার দপ্তর নাম দিয়া মাসে মাসে তাঁহার অদ্ভুত অনুসন্ধান কাহিনী সকল প্রকাশ করিতেছেন। দুইটী কাহিনী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। একটীর নাম "কুলসম্" অপরটীর নাম "আস্‌মানী লাস"। আমরা দুইটীই পাঠ করিয়াছি এবং প্রিয়নাথ বাবুর অদ্ভুত বুদ্ধিকৌশল ও অনুসন্ধান-তৎপরতার বিষয় অবগত হইয়া চমৎকৃত হইয়াছি। দুইটী ঘটনাই হৃত্যাকাণ্ড মূলক ও অতীব বিস্ময়জনক। একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। আমরা সাধারণকে ও প্রত্যেক পুলিস কর্ম্মচারীকে এই সকল অনুসন্ধান কাহিনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সঙ্গীত রত্নাবলী। ৺রাখাল দাস কুণ্ডু দ্বারা প্রণীত ও শ্রীগোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই ক্ষুদ্র সংগীত-পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। বিশ্বস্ত সূত্রে স্বর্গীয় কুণ্ডু মহাশয়ের ধর্ম্মপরায়ণতা, জ্ঞান, ভক্তি ও ভগবদ্‌নিষ্ঠার বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, এই পরমার্থ-বিষয়ক জ্ঞানভক্তিবৈরাগ্যোদ্দীপক সংগীতগুলিতে তাহারই জলন্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তিনি জীবিতমানে এই সকল সংগীত রচনা করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত ও পিতৃভক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু মহাশয় ঐ সংগীতগুলি সঙ্কলন করিয়া, সংগীত রত্নাবলী" নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। গানগুলি অতি উচ্চ অঙ্গের। দুঃখের বিষয় আমরা স্থানাভাববশতঃ তাহার নমুনা দেখাইতে পারিলামনা।

পল্লী-সমাজ। (১)

ভারতের স্বাধীন অবস্থায় যে অভ্যুদয় াছিল, ইয়ুরোপে এখন প্রায় সেইরূপ অভ্যুলিতেছে। এই হিসাবে যদি কেহ বলেন, ান ভারত, ভারত না হইয়া, যদি ইয়ুপর কোন দেশ হইত, তবে এদেশের কি ন্ত যে শ্রীবৃদ্ধি হইত, তাহা সহজেই মেয়। ইহা প্রলাপ বলিয়া উপহাস করি- কথা নয়। ফলতঃ এ দেশের প্রত্যেক সমা- প্রত্যেক পল্লীগ্রামের ইতিবৃত্ত, লিখিয়া বার বস্তু বলিতে হাসি পায়—কান্নাও আসে ামাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কখন কখন ইংরেজ তেছেন। দেশের মতিগতির কি বিপর্য্যয়ই ল! কোন কোন বিষয়ে আবার বিপরীত ধি। বিদেশীয় ও বিজাতীয়েরা, এদেশীয় ার ধর্ম্মাদির প্রশংসা করিয়া অধীর হইয়া তেছেন, আর আমরা ইয়ুরোপের অননুীয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কার্য্য পর্য্যন্তও সাদরে ধারণ করিতেছি। ও সকল কথা ছাড়িয়া া যাক্। যাহাতে হৃদয়ে ব্যথা লাগে, ার আলোচনা করিয়া কাজ নাই। যাহাতে ক্লেশের উপশম হয়, তাহার চেষ্টা করাই শুক।

ংটার সাহেব, বঙ্গদেশের যে স্থান সকলের া করেন নাই, অথবা অত্যল্প পরিমাণে য়াছেন, আমরা এই প্রবন্ধে তাহার ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি বর্দ্ধমান লের প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু র অন্তর্ব্বর্ত্তী অনেক প্রসিদ্ধ স্থানের নির্ণয় তে না পারিয়া নীরবে সেই সেই স্থানের দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। "খানাকুলনগর" সমাজও সুতরাং অনুল্লিখিত হইা। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ওরূপ বিখ্যাত শ আর নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গঙ্গার পূর্ব্ব পারে নবদ্বীপ যেমন গৌড় দেশের এক অগ্রগণ্য স্থান, গঙ্গার পশ্চিম পারে খানাকুল-কৃষ্ণনগরও তদ্রূপ। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া উহার মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরও চৈতন্যদেবের প্রধান সহচর অভিরাম গোপালের লীলা-ভূমি। অভিরাম, গৌরাঙ্গ-লীলাকালে দ্বাদশ গোপালের মধ্যে প্রধান ও প্রথম গোপাল। তিনি দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীদাম ছিলেন, ইহা বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর প্রসিদ্ধ কেন, তাহার ইতিবৃত্ত রচনারই বা আবশ্যকতা কি, যিনি ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহার গোচরার্থে এই মাত্র বলিলেই, পর্য্যাপ্ত হইবে, যে দিক্ দিয়া দেখা যাউক না কেন, খানাকুল-সমাজ সকলেরই শ্রদ্ধাস্পদ, সুতরাং বিখ্যাত। আমরা একে একে সকল গুলির উল্লেখ করিব। বঙ্গীয় কবি ভারতচন্দ্র রায় ও পাদরি লঙ্ সাহেব প্রভৃতি, এই স্থানের দর্শক। নবদ্বীপ যেমন দার্শনিক বাসুদেব সার্ব্বভৌম, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, ধর্ম্মবীর চৈতন্য ও অন্যান্য খ্যাত লোকের জন্মভূমি বলিয়া জনসমাজে চিরাদৃত, খানাকুল প্রদেশ সর্ব্বাংশে তাদৃশ না হউক, অনেকাংশে নবদ্বীপের সমকক্ষ। ইহাকে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বা ছোট নবদ্বীপ বলা চলে।

১। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি বলিয়া নবদ্বীপ যেমন বৈষ্ণবগণের এক তীর্থ, দ্বাদশ গোপালের পাঠও, তাঁহাদের সেইরূপ তীর্থ। দ্বাদশ গোপালের অগ্রগণ্য অভিরাম গোস্বামীর লীলাস্থলী (খানাকুল) কৃষ্ণনগর-ভূমি। এ কারণ বৈষ্ণবকুল এ স্থান পরম পবিত্র জ্ঞান করেন। দ্বাদশ গোপালের নাম ও শ্রীপাঠ প্রদত্ত হইল,—

দ্বাপরযুগ—শ্রীকৃষ্ণলীলায়	কলিযুগ—গৌরাঙ্গলীলায়	শ্রীপাঠ
১ শ্রীদাম	১ অভিরাম গোস্বামী	(খানাকুল) কৃষ্ণনগর
২ সুদাম	২ সুন্দরানন্দ ঠাকুর	(হলদা) মহেশপুর
৩ বসুদাম	৩ ধনঞ্জয় পণ্ডিত	শীতলগ্রাম
৪ সুবল	৪ গৌরদাস পণ্ডিত	অম্বিকা (কালনা)
৫ মহাবল	৫ কমলাকর পিপলাই	মাহেশ
৬ সুবাহু	৬ উদ্ধারণ দত্ত	সপ্তগ্রাম
৭ মহাবাহু	৭ মহেশ পণ্ডিত	মসীপুর
৮ স্তোককৃষ্ণ	৮ পুরুষোত্তম	সুখসাগর
৯ অর্জ্জুন	৯ পরমেশ্বর ঠাকুর	বিষখানা
১০ লবঙ্গ	১০ কানাই পণ্ডিত	লোধখানা
১১ মধুমঙ্গল	১১ শ্রীধর পণ্ডিত	নবদ্বীপ
১২ দাম	১২ পুরুষোত্তম দত্ত	নাগদেশ

২। একটি পীঠস্থান বলিয়াও ইহার প্রচুর প্রবাদ আছে। এতদ্ভিন্ন এখানকার গোপীনাথ ও রাধাবল্লভ বিগ্রহ, ঘণ্টেশ্বর ও সাহানেশ্বর শিবলিঙ্গ, এবং অপরাপর স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ অল্প খ্যাত নহেন। এ সকল এই প্রদেশের সুখ্যাতিরই কথা।

৩। নবদ্বীপ যেমন দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য সকলের নিকট নিতান্ত পূজ্য,—এ প্রদেশ, তাদৃশ না হউক, অনেকাংশে তৎসদৃশ বিদ্যালোচনার নিমিত্ত গৌরবান্বিত। অত্রত্য নারায়ণ বন্দ্য ঠাকুরের "স্মৃতি-সর্ব্বস্ব" কণাদ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের ন্যায়-দর্শনাদির টীকা-টিপ্পনীও পণ্ডিমণ্ডলীতে সুপ্রথিত। উহাতে উল্লিখিত শাস্ত্রের মহোপকার সাধন করিয়াছে কি না, পণ্ডিতগণই তাহার সাক্ষী।

নবদ্বীপের স্মৃতিকর্ত্তা—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। খানাকুল কৃষ্ণনগরের স্মৃতিকর্ত্তা—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর। তদীয় স্মৃতি-সংগ্রহ তাঁহার যে যে বিশেষত্ব আছে, ক্রমশঃ তাহা প্রদর্শিত হইবে। রঘুনন্দন, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যঘটী গ্রামীণ—নারায়ণও শাণ্ডিল্য গোত্রসম্ভূত বন্দ্যঘটী গ্রামীণ। এ বিষয়েও উভয়ে জনেই তুল্য।

৪। এখানকার আদিম জমিদার চৌধুরী কায়স্থের "গোষ্ঠীপতি" ছিলেন। অত্রত্য সর্ব্বাধিকারীরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন। এই হেতু-বশতঃও ইহাকে প্রসিদ্ধ বলিতে হইবে।

৫। নবদ্বীপের নৈয়ায়িক—রঘুনাথ শিরোমণি। এখানকার নৈয়ায়িক—কণাদ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৬। ইংরেজ-রাজত্ব-কালে বঙ্গবাসিগণের কেবল বঙ্গবাসিগণের কেন—সমগ্র ভারতবাসিগণের গৌরব-ভূমি রাজা রামমোহন

কুল কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী রাধানগরে গ্রহণ করেন। তখন এ প্রদেশ, বর্দ্ধমান লের অধীন থাকে। সেই মহাপুরুষের পরিগ্রহে কেবল এ প্রদেশের নয়—সমস্ত ত-মণ্ডলের কত মহাশ্লাঘা হইয়াছে! ঙ্কিত সমাজে তাহাতে সত্য সত্যই আমা- শির উন্নত রাখিয়াছে। বলিতে কি, তিনি তের স্পর্দ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। াল জলধি-রাশি অতিক্রম করিয়া যাঁহার পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল—হইয়াছিল ই বলি, এখনও উড্ডীন রহিয়াছে—ভরসা য়া বলা যাইতেছে, চিরকাল সমভাবে ডীন থাকিবে, সেই রামমোহন, আমাদেরই প্রদেশের অধিবাসী। এই অধঃপতিত সম- যেন ভারত-মাতার বদন সুপ্রসন্ন ও জ্জ্বল রাখিবার নিমিত্তই বুঝি বিধাতা াকে বঙ্গের ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ড়ভূমির খ্যাতি তাই বিশাল বারিধি-পারে া উপনীত হইয়াছিল!

ধর্ম্মবীর শঙ্করাচার্য্যের পর ভারতবর্ষে যে মোহন ব্যতীত অদ্যাবধি অদ্বিতীয় শক্তি- দ্বিতীয় ব্যক্তি উৎপন্ন হইল না—আর প কেহ হইবেও কি না সন্দেহ—অন্ততঃ ার জন্মভূমি বলিয়াও এখানকার সমাজের ায়তির ইতিবৃত্ত জানিতে সকলের কৌতূ- নল উদ্দীপ্ত হইতে পারে;—হওয়াও ত; অতএব আমরা যে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত লাম, তাহা অস্বাভাবিক কার্য্য নয়, ইহা র হইতেছে।

রাশি রাশি ইংরেজি ও বাঙ্গালা পুস্তকে নগর ও খানাকুল কৃষ্ণনগরের নাম উল্লিখিত য়াছে। অধিক কি, ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্তে, দেশের ভূগোল-শাস্ত্রেও রাধানগর প্রভৃতি র নাম-প্রসঙ্গ উদ্ঘোষিত হইয়াছে।

রাজা রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের জন্মভূমি বলিয়াও এ প্রদেশ অনেকের নিকট বিশেষ বিখ্যাত। রমাপ্রসাদ বাবুই, বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হাইকোর্টের জজ-পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। স্বনামপ্রথিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীকে (১) খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রসব করিয়াছিলেন, ইহাও এ প্রদেশের গৌরবের অন্যতম পরিচয়।

৭। নবদ্বীপের তান্ত্রিক—কৃষ্ণানন্দ। অত্রত্য তান্ত্রিক—আগমবাগীশ-গোষ্ঠী ও কণাদ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের বংশ-পরম্পরা। এ প্রদেশে তন্ত্র, আগম, নিগম আদি শাস্ত্রবিদ্যার কিরূপ ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি, কীদৃশী অদ্ভুত চর্চ্চা ও বিস্ময়োৎপাদক আগ্রহ হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের স্থানে স্থানে তাহা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইব। ফলতঃ বহুল অনুশীলন না হইলে কদাচ ওরূপ সমুন্নতি সংসাধিত হইতে পারিত না। এখানে বৈষ্ণব দলের যেমন সংখ্যা, তেমনই তান্ত্রিকেরও অসদ্ভাব কি? আগম-নিগমেরও সুপ্রচুর পর্য্যালোচন যথেষ্ট হইয়াছিল। এই অঞ্চল অশেষ সিদ্ধ, যাপক ও ধার্ম্মিকের আকর-স্বরূপ; এই নির্দ্দেশ কখনই অসঙ্গত নয়।

এই সকল কারণে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের যশঃ, পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ভূভাগেই প্রসারিত। এই সমুদয় দিগ্বিজয়ী মহা মহা বীরবরগণকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, এ প্রদেশ কত স্পর্দ্ধা করিতে পারেন! যে দিক দিয়াই দেখ না, এই অঞ্চল, সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত—এ প্রদেশ অপরিচিত থাকিবার কথা নয়।

(১) ইনি কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ এবং বীজগণিত ও পাটীগণিত-প্রণেতা ছিলেন।

TIGHT BINDING

এক্ষণে আমরা এই সমাজের অন্তর্গত স্থানের ও স্থানীয় ব্যক্তিগণের নাম নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পাতুল একটী সামান্য গ্রাম,এখানে তেলিরই বাস অধিক বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থেরও অপ্রতুল নাই। এই গ্রামটী সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতার (ভগবতী দেবীর) মাতুলালয়। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির জন্ম-স্থান এই গ্রাম। বাচস্পতির জ্ঞাতিরা বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের মাতার মাতামহ-গোষ্ঠী। এখানে বিদ্যাসাগর মহোদয় মধ্যে মধ্যে থাকিতেন। পাতুলের বর্ণনা বিদ্যাসাগর এইরূপ করিয়াছেন,—

"পাতুল-নিবাসী মুখটী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের চারি পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ রাধা-মোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়; জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা তারা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিজ বাটীতেই চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি, স্বগ্রামে ও চতুঃ-পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহে সবিশেষ আদরণীয় ও সাতিশয় মাননীয় ছিলেন।

"জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহ-যোগ্যা হইলে, বিদ্যা-বাগীশ মহাশয়, গোঘাটে একটী সুপাত্র আছে, এই সংবাদ পাইয়া ঐ গ্রামে উপস্থিত হই-লেন। পাত্রের নাম রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ইনি, সাতিশয় বুদ্ধিমান্ ও নিরতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন; অবাধে অধ্যয়ন করিয়া একুশ বাইশ বৎসরে ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎ-পন্ন এবং তর্কবাগীশ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ছাত্রকে অন্নদান এবং ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষাদান করি-তেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, * * রামকান্ত তর্কবাগীশের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যার বি দিলেন।

"কালক্রমে গঙ্গাদেবীর গর্ভে তর্কবা মহাশয়ের দুই কন্যা জন্মিল; জ্যেষ্ঠা ম কনিষ্ঠা ভগবতী।"

এই ভগবতীই বিদ্যাসাগর মহোদয়ের ধারিণী। পাতুলের মুখোপাধ্যায় পরিবা আতিথ্য-কাহিনী কেমন অদ্ভুত, পাঠ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা হইতেই দেখু

"বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অবিদ্যমান হ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যা সংসারের কর্ত্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, ম রামধন ন্যায়রত্ন, পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, তৃতীয় গুরুপ্রসা চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। * *

" * * স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থা ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভাগিনেয়ীদের পুত্র দের উপরেও তাঁহাদের অণুমাত্র বিভিন্ন ছিল না। ভাগিনেয়ীরা পুত্র কন্যা লইয়া লালয়ে গিয়া যেরূপ সুখে সমাদরে কাল করিতেন, কন্যারা পুত্র কন্যা লইয়া পিত্রা গিয়া, সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর হইতে পারেন না।

"অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচ এই পরিবারে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহ সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, ঐ অঞ্চলের কে পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের ন্যায়, প্র পত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ফল এই, অন্নপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষ দ্বারস্থ হইয়া কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত য়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগো হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া

যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই পরম সমাদরে অতিথি-সেবা ও অভ্যা-গত-পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায় এই মুখোপাধ্যায়-পরিবারের স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী বহুতর গ্রামে আধিপত্যের সীমা ছিল না। এই সমস্ত গ্রামের লোক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদভঞ্জন, বিপদ্‌মোচন, অসময়ে সাহায্যদান প্রভৃতি কার্য্যই, বিদ্যাভূষণ মহা-শয়ের জীবনযাত্রায় সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু সেই অর্থের সঞ্চয়, অথবা স্বীয় পরিবারের সুখ-সাধনে প্রয়োগ, এক দিন এক ক্ষণের জন্যেও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিযোজিত ও পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত অমায়িক,পরোপকারী ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

"রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবার-বর্গের নিকট আমরা অশেষ প্রকারে যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, মাতৃদেবী পুত্র-কন্যা লইয়া মাতুলা-লয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায় ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন; কিন্তু একদিনের জন্যও স্নেহ, দয়া ও সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্তুতঃ,ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্র কন্যাদের উপর এরূপ স্নেহপ্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুত-পূর্ব্ব ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হইলে তদীয় একবর্ষীয় দ্বিতীয় সন্তান, বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আদ্যন্ত অবিচলিত স্নেহে প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়, পাতুলের জলবায়ু-মৃত্তিকার কত ঘনিষ্ঠ, সুতরাং তাহা হইতে কত উপকৃত, বিদ্যাভূষণ পরিবারের নিকটই বা কত বাধিত—কত ঋণী, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আর একটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

"জননীদেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ আমার পীড়া-বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া বীরসিংহে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিয়া শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া আমাকে আলয়ে লইয়া গেলেন। পাতুলের সন্নিকটে কোটরী নামে (২) যে গ্রাম আছে, তথায় বৈদ্যজাতীয় উত্তম উত্তম চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহাদের অন্যতমের হস্তে আমার চিকিৎসার ভার অর্পিত হইল। তিন মাস চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম। এই সময় আমার উপর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবার-বর্গের স্নেহ ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।" (৩)

এই পাতুল-গ্রামবাসী পণ্ডিত মধুসূদন

---

(২) এখানে দুইটী ভুল হইয়াছে। প্রথম ভ্রম—গ্রামের নাম কোটরী নয়, কোটরা। দ্বিতীয় ভ্রম,—ঠিক্ কোটরায় বৈদ্য ছিল না, এখনও নাই। রাধানগরই বৈদ্যের বাস-স্থল ঐ ভ্রান্তি সংঘটনের কারণ এই,—"রাধানগর" নামে তিন চারি জেলায় গ্রাম আছে। বাঁকুড়া জেলায় এক রাধানগর আছে। উহা বস্ত্রের জন্য খ্যাত। হুগলী জেলার অন্ত-র্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সীমাস্থিত রাধা-নগরের পরিচয় দিবার সময় ঐ অঞ্চলের কেহ কেহ কোটরা রাধানগর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দূরবর্ত্তী স্থানের লোক; তিনি কোটরা রাধানগর স্থলে কোটরী করিবেন, ইহা সঙ্গত।

(৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী দেখ।

TIGHT BINDING

বাচস্পতি মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তিনিই কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রথম প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি নর্ম্মাল স্কুলে তাঁহার চিত্রময়ী প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিয়া লোকের মনঃপ্রাণ চরিতার্থ করিতেছে। তিনি অমায়িক-স্বভাব, সৌম্যমূর্ত্তি, প্রসন্নবদন, সদাপ্রফুল্ল পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিরচিত গ্রন্থও আছে, তন্মধ্যে এস্থলে "বসন্তসেনার" নাম উল্লিখিত হইবার যোগ্য। সেই পুস্তক হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালয়ে মমের বাতি।
পুন গৃহে তার জ্বলিবে না আর
নিশিতে প্রদীপ-ভাতি॥"

কেমন সুন্দর রচনা! কেমন ভাবশুদ্ধ!

এই বাচস্পতি মহোদয়ের ভবিষ্য বিষয়ে কেমন দূর দৃষ্টি ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের লেখা হইতে তাহার প্রমাণ দিলাম। যথা—

"মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি, সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, 'আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক; আর যদি চাকরী করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে; সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া যাহারা ল কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব আমার বিবেচনায় ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজেই পড়িতে দেওয়া উচিত। চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কালেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে।' বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণরূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।"(৪)

এখানে এক স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ আছেন। লোকে তাঁহার "পেটকাটা" মহাদেব সংজ্ঞা দিয়াছে। বাস্তবিকই তাঁহার দেহ কর্ত্তিত বটে। প্রবাদ, এক অতিথি, উল্লিখিত দেবতার শরীর কাটিয়া মণি-মাণিক্য রত্নাদি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। যে অতিথি রত্নাপহারক, সে ব্যক্তি, অনেক দিন হইতে প্রতি নিশিতে নিশীথে "পেট গেল, পেট গেল" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিত। যে দিন সে রত্ন অপহরণ করে, সেদিনও ঐরূপ করিয়াছিল। পরদিন প্রভাতে সকলে দেখিল, শিব ঠাকুরের অঙ্গ অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ।

"যাত্রাসিদ্ধি"নামক এক ধর্ম্মঠাকুর এখানকার বিখ্যাত দেবতা। তাঁহার উপাসকেরা বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা নারীদিগকে ঔষধ দিয়া থাকে। ঔষধের গুণে বন্ধ্যারা সুতানন নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হয়। মৃতবৎসারাও সজীব কুমার ক্রোড়ে করিয়া সুখিনী হইয়া থাকেন। এই কারণেই ঐ ধর্ম্মদেবের অপার মহিমা নানা স্থানে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে।

এইখানে পাতুলের বর্ণনা সমাপ্ত করা গেল।

---

(৪) বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী দেখ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়-কৃত বর্ণনা সহজে বুঝিবার জন্য পরপৃষ্ঠায় একটী বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল।

বংশ-তালিকা।

পাতুল।

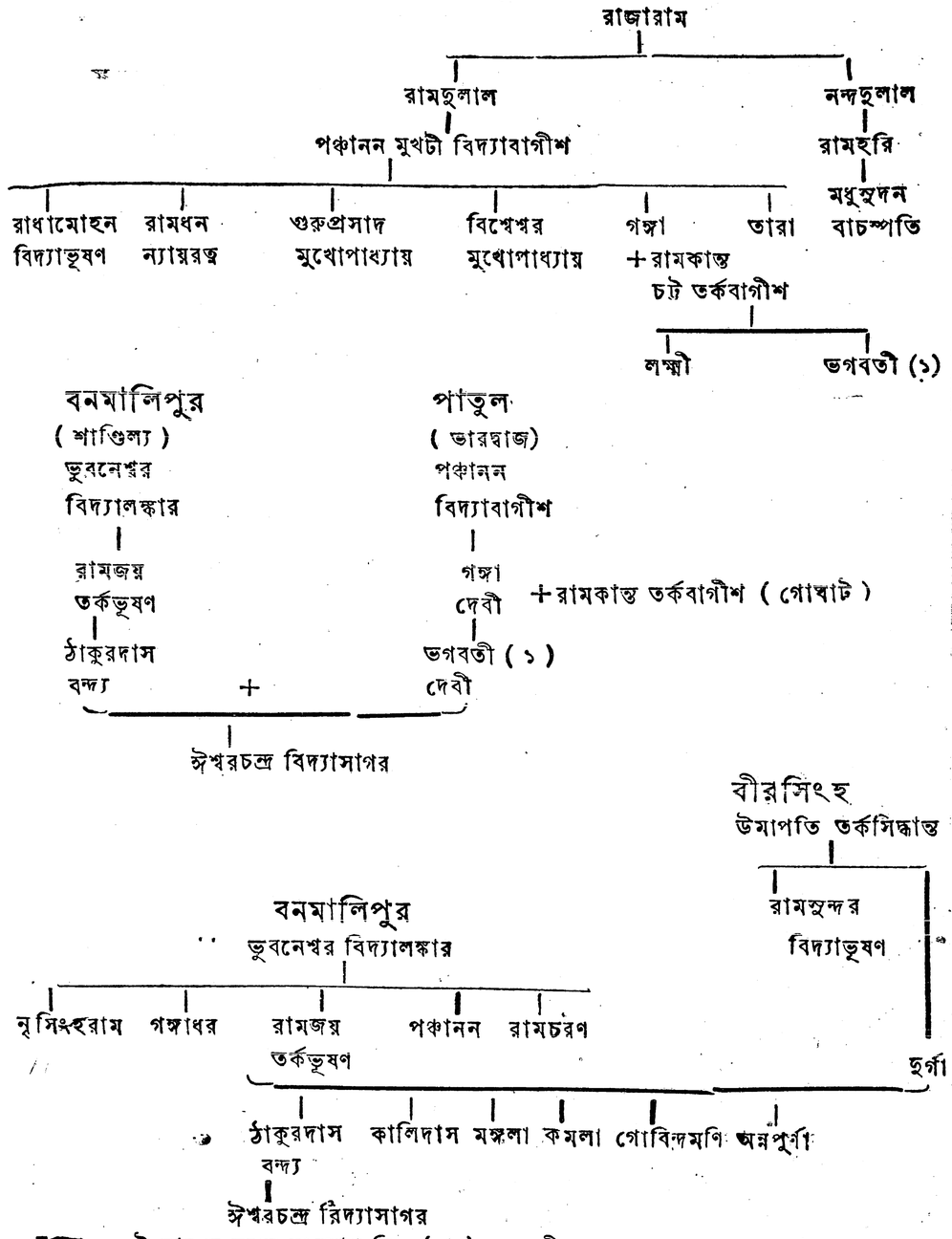

☞ যে দুই নামের মধ্যে সংযোগ চিহ্ন (+) ও বন্ধনীর সংযোগ আছে, তথায় উভয়ের বিবাহ বুঝিতে হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

৪১

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যা-
ন্মোঘীকর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি॥

দেখিবে গম্ভীরা নদী মৃদুমন্দ ধায়
কিছু দূরে মিত্রবর নির্ম্মল সলিলে।
পড়িবে তোমার ছায়া গম্ভীরায় কায়,
যেমতি আত্মার ছায়া হৃদয়-কমলে।
চঞ্চল সফরীমালা
নানারূপে করি খেলা
চঞ্চল কটাক্ষ সম শোভিবে সুন্দর;
তটিনীরে প্রাণসখে করিও আদর।

৪২

তস্যাঃ কিঞ্চিৎকরধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
নীত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ॥

সুনীল বসন সম সলিল তাহার
তট ছাড়ি নিম্নদেশে গিয়াছে এখন;
শ্রোণী হতে বাস যেন খসিছে বালার,
সলাজে বসন তাই করিছে ধারণ।
রসবোধ আছে যার
সে কি কভু অবলার
উলঙ্গ নিতম্ব দেখি পারে হে যাইতে?
পারিবে কি তারে বিনা বিহারে ত্যজিতে?

৪৩

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিত বসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ।
নীচৈর্বাস্ত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্ব্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্॥

যে কালেতে দেবগিরি করিবে গমন
উচ্ছ্বসিত ধরা হবে তোমার ধারায়;
সুশীতল সমীরণ করিবে বীজন
শোভিবে ধরণী এক নূতন শোভায়।
করিকর প্রসারিয়ে
স্নিগ্ধ পরিমল লয়ে,
নাসাগ্রে মধুর ধ্বনি করিবে হরষে
পাকিবে কাননে ফল তোমার পরশে।

৪৪

তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ॥

পুরাকালে মহাদেব, কোটী সূর্য্য যিনি
রাখিল স্বকীয় তেজ অনলের পাশে;
যাহা হতে ষড়ানন লভিয়া জনম
বিহরে ঐ গিরি পরে মনের হরষে।
তুমি মেঘ কামচারী
লইয়া জাহ্নবী বারি
আরণ্য কুসুম তুলি ভক্তিপূর্ণ মনে
পূজিও যতনে সখে দেব ষড়াননে।

৪৫

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্না কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জ্জিতৈর্নর্ত্তয়েথাঃ॥

ষড়ানন পূজা তব হলে সমাপন
প্রতিধ্বনি পরিপূর্ণ করিয়া ভূধর,
অবিরাম ঘন ঘন করিও গর্জ্জন;
শুনিয়া নাচিবে হর্ষে ময়ূর নিকর।
হরশির শশিকরে
পুচ্ছ প্রান্ত শশধরে
দ্বিগুণ সুন্দর হবে রজত বরণ
যে পুচ্ছ ভবানী কর্ণে করেন ধারণ।

৪৬

আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জ্জলকণভয়াদ্বীচিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্॥

পূজিয়া তুষিলে তুমি দেব ষড়াননে,
অবাধে ছাড়িবে তব পথ সিদ্ধগণ।
স্রোতস্বতী চর্ম্মবতী দেখিবে নয়নে,
গিরি ছাড়ি কিছু পথ যাইবে যখন।
রন্তিদেব পূর্ব্বকালে
সুরভি-তনয়াদলে
হরিয়া গোপনে লয়ে রাখিল যথায়।
এই তটিনীর জন্ম জানিও তথায়।

৪৭

তস্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিনো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্॥
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী-
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূল মধ্যেন্দ্রনীলম্॥

নামিলে তটিনী নীরে তব শ্যাম কায়
(বনমালী সম বর্ণ) শোভিবে সুন্দর!
শোভা পাবে দূর হতে অপূর্ব্ব শোভায়,
হার মাঝে যথা নীলমণি মনোহর।
যদিও পর্ব্বত প্রায়
বিস্তৃত তোমার কায়,
সুদূর অম্বর হতে তথাপি সকলে
দেখিবে রতন প্রায় তটিনীর জলে।

৪৮

তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণশারপ্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূনেত্র কৌতূহলানাম্॥

কল্লোলিনী পার হয়ে করিলে গমন
দশপুরবধূগণ বিস্তারি ভ্রূ-লতা
জলধর! তবদেহ করিবে দর্শন।
অধরে খেলিবে হাসি, চক্ষে মধুরতা।
চাহিলে আকাশ পানে
মধুকর সে নয়নে
কমল ভাবিয়ে মনে করিবে ঝঙ্কার;
হবে নাকি তাহে মনে আনন্দ তোমার?

৪৯

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিত শরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি॥

শ্রাবণে যেমন তুমি কমলকাননে
অবিরল বারিধারা কর বরিষণ,
সেইরূপ যেই স্থানে শত্রুর আননে
গাণ্ডিবী অসংখ্য বাণ করিলা ক্ষেপণ,
সেই মহা কুরুক্ষেত্রে
দেখিও চকিত নেত্রে
অসংখ্য কপাল-অস্থি রয়েছে পতিত
ছায়া দিও সেই ক্ষেত্রে হইয়া প্রণত।

৫০

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং
বন্ধু প্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা
মন্তঃ শুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ॥

তেয়াগি সুরার পাত্র রেবতীরঞ্জন
করিলা যাহার সেবা হরষিত মনে
(মিত্র প্রীতি বশংবদ হইয়া যখন
করিল সঙ্কল্প ত্যাগ কুরুক্ষেত্র রণে)
দেখিবে সে পুণ্যবতী
সুরনদী সরস্বতী
হইতেছে প্রবাহিতা, পূজিও তাঁহারে
লভিবে আনন্দ রাশি বলিনু তোমারে।

৫১

তস্মাদ্গচ্ছেরনুকনখলং শৈল রাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গ সোপান পঙ্‌ক্তিম্
গৌরীবক্ত্র ভ্রুকুটি রচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশ গ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্ম্মিহস্তা ॥

কল্লোলিনী সুরধুনী দেখিবে অদূরে ;
সগর-তনয়-গণ মুক্তিরকারণ
আজিও সোপান রূপে হিমাদ্রি উপরে
শোভিছে স্ফটিক সম নির্ম্মলবরণ।
গৌরীর ভ্রুকুটী রাশি
উপেক্ষিয়া, মৃদুহাসি
শঙ্করের কেশপাশ ধরিবার তরে
তুলিতেছে ঊর্ম্মি-কর সোহাগের ভরে।

৫২

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধলম্বী
ত্বঙ্কেদচ্ছস্ফটিক বিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসিচ্ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগত যমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥

দিগ্বারণ সম যদি পার জলধর
জাহ্নবীর জলকলা করিবারে পান,
তাহলে তোমার নীল মূর্ত্তি মনোহর
সলিলস্তম্ভের মত হবে শোভমান।
জাহ্নবীর শ্বেত জলে
তব ছায়া পাত হলে,
দেখিতে ত্রিবেণী সম হইবে নিশ্চয়
সে বড় সুন্দর হবে—মোহিবে হৃদয়।

৫৩

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরংতুষারৈঃ।
বর্ণ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণঃ
শোভাং শুভ্রত্রিনয়ন বৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্

তারপর হিমাচল ভূধরপ্রধান
গঙ্গার উদ্ভব ক্ষেত্র তুষার শোভিত।
মৃগনাভি সৌরভেতে আমোদিত স্থান,
বসিলে যথায় শ্রম ভুলিবে নিশ্চিত।
ধবল হিমানী পর
শ্যাম মূর্ত্তি মনোহর
শঙ্করবাহনখাত পঙ্কের সমান
শোভা ধরি প্রাণ সখে মাতাইবে প্রাণ ॥

৫৪

তঙ্কেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসঙ্ঘট্টজন্মা
বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-
রাপন্নার্ত্তি প্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্ ॥

মিত্রবর দেখ যদি হিমালয় দেহে
দেবদারু সংঘর্ষণে হয় দাবানল ;
চমরীর কেশপাশ সে অনলে দহে
করিও নির্ব্বাণ তারে বরষিয়া জল।
বিপন্নের উপকার
করে সাধু বার বার
প্রাণপণে ; "পর তরে মরণও মঙ্গল,"
এক বাক্যে বলে সখে মহাত্মা সকল।

৫৫

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্ব্বীথাস্তমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্
কেবা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ॥

যদি মৃগগণ তথা করিয়া দর্শন
তোমার বিস্তৃত দেহ গিরিচূড়া প্রায়
চেষ্টা করে তব দেহ করিতে লঙ্ঘন,
রাশি রাশি শিলা পাতে নিবারিও তায়।
নিষ্ফল কর্ম্মের তরে
কেহ যদি হুচেষ্টা করে
নিশ্চয় জানিও তায় হয় পরিভব।
শিলা পাতে নিবারণ করিও বান্ধব।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী (৯)।

যম পুকুরের কথাও একটু এই স্থলে বলি, শুনিয়া লউন।

শুষুনী কলমী ন ন করে,
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পাখী সুখের বিল ;
সোণার কৌটো রূপোর খিল।
খিল খুলতে হাতে ছড়।
আমার ভাই বাপ নক্ষেশ্বর।

দেখুন, ইহাতেও পুরাতনত্ব-পরিচায়ক শব্দ কোথায় ?

মঙ্গলচণ্ডীর কথাটীও পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া উহারও কয়েক পঙ্‌ক্তি এই খানে উদ্ধৃত করিলাম।

সোণার মঙ্গলচণ্ডী রূপোর ভারা
কেন মা মঙ্গলচণ্ডী এত বেলা।
হাসতে খেলতে, সোণার দোল্লায় দুলতে
সিঁদুর কাজল পরতে, নির্ধনের ধন দিতে
অপুত্তুরের পুত্তুর দিতে,
বন্দীখানা খালাস করতে
এত বেলা।

পুন্নি পুকুরের কথাও এই সময়েরই বলিয়া বোধহয়, তাহারও কয়েক পঙক্তিমাত্র এস্থলে দেখান যাউক।

পুন্নিপুকুর পুষ্পুলালা
কে ভজেরে দুপর বেলা।
আমি সতী নীলবতী
ভাই বোন পুত্রবতী।
হবে পুত্তুর মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না।
বাজবে শঙ্খের ধ্বনি
তবে হবো রাজরাণী।

মহাদেবের ব্রতের কথাও এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করত পাঠকবর্গের ক্ষোভ মিটাই।

শিল শিলেটন শিলে বাটন, শিলে আছে স্বরে ;
স্বগ্‌গে থেকে মহাদেব বলে, গৌরী কি বত্ত করে
আস নাড়ন পাশ নাড়ন, তোলা গঙ্গাজল ;
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর।
ভোলা গেছে কলা ফুল তুলতে
কেষ্ট নতার পাতা।
শিব চরণে দেখা হলো
সন্নিসির গলায় পাটা।

ইহাতে শিল শিলেটন প্রভৃতি শব্দ সার্থক না হইলেও, আমরাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, পূর্ব্বকালের সকল রচনাতেই সার্থক শব্দ ব্যবহৃত হইত না। অনেক নিরর্থক শব্দও থাকিত। তদ্ব্যতীত ঐ সকল শব্দ অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের মুখে মুখে অভ্যস্ত বলিয়া, হয়ত, কালক্রমে এমনই বিকৃত হইয়াছে, যে উহাদিগকে আর বাঙ্গালা শব্দ বলিতেই সাহস হয় না। দেখুন না, এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণ ব্রতকে 'বত্ত' বা 'বেত্ত' বলেন, যদি ঐ 'বত্ত' বা 'বেত্ত' কালক্রমে 'বোত্তো' হইয়া শেষে 'বুত্তা' কি 'ভুত্তা' হয়, তখন আর কেমন করিয়া উহার দ্বারা 'ব্রত' শব্দের বোধ জন্মাইতে পারে। এইরূপ নানা কারণে প্রচলিত শব্দগুলি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের কথা গুলি অত্যন্ত বিকৃত দেখা যায় বলিয়া উহাদিগকে প্রাচীন প্রাচীন বোধ হয় ; বস্তুতঃ, উহারা যে দুই চারি শত বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত, কোন ক্রমেই এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না।

ইহারপর বাঙ্গালার প্রাচীনত্ব প্রমাণকারীরা কোনও কোনও অক্ষরের সাম্যপ্রদর্শনদ্বারা যেরূপে উক্ত ভাষার প্রত্নত্ব প্রতিপাদন করেন,

আমরা একে একে সে সমুদায়ের খণ্ডন করিতেছি।

তাঁহারা বলেন, যে, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্রের সমক্ষে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, দ্রাবিড়, প্রভৃতি দেশের নানা জাতীয় অক্ষর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তৎকালে বঙ্গাক্ষরের অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে।

আমরা বলি, যে, বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গদেশে কোনরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল না, ইহা কখনই হইতে পারে না। সুতরাং, তৎকালে যে অক্ষর প্রচলিত ছিল, তিনি তাহাই লিখিয়াছিলেন; উহাই বঙ্গদেশীয় অক্ষর বা বঙ্গাক্ষর শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তিনি যে বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষর লিখিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারে প্রমাণিত হইতে পারে?

তাঁহারা আরও বলেন, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এতৎ সময়ের যে সকল মুদ্রা ও তাম্রফলকাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাদের 'ক' বঙ্গীয় ককারের সদৃশ।

আমরা এই সময়ের মধ্যে বঙ্গভাষার উৎপত্তি স্বীকার করিতে পারি। সুতরাং, তদ্বিধ সাদৃশ্য কিছু অসম্ভব নহে। তবে সে সকলের ভাষা যদি বাঙ্গালা না হয়, তাহা হইলে অন্য ভাষায় বাঙ্গালার ককার গৃহীত হইয়াছে, ইত্যাদি প্রদর্শন করা নিতাই অসঙ্গত। বঙ্গীয় ভাষা এবং বঙ্গীয় বর্ণমালা যে যে রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব। অন্যান্য ভাষার ককারের সহিত বঙ্গীয় ককারের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিতে পারে, তাহা বলিয়া যে বঙ্গীয় ককার হইতে তত্তৎ ভাষার ককার গৃহীত, ইহা কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি স্বীকার করিবে।

অতঃপর, তাঁহারা বলেন, যে, ইণ্ডো সাসানিয়ান শ্রেণীস্থ মুদ্রা সমূহের 'শ্রী' বাঙ্গালার শ্রীর সদৃশ। পালী 'ঝ' ও বাঙ্গালা ঝকারের একতা দৃষ্ট হয়, এবং মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার শকার, বর্গীয় জকার ও একার সংযোগও বাঙ্গালা শকার, বর্গীয় জকার ও একার সংযোগের ন্যায়।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিষয়ের উত্তর আমরা তিন বারে দিতেছি। প্রথমতঃ, পঞ্চগৌড়ান্তর্গত যাবতীয় বর্ণমালারই শ্রী প্রায় একরূপ। শুদ্ধ শ্রী কেন, যাবতীয় বর্ণেই কোনও না কোনও প্রকারে অল্পাধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাটী, মারহাটী, ভোট, বর্ম্মা, উৎকল, তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষার বর্ণমালা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের কুতূহল চরিতার্থ করিতে পারিলেই ভাল হইত, কিন্তু অসাধ্য সাধনে প্রয়াস অপেক্ষা তাহাতে নিরস্ত থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় অথবা কথঞ্চিৎ সাধ্যায়ত্ত হইলেও সর্ব্ববিধ বর্ণমালা সংগ্রহে অযথা বিলম্ব ভয়ে আমরা তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম। তবে নিম্নলিখিত কতগুলি শ্রী যে প্রায়ই অভিন্ন, তাহা একবার অবলোকন করুন।

বাঙ্গালা	শ্রী
দেবনাগর	শ্রী
কৈথী	শ্রী
তিব্বতী	শ্রী
মারহাটী	শ্রী
গুজরাটী	শ্রী
উৎকল	শ্রী

যখন এতগুলি শ্রীতে আকৃতিগত বৈষম্য অতি অল্প, তখন কোনও কোনও মুদ্রার শ্রী যে বাঙ্গালার শ্রীর ন্যায় হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি!

দ্বিতীয়তঃ। পালী ঝকার ও বাঙ্গালা ঝকারেরও একতা দৃষ্ট হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষকারিগণ যে বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি; কারণ যে সকল বর্ণমালা পালী নামে আখ্যাত হইয়া থাকে, উহারা এক সময়ের বা একরূপ আকৃতিরও নহে। কোন্ সময়ের পালীর ঝকারের সহিত বঙ্গীয় ঝকারের সমতা দেখা যায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিলেই ভাল হইত। আমরা কিন্তু পঞ্চম পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে পঞ্চম পর খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সহস্র বৎসরের নানা প্রকারের পালী বর্ণমালা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, উহাদের ঝকার বঙ্গীয় ঝকারের মত নহে। তবে পূর্ব্বপক্ষকারিগণ এই আজব কথা কোথা হইতে আনিলেন! সত্যপ্রকাশের অনুরোধেই আমরা একথা বলিতে বাধ্য হইলাম। কারণ, প্রকৃত ব্যাপার গুপ্ত রাখিয়া লোককে ভ্রমে পাতিত করা অপেক্ষা মহাপাপ আর নাই। অধিকন্তু, পালী ঝকার ও বাঙ্গালা ঝকারে একতা দৃষ্ট হইলেও প্রতিপক্ষদিগের মনোরথ পূর্ণ হইত না। কেন না আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বাঙ্গালা ভাষাতে পালির অংশ আছে। পালী বর্ণমালার কোন্ কোন্ বর্ণের আকারে বাঙ্গালার কোন্ কোন্ বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে; তাহা আমরা পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব। যাহা হউক, প্রতিপক্ষদিগের পালী ও বাঙ্গালা ঝকারের সাম্য প্রদর্শনও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রাস্থ শকার ও জকার যে বাঙ্গালার মত, ইহাতেও কিছু আশ্চর্য্যের কথা নাই। কারণ, চন্দ্রগুপ্তের সময়ে পালী ভাষার প্রচলন হইয়াছিল। উক্ত শকার ও জকার যদি পালী ভাষার হয়, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বোত্তরেই ইহারও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। তজ্জন্য এস্থলে আর নূতন বলিবার কিছু থাকিল না।

সংস্কৃত, হিন্দী, মারহাটী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার একার সংযোগ হইতে বাঙ্গালার একার সংযোগ কিছু বিভিন্ন বটে। উহাদিগের একার বর্ণের দক্ষিণোর্দ্ধভাগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ দক্ষিণোর্দ্ধভাগ হইতেই ত্রৈলিঙ্গী ভাষার একার বর্ণের উপরিভাগে আইসে যথা ে=কে। ঐ উপরিভাগ হইতে তামিল ভাষার একার বামদিকে ব্যবহৃত হয়। যথা ে=কে। এই তামিলীয় একারের আকার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎকল ভাষার একার হয়। যথা ে=কে। ক্রমে ঔৎকলীয় একার হইতেই বাঙ্গালার একার হইয়াছে; যথা কে। ইহাতে আকৃতিক বৈষম্য অতি অল্প। ঔৎকলীয় একারের নিম্নস্থ বিন্দুটী শূন্য-গর্ভ, বাঙ্গালার সেরূপ নয়। যথা কে। বাঙ্গালা ও উৎকলের একারে যে বৈষম্য আপাতত দৃষ্টিগোচর হইতেছে, হয়ত উহা পূর্ব্বে ছিল না। এক্ষণে মুদ্রা যন্ত্র হওয়াতে বর্ণ সকলের আকৃতির যেরূপ একীভাব আছে, হস্তাক্ষরে তদ্রূপ থাকিত না। সুতরাং, হস্তাক্ষরের বাঙ্গালা একারের ঔৎকলীয় একারের ন্যায় মধ্যে ছিদ্র থাকাও অসম্ভব নহে। তবেই তামিল, উৎকল, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার একার সংযোগ প্রায়ই একরূপ। পালীর একার ও ঐ প্রকার। উহাই মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার ব্যবহৃত হইত।* অতএব, ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, অন্য কোন ভাষার শব্দ কি অক্ষর, বঙ্গভাষার শব্দ কি অক্ষরের অনুরূপ হইলেও, তাহাতে উহার অবরত্বই স্বীকার

* বর্ণ সম্বন্ধে আমরা যে যে মতের খণ্ডন করিলাম, মুদ্রাদির সে সকল বর্ণ প্রকৃত পক্ষে তদ্রূপ কিনা তাহা আমরা জানিনা। এক্ষণে সে সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবারও অবকাশ নাই। সুতরাং প্রমাণকারীদিগের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছি।

করিতে হইবে ; নতুবা,পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যে বিবিধ বিসংবাদ ঘটিতে পারে।

ইহার পর পূর্ব্বপক্ষকারীরা সংখ্যাবোধক অঙ্কগুলিরও সাম্য-প্রদর্শনে বঙ্গভাষার প্রত্নত্ব প্রতিপাদনার্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা প্রত্যেক অঙ্কের নাম ধরিয়া একে একে তাহাদের বিবরণ বিবৃত না করিয়া একেবারেই দেখাইতেছি, যে, কতগুলি ভাষার এক দুই তিন প্রভৃতি অঙ্কগুলি কিরূপ অভিন্নাকৃতি। পাঠকবর্গ পার্শ্বের স্লিপে তাহাদের আকৃতি সাম্যের উপর একবার দৃষ্টিপাত করত আমাদের বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করুন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একমূল হইতেই ভারতবর্ষের যাবতীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, সেই সকল ভাষার শব্দ বা বর্ণের যে পরস্পর সাম্য পরিদৃষ্ট হইবে, ইহাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই। তবে যে ভাষা হইতে যে ভাষা অধিক দূরবর্ত্তী, তাহাতে দূরত্বের ন্যূনাধিক্যে স্বল্পাধিক ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে।

বাঙ্গালা	এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়
হিন্দী	এক	দো	তীন	চার	পাঁচ	ছ	সাত	আঠ	নৌ
উড়িয়া	এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ	ছয়	সাত	আঠ	নয়
তেলুগু	ওক্কো	রেণ্ডু	মূড়ু	নালুগু	অয়িদু	আরু	এড়ু	এনিমিদি	তোম্মিদি
তামিল	ওরু	রেণ্ডু	মূণ্ড্রু	নালু	অয়ু	আরু	এড়ু	এট্টু	ওম্বদু
কানাড়ী	ওন্দু	এরড়ু	মূরু	নালকু	অয়দু	আরু	এড়ু	এণ্টু	ওম্বত্তু
মলয়ালম	ওরু	রণ্ডু	মূণ্ড্রু	নালু	অঞ্চু	আরু	এড়ু	এট্টু	ওম্বদু
মহারাষ্ট্রী	এক	দোন	তীন	চার	পাঁচ	সহা	সাত	আঠ	নউ
গুজরাটী	এক	বে	ত্রণ	চার	পাঁচ	ছ	সাত	আঠ	নব
পঞ্জাবী	এক	দো	তীন	চার	পাঁচ	ছ	সত্ত	অঠ	নউ
সংস্কৃত	এক	দ্বি	ত্রি	চতুর	পঞ্চ	ষট্	সপ্ত	অষ্ট	নব
ইংরাজী	ওয়ান	টু	থ্রী	ফোর	ফাইভ	সিক্স	সেভেন	এইট	নাইন
ফরাসী	উন	দু	ত্রোয়া	কাত্র	সাঙ্ক	সিস	সেত	হুইত	নুফ
জর্ম্মণ	আইন্স	জ্বাই	দ্রাই	ফিয়র	ফুন্ফ	জেক্স	জিবেন	আখ্ট	নয়ন
গ্রীক	এন	দুও	ত্রিয়া	তেসারা	পেন্তে	এক্সে	এপ্তা	অক্তো	এন্নিয়া
লাটিন	উনুস	দুও	ত্রেস	কুয়াত্তুর	কুইন্ক	সেক্স	সেপ্তেম	অক্তো	নোভেম

ইহার পর পূর্ব্বপক্ষকারীরা সংখ্যাবোধক অঙ্কগুলিরও সাম্য-প্রদর্শনে বঙ্গভাষার প্রত্নত্ব প্রতিপাদনার্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা প্রত্যেক অঙ্কের নাম ধরিয়া একে একে তাহাদের বিবরণ বিবৃত না করিয়া একেবারেই দেখাইতেছি, যে, কতগুলি ভাষার এক দুই তিন প্রভৃতি অঙ্কগুলি কিরূপ অভিন্নাকৃতি। পাঠকবর্গ পার্শ্বের স্লিপে তাহাদের আকৃতি সাম্যের উপর একবার দৃষ্টিপাত করত আমাদের বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করুন।

বাঙ্গালা	এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়
হিন্দী	এক	দো	তীন	চার	পাঁচ	ছ	সাত	আঠ	নৌ
উড়িয়া	এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ	ছয়	সাত	আঠ	নয়
তেলুগু	ওক্কো	রেণ্ডু	মূড়ু	নালুগু	অয়িদু	আরু	এড়ু	এনিমিদি	তোম্মিদি
তামিল	ওরু	রেণ্ডু	মূণ্ড্রু	নালু	অয়ু	আরু	এড়ু	এট্টু	ওম্বদু
কানাড়ী	ওন্দু	এরড়ু	মূরু	নালকু	অয়দু	আরু	এড়ু	এণ্টু	ওম্বত্তু
মলয়ালম	ওরু	রণ্ডু	মূণ্ড্রু	নালু	অঞ্চু	আরু	এড়ু	এট্টু	ওম্বদু
মহারাষ্ট্রী	এক	দোন	তীন	চার	পাঁচ	সহা	সাত	আঠ	নউ
গুজরাটী	এক	বে	ত্রণ	চার	পাঁচ	ছ	সাত	আঠ	নব
পঞ্জাবী	এক	দো	তীন	চার	পাঁচ	ছ	সত্ত	অঠ	নউ
সংস্কৃত	এক	দ্বি	ত্রি	চতুর	পঞ্চ	ষট্	সপ্ত	অষ্ট	নব
ইংরাজী	ওয়ান	টু	থ্রী	ফোর	ফাইভ	সিক্স	সেভেন	এইট	নাইন
ফরাসী	উন	দু	ত্রোয়া	কাত্র	সাঙ্ক	সিস	সেত	হুইত	নুফ
জর্ম্মণ	আইন্স	জ্বাই	দ্রাই	ফিয়র	ফুন্ফ	জেক্স	জিবেন	আখ্ট	নয়ন
গ্রীক	এন	দুও	ত্রিয়া	তেসারা	পেন্তে	এক্সে	এপ্তা	অক্তো	এন্নিয়া
লাটিন	উনুস	দুও	ত্রেস	কুয়াত্তুর	কুইন্ক	সেক্স	সেপ্তেম	অক্তো	নোভেম

দুধ কেমন—সাদা ; সাদা কেমন—বগের মত ; বগ কেমন—কাস্তের মত। ইহাতে যেমন ক্রমিক সাম্য থাকিলেও দূরত্ব প্রযুক্ত দুধ ও কাস্তের আদৌ সাম্য নাই ; তদ্রূপ যে যে ভাষা হইতে যে যে ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে অনুশীলন করিয়া গেলে সহজেই উভয়ের সমতা দেখা যাইবে, কিন্তু আদিম ও অন্ত্য ভাষার অনুশীলন করিলেই একেবারে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পূর্ব্বকথিত রীতিতে বাঙ্গালা ভাষার ক্রম নির্ণয় করিয়া পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টির জন্যই আমরা এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ; কিন্তু, তাহাতে সিদ্ধাসিদ্ধি সেই সর্ব্বান্তর্য্যামীর ইচ্ছাধীন। জানিনা, তিনি কি প্রকারে আমাদের মুখ রক্ষা করিবেন। তাঁহার শক্তি ব্যতীত আমাদের এক গাছি তৃণ নাড়িবারও ক্ষমতা নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।

সুন্দরী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রায় একমাস গত হইল, সুন্দরী শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। সুন্দরী সহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—আজন্ম সহরেই প্রতিপালিতা হইয়াছে। এই তাহার প্রথম পল্লীগ্রাম দর্শন ; গ্রাম্যজীবন তাহার কি ভাল লাগিবে ? শৈশব হইতেই সুন্দরী দাসদাসীগণের সেবায় পরিবর্দ্ধিতা হইয়াছে ; শারীরিক পরিশ্রম যে কেমন তাহা কখন জানেনা। তাহার আহারের সময় আহার প্রস্তুত থাকিত, রোগ-শয্যায় পাঁচজনে শুশ্রূষা করিত। সেই সুন্দরী কি আজ গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম করিয়া অন্যের দাসীপনা করিতে পারিবে ? যে চিরকাল দ্বিতল অট্টালিকায় বাস করিয়াছে, পালঙ্কে কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াছে, মৃত্তিকার গৃহে সামান্য শয্যা আজ কি তাহার তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হইবে ?

মনুষ্যহৃদয়ে একটুকু অহঙ্কার আছে ; মানব মাত্রেরই যাহা থাকা আবশ্যক, যাহা না থাকিলে মনুষ্যের মনুষত্ব লুপ্ত হইয়া যায়—মনুষ্য ও পশুতে কোন প্রভেদ থাকেনা—সেটী মনুষ্যের আত্মসম্মান। আত্মসম্মানই মনুষ্যকে সকল কষ্ট সহ্য করিতে শিক্ষা দেয় ; শত দুঃখে পতিত হইলেও লোকে এক আত্ম-সম্মানের বলে সেই দুঃখে উপেক্ষা প্রদর্শন করে। আত্মসম্মানই মনুষ্যত্বের সর্ব্ব প্রধান সহায়। সুন্দরীর

আবার কষ্ট কি ? সে জানে যে, পতিগৃহই স্ত্রীলোকের গৃহ, পিত্রালয় প্রবাস মাত্র। এই এক মাসেই সুন্দরী অধিকাংশ সাংসারিক কার্য্য শিক্ষা করিয়াছে। চন্দনবালা এবং তাহার মাতাঠাকুরাণী সুন্দরীকে কোন কার্য্য করিতে দিতনা, করিতে যাইলে হাতের কার্য্য কাড়িয়া লইত ; সুন্দরী কিন্তু ছাড়িত না। যখনই চন্দন কোন কার্য্য করিতে যাইত, সে তখনই গিয়া তাহার সঙ্গে যোগদান করিত। কিন্তু দুইটা কার্য্য সুন্দরী নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। প্রথমতঃ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সন্ধ্যার সময় সত্যচরণের গৃহে প্রতিবেশিনী রমণীগণ আসিয়া বসিত, সুন্দরীকে প্রত্যহই তাহাদিগকে রামায়ণ কিম্বা মহাভারত পড়িয়া শুনাইতে হইত। দ্বিতীয়তঃ, তাহার শাশুড়ী শয়ন করিলে পর সুন্দরী একটী বাটীতে একটুকু সর্ষপ তৈল লইয়া গিয়া তাঁহার পা দুখানিতে মাখাইয়া দিত ; তিনি কত দিন নিষেধ করিতেন, সুন্দরী তাঁহার সে নিষেধ শুনিত না। বলিত "সেকি মা, আমি তোমার দাসী, দাসীর কার্য্য দাসী ভিন্ন অন্যে আর কে করিবে ? তিনি আর বারণ করিতেন না।

শীঘ্রই প্রতিবেশিনী মহলে সুন্দরীর প্রশংসা হইতে লাগিল। সকলে একবাক্যে বলিল "আহা যেন সোণার চাঁদ বউ, শাশুড়ী ননদকে কত যত্ন, লোকজনকে কেমন মিষ্ট কথা ; এমন নইলে কি বউ" ! ক্রমে গ্রামবাসিনীগণও স্বীকার করিল যে, "সুন্দরী বড়ই লক্ষ্মী বউ।"

বেলা পড়িয়া গিয়াছে, সুন্দরী প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে ; চন্দনবালা গৃহের মধ্যে কি করিতেছে ; এমন সময় চন্দনের পিতৃব্য-পুত্রজায়া দক্ষিণ হস্তে একখানি গাত্রমার্জ্জনী সঞ্চালন করিতে করিতে সেখানে আসিয়া সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিল "কি দিদি, কি কর্‌ছ" ?

সুন্দরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "এস ভাই, আজ যে দেখা পাওয়া গেল ভাই ভাল"।

চন্দনও বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি ছোট বউ যে, দিন দিন তুই যে বড় আক্রা হচ্ছিস্ লো" ?

ছোট বউ বলিল "সে সব কিছু নয় ঠাকুরঝী, সারাদিন বড় কাজের ঝন্‌ঝাট ছিল, তাই আসি আসি ক'রে আসিতে পারি নাই।" সেই সময় এক গোছা চুল আসিয়া মুখের উপর পড়ায় সুন্দরী সেই কেশগুচ্ছ যথাস্থানে বিন্যাস করিতে করিতে বলিল "এখন তবে কি মনে ক'রে আসিলে বোন্ ?"

ছোটবউ। সারাদিনের পর দিদিকে একবার দেখ্‌তে এলাম।

সুন্দরী। দিদির ত বড় সৌভাগ্য।

ছোটবউ। দিদির নয়, আমার।

সুন্দরী। কেন দিদি ?

ছোটবউ। দিদি আমায় বড় ভালবাসে।

সুন্দরী। সেটা দিদির গুণ নহে, দিদির ভগ্নিরই মনের গুণ।

ছোটবউ। তা নয় দিদি, দিদি আমায় নিজ গুণেই বড় ভালবাসে।

সুন্দরী। ঠাকুর পো অপেক্ষাও ?

ছোটবউ। যথার্থ দিদি ; দিদি আমার কি গুণ জানে ; যে দিন দিদিকে দেখেছি সেই দিন হতেই মনে হয়, সর্ব্বদাই যেন দিদির কাছে কাছে থাকি। মনটা যেন সদাই দিদির পিছে পিছে ফেরে।

সুন্দরী। তবে আর কি ; এইবার ঠাকুর পো আসিলেই তাকে বলিব, তুমি একটী বিবাহ কর, আমার হাতে তোমার অন্ন মারা গিয়াছে।

ছোট বধূর নলিনীপ্রফুল্ল মুখখানি আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি তবে বরণ ডালা সাজাও। আমি সতিনীর

সঙ্গে খুব কোন্দল করিতে পারিব। এখন গা ধুইয়া আসিগে চল"।

'মা ঠাকুরবাড়ীতে গিয়াছেন, আসিলেই যাচ্ছি" এই বলিয়া সুন্দরী গৃহের ভিতর গামছা আনিতে গেল।

অবিলম্বেই মা আসিলেন, তাহারা তিন জনে পুষ্করিণীর দিকে বাহির হইল।

পুকুরের কাল জল সন্ধ্যার ছায়ায় আরও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সেই কাল জলে তিনটী সুন্দরী আকণ্ঠ অবগাহন করিয়া প্রভাতী রাজিববৎ শোভা পাইতে লাগিল। সুন্দরী বলিল "এই সময় গঙ্গায় বড় শোভা হয়।

চন্দন বলিল "কেমন শোভা বউ"।

সুন্দরী। সে কথা মুখে বলা যায় না।

তাহাদের সে কথায় বাধা দিয়া ছোটবউ বলিল, "আচ্ছা দিদি, সহর ভাল, না পল্লিগ্রাম ভাল ?"

সুন্দরী। কেন ভগ্নি, সহসা একথা উঠলো কেন; ঠাকুরপোর চাকুরি হ'লে সহরবাসিনী হ'বে নাকি ?

ছোটবউ একটু অপ্রতিভ হইল, বলিল, "না দিদি,কথাটা কেবল জিজ্ঞাসা কর্‌ছি মাত্র।"

সুন্দরীর কথা শুনিয়া চন্দনবালা হাসিয়া বলিল "আচ্ছা বউ, আমাদের বাড়ী যদি সহরে হ'ত, আর তোমার বাপের বাড়ী কোন পল্লিগ্রামে হ'ত তাহ'লে কোন স্থানটা ভাল লাগিত" ?

সুন্দরী। তা আমি জানিনা। তবে সেরূপ হ'লে তোমার দাদাকে পরামর্শ দিয়া পল্লীগ্রামে বাস করাইতাম।

ছোটবউ। কেন দিদি, সহরের প্রতি তোমার এত বিরাগ জন্মাল কেন ?

সুন্দরী। বিরাগ হবে কেন দিদি; ভালকে ভাল বলিতে কি দোষ আছে ?

ছোটবউ। এখানকার যে কি ভাল তা আমি জানি না। এখানে কি আছে বল দেখি, শুনেছি সহরে কত ভাল জিনিস দেখা যায়, কত ভাল জিনিস পাওয়া যায়, সেখানে কিছুরই অভাব নাই!

সুন্দরী। সে পক্ষে সহর ভাল বটে; কিন্তু বড় লোকেরই ভাল, আমাদের মত লোকের পক্ষে নহে। বড় লোকের পয়সা আছে, পয়সায় সকল অভাব পূর্ণ হয়। গরীবের সর্ব্বদাই অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন; পল্লীগ্রামে সে সাহায্য সহজে পাওয়া যায়। পয়সা নইলে সহরে একটি সামান্য কাজ হয় না; কিন্তু এখানে একজনকে কথায় বলিলে, সে তা করিয়া দেয়।

ছোটবউ। সহরে কি কেউ কারো সাহায্য করে না ?

সুন্দরী। আমার ত তাই মনে হয়। এমন কি এখানে একজনের বিপদ উপস্থিত হ'লে পাঁচজনকে ডেকে পাওয়া যায়—পাঁচজনে আসিয়া সে বিপদে বুক দিয়া পড়ে। কই সহরে সেরূপ ত দেখ্‌তে পাইনা। এক জন সহায়হীন, তার আর আত্মীয় স্বজন অন্য কেউ নাই, সে যদি রোগে পড়িয়া যাতনায় ছটফট্ করে, তবে কেউ তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে না,কেউ তাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিবেনা। কিন্তু এখানে ত দেখিতেছ সেরূপ যদি কারো হয়, তবে তাকে কোন কষ্ট পাইতে হয় না, পাঁচজনে তার সেবা শুশ্রূষা করে; তার যে কেউ নাই, একথা সে জান্‌তে পারে না। তাতেই বলি ভগ্নি, আমাদের মত গরীবের পক্ষে পল্লীগ্রামই ভাল।

ছোটবউ। সহরের মুখে ছাই; অন্ধকার হবে ঘরে যাই চল।

অন্ধকার হইতেছে দেখিয়া, জল হইতে

উঠিয়া তিন জনে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরবাড়ী পরিত্যাগের সহিত সত্যচরণ কলীর চাকরীটিও পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। চাকরী ভিন্ন সংসার চলিবার আর অন্য উপায় নাই—এই ভাবিয়া সত্যচরণ বেশি বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় গমন করিল। সেখানে একজন বন্ধুর সাহায্যে শীঘ্রই কোন সওদাগরী আপিসে তাহার ৩০৲ টাকা বেতনে একটী চাকরী হইল।

বিবাহ হইতেই সুন্দরী স্বামিসহবাসে ছিল। এক দিনের জন্যও তাহাকে পতিবিরহ সহ্য করিতে হয় নাই। সংসার-তরুশাখে বিহগ-বিহগী যুগল পরস্পর পরস্পরের সাহচর্য্যে সুখে কালযাপন করিতেছিল। অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাহাদিগকে আপাততঃ সে সুখে বঞ্চিত হইতে হইল। হায় রে অন্নচিন্তা! মানবজীবনে তোর মত সুখের পথের কণ্টক আর দ্বিতীয় নাই! যে পুত্র, পিতামাতার বার্দ্ধক্যে একমাত্র অবলম্বন অন্ধের যষ্টি স্বরূপ, শয়নে ভোজনে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি পদক্ষেপে যাহার সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই; পিতা মাতার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র আশ্রয় সেই পুত্র, কেবল তোর শাসনে— তোর প্রবল শাসনে সশঙ্কিত হইয়া সেই অনন্যোপায় জরাজীর্ণ মুমূর্ষু জনকজননীকে পরিত্যাগ করিয়া সুদূরে যাইতে বাধ্য হয়। যে এই সংসার মরুভূমে একমাত্র শীতল ছায়া, সন্তাপিত হৃদয়ে একমাত্র শান্তিদায়িনী, যাহার চন্দ্রানন দর্শনে শোক, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা ক্ষণকালের জন্যও উপশমিত হয়, যাহার মিলন এ দুঃখময় জগতে সুখময় স্বর্গসুখের উপমা; বিচ্ছেদ অনন্ত নরকযন্ত্রণা রে অন্নচিন্তা, তোর প্রভাবেই সেই প্রণয়িনীর—সুখশান্তিদায়িনী সেই জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া, চক্ষের জল চক্ষে চাপিয়া রাখিয়া, মর্ম্মাহত স্বামী প্রবাসে মর্ম্মজ্বালায় জ্বলিতে থাকে। তোর জন্য মানবে সবই করিতে পারে। তোর ভ্রুকুটী ভঙ্গিতে ভ্রান্ত হইয়া জ্ঞানী অজ্ঞানীর কার্য্য করে, পণ্ডিত মূর্খের সেবায় রত হয়, ধার্ম্মিক ধর্ম্মাচরণ বিসর্জ্জন দেয়, বীরকেশরী কাপুরুষের দাসত্ব করে। তোর তাড়নায় দেবতায় দস্যুর সাজে সজ্জিত হয়, সতী সতীত্ব-রতনে জলাঞ্জলি দেয়, মনুষ্য—মনুষ্যত্বভ্রষ্ট হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।

স্বামিবিরহ সুন্দরীর পক্ষে দিন কতক বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল। মানব, মনের দাস; সেই মন আবার অবস্থার দাস। এক সময়ে যে কষ্ট নিতান্ত অসহ্য মনে হয়, আবার একদিন তদপেক্ষা শত গুণে অধিক কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে শ্বশুরালয় হইতে সত্যচরণ এক দিনের জন্য বাটী আসিলে, যে সুন্দরী সেই স্বল্প কালের বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় চক্ষে অন্ধকার দেখিত, আজ সেই সুন্দরীই, অম্লানবদনে দীর্ঘ কালের নিমিত্ত সত্যচরণের বিরহ সহ্য করিতে লাগিল। পাঠক! অবস্থার পরিবর্ত্তনই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে ?

বিরহ যন্ত্রণা যে কেবল মাত্র সুন্দরীকেই ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা নহে, সত্যচরণও প্রথম প্রথম কলিকাতা গিয়া পত্নীবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। আপিসে যাইত, কিন্তু কাজ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারিতনা। যেখানে সেই সুন্দরীরূপিণী বিরহবিধুরা বিহঙ্গিনী গৃহপিঞ্জরে বাস করিতেছিল, সত্যচরণের প্রাণ পাখিটি উড়িয়া গিয়া অল-

ক্ষিতে সেই পিঞ্জরপার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। কেবল মনে হইত সর্ব্বদা বাড়ী গিয়া সুন্দরীর সেই চাঁদ মুখখানি দেখিয়া আসি। কিন্তু নিদারুণ অন্নচিন্তা সেই উচ্ছৃঙ্খল বাসনাকে সংযত করিয়া রাখিত। ক্রমে সত্যচরণেরও সকল সহ্য হইল।

সত্যচরণ কলিকাতা যাওয়ার পর সুন্দরীকে লইবার জন্য হুগলী হইতে একজন ঝি আসিল সুন্দরী ঝিকে ফিরাইয়া দিল। বলিল "মাকে বলিস্ সেখান অপেক্ষা আমি এখানে সুখে আছি। সেখানে মাকে ফেলিয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু এখানে মাতৃস্নেহের অভাব নাই। সেখানে দিদি আছেন বটে, কিন্তু এখানে দিদি অপেক্ষাও স্নেহময়ী দিদি এক জন পাইয়াছি। খাওয়ায় শোয়ায় পরায় এখানে আমার কোন কষ্ট নাই, স্নেহ-বাৎসল্য, মায়া-মমতা তারও কিছুই অপ্রতুল নাই।" পুনর্ব্বার বলিল "আমি মায়ের দরিদ্রা মেয়ে আমাকে লইয়া তিনি কি করিবেন ? আমাকে না দেখিলে যদি তাঁহার নিতান্তই কষ্ট হয়, তবে স্বামির অনুমতি লইয়া কোন সময় দেখা দিয়া আসিব।" ঝি চলিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

হায় রে মানবঅদৃষ্ট! তুমি যখন যাহার প্রতি বিমুখ হও, তখন তাহার সকল দিকেই অমঙ্গল সঙ্ঘটিত হয়। অক্ষুণ্ণপ্রতাপ অসীম ক্ষমতাশালী বীর, যাহার ইঙ্গিতে কত রাজ্যের উত্থান পতন হইয়াছে, যাহার ভ্রূভঙ্গিতে কত লোকের জীবন মরণ নির্ভর করিয়াছে, সেই বীরকেশরীও তোমার আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না—তোমার প্রকোপ হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের তাসক্রীড়া আর মনুষ্যকে লইয়া তোমার ক্রীড়া উভয়ই সমান। তাসক্রীড়ায় যখন যে পক্ষে পড়্‌তা পড়িল, তখন সে পক্ষে ছক্কা, পঞ্জা, ব্যোম হইতে লাগিল। আর প্রতিপক্ষ যেখানে কাটিল, সেই খানেই তিন খানা রং—গোলাম, নয়, টেক্কা; নিজের হাতে সাদা আটা মাত্র। তুমিও যাহার প্রতি প্রসন্ন হও, সে "ধুলি মুঠা" ধরিলে "কড়ি-মুঠা" হয়। যে তোমার প্রকোপে পতিত হতভাগ্য, তার "পোড়া মৎস্য" জলে সাঁতার দিয়া পলায় করে। তোমার প্রতিকূলতায় ইন্দ্রের নন্দন কাননে অসুর বিচরণ করিয়াছিল, আবার তোমার আনুকূল্যেই শমন শাসনকারী রাবণে সৌধকিরিটিনী স্বর্ণলঙ্কা বানর কর্ত্তৃক শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। তুমি ভূপতিকে ভিখারী করিয়া থাক; আবার তুমিই ভিখারী-মস্তকে রাজছত্র ধারণ করাও। তোমারই অনিবার্য্য ক্ষমতা বলে আজ চন্দনবালা সধবায় বিধবা।

শৈশবেই চন্দনবালার বিবাহ হইয়াছিল। তখন তাহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল। তিনি কৌলিন্যপ্রথানুসারে সম্ভ্রান্ত বংশের একটী সুপাত্র আনিয়া কন্যার বিবাহ দিয়া ছিলেন। দুর্গাপুরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে ভৈরবপুর গ্রামের যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত চন্দনবালার বিবাহ হইয়াছিল। যামিনীনাথ অতি শৈশবাবস্থায় পিতামাতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ সহোদর রজনীনাথ কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়াছিল। রজনীনাথ গৃহে থাকিতেন, যামিনী কলিকাতায় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত।

যামিনী একজন বুদ্ধিমান বালক ছিল। সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। সংসর্গ, মানবচরিত্রের বড় দৃঢ় অবলম্বন। সংসর্গদোষে কত দেব চরিত্র স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিরয়গামী হইতেছে, আবার সংসহবাসে কত পাশব

চরিত্র দেবত্ব লাভ করিতেছে। উন্নতি-রাজ্য গোপনে, সাধুসঙ্গ যেমন প্রধান অধিনায়ক, অধঃপতনে, অসৎসঙ্গ সেইরূপ মোহময় পথপ্রদর্শক। যামিনীনাথ অসৎসঙ্গে পতিত হইল। প্রথমে পিশাচী সুরা মোহিনী মূর্ত্তিতে তাহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইল; যামিনী মোহিত হইয়া পিশাচিকে আলিঙ্গন করিল। ক্রমে সুরা সহসহচরী বেশ্যাসক্তি তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। তাহার বিদ্যাশিক্ষারূপ মহাব্রতের উদ্‌যাপন হইল। যামিনী বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিল। দুই বৎসর গত হইল পুনর্ব্বার পরীক্ষার সময় উপস্থিত। যামিনী পীড়ার ছলনা করিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিয়া বলিল যে, "এবার আমি পরীক্ষা দিতে পারিব না"। রজনীনাথ তাহার সেই কথায় বিশ্বাস করিল। পাপস্রোতও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাড়ী হইতে তাহার যাহা খরচ আইসে, তাহাতে তাহার সঙ্কুলান হয় না, ক্রমে সে পাঠ্য গ্রন্থগুলি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল।

হায়! এই মহানগরী কলিকাতাতে বিদ্যা লাভ করিতে আসিয়া যামিনীনাথের ন্যায় কতশত যুবক চিরদিনের জন্য অধঃপতনের অতল তলে নিমগ্ন হইতেছে। আলোক ও সভ্যতা (?) পরিপূর্ণ এই মহানগরীর বাহ্য সৌন্দর্য্যই যুবক চরিত্র কলঙ্কিত করিবার প্রধান হেতু। প্রকাশ্য রাস্তায় গণিকাগৃহ। আবার সেই গণিকারা মানবমন হরণ করিবার জন্য অহরহ কুৎসিত বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া কুটিল কটাক্ষ ও নির্লজ্জ হাব ভাব প্রদর্শন করিতেছে! তার উপর সুরারাক্ষসী, ঐ পাপীয়সী বারবিলাসিনীদিগের সাহচর্য্যে প্রলোভনের এক বিকট ফাঁদ পাতিয়া রহিয়াছে। কার সাধ্য সে মোহময় ফাঁদ অতিক্রম করে! একলা যামিনীনাথের অপরাধ কি ?

পাপস্রোত এতদিন অন্তঃশীলা বহিতেছিল, কিন্তু তাহা আর অধিক দিন গোপনে রহিল না। যামিনীনাথের গ্রামস্থ একজন ভদ্র লোক কলিকাতায় থাকিতেন। রজনীনাথের নিতান্ত অনুরোধে তিনি যামিনীর তত্ত্বাবধারণ করিতেন। যামিনীর চরিত্র সম্বন্ধে সকল কথাই জানিতে পারিয়া তিনি বাটীতে রজনীনাথকে পত্র লিখিলেন। পত্র পাইবা মাত্র রজনীনাথ কলিকাতা আসিয়া যামিনীনাথকে বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিলেন। অগ্রজের সম্মুখে বাড়ী যাইতে স্বীকার করিয়া যামিনী যে কোথায় অদৃশ্য হইল, রজনীনাথ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উদ্দেশ পাইলেন না। অগত্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। যামিনীর পথ এখন প্রশস্ত, যাহা বাধা ছিল তাহাও অপসৃত হইল। ক্রমে একটী চাকুরী জুটাইয়া একজন বারাঙ্গনাভবনে বাস করিতে লাগিল। চন্দনবালা সধবায় বিধবা হইল।

শ্রীধনকৃষ্ণ সেন।

কবিতা ও গান।

কি ভয় মরণে ?

১

কি ভয় মরণে বল ওহে ভ্রান্ত মন!
মৃত্যু হলে মরিবে না তুমি কদাচন;
মৃত্যু সুধু রূপান্তর,
তাহে কেন এত ডর?
ভঙ্গুর এ দেহ তব রূপান্তর হয়ে,
পঞ্চভূতে পঞ্চভূত যাবে মিশাইয়ে।

২

তব দেহ-কণা এক হবে না বিলীন ;
অনন্ত বিশ্বের মাঝে রবে চিরদিন।
আত্মাও অবিনশ্বর,
ধ্বংশ ক্ষয় নাই তার,
সবই তব চিরদিন রবে বিদ্যমান।
তবে কেন মৃত্যুনামে হও কম্পবান ?

৩

ভাব কি হে ! এ সংসার চির নিকেতন ?
চিরদিন এই খানে করিবে যাপন ?
এ সংসার মায়াজালে,
বদ্ধ থাকি, আছ ভুলে
চির শান্তিময় তব সুখের ভবন।
তাই তব এ জীবনে এত আকিঞ্চন।

৪

এ সংসার পান্থবাসে তুমি পান্থজন ;
ভুলেছ কি মায়া-ঘোরে হে অবোধ মন !
পথিক কে কোথা বল,
ভুলিয়া গন্তব্য স্থল
পান্থবাসে চিরকাল করয়ে যাপন ?
ত্যজিতে হে পান্থশালা কার না মনন ?

৫

এ সংসার পান্থশালা নহে ত কেবল !
মানব-জীবনে ইহা পরীক্ষার স্থল।
কল্পিত সৌন্দর্য্য দিয়ে,
এই স্থান সাজাইয়ে,
পাঠায়েছে পরমেশ মানব সকলে।
দেখিছে মানব মন ভুলে কিনা ভুলে।

৬

যে দু'দিন এ আবাসে করিবে যাপন,
বাহ্য-দৃশ্যে আত্মসুখে ভুলনা রে মন।
বিশ্ব-প্রেমে বাঁধি হিয়া,
নিজ স্বার্থ বলি দিয়া,
পরদুঃখ প্রাপণণে করি বিমোচন,
ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য কর সম্পাদন।

৭

প্রেমময় পরমেশ দয়ার নিধান।
ঝরিছে তাঁহার দয়া সকলে সমান।
তবে যে একই বাসে,
কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
সে কেবল তাঁর এই পরীক্ষার ভান।
হাসা কাঁদা ভিন্ন নহে উভয়(ই) সমান।

৮

অবস্থার বিপর্য্যয়ে মানবের মন,
ভুলে কি না ভুলে তাঁরে, করেন দর্শন।
সুখেতে ভাসা'য়ে কা'রে
কা'রে ফেলি দুঃখনীরে,
পরীক্ষা করেন তিনি সকলের মন।
কর্ম্ম-ফল এইরূপে হয় নিরূপণ।

৯

ছায়াবৎ কর্ম্ম-ফল জন্মজন্মান্তরে
ফিরিছে সবার সাথে সংসার-মাঝারে।
কর্ম্মফলে কোন নর,
দুঃখে ভাসে নিরন্তর,
কর্ম্মফলে কোন জন সুখের সাগরে
দিবানিশি সন্তরিছে প্রফুল্ল অন্তরে।

১০

দুর্লভ মানব-জন্ম পেয়েছ যখন,
বৃথামোদে বৃথা কার্য্যে ক'রনা ক্ষেপণ।
এ হেন জনম পেয়ে,
থেকনা অলস হয়ে,
দিবানিশি সৎকর্ম্ম করহ সাধন।
এড়াইতে চাহ যদি নরক ভীষণ !

১১

লভেছ এ শ্রেষ্ঠ জন্ম যাঁহার কৃপায়,
তাঁর অভিপ্রেত কার্য্যে মতি যেন রয়।

ছয়টি প্রবল অরি,
একে একে জয় করি
প্রেমভরে দিবানিশি ডাক হে তাঁহায়,
পাবে মুক্তি—জন্ম আর হবে না ধরায়।

১২

ওরে মন ! পাপে মন দিও না কখন (ও) ;
সৎকর্ম্ম অবিরাম কর সম্পাদন।
রহিও না নিদ্রাবেশে,
মজ ঈশ-প্রেমরসে।
মরণের ভয় তব রহিবে না আর,
জীবন মরণ এক হইবে তোমার।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

সুখের পরিণাম।

১

যে সুখের তরে মরে সবে ঘুরে,
পরিণাম তার আছে কত দূরে,
সুখ বলে কিছু আছে কি সংসারে ?
এ জগতে কেবা জেনেছে কবে !

২

অতি শিশুকালে জননীর কোলে,
তখনও কেঁদেছি সুখ পাব বলে,
এখনও ভাসি নয়নের জলে,
জানিনা এ সুখ কবে বা হবে।

৩

শিশুকাল গেল, বাল্যকাল এল,
বাল্য খেলা খেলে সুখ উপজিল ;
সে সুখ আবার ক্ষণে চলে গেল,
নব সুখ তরে কাঁদিল প্রাণ।

৪

মধুর যৌবন ক্রমে দেখা দিল,
অসংখ্য কল্পনা মনেতে উদিল,
হৃদয়ের তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল,
উল্লাসে গাহিনু সুখের গান !

৫

কত সুখ আশা হৃদয়-সাগরে,
তরঙ্গের মত ক্ষণে খেলা করে,
ক্ষণে মিশি গেল জনমের তরে,
পুন দেখা দিল নবীন ভাবে।

৬

আশার মোহিনী কুহকে পড়িয়া,
সেই সুখ আশা হৃদয়ে ধরিয়া,
আনন্দ প্রবাহে গিয়াছি ভাসিয়া,
না জানিয়া পরে কি যে হবে !,

৭

কল্পনা সহায়ে বসি নিরজনে,
সুখের উদ্যান গড়েছি যতনে,
হেরি তায় চারু তরু লতাগণে,
আনন্দে বিভোর হইত চিত্ত।

৮

বাল্যকালে যবে সংসার ভাবনা,
বারেক (ও) হৃদয়ে উদিত হোতনা,
ভাবিতাম মনে পাইব জানি না,
ইহাতে সুখের রতন কত।

৯

সংসারে প্রবেশি দেখিনু তখন,
আমার মতন কত শত জন,
সুখ অন্বেষণে আসিয়া এখানে,
পথ হারা হয়ে কাঁদিতেছে বসে।

১০

অশান্তি, দারিদ্র্য, অকাল মরণ,
বিস্তারিয়া হায় করাল বদন,
চারিদিকে সবে করিছে ভ্রমণ,
তাহা দেখি সবে ছুটিছে ত্রাসে !

১১

রাজার প্রাসাদে, দরিদ্র কুটীরে,
কোন স্থানে সুখ পাবে না সংসারে ;

জিজ্ঞাসিলে সবে, কবে সমস্বরে,
মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়।

১২

সুখ আশা ছলে কতশত জন,
সুধা ভ্রমে বিষ করিতেছে পান ;
পাপ তাপানলে হতেছে দহন,
দীপের শিখায় পতঙ্গ প্রায়।

১৩

এই সুখ ভ্রমে রাজা দুর্য্যোধন,
জ্বালিল ভীষণ কুরুক্ষেত্র রণ ;
কোটি কোটি বীর ত্যজিল জীবন,
কোথা সে রহিল বিপুল মান ?

১৪

চিতোর নগর এই সুখ তরে,
শ্মশান হয়েছে আলা অত্যাচারে;
শত শত নারী সতীত্বের তরে,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপেছে প্রাণ!

১৫

এই সুখ লাগি মামুদ পাষণ্ড,
কত শত রাজ্য করি লণ্ড ভণ্ড ;
সোমনাথ দেবে করিয়া বিখণ্ড,
লভেছিল কত ধনের রা'শ।

১৬

ইহারি লাগিয়া শের আফ্‌গানে,
পাষণ্ড সেলিম বধিল পরাণে ;
ভাবিল না মূঢ় একবার মনে,
কোথা তার এই সুখের শেষ!

১৭

কিন্তু শেষ দিনে কে বলিতে পারে,
দুর্য্যোধন আলা প্রভৃতি অন্তরে,
অনুতাপানলে ধিকি ধিকি করে,
জ্বলিয়া কেমন হয়েছে ছাই ?

১৮

বুঝেছি বুঝেছি সুখ পরিণাম।
এসংসার কভু নহে সুখ ধাম ;
অতুল রাজত্ব বিলাস বিভ্রম,
এ সবেতে সুখ কিছুই নাই।

১৯

তবে কি সুখের নাহি পরিণাম ?
"সুখ" কথা তবে ছায়াবাজী সম ?
সুখ আশা কি রে হৃদয়ের ভ্রম ?
তা না হলে কেন পায় না তারে ?

২০

অহো!
এ সংসারে যদি সুখ পেতে চাও,
শান্তিগানে মন মজাইয়া দাও ;
শান্তি-দাতা নাম প্রাণ ভরে গাও,
ভাসিয়া হরিষে ভকতি নীরে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

গান

(বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের সুরে)

কোথা হতে এসে শেষে যাব কোথা।
কি কাজেতে ভবে আশা কে ভাবে অন্তরে;—
এসে মায়ার আঠায় আট্‌কে যায় রে
সংসার-পিঞ্জরে (স্নেহ মোহ ঘোরে)।
দিন ত গেল সন্ধ্যা হলো আমোদ উল্লাসে ;—
তখন কি হবে মন শমন যখন ধরবে এসে কেশে
(ভীষণ করাল বেশে।)
ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ভাবে আপন ;—
কিন্তু যাবার দিনে সাথের সাথী কে হবে বল
তখন (ফিরে কেউ চাবে না।)
পত্নী পুত্র কাঁদে আমার কি হইবে বলে ;—
কিন্তু বল্ কে ভাবে তার কি হবে যে জন যাবে
চলে (তাত কেউ ভাবে না।)

পরের ভাবনা ভাব্‌লি কেবল আসিয়া সংসারে,
আছে ভবের সাগর সাম্‌নে পড়ে তার পারের
উপায় কি রে ? (ভেবে দেখ্‌লি নাত।)
রতনকাঞ্চন মণি সকলি অসার ;—
হয় রাজরাজেশ্বরের দেহ ধূলায় ধূসর।
(সে সব থাকে কোথা)।

একা এসে অবশেষে একা যেতে হবে ;—
এত যত্নের মানব দেহ মাটিতে মিশাবে
(দেহের এই পরিণাম)

শ্রীধনকৃষ্ণ সেন।

স্বর্গীয় রামলোচন তা (২)।

শিক্ষা।

এক শতাব্দী পূর্ণ হইতে চলিল, মহাত্মা রামলোচন তা ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই এক শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় কিছুই ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ আবার দেশের যে অংশে আমাদের নায়কের জন্মভূমি, তথায় অর্থকরী পাশ্চাত্য শিক্ষার তীক্ষ্ণ জ্যোতি বিকীর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, দেশীয় শিক্ষার স্নিগ্ধ আলোকও তথায় তখন প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ক্বচিৎ এক আধ্‌টী গুরু মহাশয়ের পাঠশালা এবং জমিদারের জমিদারী "সেরেস্তা" ও মহাজন এবং দোকানদারের "গদি" রূপ বিদ্যাগার হইতে শিক্ষার যে অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষীণতর রশ্মি বহির্গত হইত, তদবলম্বন করিয়াই তদানীন্তন সংসারপথের পথিকগণ কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনে সমর্থ হইয়া গন্তব্য স্থলে গতিবিধি করিত। প্রয়োজনানুসারে এখন যেমন বিভিন্ন প্রণালীর শিক্ষা লাভের সুব্যবস্থা হইয়াছে, তদ্রূপ না হউক তৎকালেও তাৎকালিক আবশ্যকানুযায়ী লেখা পড়া শিখিবার বন্দোবস্ত ছিল না, এরূপ নহে। জমিদারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ও দোকানদার এবং মহাজনের খাতা লিখিতে যে পরিমাণ বিদ্যার প্রয়োজন, তল্লাভের উপায় ছিল। তবে এখন যেমন স্থানে স্থানে উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা, ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় এবং মাইনর ও এণ্ট্রেন্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশুদ্ধরূপে ভাষা শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় বিধান হওয়ায়, ভাষাবিদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন ঐ প্রকার বিদ্যালয়ের নিতান্ত অভাব নিবন্ধন শিক্ষা অভাবে ভাষাবোধ দূরে থাকুক বর্ণাশুদ্ধি-জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই ছিল কি না সন্দেহ! ভাষা, শিক্ষার দ্বার স্বরূপ। কাব্য, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, ব্যবহার শাস্ত্র যাহা কিছু মানবের শিক্ষার সামগ্রী, ভাষাদ্বার অবরুদ্ধ থাকিলে, সে সকল লাভ করিবার কোনই উপায় নাই। এখন ঐ দ্বার সর্ব্বত্র সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের পক্ষে যে পরিমাণে উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং ঐ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া, লোকে যেরূপ শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া লইতেছে, তৎকালে প্রায় সর্ব্বত্রই সকলের, বিশেষতঃ রামলোচনের স্বদেশবাসিগণের নিকট সেই পরিমাণে উক্ত দ্বার দৃঢ়রূপে অর্গলবদ্ধ থাকায় তাহাদের পক্ষে প্রকৃত শিক্ষার বস্তু আকাশ কুসুমবৎ ছিল।

লিপি কুশলতা ও বাক্‌পটুতা যেমন এখন-

কার উচ্চ শিক্ষার নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয়, শুভঙ্করের আর্য্যায় অধিকার ও হস্তাক্ষরের পারিপাট্যই তখনকার শিক্ষার চরমোৎকর্ষের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু সত্যানুরোধে আমাদিগকে এই খানে একটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইতেছে। আমাদের কথা যদি সত্য হয়, যে, মানবের নৈতিক শিক্ষা কেবল মাত্র গ্রন্থঅধ্যয়নে পর্য্যবসিত হয় না, ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধির উপর ইহার ভিত্তি সংস্থাপিত নহে, তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ইদানীন্তন কালের ন্যায় পুস্তকবহুল ও বক্তৃতাপ্লাবিত দেশে নৈতিক শিক্ষার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তদানীন্তন কালের গ্রন্থবিরল ও বক্তৃতাহীন দেশে নীতিশিক্ষার সেরূপ অবমাননা হয় নাই। দাতাকর্ণের উপাখ্যান, চাণক্যের শ্লোক, প্রহ্লাদ চরিত্র, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কালীয়দমন যাত্রা দ্বারা তখনকার লোকের যেরূপ নীতি শিক্ষা হইত, এখন শত শত চরিতাবলী, নীতিবোধ, নীতিপথ, রঘু, ভট্টি, কালীসিংহ ও "বঙ্গবাসীর" মহাভারত এবং নাট্য সম্প্রদায় দ্বারাও সেরূপ নীতিশিক্ষা হয় না। তখনকার "মূর্খ" গুরুমহাশয়, "অশিক্ষিত" জনকজননী ও ঠাকুরদাদা এবং "সেকেলে" কথকঠাকুর যেরূপ অনায়াসে নীতি শিক্ষা দানে সমর্থ হইত, এখনকার "লার্ণেড" শিক্ষক-অধ্যাপক, "এন্‌লাইটেণ্ড" পিতামাতা ও "এলোকোয়েণ্ট" ধর্ম্মবক্তা ও "লেকচারার" সহস্র চেষ্টা দ্বারাও সেরূপ নীতি শিক্ষা প্রদান করিতে সক্ষম হইতেছেন না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তখনকার একজন নিরক্ষর অন্ত্যজ ব্যক্তি যেরূপ সরল ভাবে নীতির শাসন মানিয়া চলিত, এখনকার একজন শিক্ষিত (?) ব্রাহ্মণ কুমারও সেরূপ নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম নহেন। বস্তুতঃ নানা বিষয়িণী বিদ্যার্জ্জনে তখনকার লোক এখনকার লোকের তুলনায় নগণ্য হইলেও নৈতিক শিক্ষায় তাহারা অগ্রগণ্য ছিল।

আন্দিয়ার অনতিদূরে সদরপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। বঙ্গাব্দ ১২০১ সালের কিছু পূর্ব্বে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ পাটনা নগরী হইতে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থবংশসম্ভূত রামানন্দ রায় নামক জনৈক ব্যক্তি এদেশে আসিয়া উপরিউক্ত সদরপুরে বাস করেন। কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত সুপ্রথিত কুমারখালি নামক গণ্ডপল্লীতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অপরাপর স্থানের ন্যায় একটী কুটী ছিল। রামানন্দ বাবু ঐ কুটিতে দেওয়ানী করিতেন। দেওয়ানী আমলেই তিনি বেগমাবাদ পরগণা নামক সুবিস্তৃত জমিদারী খরিদ করেন। সন ১২০১ সালে এই জমিদারী খরিদ হয়। তখন দেশে বিদ্যালয়ের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। রামানন্দ বাবুর জমিদারীর সদর সেরেস্তাই সদরপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের শিক্ষার্থিবর্গের একটি প্রধান শিক্ষাস্থল ছিল। কালী কলম কাগজ প্রভৃতি লিখিবার উপাদান সরকার হইতেই মিলিত এবং সরকারী আমলাগণই অবৈতনিক শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। সুতরাং গরীব ভদ্র লোকের সন্তানেরা ঐ খানে গিয়া তৎকালোপযোগী লেখাপড়া শিক্ষা করিত। সদাশয় রামানন্দ বাবুর বদান্যতাগুণে বিদ্যার্থিগণের মধ্যে অনেকেই সরকার হইতে খাইতে পাইত এবং লেখাপড়া শিখিয়া উপযুক্ত হইলে ঐ সরকারেই প্রয়োজন মতে সদর ও মফস্বলে চাকরী প্রাপ্ত হইত।

পিতার দারিদ্র্য নিবন্ধন এবং জন্মভূমি আন্দিয়া বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পাঠশালার

ভাব বশতঃ রামলোচন কোন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। রামানন্দবাবুর সদরপুরের জমিদারী সেরেস্তাতেই রামলোচনের হাতে খড়ি এবং সেই খানেই তাঁহার শিক্ষার অবসান হয়। বাড়ী সদরপুর হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী হইলেও রামলোচন নিয়ত সদরপুরে রামানন্দবাবুর বাটীতে থাকিয়াই লেখাপড়া শিখিতেন। বালা বাহুল্য তাঁহার আহারাদিও সেইখানেই হইত। এইরূপে দুই তিন বৎসরে রামলোচনের শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রামলোচনের ছাত্র জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শুভঙ্করের আর্য্যা শিখিয়া ও হাতের লেখা পাকাইয়া "পাকা মহুরী" হইতে পারিলেই তখনকার কালে অর্থকরী বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইতে পারা যাইত। রামলোচনের "পাকা মহুরী" বলিয়া খ্যাতি ছিল না। এতদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হইতেছে যে, তিনি তাৎকালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত উন্নীত হইতে পারেন নাই।

জমিদারী সেরেস্তারূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রামলোচন কিরূপ শিক্ষিত হইয়াছিলেন, আমরা তাহারই পরিচয় প্রদান করিব। জমিদারী সেরেস্তা হইতে অর্থকরী শিক্ষায় তিনি একজন সাধারণ পাটোয়ার অপেক্ষা অধিক বিদ্যার্জ্জন করিতে পারেন নাই। না পারুন, কিন্তু উল্লেখের অযোগ্য এই স্বল্পপরিমিত লেখাপড়া শিখিয়াই রামলোচন বিষয়কার্য্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কখন কোন আইন গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু কি ফৌজদারী কি দেওয়ানী মোকদ্দমায়, তিনি যেরূপ যুক্তি দিতেন, অনেক বিজ্ঞ ব্যবহারাজীবের কূট বুদ্ধিতে সেরূপ যুক্তি আসিত কিনা সন্দেহ। "রচনা" এই শব্দটী বোধ হয় কখন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই, কিন্তু দলিলাদি মোসাবিদায় এরূপ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতেন, যে, অনেক বিচক্ষণ মুন্সি তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। অঙ্কশাস্ত্র কখন তাঁহা কর্ত্তৃক অধীত হয় নাই, কিন্তু তহসীলদার ও নায়েবদিগের প্রদত্ত জটিল হিসাব নিকাশ এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিয়া লইতে পারিতেন যে, অতি চতুর মহুরীও তাঁহার চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিতে পারিত না। এইরূপ প্রায় যাবতীয় বিষয়কার্য্যে যেরূপ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল।

মহানুভব রামলোচন, যে গুণে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, বৈষয়িক পাণ্ডিত্য তাহার হেতু নহে। নৈতিক বল ও নিরুপম চরিত্রই তাঁহার চিরস্মরণীয় খ্যাতি প্রতিপত্তির মূলীভূত কারণ। বিনা গ্রন্থ অধ্যয়নে এবং গুরূপদেশ ব্যতিরেকে নৈতিক শিক্ষায় তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সত্যপরায়ণতা, নির্ভীকতা, সংযম, নিস্পৃহতা, উচিতবাদিতা, নিরপেক্ষতা, পরোপকারিতা, নিরহংকারিতা, তেজস্বিতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং ভগবদ্‌ভক্তিরূপ অমূল্য নীতিরত্ন সমূহ, তিনি কেবলমাত্র হৃদ্গত সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি আজীবন তদ্বিনিময়ে বিপুল যশঃ ও অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আপনাকে প্রকৃত মহাত্মপদবাচ্য করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ তিনি নীতিবাদী ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার সময়ে তিনি একজন অদ্বিতীয় নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন তদ্বিষয়ে কাহার দ্বিমত নাই। পাঠকগণ তাঁহার এই ক্ষুদ্র জীবনী মধ্যে ক্রমশঃ তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইবেন। আমরা সত্যানুরোধে

ইহাও বলিতে বাধ্য যে, তিনি অতিশয় দুর্ম্মুখ ছিলেন। যে কেহ হউক না কেন, অন্যায় কার্য্য করিলেই,তিনি তাহার উপর অশ্লীল কটু-কাটব্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু, কি আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি যাহার প্রতি এইরূপ বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেন, সেই আপনাকে, তাঁহার প্রিয়পাত্র বলিয়া শ্লাঘ্য মনে করিত। আমরা এই খানেই মহাত্মা রামলোচনের শিক্ষার ইতিবৃত্ত শেষ করিলাম।

চাকরী—সদরপুরে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে,রামলোচনের শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়। পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতেই তিনি চাকরীতে প্রবিষ্ট হন। রামনন্দ বাবুর সদর পুরের সদর কাছারীতে মাসিক ২৲ টাকা বেতনে শিক্ষানবিসী করিতে আরম্ভ করিয়া রামলোচন স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে এবং কার্য্য-দক্ষতা ও প্রভুপরায়ণতার গুণে অচিরেই সদর-পুরের জমিদারের সংসারে মাসিক ৭০৲ টাকা বেতনে সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সদরে শিক্ষানবিসী করিতে করিতেই, তিনি একবার রামানন্দ বাবুর জমিদারীর অন্তঃর্গত "তারাগুণিয়া"নামক মহলে তহসীলদারী করেন এবং কিছু কালের নিমিত্ত আমিনী কার্য্যও করিয়াছিলেন। এ সকল কার্য্য তাঁহাকে বেশী দিন করিতে হয় নাই। সদরপুরের জমি-দারদিগের আদি পুরুষ রামানন্দ বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার দুইকন্যা তদীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। জমিদারী তুল্যাংশে বিভক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠা ব্রজসুন্দরীর ইষ্টেট "বড় তরফ" ও কনিষ্ঠা প্যারীসুন্দরীর ইষ্টেট "ছোট তরফ" নামে আখ্যাত হয়। ইহাঁ-দের আমলে ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামলোচন বড় তরফে কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে নামে তাহার উপরে অন্য একজন কর্ত্তা থাকি-লেও কার্য্যতঃ তিনিই উক্ত সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কিছু কাল পরে তিনিই "দেওয়ানের" পদ গ্রহণ করেন। যদিও ছোট তরফে অর্থাৎ প্যারীসুন্দরীর সংসারে তিনি কার্য্য করিতেন না, তথাপি তাহার মন্ত্রণা ব্যতীত উভয় সংসা-রের কোন গুরুতর কার্য্যই নির্ব্বাহিত হইত না। প্যারীসুন্দরী অতি বুদ্ধিমতী এবং চতুরা রমণী ছিলেন। নিঃসন্তানে তিনি বিধবা হন। বৈধব্যাবস্থায় পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া প্রবল সরিকপক্ষের সমকক্ষতায় স্বীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। জমিদারী সংক্রান্ত কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে তিনি রামলোচনের বিনা পরামর্শে কোন কার্য্য করি-তেন না। রামলোচন সরিকের কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহার প্রকৃতি তিনি অবগত ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন। রামলোচনও প্রভুনির্ব্বি-শেষে সদ্যুক্তি প্রদান করিতে কদাচ কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না। রামলোচন এক তরফের কর্ম্মচারী হইলেও সদরপুরের উভয় সংসারেই তাঁহার আধিপত্য সমান ছিল।

ব্রজসুন্দরীরও পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্যামাসুন্দরীই সম্পত্তির অধি-কারিণী হন। শ্যামাসুন্দরীর স্বামী মনোমোহন ঘোষ রামলোচনের কর্ত্তৃত্ব আমলে বিবাহিত হইয়া আইসেন। মনোমোহন বাবু বড় তেজস্বী ও "একগুঁয়ে"লোক ছিলেন। সাধারণে তাহার সহিত দেখা করিতে বা কোন দরবার করিতে ভয় করিত। ছোট তরফের সর্ব্বময় কর্ত্রী প্যারীসুন্দরীও তেজস্বিতায় ও "জেদে" মনো-মোহন বাবু অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। বরং অনেকাংশে বেশী ছিলেন। প্যারী

সুন্দরীর "রব রবায়" সদরপুরের ঘর তাঁহার আমলে মস্তক উন্নত করিয়া সাধারণ সমক্ষে স্বীয় গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। রামলোচন দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হই-য়াও এ হেন প্যারীসুন্দরী ও মনোমোহনের অযথা কর্ত্তৃত্ব ও অত্যাচারের প্রতি উপেক্ষা ও ঘৃণা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। জমিদার ও প্রজার উভয়ের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি অনুক্ষণ কার্য্য করিতেন। স্বীয় প্রভুর স্বার্থ সংরক্ষণার্থ তিনি যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে প্রাণ পণ চেষ্টা করিতেন,প্রজাকেও তাহার ন্যায্য স্বত্ব প্রদান করিতে তদপেক্ষা কিছুমাত্র কম চেষ্টা করিতেন না। এই কারণে মনিব তাঁহাকে যেমন অকপট হিতৈষী ও নিঃস্বার্থ প্রভুপরায়ণ বলিয়া শ্রদ্ধা করিত,প্রজারাও সেইরূপ তাঁহাকে আপনা-দের পরম শুভানুধ্যায়ী বলিয়া, পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও নির-পেক্ষতা দর্শনে,কি মনিব,কি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারি-বর্গ ও ভৃত্যগণ, কি প্রজাবৃন্দ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। অন্যায়াচরণ দেখিলে তিনি যেমন, কি সাধারণ কি সম্ভ্রান্ত সকল শ্রেণীর প্রজাকেই উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিতেন, সেই রূপ ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিতে দেখিলে, মনিবকেও কড়া কথা শুনাইয়া দিতে অনুমাত্র সঙ্কোচ করিতেন না। তাঁহার ভয়ে জমিদার, প্রজার নিকট অন্যায়রূপে অর্থ গ্রহণ বা তাহা-দের প্রতি অকারণ পীড়ন করিতে সাহসী হই-তেন না। চাকরী বজায়ের ভয়ে তিনি কখনই বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন না। বলা বাহুল্য বেতনের অর্থ ও প্রথাসিদ্ধ "নজর" ব্যতীত তিনি কি মনিবের তহবিল হইতে কি প্রজার নিকট হইতে কখনও কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। এই জন্যেই তিনি রাজা ও প্রজার নিকট স্বীয় প্রভুত্ব ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পাঠকবর্গ দুর্দ্দান্ত নীলকর আই, টমাস্, কেনী সাহেবের নাম ইতিপূর্ব্বেই শ্রবণ করি-য়াছেন। আন্দিয়া যে জমিদারীর অন্তর্গত মহল, সেই জমিদারীর নাম "আঠারপাড়া"। কেনী সাহের এই আঠারপাড়ার পত্তনীদার ছিলেন। সদরপুরের জমিদারদিগের জমিদারী ও আঠারপাড়ার সীমানা পরস্পর সংলগ্ন। এই জন্য সীমানা সরহদ্দ লইয়া এবং অন্যবিধ নানা কারণে কেনীর সহিত সদরপুরের জমিদার মনোমোহন ও প্যারীসুন্দরীর বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। আন্দিয়াতে বাস হেতু,রামলোচন কেনী সাহেবের প্রজা ছিলেন। একদিকে তিনি কেনীর প্রজা, অন্যদিকে কেনীর শত্রু-পক্ষের কর্ম্মচারী—যে সে কর্ম্মচারী নহেন, সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী। সুতরাং তাঁহাকেও কেনীর শত্রু হইতে হইয়াছিল। জমিদারী সংক্রান্ত দাঙ্গাহাঙ্গামায় এবং মামলা মোকদ্দমায় রামলোচনের সাহস, ক্ষমতা ও কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া এবং সদরপুরের সংসার তাঁহারই মন্ত্রণা-বলে পরিচালিত বুঝিতে পারিয়া, চতুর কেনী প্রথমতঃ নানাবিধ প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করে। এবং অনেক চেষ্টায় তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে তাঁহাকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীবোধে তাঁহার প্রতি নানাবিধ অযথা উৎপীড়ন করিতে থাকে। নির্ভীক রামলোচন, ধন ও জন বলে কেনী অপেক্ষা শতাংশে হীন হইয়াও, স্বীয় অসা-ধারণ তেজস্বিতার গুণে কেনীকে কোন অংশেই ভয় করিয়া চলিতেন না। বরং তিনিও সুযোগ পাইলেই তাহাকে অপমানিত করিবার চেষ্টা পাইতেন। এইরূপে ক্রমশঃ উভয় উভয়ের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। রামলোচন কেনীর কাপুরুষোচিত অত্যাচারে এবং শত্রুর প্রজা থাকা কর্ত্তব্য নহে বিবেচনায়, আন্দিয়ার

বাস পরিত্যাগ করতঃ সদরপুরের জমিদারদিগের এলাকাধীন খলিসাকুণ্ডীতে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হন।

এই কেনীর সহিত সদরপুরের জমিদারদিগের বিবাদ-বিসম্বাদকালে অস্মদ্দেশে সুপ্রসিদ্ধ "দারোগা খুন' নামে একটী লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। গৌরী নদীর তীরবর্ত্তী "সালঘরমহুয়া" নামক স্থানে কেনী সাহেবের এক নীলকুঠী ছিল। সাহেব অধিকাংশ সময়ই সস্ত্রীক সেই কুঠীতে বাস করিত। কেনীর সহিত সদরপুরের জমিদারদিগের ঘোরতর শত্রুতার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কেনী অন্যায়রূপে সদরপুরের এলাকার প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন করায়, প্রজারা আসিয়া সদরে আপন জমিদারের নিকট তাহার অত্যাচারের কথা বিবৃত করিলে, তাঁহারা বারবার সতর্ক করিয়া দিলেও কেনী তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া প্রজাদিগের প্রতি উত্তরোত্তর অত্যাচার করিতে লাগিল। স্বীয় এলাকার প্রজার প্রতি বারবাংর অযথা অত্যাচার দর্শনে সদরপুরের ছোট তরফের কর্ত্রী প্যারীসুন্দরী ভয়ানকরূপে চটিয়া গিয়া কর্ম্মচারীদিগকে হুকুম দিলেন, "সালঘরমহুয়া" গিয়া কেনীকে সস্ত্রীক অপমানিত করে"। তাঁহার আজ্ঞানুসারে সদরপুর হইতে কয়েকবার লাঠিয়াল প্রেরিত হইল। দুর্দ্দান্ত কেনী কৌশলক্রমে উপর্য্যুপরি কয়েকবারই সদরপুরের লাঠিয়ালদিগকে বিতাড়িত করিয়া প্যারীসুন্দরীকে অপমানিত করিলেন। তেজস্বিনী প্যারীসুন্দরী নীরবে এ অপমান সহ্য করিলেন না। ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্তার ন্যায় হইলেন এবং বড় তরফ হইতে রামলোচনকে ডাকাইয়া কহিলেন "রামলোচন! যত টাকা লাগে আমি দিব, আমার এই জমিদারী পণ রহিল,তুমি কি দুরাত্মা কেনীর মস্তক আমাকে আনিয়া দেখাইতে পারিবে না?" তেজস্বিনী মনিবের তেজস্বী কর্ম্মচারী নির্ভয় ও দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল "কেন পারিব না মা! এই আমি যাই চলিলাম, কেনীর মুণ্ড আপনাকে আনিয়া দেখাইব।"

সেবারে সদরপুরের জমিদারদিগের তরফ হইতে বাছা বাছা লাঠিয়ালদল রামলোচনের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়া সালঘর মহুয়ার কুঠী ভীমপরাক্রমে আক্রমণ করিল। কেনী ঐই দাঙ্গার আভাস পূর্ব্বাহ্ণেই অবগত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসকে খবর দিয়া এবং বিস্তর লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া নিজের কামরায় আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। দাঙ্গার দিন দুর্ভাগ্যক্রমে জনৈক মুসলমান দারোগা, সাহেববেশে সজ্জিত হইয়া শান্তিরক্ষার্থ অথবা কেনীর বিপক্ষদলকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দাঙ্গাস্থলে উপনীত হইল। চতুর কেনী পরিণাম বুঝিয়া সে দিন বিবাদক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই। যখন উভয় দলে ভয়ানক দাঙ্গা বাধিয়া উঠিল, সেই সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সেই হতভাগ্য দারোগার প্রতি কেনীর বিপক্ষদলকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিলেন। সাহেবেরবেশধারী দারোগাসাহেব,যেমন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুযায়ী বিপক্ষদলের মধ্যে "পাকড়াও" "পাকড়াও করিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিয়াছে, অমনি সদরপুরের উন্মত্ত লাঠিয়াল দলের মধ্যে কয়েকজন তাহাকে কেনী সাহেব মনে করিয়া, তাহার বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ বল্লম বিদ্ধ করিয়া দিল। বল্লমবেধের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে, অশ্বকে কষাঘাত পূর্ব্বক প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। বিপক্ষদল ভাগিয়া চলিয়া গেল। সদরপুরের উন্মত্ত লাঠিয়াল দল তখন সেই হতভাগ্য দারোগার মৃতদেহ বল্লমবিদ্ধ করিয়াই অদূরবর্ত্তী 'আলামপুরের' কাছারীতে আসিয়া উপনীত হইল।

লাঠিয়ালদিগকে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া রামলোচন এইখানেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা সেই দারোগার বল্লমবিদ্ধ মৃতদেহ তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিল। তিনি অকারণ নরহত্যা দেখিয়া চমকিয়া গেলেন। বলিলেন "বেটারা করিয়াছিস্ কি? আমিত তোদিগকে নরহত্যা করিতে হুকুম দেই নাই। আমি কেনীকে ধরিয়া আনিতে বলিয়া ছিলাম মাত্র। তোরা কোথায় তাহাকে ধরিয়া আনিবি, না কোথায় কোম্পানীর চাকর দারোগাকে বধ করিয়া আসিলি।" তাঁহার তিরস্কারে লাঠিয়ালদের তখন চমক ভাঙ্গিল; তাহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং যে যে দিক দিয়া পারিল সে সেই দিক দিয়াই পলায়ন করিল। রামলোচন আসন্নবিপদ বুঝিয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন, এবং অবিলম্বেই স্বীয় অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে সেই মৃত দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিকটস্থ একটী বৃহৎ জলাশয়ে নিক্ষেপ করাইলেন। তিনি অচিরেই সদরপুর আসিয়া প্যারীসুন্দরীকে সমস্ত অবগত করিলেন এবং সেই দিনই তিনি কি ভাবিয়া নদিয়া জেলার সদর ষ্টেসন কৃষ্ণনগরে চলিয়া গেলেন। এ দিকে সদরপুরের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে দারোগাখুনের অভিযোগ আসিল। সরকার হইতে তাহাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। প্যারীসুন্দরী প্রভৃতি গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া আশ্রয় লইলেন। দেশে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। তুমুলবেগে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। এই সময় রামলোচন অসামান্য বুদ্ধিকৌশলে নানাপ্রকার উদ্যোগ ও যোগাড় যন্ত্র দ্বারা এবং বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া এই মহা বিপদ হইতে 'মনিবকে রক্ষা এবং তাহার জমিদারী খোলসা করিলেন। দেশে বিদেশে রামলোচনের জয়জয়কার পড়িয়া গেল। তেজস্বিতার পরিচয় দিতে হইলে,আজিও "দারোগা খুনের" সহিত রামলোচনের নাম সংযোযিত হইয়া থাকে। সদরপুরের জমিদারেরা এজন্য যে রামলোচনের নিকট কতদূর ঋণী তাহা বলা যায় না। তিনি কিন্তু তাহা মনে করিতেন না, বলিতেন, আমি ভৃত্যের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি মাত্র। এই ঘটনার পর হইতে কেনী তাহাকে অধিকতর ভয় করিয়া চলিত।

সদরপুরের ঘরে অবস্থান কালে কেবল দারগা খুনি মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া উক্ত সংসারের মহদুপকার সংসাধন করিয়াছিলেন এমত নহে, অদ্ভুত কৌশলে অপহৃত "চর বলরামপুর" দখল "গঙ্গাপথের "সুবন্দোবস্ত দ্বারা আয় বৃদ্ধি ইত্যাকার কত শত হিতকর কার্য্য দ্বারা সদরপুরের ঘরের যথেষ্ট পরিমাণে হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহা কর্ত্তৃক সদরপুরের ঘরের যেরূপ গৌরব ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাঁহার পরবর্ত্তী কোন কার্য্যকারক দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই ও ভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা নাই ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি বহুকালাবধি সদরপুরের ঘরে থাকিয়া উক্ত ইষ্টেটের উন্নতি বিধান করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে কোন বিশেষ কারণে মনোমোহন বাবুর সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি চাকরিতে "ইস্তফা" দিয়া কিছু কালের নিমিত্ত বাটী আসিয়া বসিয়া থাকেন।

চাকরী – তাহেরপুরে।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহেরপুরের রাজাদিগের নাম অনেকেই অবগত আছেন।

তাহেরপুরের বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের পিতা চন্দ্রশেখর রায় বাহাদুরের প্রথম আমলে তাহেরপুর রাজ ইষ্টেটের বড় শোচনীয় অবস্থা ঘটে। নানা কারণে চন্দ্রশেখর রায় বাহাদুর বিস্তর ঋণ দায়ে জড়ীভূত হইয়া পড়েন। ন্যায্য কর ব্যতীত রাজভক্ত প্রজারা বার বার "মাথট" প্রদান করিয়াও রাজাকে ঋণমুক্ত করিতে পারে নাই। চন্দ্রশেখর বাহাদুর স্বয়ং বড় অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাজকার্য্য নিজে বড় একটা দেখিতেন না। তখন তাঁহার বয়ঃক্রমও অধিক হয় নাই। স্বার্থপরায়ণ নীচাশয় কর্ম্মচারিবর্গের দোষেই রাজ্যের এরূপ দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময়ে "জ্যাকসন" সাহেব রাজসাহীর জজ ছিলেন। রাজা চন্দ্রশেখরের সহিত তাঁহার বড় প্রণয় ছিল। রাজা একদিন প্রিয়বন্ধু জ্যাকসনকে কহিলেন "আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একজন সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত ইংরেজ কর্ম্মচারী সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আমার সংসারের উন্নতি হইতে পারে।" বহুদর্শী জজ জ্যাকসন বলিলেন "ইংরেজ কর্ম্মচারী দ্বারা আপনার কোনই উপকার হইবে না, সাহেব লোক জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য ভালরূপ বুঝিতে পারিবে না; অথচ তাঁহাকে বিস্তর টাকা বেতন দিতে হইবে। আপনি একজন বিচক্ষণ ও বিশ্বাসী বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করুন; তাহা হইলে আপনার ইষ্টেটের উন্নতি হইতে পারিবে।" চন্দ্রশেখর কহিলেন "বাঙ্গালীর মধ্যে কার্য্যদক্ষ লোক চেষ্টা করিলে মিলিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসী লোক মিলা বড় কঠিন"।

জ্যাকসন কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "আচ্ছা আমি আপনাকে একজন উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। আমি শুনিয়াছি তাঁহার উপস্থিত চাকরী নাই, বোধ হয় আপনি চেষ্টা করিলে তাঁহাকে পাইতে পারিবেন"। রাজা বাহাদুর তাঁহার পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইলে, জ্যাকসন্ সাহেব কহিলেন "সে লোকটীর নাম রামলোচন তা। আমার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে। আমি যখন পাবনায় ছিলাম সেই সময় তিনি তাঁহার মনিবদিগের পক্ষ হইতে সময়ে সময়ে মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে পাবনায় আসিতেন। আমি অনেক বার তাঁহাকে আমার এজলাসে মোকদ্দমার তদ্বির আদি করিতে দেখিয়াছি। প্রসিদ্ধ দারোগাখুনি মোকদ্দমায় তিনি যেরূপ অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া সদরপুরের জমিদারদিগকে ভয়ঙ্কর বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যেরূপ নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গালীর ভিতর তাঁহার ন্যায় প্রভুপরায়ণ ও নিস্পৃহ ব্যক্তি অতি অল্পই আছে বলিয়া বোধ হয়।

আমি একদিন তাঁহাকে স্বীয় মনিবের মান ও স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত এজলাসের ভিতর দুর্দ্দান্ত নীলকর কেনী সাহেবকে অসম্ভাবিতরূপে তিরস্কার করিতে শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রভুহিতৈষিতার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আচ্ছা দেওয়ানজী সদরপুরের জমিদারীতে আপনার কোন অংশ আছে কি"? তাহাতে রামলোচন উত্তর করিয়াছিলেন "না ধর্ম্মাবতার, আমার ঐ জমিদারীতে কোন অংশ নাই, আমি বেতনভোগী চাকর মাত্র। যখন মনিবের "নুণ" খাই তখন প্রাণপণে তাহার "গুণ" না গাহিলে চলিবে কেন? আমি মনিবের হিতের জন্য সকল বিপদই সহ্য করিতে প্রস্তুত। রামলোচনের মুখে সেই কথা শুনিয়া, তদবধি আমি তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। সে যেমন নির্ভীক ও বিশ্বাসী, সেইরূপ কার্য্যকুশল ও মন্ত্রণাপটু। আমার বিবেচনায়, আপনি তাঁহাকে আনাইয়া আপনার রাজ্যের সমুদয় ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করুন। তাহা হইলে আপনার সব দিকেই মঙ্গল হইবে।

বন্ধু জ্যাকসনের উপদেশ ক্রমে, চন্দ্রশেখর রায়বাহাদুর তৎক্ষণাৎ তাঁহার রাজসাহিস্থ মোক্তারকে রামলোচনের নিকট পত্র লিখিতে আদেশ দিয়া রাজসাহিতেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পত্র যথা সময়ে প্রেরিত হইল।

রামলোচন সদরপুরের কর্ম্মত্যাগ করিয়া অতি অল্প দিনই বাটিতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাজসাহীর মোক্তারের পত্র আসিয়া পঁহুছিল। তিনি পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া, জনৈক খানসামা ও একজন রসুয়ে ব্রাহ্মণ সহ রাজসাহীতে গিয়া মোক্তারের বাসায় উপস্থিত হইলেন। মোক্তার তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন। রাজা রামলোচনকে সমভিব্যাহারে লইয়া বন্ধু জ্যাকসনের কামরায় উপনীত হইলেন। তাঁহার সমক্ষে আপন ইষ্টেটের অবস্থা আদ্যপ্রান্ত বিবৃত করিয়া তাঁহাকে ইষ্টেটের কর্ত্তৃত্ব ভার লইতে বলিলেন। বলা বাহুল্য বিচারপতি জ্যাকসনও তাঁহাকে এই বিষয়ে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলেন। রামলোচন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "আমি আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি, কিন্তু আমার উপযুক্ত সম্পত্তিও নাই এবং জামিন দিয়া চাকরি করিবার ইচ্ছাও নাই। রাজাবাহাদুর যদি বিনা জামিনে তাঁহার রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর ভার আমাকে অর্পণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমার চাকরি করিতে আপত্তি নাই"। রাজা এই গুরুতর বিষয়ের উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, মহামতি জ্যাকসন কহিলেন "আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামলোচন যেমন কার্য্যদক্ষ, তেমনি বিশ্বাসী। আমার মতে ইহাকে বিনা জামিনে চাকরী দিলেও আপনার কোন ক্ষতি হইবে না। আমার বাক্যেও যদি আপনার সন্দেহ থাকে, তবে আমি রামলোচনের জামিন হইতে রাজি আছি। পাঠকগণ, সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন, একজন জেলার জজ যাঁহার প্রতিভূ হইতে প্রস্তুত, তাঁহার প্রতি চন্দ্রশেখরের আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি বিনা জামিনে রামলোচনকে আপনার রাজ্যের প্রধানতম পদে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু স্বাধীনপ্রকৃতি পরিণামদর্শী রামলোচন শেষে যে প্রস্তাব করিলেন, সেই গুরুতর প্রস্তাবের সম্পূর্ণ মীমাংসা রাজসাহীতে না হওয়ায়, সেখানে তাঁহাকে বাহালী "পরওয়ানা" দেওয়া হইল না।

রামলোচন কহিলেন "রাজাবাহাদুর বোধ হয় আমার পরিচয় পূর্ব্বেই জজ বাহাদুরের নিকট অবগত হইয়াছেন। আমার সঙ্কল্প এই যে, আমি যে সংসারে চাকরী করিব, সেখানে আমার স্বাধীনতা, আমার ক্ষমতা, আমার হুকুম ও আমার কৃত বন্দোবস্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই সকলের অন্যথা হইলে বা আমার উপর কেহ কর্ত্তৃত্ব করিলে, আমি সেখানে চাকরি করিনা। আপনি যদি এই স্বত্বে আমাকে বাহালী পরওয়ানা দেন যে, আমি আপনার ইষ্টেট সম্বন্ধে আমার বুদ্ধি মতে যাহা করিব, তাহাতে আপনি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, আমার হুকুম বা আমার কৃত বন্দোবস্ত কখন রদ হইবেনা, যদি কখন ইহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে

আমি তৎক্ষণাৎ বিনা নিকাশে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাটী যাইতে পারিব। তাহা হইলে আমি আপনার চাকরী করিতে রাজি আছি, নচেৎ নহে। রাজা, রামলোচনের এই প্রস্তাব শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। একজন চাকরীজীবী বাঙ্গালী এরূপ স্বাধীনভাবে প্রস্তাব করিতে পারে, তাহা তাঁহার বিবেচনায় আইসে নাই। রাজা বন্ধু জ্যাক্‌সনের উপদেশ চাহিলেন। জ্যাক্‌সন বলিলেন "রামলোচন সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু বলিবার তাহাত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উহার প্রতি আপনি সকল ক্ষমতা দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তথাপি আমি বলি আপনি রামলোচনকে সঙ্গে করিয়া রাজধানী গমন করুন। তথায় আপনার মাতৃদেবীর সহিত পরামর্শ করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করিবেন। কিন্তু আমার অনুরোধ যে, যদি আপনি আপনার কল্যাণ কামনা করেন, তবে যেন রামলোচনকে পরিত্যাগ করা না হয়।

রাজা রামলোচনকে সঙ্গে লইয়া তাহেরপুর গমন করিলেন। তথায় গিয়া সমুদয় বিবরণ আদ্যোপান্ত রাজমাতার নিকট বর্ণন করিয়া তাঁহার মত চাহিলেন। রাজমাতা বড়ই বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। তিনি সমুদয় অবগত হইয়া কহিলেন, "চন্দ্রশেখর! তোমার মত কি ?" রাজা কহিলেন আমার যেন মনে হইতেছে "রামলোচনকে কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিলে আমাদের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবেনা"। রাণীও তাহাতেই মত দিয়া রামলোচনকে তাঁহার প্রস্তাবিত সর্ত্তে পরওয়ানা প্রদান করিতে অনুমতি দিলেন। রামলোচন পূর্ণ ক্ষমতার সহিত মাসিক এক শত টাকা বেতনে তাঁহেরপুর-রাজ-ইষ্টেটের সর্ব্বোচ্চ পদে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রমশঃ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মিনার্ভা-থিয়েটার। শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উদ্‌যোগে ও কর্ত্তৃত্বাধীনে বিডন ষ্ট্রীটে "মিনার্ভা" থিয়েটার খোলা হইয়াছে। গিরিশ বাবু মহাকবি সেক্সপিয়ারের সুবিখ্যাত "ম্যাক্‌বেথের" বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহারই অভিনয় দ্বারা নিজের যেরূপ লিপি চাতুর্য্য ও অভিনয়নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বেরই পরিচায়ক হইয়াছে। ম্যাক্‌বেথ ও লেডি-ম্যাকবেথের অভিনয় অতীব স্বাভাবিক এবং নিরতিশয় আনন্দপ্রদ। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ অভিনেতা বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি "মুকুল। মুঞ্জরায়" হাস্যরসের লহরী তুলিয়া সমাগত দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে যে বিমলানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা কোন মতেই ভুলিবার নহে। চামেলীর মনোমুগ্ধকর সংগীত আজও প্রাণে লাগিয়া রহিয়াছে। "আবুহোসেনের" হঠাৎ বাদসাই দেখিতে বাস্তবিকই বড় আমোদ বোধ হয়। অর্দ্ধেন্দু বাবুর সরস রসিকতায়, দাই ও মন্থরের কলহে এবং সখিদিগের ঘন ঘন নৃত্যগীতে দর্শক মাত্রেই পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। দক্ষযজ্ঞে সতী, রাণী ও তপস্বিনীর অভিনয়ে যথার্থই হৃদয় দ্রব হইয়া থাকে। মহাদেবের অভিনয় প্রকৃত মহাদেবেই অনুরূপ। "বেজায়-আওয়াজ" বেজায় আওয়াজই বটে। বিষ্ণুপুরের ব্রাহ্মণের অভিনয়ে মুস্তফি মহাশয় বড়ই হাঁসাইয়া থাকেন। "বৃষকেতুর অভিনয়ে করুণরসের আধিক্য অধিক। বৃষকেতুর আশ্চর্য্য শিরশ্ছেদন এবং রাজা ও রাণীর বিলাপ দর্শনে সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই চক্ষের জল ফেলিয়া থাকেন। বালকগণের নৃত্যগীতে মনমুগ্ধ হয়। গোলকধামের শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অতীব মনোহর। মোটের উপর "মিনার্ভা" রঙ্গালয়ে যতগুলি বিষয়ের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহার সকল গুলিই দেখিবার জিনিষ। বলা বাহুল্য ইহার দৃশ্যপটাদিও অতি উৎকৃষ্ট। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, গিরিশ বাবুর উদ্যম সফল হইয়াছে।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী (১০)।

বাঙ্গালাভাষা কোন সময়ের ?

সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালী, হিন্দী, উৎকল প্রভৃতি ভাষা হইতে কিরূপে বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা অব্যবহিত পরেই প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে কোন্ সময় হইতে উহা উক্ত নামে আখ্যাত হইতেছে, তন্নির্ণয়ের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। আমাদের ধারণা, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই বঙ্গভাষা স্বতন্ত্র রূপ ও স্বতন্ত্র আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে *। কেননা, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ফাহিআন নামক চৈনিক পরিব্রাজক এতদ্দেশে মাগধী প্রাকৃত প্রচলিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদীয় নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করিলে সহজেই উপলব্ধি হয়, যে মাগধী প্রাকৃত হইতে হিন্দী, এবং হিন্দী হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হওয়া দুই তিন শতাব্দীর কমে কখনই সম্ভব নহে। বাঙ্গালার বাল্যকালের কোনও গ্রন্থ অস্মদ্দেশে বর্ত্তমান নাই। সুতরাং, এ বিষয়ের স্থির মীমাংসা হওয়াই এক প্রকার অসম্ভব। যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া অস্মদ্দেশে প্রসিদ্ধি আছে, তাহাও ত পাঁচ শত বৎসরের বৈ নয়। সম্প্রতি কৃষ্ণমঙ্গল নামে একখানি বাঙ্গালা কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহার বয়ঃক্রম ছয় শত বৎসরের ন্যূন নহে। বাঙ্গলা-সাহিত্য-বিবরণ বিষয়ে যে মহাত্মা গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই দ্বিজমাধব বিরচিত কৃষ্ণমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই। আমরা যথাযোগ্য স্থলে উক্ত পুস্তকের সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। এক্ষণে ঐ প্রাচীনতম কৃষ্ণমঙ্গল হইতেও বাঙ্গালা ভাষার শৈশবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ভাব ভঙ্গির কিছুই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না।

অন্ধকারে হস্তামর্ষণে পদার্থাববোধ যেমন আয়াসসাধ্য, করস্পৃষ্ট বস্তুরও স্বরূপাবধারণ যেমন কালসাপেক্ষ; তদ্রূপ কোন্ সময়ে বঙ্গভাষা একবংশজাত ভাই ভগিনীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সুবিধামত স্বীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, তন্নির্ণয়ও আয়াসসাধ্য ও কালসাপেক্ষ। যে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, কি চতুর্দ্দশ শতাব্দী আমরা বঙ্গভাষার বয়ঃক্রম বলিয়া অনুমান করিতেছি, এতৎ সময়ের মধ্যে অনেকগুলি তন্ত্রও রচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ তন্ত্রের ভাষাদৃষ্টে স্বতই এরূপ অনুমান উপস্থিত হয়, যে তাহাদের রচনা কালে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম ও নূতন নূতন কথা কহিবার শক্তি হইয়াছে। বাঙ্গালার বাল্যাবস্থার সেরূপ অনেক শব্দ তন্ত্র মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়; কামধেনু তন্ত্রের দ্বাত্রিংশ পটলে লিখিত আছে—

গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যস্য আসনে ন বসেত্তদা।
কাশীক্ষেত্রসমাভূমির্গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥

এস্থলে 'আসনে ন বসেৎ' ইত্যাদি বাক্যে 'বসেৎ' ক্রিয়া বস্ ধাতুজ। কিন্তু, সংস্কৃত বস্ ধাতুর অর্থ বাস করা, উপবেশন করা নহে। আসনে বাস করা বলিলেও অসঙ্গত হয়। অথচ বাঙ্গালা ভাষায় আসনে বসা প্রচলিত আছে। তজ্জন্য বোধ হয়, বাঙ্গালা 'বসা' হইতেই উক্ত তন্ত্রের 'বসেৎ' ক্রিয়াপদ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, সহজেই এইরূপ অনুমিতি আইসে,

* প্রোফেসর লাসেন (Lassen) এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষার বয়ঃক্রম সহস্র বৎসরের ঊর্দ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না।

যে, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির পর ঐ তন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে।

এক্ষণে যদি কেহ এইরূপ আপত্তি করেন যে, ব্যবহৃত হওয়ায়, কালক্রমে সংস্কৃত বস্ ধাতুরই অর্থান্তর ঘটিয়া বস্ ধাতুরই 'বসা' অর্থ হইয়া পড়িয়াছে; তাহা হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় 'বসা' ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সংস্কৃতের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতের প্রচলন হইয়া উহার যতদূর বিকৃতির সম্ভাবনা, তাহাই হইয়া অনতিবিলম্বে সংস্কৃতের প্রায় একরূপ শেষাবস্থা ঘটিল। তদবধি সংস্কৃত মৃতবৎই আছে। মৃত ভাষার আর বিকৃতি সম্ভবে না। আলোচনাকারীরা কেবলমাত্র পূর্ব্বপদ্ধতিগ্রহণেই আপনাপন অভীষ্ট সম্পাদন করেন। সুতরাং, প্রাকৃতাবস্থায় সংস্কৃতের যাহা বিকৃতি দেখা যায়, উহার তদিতর বিকৃতি ঘটেও নাই, ঘটিবেও না। তবে স্থানে স্থানে যতটুকু অন্যথাত্ব প্রত্যক্ষ হয়, সেগুলি রচনাকালীন ভাষানুপ্রাণিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তজ্জন্যই বঙ্গভাষার প্রচলনকালে যে যে সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে তত্তৎ ভাষার শব্দ বা রচনা প্রণালী নয়ন গোচর হইয়া থাকে।

সপ্তবিধ আচারের বিশেষ-কথন-ব্যাপারে দক্ষিণাচারের উল্লেখের সময় তন্ত্রে লিখিত আছে—

দক্ষিণামূর্ত্তিঋষিণানুষ্ঠিতোঽসৌ মতঃ প্রিয়ে।

এস্থলে এক বিশেষ ব্যতিক্রম দেখুন; সমস্ত পদের মধ্যে সন্ধি সংস্কৃত ভাষায় নিত্য, বাঙ্গালা ভাষায় বৈকল্পিক; সুতরাং 'দক্ষিণামূর্ত্তি-ঋষিণা', ইত্যাদিতে সমাস থাকিলেও সন্ধি না হওয়া বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধীয় নয় ত কি? এটীতে বাঙ্গালার ধরণ জাজ্বল্যমান।

কামধেনু তন্ত্রে অন্যত্র লিখিত আছে—

'নিশ্চয়ং দেবদেবেশ কথ্যতাং পরমেশ্বর'।

এস্থলে 'নিশ্চয়ং' পদটী ক্রিয়ার বিশেষণ। কিন্তু বিশেষ্য পদে ক্রিয়ার বিশেষণ সংস্কৃত ভাষায় আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা যেমন বাঙ্গালায় শুদ্ধই হউক, আর অশুদ্ধই হউক, 'নিশ্চয় যাইব, নিশ্চয় করিব' ইত্যাদি বলিয়া থাকি; বোধ হয়, তদভ্যাসবশতই তন্ত্রীয় উক্ত 'নিশ্চয়ং' ক্রিয়ার বিশেষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু তন্ত্রে 'দদেদ্বলিম্' 'হুয়েদ্ধবিঃ' ইত্যাদিরূপ প্রয়োগেরও বহুল সমাবেশ আছে। দা ও হু ধাতুর বিধিলিঙে দদ্যাৎ ও জুহুয়াৎ হইয়া থাকে। তন্ত্রে হইল দদেৎ ও হুয়েৎ; ইহাতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে, যে, ইদানীং অস্মদ্দেশে মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীও যেমন অভ্যাসবশত কৃ ধাতুর বিধিলিঙ স্থলে 'করেৎ' বলিয়া ফেলেন, তদ্রূপ সহজাত অভ্যস্ততা-নিবন্ধনই দা ও হু ধাতুর বিধিলিঙে 'দদেৎ' ও 'হুয়েৎ' হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত অনেকানেক তন্ত্রে 'শূণ্যভীতিং', 'হবিম্', 'মতঃ', 'চন্দ্রসূর্য্যস্থ' ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োগে ব্যাকরণের শৈথিল্য-দর্শনে নিশ্চয়ই এইরূপ ধারণা জন্মে, যে, বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তির পর উহাদের রচনাকার্য্যের সমাধা হইয়া থাকিবে।

শুদ্ধ শব্দ বিষয়ে নহে, বঙ্গীয় ভাবেরও সমাবেশ তন্ত্র মধ্যে দেখা যায়। নীলতন্ত্রে লিখিত আছে—

যদি নাথ ন ব্রূবীষি মম দিব্যং তদস্তু তে।

স্বামীকে মাথার দিব্য দিয়া কোনও কিছু করান, যেমন ইদানীন্তন যোষিদ্বরাদের অভ্যস্ত, তন্ত্রে সেই ভাবটীও জাজ্বল্যমান। প্রাচীন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ ভাব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সুতরাং, অনেকগুলি তন্ত্রের উৎপত্তি, বাঙ্গালা ভাষার পরেই বটে।

তাই বলিয়া, সকল তন্ত্রই আধুনিক নহে।

উহাদের মধ্যে কোন কোনটী অত্যন্ত প্রাচীন। সে সকলের সবিশেষ বিবরণ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া আমরা তদবধারণে হস্তক্ষেপ করিলাম না।

বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন হইলে তন্ত্রাদির পরেই বোধ হয়, কুলদীপিকাদি গ্রন্থনিচয় বিরচিত হইয়া থাকিবে। পাঁচ হইতে আটশত বৎসর পর্য্যন্ত উহাদের বয়ঃক্রম বলিয়া অনুমান হয়। ঐ সকল গ্রন্থে বংশ বা গ্রাম সম্বন্ধে যে সকল শব্দ পাওয়া যায়, সে গুলির অধিকাংশ সংস্কৃত বা প্রাকৃত নহে। ঐ সময়ে এতদ্দেশে মুসলমানদিগের রাজত্ব হইলেও, তাহাদের অনেক শব্দ আরবিক বা পারসিকও নহে। সে গুলি বোধ হয়, নানা ভাষার সংস্কলনে এমন এক বিসদৃশ আকৃতি গ্রহণ করিয়াছে, যে দর্শন-মাত্রেই তাহাদের জন্ম স্থির করা দুঃসাধ্য। মুখটী, ডিণ্ডী, সাহরী, রাই, পোড়ারি, হড়, গুড়, পর্কটী, কোয়ায়ী, পলশায়ী, ঘোষলী, সেয়ক, বসুয়ারী, লাহিড়ী, ভাদুড়ী, লাউডেন, চম্পটী, ঝম্পটী ইত্যাদি শব্দ গুলির মূলানুসন্ধান হওয়া একেবারেই অসম্ভব। অধিকন্তু, ভট্টনারায়ণাদির সঙ্গে দশরথাদি যে পাঁচজন ভৃত্য আসিয়াছিল, তাহাদের উপাধি বসু, ঘোষ, গুহ মিত্র ও দত্ত এই শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দ হইলেও কিরূপে কুলবাচক হইল, তাহাই বিস্ময়াবহ। আবার যে দেশ হইতে তাহারা ঐ সকল উপাধি লইয়া আসিয়াছিল, সে দেশে কোনও কালে ঐরূপ উপাধি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য মনে হয়, যে হয়ত উহারা এদেশে আসিয়া ঐ সকল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে; তৎপরে কুলদীপিকাদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। কুলদীপিকার রচনা অবিকল বাঙ্গালা। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥

আমরা যেমন বাঙ্গালায় 'দশরথ বসু' বলিয়া থাকি, এখানে সংস্কৃতেও ঠিক তদ্রূপ লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃততে 'দশরথবসুঃ' ইত্যাদিরূপ একপদ না হইলে অর্থান্তর ঘটিতে পারে। এইরূপ ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ, বিরাটীখ্যো গুহকঃ, বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ, দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ ইত্যাদি সর্ব্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন পদ লিখিত হইয়াছে। এগুলিকে বাঙ্গালার নকল বলিয়াই মনে হয়; এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার বাল্যাবস্থা অতীত হইয়াছে।

বল্লাল সেনের সময়ে বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপ্রদত্ত তাম্রফলক সকল দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে, যেন অক্ষরগুলি দেবনাগর ও বাঙ্গালার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। বাস্তবিক উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বঙ্গীয় ভাষা ও বর্ণমালার জাতকরণ ও নামকরণ হইয়াছে। অন্নপ্রাশনাদি অন্য সংস্কার হয় নাই। বল্লালের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে নানাবিধ মতান্তর থাকিলেও আট শত হইতে নয় শত বৎসরের ন্যূন বা অধিক কথনই নহে। ইহারও তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভাষার জন্ম হইলে, এক্ষণে উহার বয়ঃক্রম বারশত কি তেরশত বৎসর হইবে। ইহাতে হিন্দীর দুই তিন বৎসর পরবর্ত্তীও হইয়া পড়িতেছে। ফাহিআননামা চীনদেশীয় পরিব্রাজক ভ্রমণব্যপদেশে ভারত ভ্রমণ করিতে করিতে তৎকালে বাঙ্গালায় মাগধী প্রাকৃত প্রচলিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ষোলশত বৎসর পূর্ব্বে ফাহিআন এতদ্দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহার দুই তিনশত বৎসর পরে বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তিতে কোন সন্দেহ থাকেনা। অতএব বঙ্গীয় ভাষার বয়ঃক্রম বারশত কি তেরশত বৎসর। আমরা অক্ষর সাম্য প্রদর্শনকালে বল্লালীয় তাম্রফলকস্থ অক্ষর সকলের অবয়বের নিদর্শন অত্যল্প পরিমাণে প্রদান করিতে ত্রুটি করিবনা।

হোএন থসাঙ্ নামক আর এক চৈনিক পরিব্রাজ্ সপ্তম খৃষ্টাব্দে ভারতভূমে ভ্রমণ করিতে আইসেন। তিনি কামরূপ ও তৎসন্নিহিত স্থান সকলের ভাষা মধ্য ভারতের ভাষা হইতে বিভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভাষাকে আমাদের আসামী ভাষা বলিয়া মনে হয়। আসামী ভাষা বাঙ্গালার পরবর্ত্তী; এবং বাঙ্গালার উপাদানেই উহার জন্ম। সুতরাং হোএন থসাঙের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার সত্তায় আর কোনও সন্দেহ থাকিল না। অধিকন্তু, তিনি উড়িষ্যার বিষয়েও লিখিয়াছেন, যে, তথাকার ভাষা মধ্য ভারতের ভাষা হইতে বিভিন্ন। তৎকালে মধ্য ভারতে হিন্দী ও উড়িষ্যায় উৎকল ভাষার বেশ চলন হইয়াছে; সুতরাং উভয় ভাষা যে বিভিন্ন হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কিছুই নাই। বঙ্গদেশের ভাষাকেও তিনি ঐরূপ মধ্যভারতের ভাষা হইতে বিভিন্ন বলিয়াছেন। সেই সময়ের বঙ্গ এক্ষণকার বঙ্গের সীমানুরূপ না হইলেও বর্ত্তমান বঙ্গের কতকটা যে তদন্তর্গত, তাহা ত নিঃসন্দেহ। সুতরাং, তাঁহার ভাষাকেও বঙ্গীয় ভাষা বলায় কোন দোষ সংঘটন হয় না। অতএব, তাঁহার সময়ে বঙ্গ ভাষার জন্ম হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার সংগঠন।

যে যে ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই আমরা বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে কিরূপে ঐ সকল ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষা সংগঠিত হইল, অতঃপর তাহাই বিবৃত হইবে। ভূরি ভূরি সংস্কৃত শব্দেরই বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার দেখা যায়; তজ্জন্য সেই সকল শব্দের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। তবে প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ শব্দ আমাদের ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট, পশ্চাল্লিখিত শব্দ নিচয় তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইল।

প্রাকৃত	বাঙ্গালা
সেজ্জা	সেজ
মউড়	মৌড়
বউল	বৌল বা মৌল
মউর	মৌর
লোণ	লোণ বা নুন
মহু	মৌ
সিয়াল	শিয়াল বা শ্যাল
গব্ভিণী	গাভিন
পুত্ত	পুত
পল্লাণ	পালান
ছার	ছার
মজ্ঝ	মাঝ
মিচ্ছা	মিছা
বম্হণ	বামন
তেল	তেল
পাস	পাশ
মাআ	মা
মোদ্গার	মুগুর
অম্ব	আঁব
বগ	বগ
জেথু	যেথা
ইথু	এথা
হলদ্দা	হলুদ
লট্বী	লাঠি
ছ	ছ বা ছয়
ণঙ্গল	নাঙ্গল
দুদ্ধ	দুধ
মসান	মশান
সরিস	সরিসা
আঅরিস	আরসি
রূপ্প	রূপ, রূপা
তম্ব	তাঁবা
পনরহ	পনর

প্রাকৃত	বাঙ্গালা
মচ্ছি	মাছি
কজ্জ	কাজ
পচ্চিম	পশ্চিম
গম্ভর	গভর
দাঢ়া	দাড়া
মাস	মাস
পোথি	পোথি
কাহাবণ	কাহন
কেথু	কোথা

এতদ্ব্যতীত আরও প্রাকৃত অনেক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সে সকলের সংগ্রহ দ্বারা আরও বাহুল্যরূপে তালিকার কলেবর পুষ্টির কোনই আবশ্যক নাই। অতঃপর প্রাকৃত কোন্ কোন্ ধাতু বাঙ্গালায় প্রচলিত, তাহাই প্রদর্শন করা যাইতেছে।

প্রাকৃত	বাঙ্গালা
চিণ	চেনা
ছিন্দ	ছেঁড়া
বুঢ	বাড়া
ণচ্চ	নাচা
বুজ্ঝ	বোঝা
সক্ক	সকা (হিন্দী)।
ধুণ	ধোনা
শুণ	শোনা
জাণ	জানা
কর	করা
লগগ	লাগা
যুজঝ	যোঝা
পুচ্ছ	পুছা
ফুট	ফোটা
গাঅ	গাওয়া
থাঅ	থাকা
পড়	পড়া

প্রাকৃত	বাঙ্গালা
পঢ়	(বই)পড়া
মল	মলা
বুড্ড	বোড়া
হো	হওয়া
কিণ	কেনা
বেড	বেড়া
খা	খাওয়া

কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত মস্জ ধাতুর স্থানে প্রাকৃতে 'ডুব্ব'ও হয়; তাহা হইতেই আমাদের 'ডোবা' হইয়াছে। এইরূপ 'ঢক্ক' হইতে ঢাকা'। 'ছিন্ন' হইতে 'ছিণান'। 'বিচ্চে' হইতে 'বেচা' 'জল্প' হইতে 'জপা', 'বোল্ল' হইতে বলা; 'দেখখ্' হইতে 'দেখা'। আমরা পূর্ব্বোক্ত ধাতুগুলির কোন কোনটী প্রাকৃত গ্রন্থে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বটে, তথাপি আমাদের ধারণা যে, উহারা হিন্দীতেই ঐরূপ রূপান্তর লাভ করিয়া থাকিবে। প্রাকৃতে নহে। প্রাকৃতে দৃশ ধাতুর স্থানে 'পেক্খ' ও ব্রূ ধাতুর 'ভণ' আদেশই দেখা যায়। 'দেখ্খই' বা 'বোল্লই' ইত্যাদি একেবারেই বিরল-প্রচার ও অপ্রচলিত। তজ্জন্য আমাদের অনুমান ব্রূ ধাতুর স্থানে 'বোল' এবং 'দৃশ' ও 'প্রেক্ষ' ইহাদের একৈক কি উভয় স্থানে 'দেখ' হওয়া হিন্দীতেই ঘটিয়া থাকিবে। এবংবিধ আরও অনেক সংস্কৃত ধাতু হিন্দীতে রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশলাভ করিয়াছে, যথাযোগ্য স্থলে তাহাও আমরা প্রদর্শন করিব।

প্রাকৃত ও পালী প্রকৃত পক্ষে একই। পালী প্রাকৃতেরই ভেদ মাত্র। অনেকে ইহাকে প্রাকৃতের মাগধী শাখার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু, মাগধী প্রাকৃত ও পালীতে কতকটা পার্থক্য আছে; তৎসমুদায় এই স্থানেই উল্লিখিত হইতেছে।

মাগধী প্রাকৃত বিষয়ে সংক্ষিপ্তসারের সূত্র—

মাগধ্যাং যলোঃ শঃ।৮।৮৬।

অর্থাৎ,মাগধীতে মূর্দ্ধণ্য ষ ও দন্ত্য স স্থানে তালব্য শ হয়। যথা, লোশ (রোষ), শাহু (সাধু)।

এখানে উভয় উদাহরণেই শকার হইয়াছে, কিন্তু, পালীতে অনেকস্থলেই প্রাকৃতবৎ দন্ত্য সকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, সব্ব (সর্ব্ব) সগগ (সর্গ), সনেহ (স্নেহ)। ইত্যাদিস্থলে পালীতে মাগধীবৎ কার্য্য হয় নাই।

মাগধীর অন্য সূত্র এই—

রো লঃ ৮।৮৭

অর্থাৎ র স্থানে ল হয়; যথা, মহালাঅ (মহারাজ); চলনং (চরণং)

পালীতে সর্ব্বত্র এ সূত্রানুযায়ী কার্য্য হয় না! যথা, রুক্খ (রূক্ষ), রাআ (রাজা)।

মাগধীর আর একটী সূত্র এই—

চিট্টঃ স্থঃ। ৮।৯৫।

অর্থাৎ স্থা ধাতুর স্থানে চিট্ট আদেশ হয়। যথা, চিট্টদু। প্রাকৃত ও পালীতে 'ঠাঅ' আদেশই দেখা যায়। তদ্ভিন্ন প্রাকৃতে পঞ্চমী স্থানীয় 'ওস্' স্থানে 'দো' 'ইদু' ও 'হি' হয়। মাগধীতে 'ডসো হং' ইত্যাদি সূত্রে 'ডস' স্থানে 'হং' হইবার বিধি আছে। যথা, বম্ভণাহং (ব্রাহ্মণাৎ) পালীতে 'হং' হয় না। বরং প্রাকৃতানুযায়ী দো, ইদু প্রভৃতিই হইয়া থাকে। এবম্বাদিক দুই একস্থলে পালী ও মাগধীতে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়; তাহা হইলেও আমাদের ধারণা, যে, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, দ্রাবিড়ী, অবন্তিকা প্রভৃতি শাখা মধ্যে সামান্যরূপ যে যে বিভিন্নতা আছে, সে গুলি হয়ত কথোপকথনাদিতে ধর্ত্তব্যমধ্যে আসিত না। কেবল ব্যাকরণাদিতেই বিধিবদ্ধ হইয়া থাকিত মাত্র। যাহা হউক, পালীকে মাগধী প্রাকৃত বলিতে আমাদের বিশিষ্ট আপত্তি নাই।

যখন পালী মাগধী প্রাকৃত বলিয়াই পরিগণিত হইল, তখন প্রাকৃত সম্ভব বাক্যনিচয়ই যে উহার উপাদান, তাহা বলা বাহুল্য। প্রাকৃত ও পালীর শব্দ নিচয় প্রায়ই এক, দৈবাৎ কোথাও কোথাও সকার, ণকার ও অন্যান্য বর্ণে কিছু কিছু ইতর বিশেষ দেখা যায়। নিম্নলিখিত শব্দ সকলের উপর দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠকবর্গ উহাদের একতা অনুধাবন করিতে পারিবেন।

পালী	প্রাকৃত
ইত্থি	ইত্থী
দিট্ঠি	দিট্ঠি
রুক্খ	রুক্খ
খেম	খেম
খন	খণ
সেট্ঠ	সেট্ঠ
সব্ব	সব্ব
অজ্জ	অজ্জ
পুত্ত	পুত্ত
অবিজ্জা	অবিজ্জা
মজ্ঝ	মজ্ঝ
বিজ্জুমা	বিজ্জুলী
গত্ত	গত্ত
নচ্চ	ণচ্চ
পোক্খর	পোক্খর
পক্ক	পক্ক
সিনেহ	সিনেহ
সগ্গ	সগ্গ
ঞাতম্	ণাতম্
পুপ্ফং	পুপ্ফং
ঠানানি	ঠাণাণি
হিরী	হিরী
মচ্ছ	মচ্ছ
তুন্হীং	তুন্হীং

পালীর পঠমো, দুতিয়ো, চত্থারো, একাদস, তেরস, চতুদ্দস, পন্নরস, সোলস ইত্যাদি শব্দ সকল যে সংস্কৃত ভাঙ্গা তাহা পাঠ মাত্রেই বুঝা যায়। উহা হইতেই হিন্দীর তেরহ, চোদ্দহ, পন্নরহ, ষোলহ উৎপন্ন, এবং তাহা হইতেই আমাদের তের, চৌদ্দ, পনর, ষোল হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। আর মারহাটী গুজরাটী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, মৈথিলী, ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষা সকল প্রকৃত হিন্দী হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হওয়াতে শব্দ সকলেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু, উহারা কোন কোন কালে এবং কোন্ কোন্ ভাষায় তাদৃক্ ব্যতিক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী শব্দ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। পালী চতুদ্দস হইতে প্রথমত চউদ্দস, তৎপরে চোদ্দস, তাহা হইতে চৌদ্দহ হইয়া সর্ব্বশেষে চৌদ্দ হইয়াছে; নতুবা পালী চতুদ্দস হইতে যে হিন্দী চৌদ্দহ হইয়াছে ইহা সম্ভবপর নহে। মধ্যে অন্য কোথাও চউদ্দস ও চোদ্দস হইয়াছিল, তাহাতে আদৌ সন্দেহ থাকিতে পারে না। তদ্রূপ সংস্কৃত হরিদ্রা হইতে প্রথমত হরিদ্দা, পরে তৎপরে হরদ্দা, তাহা হইতে হলদ্দা ক্রমে হলুদা হইয়া সর্ব্বশেষে হলুদ হইয়াছে। নতুবা সংস্কৃত হরিদ্রা হইতে একেবারেই বাঙ্গালা হলুদ হয় নাই। মধ্যে আর কোথাও ঐ রূপ গুলি ছিল। কিন্তু, কোন্ সময়ে এবং কোন্ ভাষায় উহার প্রথম সংঘটন হয়, তন্নির্ণয় একরূপ অসাধ্য। মারহাটী, গুজরাটী প্রভৃতিতে দুই একটী শব্দের তদ্রূপ মধ্যাবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায় বটে, কিন্তু, তদ্দ্বারা একটী শব্দের জন্য এক একটী ভাষার উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গকে বিরক্ত করা অপেক্ষা, তাদৃশ আয়াসকর কার্য্যের অবতারণা না করাই শ্রেয়বোধে ক্ষান্ত হইলাম।

সাহেবগণ পালীকে প্রাকৃতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কল্পনা করেন। শ্বেত ও কৃষ্ণ যেমন বিভিন্ন,—তাঁহাদের ও আমাদের মতও তেমনি বিভিন্ন। যখন স্থান বিশেষের প্রাকৃতই পালীনামে আখ্যাত হইয়াছে, তখন উহাকে প্রাকৃতের সমকালীন বলাই যুক্তিসঙ্গত। পালী নামে কোনও স্বতন্ত্র ভাষা হয় নাই; উহার এবংবিধ নামকরণই বা কোথা হইতে হইল,তাহা সাহেবগণই জানেন। প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে তাহার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। অধিকন্তু,সাহেবগণ গাথা নামে আর একটী ভাষারও উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমরা তাহাতেও সম্মত নহি। গাথা শব্দে কবিতা বিশেষ বুঝায় মাত্র। ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধ গ্রন্থে গাথা সকল যেরূপ সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে, তাহা পুরাণ বা কাব্যাদির সংস্কৃত নহে। উভয়ে প্রভূত বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান। তন্নিবন্ধন শ্বেতাঙ্গ সূরিগণ উহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া থাকেন। আমরা, দেখিতেছি, গাথা স্বতন্ত্র ভাষা নহে। উহা প্রাকৃতেরই অগ্রজ। শব্দের কার্কশ্য ও কাঠিন্য নিবন্ধন প্রাকৃতোচিত বাক্যে যেরূপ সম্প্রসারণ বিশ্লেষণাদি কার্য্য পরিদৃষ্ট হয়, গাথাতেও উহার অন্যথাত্ব ঘটে নাই। অপিচ, গাথাতে বৈদিক ব্যাকরণের নিয়মও অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে কতকগুলি গাথার শব্দ সন্নিবেশিত হইল, তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে,উহারাও একবিধ প্রাকৃত।

সংস্কৃত	গাথা
ধারয়ন্তি	ধারেন্তি
ন.চ	না চ
মায়া	মায়
লভসে	লভে
সদা	সদ
যদা	যদ

সংস্কৃত	গাথা
যথা	যথ
রাত্র্যাঃ	রাত্তিয়ে
গ্লান	গিলান
স্ত্রী	ইত্তি
তুর্য্য	তুরীয়
ক্লেশ	কিলেশ
দেব্যাঃ	দেবিয়ে
০ নির্ম্মলান্	০নির্ম্মলং
আসনাৎ	আসনিনা
উর্দ্ধৌহস্তৌ	উর্দ্ধহস্তা
দদাসি	দদসি
রংস্যসে	রমিষ্যসি
উত্তিষ্ঠ	উত্থি
শৃণু	শুনুহি
ভবিষ্যসি	ভেষ্যি
শ্রুত্বা	শুনিত্য

উল্লিখিত শব্দ সকলের মধ্যে গিলান, তুরীয়, কিলেশ প্রভৃতি শব্দে সম্প্রসারণ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। বিশুদ্ধনির্ম্মলং, আসনিনা প্রভৃতি পদে 'সুপ্তিঙ্‌পগ্রহেত্যাদি' পাণিনীয় বৈদিক সূত্রানুসারে সুপ্‌ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। উর্দ্ধহস্তা স্থলে 'সুপাং সুলুক্' সূত্রের কার্য্য দেখা যাইতেছে; এবং রমিষ্যসি, শুনুহি প্রভৃতিতে প্রাকৃতবৎ কার্য্য প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএব গাথা, প্রাকৃত বা পালী স্বতন্ত্র ভাষা নহে। উহাদের পর ভাষাশব্দের যোগদ্বারা অনেকে প্রাকৃত ভাষা, পালী ভাষা এইরূপ বলিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তত্তৎ স্থলে ভাষা শব্দের অর্থান্তরগ্রহ করিতে হইবে। সাধুভাষা, গ্রাম্যভাষা বলিলে যেমন একটা স্বতন্ত্রভাষার বোধ হয় না, তদ্রূপ এস্থলেও প্রাকৃতভাষা বা পালীভাষা দ্বারা স্বতন্ত্র ভাষা বুঝাইবে না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।

চতুরাশ্রম।

(প্রথম প্রস্তাব।)

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দুজীবনের কোন বিশিষ্ট ছেদ নাই; উহা বিশৃঙ্খলতাময়। জীবন যেমন বিশৃঙ্খল, তৎসংসৃষ্ট কার্য্যকলাপও তদ্রূপ। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই প্রতীয়মান হয়—বিশেষ বর্ত্তমান কালে। কিন্তু তাহা নয়। হিন্দুজীবনের নিমেষমাত্রও অকারণ বিভক্ত নয়। হিন্দুজীবন গর্ভশয্যাহইতে অনন্তশয্যা পর্য্যন্ত স্বভাবের অনুকূলানুযায়ী বিভক্ত। এ কার্য্যে হিন্দু—ঋষিগণের যেরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, বোধ হয় জগতে অপর কোন জাতির তদ্রূপ লক্ষিত হয় না। তাঁহারা সে ভাগ যথোপযুক্তরূপে সজ্জিত করিয়া গিয়াছেন; সে স্তর পরস্পর শৃঙ্খলের ন্যায় গ্রথিত। উহা, অব্যবহিত পরবর্ত্তী গ্রন্থির সহিত দৃঢ় সংলগ্ন; কদাপি শ্লথ বা বিশ্লিষ্ট হইবার নহে—উহাকে লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য নাই—এক-ভাগ অতিক্রম করিয়া অন্যভাগের সহিত সম্মিলিত হইবার উপায় নাই। এই সময়-বিভাগই ইহ পরকালের ক্ষেমঙ্কর। ইহাতেই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কার্য্যে অভিনিবেশ করা যায়, ইহাতেই কার্য্য বিশেষে যথা সময়ে সময় পাওয়া যায়ও কোন কার্য্যে 'সময় নাই" বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয় না। অনন্ত কাল-সাগরে যদিও জীবন বিন্দুমাত্র, কিন্তু তাহাও বিভক্ত হইতে পারে। আর ঐ আয়ুষ্কালই মনুষ্যমেয়।

প্রথমতঃ জীবনকাল ভাগচতুষ্টয়ে বিভক্ত। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য।* ইহাই চতুরাশ্রম। এই আশ্রমচতুষ্টয় ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরাবলীর ন্যায় বিরাজমান ও সজ্জিত। এক সোপান পরিত্যাগ করিয়া সোপানান্তর দুরারোহ ও দুর্গম। ইহা একপদী হইলেও উচ্চ ও প্রশস্ত রাজপথের ন্যায় স্থিত ও জ্ঞানালোকে সর্ব্বদাই উজ্জ্বলীভূত। ইহা সাধারণ পথ, নির্ম্মল ও দোষস্পর্শশূন্য।

ব্রহ্মচর্য্য।

বালকসংগঠন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য এবং সংসার কাননের মূল। এই জন্য শিশুনির্ম্মাণ প্রথম লক্ষ্যস্থল। সহ্য করাইলে এই সার্দ্ধহস্তত্রয়-মিত কলেবরে সকলই সহ্য হয়; এজন্য কোমল বয়সে কঠোর নিয়ম পালন, এই জন্য নবীন দেহে কঠিন আঘাত। এই জন্যই প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্য।

প্রথম ভাগ ব্রহ্মচর্য্য বা গুরুসেবাকাল। এ সেবা অতি দুরূহ, কিন্তু জীবনের সংক্ষিপ্তসার। শৈশবের সংস্কার জীবনান্তে শেষ হয়। এইহেতু মৃতপিণ্ডবৎ শিশুর কিশোর-কোমল দেহে এই সুগুরু ভারার্পণ। সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে বালককে জনক-জননীর স্নেহ-পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সুদূর আবাসে গুরুবাসের মধ্যে প্রেরণ করা হইত। তাহার সহিত দাসদাসী বা অন্য অভিভাবক কেহই থাকিত না। তথায় পিতৃ-ভক্তি গুরুর প্রতি, মাতৃস্নেহ গুরুপত্নীর প্রতি, গৃহাসক্তি গুরুকুটীর ও মঠের প্রতি, সোদর-প্রেম সতীর্থের প্রতি, এবং লোকালয়প্রীতি নিবিড় অটবিভাগে অর্পণ করিয়া ভাবিকালের মঙ্গলের নিমিত্ত জ্ঞানার্জ্জনে তৎপর হইয়া তাহাকে একাগ্রচিত্তে গুরুসেবা করিতে হইত। নিয়তাহারী হইয়া অভিনিবেশ সহকারে স্বকীয় আদিষ্ট পথের অনুসরণ করায়, একাদশ ইন্দ্রিয়, একাদশ দাসের ন্যায় নিয়ত তাহার অনুগত এবং অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, স্নান ও পুষ্পাদি চয়ন উপলক্ষে নির্ম্মল বায়ুসেবনে তাহার দেহ সবল ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিত। ব্রতোপবাস ও পূজার্চ্চনা দ্বারা ভক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইত।

সংসারে যত কিছু অপ্রীতিকর, যত কিছু দুষ্কর, যত কিছু বিঘ্নজনক কার্য্য আছে, সেই সকলের শত আঘাতে সেই নবনীতকোমল মতি সুপরিপক্ব হইত। অতন্দ্রিতভাবে পাঠে অভি-নিবেশ ও আচার্য্যের শুশ্রূষা, যতভাষ ও মিত বাক হইয়া ক্ষুৎপিপাসা, প্রগল্‌ভতা ও অভি-মানসংযম এবং যান-বাহন-বসন-ভূষণ প্রভৃতি হইতে তাহাকে বহুদূরে অবস্থান করিতে হইত। "সর্ব্ববিষয় হইতে মনের সঙ্গহীনতা, স্বাধ্যায়ে একাগ্রতা, সাধুদিগের সহিত সঙ্গ, যথোচিতরূপে সর্ব্বভূতে দয়া, মিত্রতা, বিনয়, শৌচ, স্বধর্ম্মাচরণ, ক্ষমা, বৃথাবাক্যপরিত্যাগ, সর্ব্ববিষয়ে সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্বে সমতা, সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি, ঈশ্বরে দৃষ্টি ও ভক্তি, নির্জ্জনে বাস, গৃহাদির প্রতি অভিমানশূন্যতা, পবিত্র চীরপরিধান, সর্ব্ব-বিষয়েই সন্তোষ, স্বকীয় শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, আর্য্যশাস্ত্রে অনিন্দা, মন, বাক্য ও কর্ম্মের সংযম, সত্য, শম ও দমসম্পন্নতা, হরির গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ ও ধ্যান, নিষ্পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যোগ, দান, তপস্যা, জপ এবং আত্ম ও মহাজনপ্রিয় সদাচার পদ্ধতি অভ্যাস" ইত্যাদি বিষয় অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষা করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত আর যে যে কঠিন নিয়ম তাহার দেহমন

* ১। ৪। মনু। ৭ম অ। হারীত।২২। ১০৬। অযোধ্যাকাণ্ড।

নিষ্পিষ্ট করিত, তাহার দুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ব্রহ্মচারিণাং গুরুকুলবাসঃ। সন্ধ্যাদ্বয়োপাসনম্। কালদ্বয়মভিষেকাগ্নিকর্ম্মকারণম্। অপ্‌সু দণ্ডবন্মজ্জনম্। মেখলাদণ্ডাজিনোপবীতধারণম্। গুরোঃ প্রিয়হিতাচরণম্। গুর্ব্বনুজ্ঞাতভৈক্ষাভ্যবহরণম্। শ্রাদ্ধকৃত লবণ-শুক্তপর্য্যুষিতান্ন-নৃত্য-গীত-স্ত্রী-মধু-মাংসাঞ্জনোচ্ছিষ্ট-প্রাণিহিংসাশ্লীলপরিবর্জ্জনম্"।

২৮অ। বিষ্ণুসংহিতা।

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করিবে, সন্ধ্যাদ্বয়ে উপাসনা করিবে, উভয়কালে স্নান ও অগ্নিতে আহুতি করিবে। দণ্ডের ন্যায় জলে মজ্জন করিবে। মেখলা, দণ্ড, অজিন ও উপবীত ধারণ করিবে; গুরুর প্রিয়হিতাচরণ করিবে। গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু শ্রাদ্ধকৃত লবণ, শুক্ত ও পর্য্যুষিত অন্ন পরিত্যাগ করিবে। নৃত্য, গীত, স্ত্রী, মধু, মাংস, অঞ্জন, উচ্ছিষ্ট, প্রাণিহিংসা, ও অশ্লীলতা পরিত্যাগ করিবে।

"অস্য (গুরোঃ) গতিচেষ্টাভাষিতাদিকং ন অনুকুর্য্যাৎ"।

২৮অ। বিষ্ণুসংহিতা।

গুরুর গমন, চেষ্টা ও বাক্যাদি অনুকরণ করিবে না।

"যদি স্বেচ্ছায় নিদ্রাবশীভূত ব্রহ্মচারীর অজ্ঞাতে সূর্য্যদেব উদিত বা অস্তমিত হন, তবে দিনমাত্র উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিবে"।

২৮অ। বিষ্ণুসংহিতা।

"গুরোঃ কুলে প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
ব্রহ্মচর্য্য মধঃশয্যা * * * ॥
কুর্য্যাদধ্যয়নঞ্চৈব ব্রহ্মচারী যথাবিধি।
বিধিং ছিত্বা প্রকুর্ব্বাণো ন স্বাধ্যায় ফলং লভেৎ॥
শৌচাচারমশেষন্তু শিক্ষয়েদ্‌গুরুসন্নিধৌ।
* * হস্ত্যশ্বারোহণঞ্চৈব সংত্যজেৎ"॥

হারীত।

কায়মনোবাক্যে গুরুকুলের প্রিয়াচরণ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য করিবে এবং অধঃশয্যায় শয়ন করিবে। * * নিয়মানুযায়ী অধ্যয়ন করিবে। বিধিত্যাগ করিয়া পাঠ করিলে তাহাতে কোন ফল দর্শেনা। * * গুরুর নিকট নানাবিধ শৌচাচার অভ্যাস করিবে। * হস্তী-অশ্বাদি আরোহণ ত্যাগ করিবে।

"প্রত্যহ জলপূর্ণ কুম্ভ, কুশ, পুষ্প এবং সমিধ আহরণ করিবে। আবশ্যক হইলে মৃত্তিকাদ্বারা গৃহাদি লেপন করিবে"।

উশনা।

"জিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ সততং বশ্যাত্মাক্রোধনঃ শুচিঃ
প্রযুঞ্জীত সদা বাচং মধুরাং হিতভাষিণীম্॥
অভ্যঙ্গকাঞ্জনোপানচ্ছত্রধারণ মেবচ।
কামং ক্রোধং ভয়ং নিদ্রাং গীতবাদিত্রনর্ত্তনম্॥
দ্যূতং জনপরীবাদং স্ত্রীপ্রেক্ষালাপনং তথা।
* * * * বিবর্জ্জয়েৎ"॥

৩অ। উশনা।

সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয়, আত্মসংযমী, অক্রোধন ও শুচি হইবে। অভ্যঙ্গ, অঞ্জন, উপানৎ ও ছত্র ধারণ, কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা গীত, বাদিত্র, নর্ত্তন, অক্ষক্রীড়া, লোকের নিন্দা, দোষভাবে স্ত্রীলোক দর্শন ও আলাপন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে।

"শৌচারারবিচারার্থং ধর্ম্মশাস্ত্রমপি দ্বিজঃ।
পঠেত গুরুতঃ সম্যক্ * * *"॥

ব্যাস।

দ্বিজ শৌচাচার বিচারার্থ গুরুর নিকট সম্যগ্‌রূপে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে।

"বিদ্বেষ, হিংসা, পৈশুন্য, অকর্দর্শন, উন্মত্ততা

কজ্জলধারণ, আদর্শ, স্রগ্‌বিলেপন, বৃথা ভ্রমণ, অসন্তোষ ও দেহের শোভা পরিত্যাগ করিবে"।

ব্যাস।

"মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে, গুরুর আদেশ লইয়া অলোলুপভাবে সৎলোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া গুরুর আদেশ মতে তাহা ভোজন করিবে। বিপদগ্রস্ত হইলেও ভিক্ষাদ্রব্য ভিন্ন অন্য ধনাদি লইবে না। * * * গুরু শয়ন করিলে শয়ন করিবে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবে"।

ব্যাস।

"ব্রহ্মচারী অধ্যয়নকালে বাক্য, বাহু ও উদরের সংযম করিবে"।

শঙ্খ।

"জিহ্বা, উপস্থ, উদর ও হস্ত সুগুপ্ত হইবে"।

হারীত।

"সম্মানকে বিষের ন্যায় ত্যাগ ও অপমানকে সাদরে গ্রহণ ও অভ্যাস করিবে। নিত্য স্নাত ও শুচি হইয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করিবে, এবং দেবতার পূজা ও সমিধাদি আহরণ করিবে। পরোক্ষেও গুরুর নাম করিবে না। যেখানে তাঁহার নিন্দা বা পরীবাদ হইবে তথায় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া থাকিবে, নতুবা অন্যত্র গমন করিবে"।

২য়। মনু।

"এইরূপ গুরুসেবা করিয়া যিনি গুরুগৃহে চিরজীবন কৌমার অবস্থায় যাপন করেন, তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং যিনি কেশান্তের পর ছাব্বিশ বৎসর এইরূপে অবস্থান করত গৃহমেধী হন, তাঁহাকে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী কহে"।

ব্যাস।

আমরা বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিতে পারিলামনা। সেই সুকুমার দেহে কত অসহ্য আঘাত সহর্ষে ধারণ করিতে হইত, তাহা ভাবিলে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। বালসুলভ চঞ্চল ভাব পরিহার, আহার বিসর্জ্জন, ভিক্ষান্ন-মাত্রে দিনপাত এবং যান-বাহন-বসন-ভূষণ ও সর্ব্ববিধ বিলাসিতা হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতে হইত। স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল কার্য্য সম্পাদিত হইত। তখন বর্ত্তমানের ন্যায় অশ্ব রথ শিবিকারোহণে অপূর্ব্ব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পাঠাভ্যাসের ব্যবস্থা ছিল না। মৃদ্‌বারিতেই দেহ পবিত্র করিত, সুগন্ধ দ্রব্য সে স্থানের ত্রিপ্রান্তে অবস্থান করিতে পারিত না। এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় না থাকিলেও ঐহিক পারমার্থিক জ্ঞানের অসদ্‌ভাব ছিল না। * এই রূপে সেই মনুজশিশুতরু সংসারকাননে ফলোন্মুখ বিটপীতে পরিণত হইত। এইরূপে নিম্নশ্রেণীর পাঠ অভ্যাস করিতে হইত। যে এইরূপ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইত, তদুচ্চ শ্রেণীতে সে কেমন করিয়া উন্নীত হইবে?

শ্রীরামশঙ্কর রায়।

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, পরিষদ্ পূর্ব্বকালের বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারত ইতিহাস।

মেঘদূত।

৫৬

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎসিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ
সঙ্কল্পন্তে স্থিরগণ পদ প্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ॥

মিত্রবর দেখিবে হে হিমগিরি পর
শশাঙ্কশেখর যথা স্থাপিলা চরণ,

আজ(ও) পদচিহ্ন আছে বড় মনোহর ;
যাহার সর্ব্বদা পূজা করে সিদ্ধগণ।
দর্শন করিলে যারে,
অবহেলে সুরপুরে,
মহাপাপী যায় চলি ; সেই সে চরণে
পূজিও হে প্রাণসখে ভক্তিপূর্ণ মনে।

৫৭

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ॥
সকণ্টক বেণুরন্ধ্রে পশিলে পবন
করিবে মধুর রব হিমালয় শিরে ;
কিন্নরীর কণ্ঠসুধা ভেদিয়া গগন
ত্রিপুরবিজয় গীত শুনাবে সুস্বরে।
করি মৃদু গরজন
কাঁপা'য়ে নিবিড় বন,
মুরজার মত ধ্বনি করো মিত্রবর
কন্দরে পশিয়া ; যথা বিরাজে শঙ্কর।

৫৮

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্য্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ॥
হিমালয় প্রান্তদেশে ক্রৌঞ্চগিরি পরে
প্রতিবর্ষে হংসগণ করে হে প্রয়াণ
যে গহ্বর দিয়া, সখে মানসরোবরে,
(পরশুরামের যশ যথা বিদ্যমান)
সুদীর্ঘ শরীর ধ'রে
প্রবেশিও সে গহ্বরে,
বলিতেজঃখর্ব্বকারী বিষ্ণুপদ প্রায়
শরীর ধরিও সখে আমার কথায়।

৫৯

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥
অনন্ত অম্বরে ঊর্দ্ধে করিয়া গমন
দেখিবে কৈলাশ গিরি ; দশানন করে
বিছিন্ন যাহার মূল রয়েছে এখন ;
যাহে সুরবালাগণ প্রতিবিম্ব হেরে।
দেখিয়া তুষার রাশী
মনে হয় হরহাসি
একত্রিত হয়ে যেন শোভে নিরন্তর,
লক্ষ লক্ষ শ্বেত চূড়া ছাইছে অম্বর।

৬০

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃ কৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিত নয়ন প্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব॥
যবে তুমি হে বারিদ করিবে গমন
অমল ধবল শ্বেত হিমালয় শিরে,
বল দেখি কত শোভা ধরিবে তখন
সুনীল তোমার কায়া শ্বেতগিরি পরে ?
বলদেব বীরবর
দেহে যথা নীলাম্বর
মানস মোহিত করে, তুমিও তখন
ধরিবে তেমতি শোভা হে বায়ুবাহন॥

৬১

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী॥
দেখিবে যখন তুমি দেব শূলপাণি
উরগ বলয় ত্যাগ করিয়া যতনে
দিয়াছেন নিজ কর, যে কর ভবানী
সপ্রেমে ধরিয়া সদা ভ্রমে ফুল্ল মনে।
তখন হে জলধর
ধরি দৃঢ় কলেবর
হইও সোপানমালা অতি সযতনে।
দেখো যেন ভবানীর না লাগে চরণে।

৬২

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ধর্ম্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ॥
পাইয়া তথায় তোমা সুরবালাগণ,
সলিল করিয়া সুখে করিবে বিহার।
নিদাঘ বলিয়া কিন্তু যদি হে তখন
না ছাড়ে তোমায় ; তুমি কি করিবে তার ?
করি ভীম গরজন
ভয়েতে আচ্ছন্ন মন
করিও তাদের, আমি বলিনু তোমায়।
ছাড়িবে নিশ্চয়, যদি মনে ভয় পায়।

৬৩

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখ পট প্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্॥
মানসসরেতে সখে করিয়া গমন,
বিহার করিও সুখে উচ্চ হিমালয়ে।
হৈমপদ্ম শালী নীর করিও গ্রহণ,
কাঁপাইও মৃদু কল্পতরুকিশলয়ে।
কভু বা মানসজলে
ছায়া দেখি কুতূহলে
ঐরাবত প্রতিরূপ করিও প্রকাশ ;
কভু বা ঢাকিও ঊর্দ্ধে সুনীল আকাশ।

৬৪

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজাল গ্রথিত মলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্॥
দেখিবে অলকাপুরী সেই গিরি পর,
জাহ্নবী দুকূল সম শরীরে যাহার ;
সপ্ততল গৃহ যার জলধরে ধরে
প্রাবৃটে, আদর ক'রে আপন মাথায়।
মুক্তামালাপ্রায় যার
শোভে সৌধ চারি ধার,
মানস মোহিত হয় যা'র শোভা দেখে,
তারে কি চিনিতে তুমি পারিবেনা সখে ?
পূর্ব্বমেঘ সমাপ্ত।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গে উগ্রক্ষত্রিয়ের সামাজিক আসন।

উচ্চকুলে জন্ম, বিদ্যানুশীলন, সদনুষ্ঠান, সংখ্যাধিক্য, একদেশে বহুকাল ধরিয়া বাস এবং ধনসম্পত্তিই সামাজিক খ্যাতি-প্রতিপত্তির মূলীভূত কারণ। ঐ সকল গুণের ন্যূনাতিরেকে খ্যাতি-প্রতিপত্তিরও ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। ইহা কবিকল্পনা নহে—ঐতিহাসিক সত্য।

অতি প্রাচীনকালে যাবতীয় মনুষ্যই এক বর্ণের অন্তর্গত ছিল, পরে গুণকর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হয়। এ কথার প্রমাণ হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত। মহাভারতের এক স্থলে (বনপর্ব্বে) মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥"

"হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে পৃথিবীতে এক বর্ণ ছিল। পরে কর্ম্ম ক্রিয়ানুসারে চারিবর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

আবার অন্যত্র (ভীষ্মপর্ব্বে-গীতাংশে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন ;—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"।

গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমিই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।

যজুর্ব্বেদেও লিখিত আছে ;—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরুতোঽস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়তঃ।

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্রের জন্ম হইয়াছে।

স্মৃতিকর্ত্তা মনুও বলিয়াছেন ;—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।"

"ব্রহ্মা, ভূলোকাদি বাহুল্যের নিমিত্ত মুখ, বাহু উরু এবং পাদদেশ হইতে যথাক্রমে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতিকে উৎপন্ন করেন।'

উপরিউক্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্লোকগুলির স্থূল অর্থ বিভিন্নরূপ হইলেও ভাবার্থ একই। সামাজিক কার্য্যসৌকর্য্যার্থ গুণকর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ন্যূনাতিরেকে অতি প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি মূল বর্ণে আর্য্য জাতি বিভক্ত হয়।

বহুকাল হইতে ভারতভূমিতে ব্রাহ্মণের বাস, বিবিধ দানমূল যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাগ্রণী, সর্ব্ববিদ্যার সারভূত তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলনে ব্রাহ্মণগণের জীবন বহুকাল ধরিয়া অতিবাহিত, সংখ্যাতেও ব্রাহ্মণের দলই পুষ্ট ; এবং জগতে যাহা কিছু সার সম্পত্তি তৎসমুদয়ই ব্রাহ্মণাধিকৃত। সুতরাং এমতাবস্থায় সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে তাহা আর বিচিত্র কি ? কালের বশে জাতি গৌরব হীনপ্রভ হইলেও এবং ব্রাহ্মণ গণও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে গুণহীন হইয়া পড়িলেও, বহুকাল ধরিয়া তাঁহাদের সমাজে যে আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে, তাহা সহজে লুপ্ত হইবার নহে। যাহাহউক পূর্ব্বোক্ত গুণের তারতম্যানুসারে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের নিম্নেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সামাজিক আসন যথাক্রমে স্থাপিত হইয়াছিল। অদ্যাপিও সে আসন স্থানভ্রষ্ট হয় নাই।

পরে কালক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির পরস্পর সংসর্গে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। এই সঙ্করজাতি অনুলোম-প্রতিলোমভেদে দ্বিবিধ।

পূর্ব্বকালে সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ"॥

মনু। ৩য় অধ্যায়।

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি। তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য। দ্বে বৈশ্যস্য। এক শূদ্রস্য॥

বিষ্ণুসংহিতা ২৪শ অধ্যায়।

"বিপ্রশ্চতস্রো বিন্দেত ভার্য্যাস্তিস্রস্তু ভূমিপঃ।
দ্বে চ বৈশ্যো যথাকামং ভার্য্যেকামপি চান্ত্যজঃ"॥

অগ্নিপুরাণ।

"সবর্ণা বিবাহ প্রশস্ত। তবে ইচ্ছা করিলে, ব্রাহ্মণ যথাক্রমে চারি বর্ণের কন্যা ; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্যা, আর বৈশ্য, বৈশ্যা ও শূদ্রা এবং শূদ্র কেবলমাত্র শূদ্রাই বিবাহ করিবে।" উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় শ্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য।

এইরূপ বিবাহের ফলে যে সকল সন্তানের জন্ম, তাহারাই উচ্চশ্রেণীর অনুলোমজ সঙ্কর জাতির মধ্যে পরিগণিত।

পশ্চাল্লিখিত ছয়টি উচ্চশ্রেণীর অনুলোমজ সঙ্কর জাতি।

১ম মূর্দ্ধাবসিক্ত ..... (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়া)
২য় অম্বষ্ঠ ..... (ব্রাহ্মণ-বৈশ্যা)
৩য় মাহিষ্য ..... (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা)
৪র্থ পারশব ..... (ব্রাহ্মণ-শূদ্রা)
৫ম উগ্রক্ষত্রিয় ..... (ক্ষত্রিয়-শূদ্রা)
৬ষ্ঠ করণ .....(বৈশ্য-শূদ্রা)

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥
বৈশ্যাশূদ্রোস্তু রাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণের ঔরষে ক্ষত্রিয়াগর্ভে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রার গর্ভে নিষাদ বা পারশব জাতির উৎপত্তি। ক্ষত্রিয়ের ঔরষে বৈশ্যাগর্ভে মাহিষ্য এবং শূদ্রাগর্ভে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি। আর বৈশ্যের ঔরষে শূদ্রাগর্ভে করণ জাতির উৎপত্তি"।

ব্যভিচার বা যাদৃচ্ছিক সংসর্গ চিরকালই আছে। ঐরূপ অবৈধ সংসর্গে এখন যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সমাজে স্থান প্রাপ্ত হয় না। প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না। তখন গুপ্ত প্রণয়ের ফলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ঔরষে ক্ষত্রিয়াদি নিম্নবর্ণীয়া নারীর গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিত, তাহারা সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নানা জাতিতে বিভক্ত হওতঃ স্ব স্ব কার্য্যানুসারে সামাজিক আসন পরিগ্রহ করিত। এই সকল জাতিনিচয়ই এক্ষণে নবশায়ক বলিয়া পরিগণিত।

"গোপ মালি তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারজী।
কুম্ভকার কর্ম্মকারশ্চ নাপিত নবশায়ক"॥

গোপ, মালি, তিলি, তাঁতি মোদক, বারুই, কুম্ভকার, ও নাপিত এই কয় জাতি নবশায়ক।

আমাদের কথা সপ্রমাণের নিমিত্ত আমরা ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে নিম্নে একটি বচন উদ্ধৃত করিলাম।

বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকার ইতি স্মৃতঃ
কুলালবৃত্ত্যা জীবেত নাপিতা বা ভবন্ত্যতঃ।

"ব্রাহ্মণ গোপনে বৈশ্যার প্রতি আসক্ত হইয়া তদীয় গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন করেন, তাহারা কুম্ভকার বা নাপিত।"

এই গেল অনুলোম জাতির বিবরণ। নিম্ন জাতীয় পুরুষ উচ্চ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে অবৈধ উপায়ে যে পুত্র উৎপাদন করিত, তাহারাই প্রতিলোম জাতি বলিয়া খ্যাত। সমাজে তাহাদের স্থান বড়ই নিম্ন স্তরে।

মৌলিক জাতির মধ্যে বৈশ্য ও শূদ্র বঙ্গ দেশে অতি বিরল, একরূপ নাই বলিলেও চলে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মানসম্ভ্রম, প্রাধান্যপ্রতিপত্তি সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই সমান ; সুতরাং তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করাই অতিরিক্ত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় পরিত্যাগ করিলেই, বঙ্গদেশে প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বিষয়ে কায়স্থ, (করণ) বৈদ্য, (অম্বষ্ঠ) উগ্রক্ষত্রিয় এবং নবশায়কগণের সামাজিক আসন পর পর স্থাপিত। সত্য কথা বলিতে গেলে প্রসিদ্ধি বিষয়ে বোধ হয় উগ্রক্ষত্রিয়কেই সর্ব্ব নিম্নে দাঁড়াইতে হয়। জাতি অনুসারে বিচার করিতে গেলে উগ্রক্ষত্রিয়ের আসন দ্বিতীয় স্থানীয় হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু অপরাপর গুণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র জাতিগত উচ্চতায় কোন জাতি সামাজিক শ্রেষ্ঠাসন প্রাপ্ত হইতে পারেনা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, বিদ্যানুশীলন, সদনুষ্ঠান ধনসম্পত্তি এবং সংখ্যাধিক্যই জাতীয় প্রতিপত্তি বিস্তারের মূলীভূত কারণ। বঙ্গদেশে ঐ সকল

গুণে উগ্রক্ষত্রিয়জাতি বৈদ্য ও কায়স্থ অপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূন বলিয়া উহাদের নিম্নে অবস্থিতি করিতেছে।

(১)কায়স্থ ও বৈদ্যগণ বহুকাল হইতে বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন; উগ্রক্ষত্রিয়গণ কেবল মাত্র তিন শত বৎসর (১) এ দেশের অধিবাসী হইয়াছেন। বসতিকালের প্রাচীনতায়, সুতরাং, উগ্রক্ষত্রিয়েরা বৈদ্য ও কায়স্থ অপেক্ষা অনেক আধুনিক। প্রাচীন অপেক্ষা আধুনিকের প্রসিদ্ধি সম্ভবপর নহে।

(২) বৈদ্য ও কায়স্থজাতির বৃত্তি, চিকিৎসা ও চাকুরী। সুতরাং তাঁহারা বহুকাল হইতে অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলনে রত থাকিয়া আপনাদের অবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উগ্রক্ষত্রিয়গণের জাতীয় বৃত্তি যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্য (২) (ইহাঁরা পিতৃমাতৃ উভয় বৃত্তিই অবলম্বী)। উগ্রক্ষত্রিয়গণ, বঙ্গদেশে আসিয়াও অনেকদিন পর্য্যন্ত যে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সমরবিভাগীয় "উপাধি" এবং দেশীয় রাজাগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত "জাইগীর" তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে স্বাধীনতামূলক যুদ্ধ ও কৃষি-বিদ্যার মর্য্যাদা অপেক্ষা অধীনতামূলক দাসত্ব লাভের উপায় অর্থকরী বিদ্যার গৌরব অধিক। তাহার প্রমাণ, আজকাল যিনি দু কথা লিখিতে পারেন বা দুকথা কহিতে পারেন, তাঁহারই নাম চারিদিকে প্রথিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ অদ্বিতীয় বঙ্গবীর দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কয়জনে অবগত আছেন? যদি তিনি মাসিকপত্র "জন্মভূমিতে "আমার জীবনচরিত" নামক প্রবন্ধে আত্মপরিচয় প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে কয়জন লোক তাঁহার নাম অবগত হইতে পারিত? তাই বলিতেছিলাম, বঙ্গদেশে স্বাধীনতার আদর নাই, এ দেশে একজন প্রসিদ্ধ কৃষিব্যবসায়ী অপেক্ষা একজন সামান্য কেরাণীর মান অধিক (৩)। রাজপুতানার স্বাধীনতাপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ অদ্যাবধিও অর্থকরী বিদ্যাভ্যাসে বিরত। ক্ষত্রিয় সন্তান উগ্রক্ষত্রিয় যদিও মাতৃদোষে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা জাত্যংশে হীন, কিন্তু স্বাধীনতা, তেজস্বিতা ও আত্মমর্য্যাদাসংরক্ষণে পিতা অপেক্ষা কোন অংশে পশ্চাৎপদ নহে। যাঁহারা কোন না কোন প্রকারে উগ্রক্ষত্রিয়ের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের কথার সত্যাসত্য বিচার করিয়া দেখিবেন। যে সময়ে কায়স্থ ও

(১) "রাজা মানসিংহ বাং ১০০১ সালে পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য উগ্রক্ষত্রিয় সৈন্য সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমন করেন। বর্দ্ধমানের দক্ষিণাংশে মোড়লমাড়ীতে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কতকগুলি সৈনিক পুরুষকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া যান। তাহারাই এতদ্দেশীয় উগ্রক্ষত্রিয়গণের আদি পুরুষ, সেই অবধি বাঙ্গালাদেশে উগ্রক্ষত্রিয়দিগের বসবাস"।

উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ।

(২) "উগ্রো যুদ্ধক্রিয়াবৃত্তিঃ।"

হলায়ুধকৃত অভিধানসর্ব্বস্ব।

"বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সদা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্য শিল্পকান্।"

২য় অধ্যায়, পরাশরসংহিতা।

(৩) কৃষিবৃত্তিতে যে কেবলই স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, তাহা নহে. সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে ধনাগমের নিমিত্ত যতগুলি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে কৃষিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পরপদলাঞ্ছিত মসীজীবী কেরাণী বাবুরা আমাদের কথায় বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের অবতারণা করিবেন জানিয়াই, তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য আমরা ভীষকরাজ চরকঋষির মত নিম্নে প্রদান করিলাম। "কৃষিকার্য্য দ্বারা যে ধনের আগম হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পশুপালন দ্বারা যে উপার্জ্জিত হয়, তাহাও উৎকৃষ্ট। বাণিজ্য দ্বারা যে ধন আইসে, তাহাও মন্দ নহে। রাজসেবা অর্থাৎ রাজার আশ্রয়ে চাকুরী দ্বারা যে উপার্জ্জিত হয় তাহাই সর্ব্ব নিকৃষ্ট।"

বৈদ্যগণ অর্থকরী বিদ্যায় সম্যকরূপে পারদর্শী হইয়া বঙ্গদেশোচিত মানসম্ভ্রমের দিব্য মাল্য নলদেশে ধারণ করিয়া শোভিত হইতেছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গবিজয় উপলক্ষে কতকগুলি স্বাধীনতা ও তেজস্বিতার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ উগ্রপ্রকৃতি উগ্রক্ষত্রিয় যোদ্ধৃবেশে এ দেশে আগমন করিয়া, স্বীয় স্বভাবসুলভ স্বাধীনতামূলক সৈনিক ও কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করতঃ বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন যুদ্ধের পরিবর্ত্তে দেশে শান্তিসংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উগ্রক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বনের সুযোগ ফুরাইয়া আসিল, তখন তাঁহাদের, স্বাধীনতা রক্ষার এক মাত্র উপায় কৃষিবৃত্তিই অবশিষ্ট রহিল। দেশের গুণে ও কালমাহাত্ম্যে উগ্রক্ষত্রিয়গণ মানের ভিখারী হইয়া পড়িলেন; দেশ এবং কালোচিত শিক্ষা উগ্রক্ষত্রিয়গণের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বিদ্যানুশীলনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অন্তঃকরণে বিপুল আনন্দের উদ্রেক হয়। কিন্তু হইলে হইবে কি, কায়স্থ ও বৈদ্যের সমকক্ষ হইতে এখনও অনেক দিন বাকী। ইহাও বঙ্গে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির সামাজিক অপ্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ।

(৩) বৈদ্য ও কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয় অপেক্ষা বহুগুণে সংখ্যায় অধিক এবং বঙ্গের সকল জেলাতেই উক্ত জাতিদ্বয়ের বাস। উগ্রক্ষত্রিয়, বৈদ্য ও কায়স্থ অপেক্ষা সংখ্যায় স্বল্পপরিমিত, এবং অন্যান্য জেলাতে ২/১০ ঘর থাকিলেও বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও হুগলী এই পাঁচটী জেলাই এই জাতির প্রধান বাসস্থল। সুতরাং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র উগ্রক্ষত্রিয় জাতির প্রসিদ্ধি সম্ভবেনা।

(৪) শাস্ত্রে যেমন সকল জাতির বিবরণ আছে, উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বিবরণও সেইরূপ আছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় গ্রন্থের পাঠক কয়জন? নানা জাতীয় ইতিহাসে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির বিবরণ যেরূপ সঙ্কলিত হইয়াছে, উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সেরূপ হয় নাই। হিন্দিভাষার "আগ্‌রাই" নামক পুস্তকে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির উৎপত্তির ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে (৪)। কিন্তু ঐ পুস্তক বঙ্গদেশের কয়জন পাঠ করিয়াছেন বা উহার নাম শ্রবণ করিয়াছেন? এক আগ্-

(৪) "চন্দ্রসেন নামে এক চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা অগ্রবনে (আগ্‌রা) বাস করিতেন। সত্যশীল নামে এক ধনাঢ্য শূদ্রও ঐ নগরে বসতি করিতেন। সত্যশীলের চিত্রাঙ্গদা নাম্নী পরম রূপবতী এক দুহিতা ছিল। রাজা চন্দ্রসেন একদিন ঐ কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া সত্যশীলের নিকট ঐ কন্যা প্রার্থনা করেন। তাহাতে সত্যশীল বলেন যে, যদি মহারাজ, রাজপুরোহিত ও বহুতর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সহ আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া আমার কন্যার যথারীতি পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে, আপনাকে আমি এই কন্যা দান করিতে পারি। রাজা সম্মত হইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিলেন। কালক্রমে রাজার ঔরষে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে দুইটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বীরেন্দ্র ও কনিষ্ঠের নাম মহাবীরেন্দ্র। বীরেন্দ্রের বংশসম্ভূত অনেকেই বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেছেন, আর মহা বীরেন্দ্রের বংশধরগণ ও বীরেন্দ্রের বংশ সম্ভূত অন্যান্য সকলে এক্ষণে আগ্‌রা অঞ্চলে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও বসতি করিতেছেন। হিন্দি ভাষার আগ্‌রাই পুস্তকের ৫৩ পৃষ্ঠা)"।

উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ।

রাই পুস্তক কেন, অধ্যবসায় ও গবেষণা সহকারে হিন্দু ও পারস্য ভাষার গ্রন্থনিচয় এবং প্রাচীন রাজসংসারের "দপ্তরখানা" অন্বেষণ করিলে উগ্রক্ষত্রির জাতির অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। (৫)যে কাল পর্য্যন্ত জাতীয় ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়া সাধারণের চক্ষুগোচর না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত উগ্রক্ষত্রিয়জাতির সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ ঘটবে না। (৬)। ইতিবৃত্তাভাব উগ্রক্ষত্রিয় জাতির পরিচয়-হীনতার একটী কারণ।

৫। উগ্রক্ষত্রিয়জাতির সামাজিক আচার ব্যবহার, বঙ্গদেশে আসিয়া, অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইলেও, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি যে সকল সদাচারগুণে এবং দান-ধ্যান-অতিথি-সেবা প্রভৃতি সৎকার্য্যে উচ্চ জাতি বলিয়া সম্মানিত, উগ্রক্ষত্রিয়জাতি সে সকল সদাচার ও সৎক্রিয়াবিবর্জ্জিত না হইলেও, সাধারণ সদনুষ্ঠানে (বিদ্যা ও চিকিৎসালয়সংস্থাপন, বিদ্যোৎসাহপ্রদানের নিমিত্ত বৃত্তিপ্রদান, অনাথ-আশ্রম-প্রতিষ্ঠা, দীন-দরিদ্র-অন্ধ-খঞ্জ, দুর্ভিক্ষপীড়িত ও নিরাশ্রয় বিধবাকুলের নিমিত্ত বৃত্তিভাণ্ডারস্থাপন, তীর্থক্ষেত্রে অথিতিসেবার বন্দোবস্ত প্রভৃতি) ব্রাহ্মণাদি জাতি অপেক্ষা বহুলাংশে পশ্চাৎপদ।

(৬) যদিও উগ্রক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে অনেক জমিদার,মহাজন,ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী রহিয়াছেন, এবং দিন দিন ইঁহাদের মধ্যে ধনবানের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির সহিত ধনবিষয়ে উগ্রক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ হইতে এখনও বহুবিলম্ব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বহুদিন হইতে কায়স্থ ও বৈদ্যগণ অর্থকরী বিদ্যাদ্বারা বিপুল ধনসঞ্চয় করিয়া আপনাদের আর্থিক অবস্থা সম্যক্-প্রকারে উন্নত করিয়াছেন। উগ্রক্ষত্রিয়েরা একেত অল্পদিন এদেশে আসিয়াছেন, তার পর

(৫) রাজপুতানার পলিটিকেল এজেণ্ট স্বনামখ্যাত মহাত্মা কর্ণেল টডের অসাধারণ অধ্যবসায়, অলৌকিক গবেষণা ও অজস্র অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে, বোধহয়, ইদানীন্তন কালের ক্ষত্রিয়জাতির ইতিবৃত্ত "রাজস্থান" সঙ্কলিত হইত কিনা সন্দেহ। যদি কোন দ্বিতীয় টড্ উগ্রক্ষত্রিয়দিগের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে লেখনী ধারণ করিতেন, তাহা হইলে তাহাদেরও ইতিবৃত্ত যে সংগৃহীত হইত না এরূপ নহে। উগ্রক্ষত্রিয়দিগের ভাগ্যে দ্বিতীয় টড্ না মিলিতে পারে, কিন্তু টডের ন্যায় অধ্যবসায়-অনুসন্ধিৎসা থাকিলে এবং সেরূপ ভাবে অর্থ ব্যয়িত হইলে, অবশ্যই উগ্রক্ষত্রিয়জাতির ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে। কিন্তু উগ্রক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সেরূপ অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসাই বা কার আছে আর সেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতেই বা কয়জন মুক্তহস্ত? জাতীয় পত্র "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি", উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে বটে,কিন্তু প্রতিনিধির আজিও এমন অর্থ হয় নাই যে, নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া এই সুমহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সময় হইলে এবং জীবিত থাকিলে, প্রতিনিধি অবশ্যই একদিন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইবে।

(৬) আমাদের এ কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। "উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ" নামক উগ্রক্ষত্রিয়জাতির শাস্ত্রীয় ইতিবৃত্ত এবং জাতীয় সমিতির মুখপত্র "উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি" দ্বারা ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতির সমাজে কয়েক বৎসরের মধ্যে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির খ্যাতি অনেক পরিমাণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহা বোধহয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

তাঁহাদিগকে অনেকদিন যাবত কেবলমাত্র কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল এবং এখনও উগ্রক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়াই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য জাতির লোকেরা যেমন সামান্য লেখাপড়া শিখিলেই চাকুরীর জন্য লালাইত হইয়া দেশত্যাগী হয়—অধীনতা-শৃঙ্খল গলদেশে করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে, উগ্রক্ষত্রিয়জাতির প্রকৃতি সেরূপ নহে। যদি কৃষিব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের উপায় থাকে, তবে ইহারা লেখাপড়া শিখিয়াও, চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না। স্বাধীনতাপ্রিয়তাই ইহার একমাত্র কারণ। কারণ যাহাই হউক,উগ্রক্ষত্রিয়জাতির ধনাভাব কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক। সাধারণ সদনুষ্ঠান যে উগ্রক্ষত্রিয় দ্বারা সচরাচর অনুষ্ঠিত হয় না, ইহাদের ধনাভাবই তাহার প্রধান কারণ। যাহা হউক অর্থ এবং অর্থের সদ্ব্যবহার ব্যতীত সাংসারিকের সামাজিক খ্যাতি-প্রতিপত্তিলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যে সকল কারণে উগ্রক্ষত্রিয়গণ বঙ্গদেশে জাত্যনুরূপ সামাজিক আসন প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার উল্লেখ করা গেল। উগ্রক্ষত্রিয়জাতির ক্রমোন্নতি দেখিয়া আশা হয়,সামাজিক প্রাধান্য-প্রতিপত্তি ও প্রসিদ্ধি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ইহাঁদের আসন আপেক্ষাকৃত উচ্চতর সোপানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। উগ্রক্ষত্রিয়জাতির কথা যখন গ্রন্থগত হইয়া সাধারণের শ্রুতিগোচর হইতে চলিয়াছে, বৎসর বৎসর যখন উগ্রক্ষত্রিয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, শিক্ষাস্রোত খরতর-বেগে প্রবাহিত হওয়ায়, যখন উগ্রক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বর্ষে বর্ষে বাড়িয়া উঠিতেছে, বাণিজ্য-ব্যবসায়-চাকুরী প্রভৃতি উপায় দ্বারা যখন উগ্রক্ষত্রিয়জাতির ধনাভাব ক্রমশঃ ঘুচিয়া আসিতেছে এবং বসতি বিষয়েও যখন দিন দিন প্রাচীনত্ব জন্মিতেছে, তখন আমাদের আশা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু আমাদের আশা অসঙ্গত না হইলেও, সাধারণ সদনুষ্ঠান ব্যতিরেকে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির অপ্রসিদ্ধি সহসা ঘুচিবে না।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী সামন্ত মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতিনিধিতে "উগ্রক্ষত্রিয়-বিধবা-বৃত্তিভাণ্ডার" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত বৃত্তিভাণ্ডার সংস্থাপনের নিমিত্ত উগ্রক্ষত্রিয়গণকে আহ্বান করিয়াছেন। সুবিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়ান মিরারের" সম্পাদক সে বিষয় স্বীয় পত্রে উল্লেখ করিয়া প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধলেখক ও উগ্রক্ষত্রিয় সাধারণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কি শিক্ষিত কি ধনী, কোন শ্রেণীর উগ্রক্ষত্রিয়কে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে না দেখিয়া আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। আমরাও প্রবন্ধ লেখকের সহিত উগ্রক্ষত্রিয়সাধারণকে উক্ত সাধু অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতেছি। যে সকল মহদনুষ্ঠানের উপর উগ্রক্ষত্রিয়জাতির খ্যাতি-প্রতিপত্তি নির্ভর করিতেছে, তন্মধ্যে "উগ্রক্ষত্রিয়-বিধবা-বৃত্তি-ভাণ্ডার" সংস্থাপন একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। মহারাজ যতীন্দ্রনাথ, এই বিধবা-বৃত্তি-ভাণ্ডার সংস্থপন করিয়া ইহপরকালের নিমিত্ত আপনার অক্ষয় যশ ও পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গেলেন। বর্ত্তমান সময়ে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে যেরূপ ধনশালী লোক রহিয়াছেন, তাহাতে দশ সহস্র টাকা মূলধনে এই বৃত্তিভাণ্ডার সংস্থাপিত হওয়া

বড় গুরুতর কথা নহে। ইচ্ছা করিলে দুই চারিজন উগ্রক্ষত্রিয়ই অক্লেশে এই সুমহৎ কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে পারেন।

তাই বলিতেছি, মাননীয় উগ্রক্ষত্রিয়গণ! কেবল উচ্চকুলে জন্ম বলিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিলে কোন ফল দর্শিবে না; যদি বঙ্গদেশে বংশানুরূপ সম্ভ্রমপ্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ থাকে, যদি বঙ্গের সর্ব্বত্র স্বীয় নাম সুপ্রথিত করিয়া উচ্চতর সোপানে সামাজিক আসন স্থাপন করিবার ইচ্ছা হয়,তবে অনতিবিলম্বে "উগ্রক্ষত্রিয়-বিধবা-বৃত্তিভাণ্ডার" সংস্থাপনে উদ্যোগী হউন এবং পর পর এবংবিধ সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে রত থাকুন। তাহা হইলেই জাতীয় কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে। কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইলেই অমরত্ব লাভ হইবে। যেহেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"।

পল্লী-সমাজ।

১। গত বারে আমরা বলিয়াছিলাম,খানাকুল-কৃষ্ণনগর একটী পীঠস্থান,এরূপ প্রবাদ আছে। তাহাতে আপত্তি করিয়া অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, প্রবাদ কেন, সত্য সত্যই উহা এক পীঠ-স্থান। তাঁহাদের মতে আমরা বাস্তবিককে অবাস্তবিক—আনুমানিক স্থির করিয়াছি। পীঠস্থান বলিয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগরের যে খ্যাতি ও প্রাধান্য আছে,আমরা তাহাকে জন-শ্রুতিতে পর্য্যবসিত করিয়াছি,—এইটীই আপত্তিকারীদের মর্ম্মান্তিক কষ্টের কারণ। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, এ প্রদেশ—অন্যতম পীঠস্থান বলিয়া, কেবল, প্রসিদ্ধ নয়, কিন্তু তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন, এখানে আদ্যাশক্তির স্তন নিপতিত হইয়াছিল (১)। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিতে অক্ষম হন, কোন্ স্তন এখানে পড়িয়াছিল। আর এক কথা যদি এখানে পীঠ আছে, তবে ভৈরব কোথায়? কেন না, যেখানেই পীঠ, সেই খানেই এক এক ভৈরব (শিব) বর্ত্তমান। ইহার মীমাংসাকালে তাঁহারা বলেন, ষণ্টেশ্বরই এখানকার ঐরূপ শিবলিঙ্গ অর্থাৎ ভৈরব। যাহা আরোপিত পীঠস্থান, তাহা জড়ুর বা ভগবতী-তলা নামে বিখ্যাত। যথায় ষণ্টেশ্বর দেবতা আবির্ভূত,তাহার নাম উবিদ্‌পুর। এই উভয় গ্রামের মধ্যে ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ক্রোশের ব্যবধান। যে যে স্থানে পীঠ রহিয়াছে, প্রায় কোন স্থানেই দেবী হইতে মহেশ্বর এত দূরবর্ত্তী নন। এতদ্ভিন্ন বিশেষ অনুসন্ধানে আরও যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, পশ্চাৎ প্রদত্ত হইতেছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় কাহারই অগোচর নাই—পীঠস্থান সর্ব্ব সমেত ৫১ একান্ন। এখানে তৎ-সমুদয়ের তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবল দক্ষিণ-বাম-স্তন-সংক্রান্ত কথাই আমাদের আলোচ্য ও বিবেচ্য। যথা,—

(১) দক্ষ-যজ্ঞে সতী, দেহ ত্যাগ করিলে, মহাদেব তাহা স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতেন। বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে এক এক অঙ্গ উড়াইয়া দেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হয়। উহাই পীঠ নামে খ্যাত।

সংখ্যা	অঙ্গের নাম	স্থানের নাম	ভৈরবীর নাম	ভৈরবের নাম
৩০	বাম স্তন	জালন্ধর	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
৩১	দক্ষিণ স্তন	রামগিরি	শিবানী	চণ্ড

এখন মিলাইয়া দেখা যাউক, কোন অংশেও অন্ততঃ ঐক্য হয় কি না।

যদি প্রতিবাদীরা বলেন, এখানে বামস্তন পতিত হইয়াছিল,তাহা হইলে ঐ স্থানের নাম জালন্ধর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ঐ স্থানের নাম জড়ুর। জড়ুরের নামান্তর জালন্ধর (২) নয়। ভৈরবীর নাম ভগবতী, কিন্তু "ত্রিপুরমালিনী" নয়। ভৈরবের নাম "ভীষণ"নয়,কিন্তু ষণ্টেশ্বর। ষণ্টেশ্বরের অপর নাম "ভীষণ" নয় (৩)। এখানে যে বাম স্তন পতিত হয় নাই, তাহা প্রতিপন্ন হইল।

দক্ষিণ স্তনও কি এখানে পতিত হয় নাই? সে বিষয়ও বিচার্য্য বটে। যদি তাহা হইত, তবে স্থানের নাম "রামগিরি" হইত, কিন্তু স্থানের নাম জড়ুর, তাহা উপরেই বলিয়া আসিয়াছি। দেবীর নাম "ভগবতী" না হইয়া "শিবানী" হইলে, তবে আংশিক ইষ্টসিদ্ধি হইত। ভৈরবও "চণ্ড" নহেন—অত্রত্য ভৈরব ষণ্টেশ্বর। অতএব সপ্রমাণ হইল, এখানে আদ্যাশক্তির স্তন পতিত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ ছিল ও আছে, তাহা অমূলক।

২। বিদ্যাসাগর মহাশয় খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সমীপবর্ত্তী পাতুলের বর্ণনা-স্থলে লিখিয়াছেন,—"পাতুলের সন্নিকটে কোটরী নামে যে গ্রাম আছে, তথায় বৈদ্যজাতীয় উত্তম উত্তম চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহাদের অন্যতমের হস্তে আমার চিকিৎসাভার অর্পিত হইল।"

এই লিপি লক্ষ্য করিয়া গত বারে আমরা টীকা করিয়াছিলাম,—

"এখানে দুইটী ভুল হইয়াছে। প্রথম ভ্রম—গ্রামের নাম কোটরী নয়, কোটরা। দ্বিতীয় ভ্রম—ঠিক্ কোটরায় বৈদ্য ছিল না, এখনও নাই। রাধানগরই বৈদ্যের বাস-স্থল। ঐ ভ্রান্তি-সংঘটনের কারণ এই,—রাধানগর নামে তিন চারি জেলায় গ্রাম আছে। বাঁকুড়া জেলায় এক রাধানগর আছে। উহা বস্ত্রের জন্য খ্যাত। হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সীমাস্থিত রাধানগরের পরিচয় দিবার সময় ঐ অঞ্চলের কেহ কেহ কোটরা-রাধানগর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দূরবর্ত্তী স্থানের লোক; তিনি কোটরা-রাধানগর স্থলে "কোটরী" করিবেন, ইহা সঙ্গত।"

আমাদের আপত্তি-কারকেরা বলেন,—কোটরার নিকটে "সাহানপুর" নামে যে গ্রাম আছে, তথায়ও বৈদ্যের বসতি ছিল এবং এখনও রহিয়াছে। অতএব রাধানগরের চিকিৎসকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন,

(২) কাঙ্গাড়া-বিভাগে এই জালন্ধর অবস্থিত।

(৩) ষণ্টেশ্বরের পূজকদিগকেও জিজ্ঞাসা করায়, "ভীষণ" ভৈরবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

সাহানপুরের চিকিৎসকেরা করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি?

সাহানপুর ও রাধানগর উভয় গ্রামই চিকিৎসকের খনি-স্বরূপ বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিকিৎসক, রাধাগরনিবাসী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম, "কোটরী-নিবাসী কবিরাজ শ্রীধর সুধাকরের চিকিৎসায় রোগ-নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলাম।" তাঁহার ভ্রম-সংশোধনার্থে তৎকালেই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, শ্রীধর সুধাকর,কোটরা-নিবাসী নন,রাধানগরে তাঁহার বসতি ছিল(৪)।

৩। পণ্ডিত-প্রবর মধুসূদন বাচস্পতি মহোদয়ের বিরচিত বলিয়া—

"যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জ্বালয়ে মমের বাতি।
পুন গৃহে তার, জ্বলিবে না আর,
নিশিতে প্রদীপ-ভাতি॥"

এই কবিতা উদ্ধৃত করা গিয়াছিল, উহা তাঁহার কৃত নয়; সুপ্রবীণ কবিপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহোদয় উহার প্রণেতা। সুতরাং "কেমন ভাবশুদ্ধ" এই প্রশংসা, বাচস্পতি মহাশয়ের উপর অর্পিত হইলেও, তাহা মজুমদার মহাশয়ের নিকট গিয়া উপনীত হইয়াছে। সুতরাং এই বার বাচস্পতি মহাশয়ের প্রকৃত কবিতা দেখাইতে হইল। তাঁহার বিরচিত ও সঙ্কলিত "বসন্তসেনা," "ছন্দোমালা" ও"মাধবীলতা" এই তিন খানি পুস্তকের সমাচার আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। তন্মধ্যে "বসন্তসেনা" সংস্কৃত "মৃচ্ছকটিক" নাটকের অনুবাদ ১২৭০সালে ১২ই ফাল্গুনে উহার প্রথম মুদ্রাঙ্কন হয়; এখন উহার তৃতীয় সংস্করণ চলিতেছে। উহা নামে অনুবাদ, কার্য্যতঃ কিন্তু অনুবাদের মত বোধ হয় না। "ছন্দোমালার" পৃথক্ পরিচয় অনাবশ্যক। নামকরণেই উহার উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, ছন্দঃ-বিষয়েই উহার অধিকার। শেষোক্ত তৃতীয় পুস্তক অমুদ্রিত। সম্প্রতি উহার পাণ্ডুলিপি পর্য্যন্তও নষ্ট হইয়াছে। বাচস্পতি মহোদয়ের বিদ্যোৎসাহী জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাগ্যে উহার কয়েকটী কবিতা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতে সমর্থ হইলাম। "মাধবীলতার" গল্প ভাগের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই,—এক রাজপুত্রের বিমাতা, সপত্নীতনয়ের প্রাণহানির চেষ্টা করিয়াছিল। রাজনন্দন তাহা জ্ঞাত হইয়া প্রাসাদ হইতে পলায়নোদ্যত হন। রাজকুমার এই সময়ে অবিবাহিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার প্রেয়সীও তাঁহার সঙ্কল্প অবগত হইয়া সহচারিণী হইতে চাহিলেন। তাঁহারা রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিয়দ্দূর গমনের পর নিবিড়-গম্ভীর অরণ্যানী-মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। নৃপকুমার-বনিতা মাধবীলতাকে চণ্ডালপল্লীতে থাকিতে হইল। চণ্ডালের নারীরা, তাঁহাকে এক দিন দেখিয়া তাঁহার অপরূপ রূপে বিমোহিত হইয়া তাহাদের সমীপস্থ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মাধবীলতা কহিলেন—

সদৃশীমনুগন্তুমীহতে
ন পরমাধিসমাকুলেত্যতঃ।
কুমুদস্পরিহায় পদ্মিনীং,
ভজতাং দ্বন্দ্বচর-প্রিয়া নিশি॥

যিনি মনঃপীড়ায় কাতরা, তিনি আপন অনুরূপার নিকটেই গমন করেন। চক্রবাকী কুমুদিনীকে বর্জ্জন করিয়া পদ্মিনীর সমীপস্থা হউক।

(৪) ঐ রাধানগর গ্রামেই এখনও উক্ত কবিরাজের পুত্রেরা বাস করেন।

চক্রবাকী রাত্রিতে বিরহিণী। এদিকে পদ্মিনীও দিবাকরের অভাবে বিরহিণী। চন্দ্রসোহাগিনী কুমুদিনীর সংসর্গ, সুতরাং তাহার কেন ভাল লাগিবে?

ঐ পুস্তকের বাঙ্গালা কবিতা দুই চারিটী পাঠকগণকে উপহার দিলাম। সরস্বতী, ভগবতী ও কবিগণের বন্দনা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল। যথা,—

শরদিন্দু শুভে শিবে, শুভদে সারদে,
বীণাপাণি বাণি বাগ্‌বাদিনি বরদে। (ক)

ওগো গিরীশনন্দিনি! তুমি গিরিশনন্দিনী (৫)
ব'লে দিব সব ভূতগণে। (খ)।

সাক্ষী আছে দুই জন, গুহ আর গজানন
আর জানে ভক্ত-সমুদয় (গ)।

যাঁহাদের মুখবাণী অনুপমা অনুমানি'
অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে সুধা নিরুপমা।
ধন্য সেই কবিগণ, অন্য নাহি হেন জন
কার সনে কি বলিয়া কি দিব উপমা॥ (ঘ)।

এই সকল কবিতা পাঠ করিয়া বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "মধু খুড়ো, এ যে দেখ্‌ছি, ভারতচন্দ্রের প্রায় কাছাকাছি হয়েছে।"

"বসন্তসেনা"হইতে অধিক উদ্ধৃত করিবার যোগ্য কবিতা থাকিলেও স্থানাভাবে একটীমাত্র এখানে তুলিয়া দিলাম—

"এ পোড়া পেটের দায়, প্রাণ যায় মান যায়,
জাতি কুল তেজ লাজ, কিছুই ত রয় না।
তবে কেন তার লাগি, হও এত দুখভাগী,
সে ত অসময়ে তব, কোন দুখ সয় না॥
বাজাও জ্ঞানের ঢাক, দাও অলভের হাঁক,
জেগে থাক, দেখ যেন মোহ-নিদ্রা হয় না।
বিষম ইন্দ্রিয় চোর, হরে ধন ক'রে জোর,
দেখ, যেন ধর্ম্ম-ধন লুটে পুটে লয় না॥
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণে, যে বা জয় করেছে।
সংসারের মায়া-জাল হ'তে যেবা তরেছে।
খল রিপু অহঙ্কার, যার বশ হয়েছে।
তাহার কৈবল্যধাম হাতে ধরা রয়েছে॥
হে শিরোমুণ্ডক! মাথা মুড়ায়েছ বটে।
বাহিরে জানাও তুমি আছ অকপটে॥
না করিয়া থাক যদি মানের মুণ্ডন।
মাথা মুড়াইয়া বল কোন্ প্রয়োজন॥
যে জনার মনে নাহি কিছুই বিকার।
সে মাথা মুড়ান বলি যথার্থ তাহার॥"*

এই বাচস্পতি মহাশয়, কুমার কৃষ্ণনাথের (৬) সভায় আদর্শ বঙ্গীয় কবি ছিলেন। তিনিই সভাপণ্ডিতের কার্য্যে ও কবিতা-যুদ্ধে কুমারের সাহায্য করিতেন। আনুমানিক ১২৯৪ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গিয়াছেন। বাচস্পতির বংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। প্রাচীনত্বের একটীমাত্র নিদর্শন এই, হমায়ুনের সমসাময়িক "সাহিত্য-দর্পণের" এক প্রতিলিপি ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষের হস্তলিখিত। অদ্যাপি তাহা বিদ্যমান আছে।

"বিদ্যানিধিরতঃ খ্যাতো বিদ্যানিধিরুপাধিতঃ।
শ্রীরামহরিবিপ্রোঽভূদ্ ভরদ্বাজ-কুলোদ্ভবঃ॥১॥
শাকে গ্রহেভমুনিচন্দ্রমিতে শুভেঽস্মিন,
তৎসুনুনা লঘুধিয়া গুণিনাং নিদেশাৎ।
পদ্যেন পুস্তকমিদং রচিতং প্রয়ত্না-
দালোচ্য কাব্যনিবহানিহ রাজধান্যাং॥২॥
হিতকামনয়া কৃতং ময়া,
সুকুমারপ্রতিভাবতামিদং।

(৫) এখানে শ্লেষ করা হইয়াছে। গিরীশ শব্দে হিমালয় ও মহাদেব দুইই হয়। এখানে হিমালয়ই লক্ষ্য। গিরিশ—অর্থে মহাদেব।

(৬) মহারাণী স্বর্ণময়ী ইঁহারই পত্নী।

যদি বোধ-লবোহপি জায়তে,
নিতরাং বাঞ্ছিতলাভবানহং ॥৩॥
শ্রীমধুসূদন রচিতা
শুকমুখ-গলিতা যথা নৃণাং বাণী।
কবিতারস-রসিকানাং
ছন্দোমালা ভবেন্মুদে কিমিয়ং” ॥ ৪ ॥

“ছন্দোমালা” হইতে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়াই নিরস্ত হওয়া গেল। উহাতে এত অত্যুত্তম বাঙ্গালা কবিতা আছে যে, তাহা প্রদর্শন করিতে গেলে, আমাদিগকে বিব্রত হইতে হয়। কোন্ কবিতা রাখিয়া, কোন্ কবিতা পাঠককে দেখাইব, ইহাই চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। এই কারণেও বটে, আর আমাদের প্রদত্ত গতবারের বংশ-তালিকার যাথার্থ্য প্রতিপাদন জন্যও বটে কেবল সংস্কৃত কবিতাই উদ্ধৃত করা গিয়াছে। এই বংশে আর এক বঙ্গীয় কবির উদ্ভব হইয়াছিল। কবির নাম অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন। তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্যের নাম “মনোহর বিবরণ”। উহার রচনা বড়ই মধুর। তাঁহার আর একখানি পুস্তক অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

সর্ব্বাধিকারিগণের বাস-গ্রহণের কিছু পরে যাঁহাদের রাধানগরে বাস ঘটিয়াছিল, সেই আগমবাগীশদিগের প্রসঙ্গ এস্থলে প্রথমে আলোচিত হইতেছে।

সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের সন্তান কিশোর আগমবাগীশ রাধানগরে আসিয়া বসতি করেন। তাঁহার আগমভূষণ উপাধিও অনেককে বলিতে শুনিয়াছি। ফল কথা, তিনি তন্ত্র শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কয়োড়ি গাঁই সম্ভূত। কিশোর আগমবাগীশের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বৈদ্যবাটী ও সেওড়াপুলিতে বসবাস করিতেন। তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া খানা-কুলকৃষ্ণনগরের অন্তর্গত সোণাটিকুরি গ্রামে বাস করেন, পরে রাধানগরে উঠিয়া আইসেন।

বাঙ্গালা চণ্ডী প্রণেতা বঙ্গের সুপ্রথিত কবি-কেশরী মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের সহিত এই গোষ্ঠীর সংস্রব আছে। কয়োড়ি গাঁই, সপ্তশতী অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণের। এই কথা কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং ইঁহারা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন; অনেক কাল হইতে রাঢ়ীয় সম্প্রদায়-নিবিষ্ট হইয়াছেন।

অনেক পল্লীগ্রামের রীতি—যে গ্রামে প্রাচীন প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে, সেই খানেই আদ্যা-শক্তি যে মগ্ন থাকেন, ইহা অনেকেরই বিশ্বাস। তান্ত্রিক গোষ্ঠী হইলেই তাঁহাদের শাপে টেঙরা মাছকে মরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে সে অভিযোগ নাই। ইঁহারা টেঙরা মারেন নাই। শুনিয়াছি, এই বংশীয় গুরু-প্রসাদ আগমবাগীশ, নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে একদা অন্যমনস্ক হইয়া অমাবস্যার দিন পূর্ণিমা তিথি বলিয়াছিলেন। অবশেষে রাত্রিতে নাকি ভগবতী, রাজাকে শঙ্খ দেখান। শঙ্খই, চন্দ্রের স্থানীয় হইয়াছিল। চন্দ্র ও শঙ্খ উভয়েই শ্বেত-বর্ণ। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিস্তর নিষ্কর ভূমি সম্প্রদান করেন। এই গোষ্ঠী মার্জ্জিত শ্রোত্রিয়। বিদ্যা ও জ্ঞানে ইঁহারা চির-প্রসিদ্ধ। এ বংশে কন্যা বিক্রয় দোষ নাই। অদ্যাপি সে দোষ ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই, ইহা অতি সুখের বিষয়। তন্ত্র, আগম, নিগম ব্যতি-রেকে ইঁহাদের ভবনে বিস্তর ভক্তি-শাস্ত্রীয় পুঁথি ছিল। মহা-শঙ্খের মালা, পঞ্চমুণ্ডীর আসন ইত্যাদি ইঁহাদের গৌরবের বস্তু।

“গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো
ন চ পূর্ণো ন চাংশশ্চ”।

এই শ্লোকার্দ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য, ইঁহাদের বাটীর গ্রন্থালোচনে মীমাংসিত হয়। বৈষ্ণব ও গোস্বামীরা উহার ব্যাখ্যা করেন, গৌরাঙ্গ ভগ-বানের ভক্ত বা অংশ নহেন, কিন্তু তিনি পূর্ণ।

আগমবাগীশের গ্রন্থে ও টীকাতে সিদ্ধান্ত হইল, যে, গৌরাঙ্গ পূর্ণব্রহ্ম বা ব্রহ্মের অংশ অর্থাৎ কলা নহেন, কিন্তু তিনি ভক্ত।

এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কিশোর আগম-বাগীশ মহাশয় মদ্যকে দুগ্ধে পরিণত করিয়া-ছিলেন। তিনিই প্রথমে “আগমবাগীশ” উপাধি-বিমণ্ডিত হন। তিনি ঘণ্টেশ্বরের দেবা-লয়ের সন্নিহিত পলাশ-তরুতলে যোগাসন স্থাপন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণানন্দ সরস্বতীর ভূসম্পত্তি, ধনরত্ন, মণিমাণিক্যাদি কিছুই ছিল না। তিনি অবিবাহিতাবস্থায় পরলোকগত হন। কিশোরের সন্ততি রাজেন্দ্র আগমবাগীশের বাক্‌সিদ্ধি হইয়াছিল। তিনি সদাই উলঙ্গ থাকিতেন। রাধানগরের মাঠে গুরুপ্রসাদ আগমবাগীশ কর্ত্তৃক ত্রিকোণ-গৃহে পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও “আনন্দময়ী” নাম্নী কালী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ত্রিকোণ যন্ত্র বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ। তাই, ত্রিকোণাকার আলয় তাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চতু-ষ্কোণ ও গোলাকার ভবন, সচরাচর দেখিতে পাই। আর কোথাও ত্রিকোণ গৃহ আছে বলিয়া আমরা কখন শুনি নাই। কেবল ত্রিকোণ গৃহ নয়, উহাতে সিদ্ধ আসন, পঞ্চ-মুণ্ডীর পীঠ আছে। মহাশঙ্খের মালা আজও ইঁহার বংশীয়গণের অধিকারে আছে। বীজমন্ত্রের সংযোগে ইহাঁদের দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয় ও সন্ধি-পূজাদি সেই কারণেই সংক্ষেপে ও শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইঁহাদের নিজ বাস্ত বাটীতেও সিদ্ধপীঠ অর্থাৎ পঞ্চমুণ্ডীর স্থান আছে। ইহাই-নাকি আনন্দময়ীর সিদ্ধ পীঠ অপেক্ষাও বিশেষ জাগ্রৎস্থল। কৃষ্ণনগরের কণাদ, রাধানগরের আগমবাগীশ তুল্য প্রখ্যাত।(৭)

আগমবাগীশের বংশতালিকা।

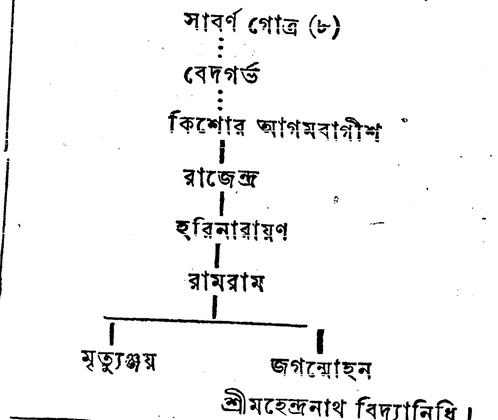

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

(৭) এই প্রবন্ধে “সপ্তশতী অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্ম-ণের” পরিবর্ত্তে ‘সপ্তশতী ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত’ হইবে। ২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮) যে নামের নীচে বিন্দু বিন্দু আছে, তথায় পুত্র না বুঝাইয়া তদ্বংশীয় বুঝাইবে।

উপনিষৎ।

(ঈশা)

১

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্ ॥

পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে সমস্তই, পরমাত্মদ্বারা আচ্ছাদন করিবেক। অর্থাৎ সকল বস্তুই পরমাত্মসত্তাদ্বারা প্রকাশমান এইরূপ জ্ঞান করিবেক। সেই বিরাগদ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবে। কাহার ও ধনে অভিলাষ করিবে না।

২

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়িনান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

এই সংসারে (অগ্নিহোত্রাদি) কর্ম্মসকল নিষ্পাদন করিয়াই শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক। তুমি মনুষ্য; ইহা ভিন্ন কোন উপায় নাই, যাহাদ্বারা তোমাতে (পাপ) কর্ম্ম লিপ্ত হইবে না।

৩

অসুর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যেকেচাত্মহনো জনাঃ

যাহারা আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মোন্নতি সাধন করেনা; তাহারা দেহ ত্যাগ করিয়া অন্ধতমসাবৃত অর্থাৎ মোহান্ধকারাচ্ছন্ন অসুর্য্য নামক লোক অর্থাৎ অসুরলোক প্রাপ্ত হয়।

৪

অনেজদেকং মনসোজবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি॥

(পরমাত্মা) গতিবিহীন এক মন হইতেও বেগবান্ ইন্দ্রিয় সকল ইহাকে পায় নাই (ইনি) পূর্ব্বেই গিয়াছেন অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়েরই অগোচর। অতএব ধাবমান অপর সকলকে অর্থাৎ মন প্রভৃতি অতিক্রম করেন (ইনি) নিত্য, তাঁহার অধিষ্ঠানে বায়ু কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতেছে।

৫

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

তিনি চল তিনি অচল, তিনি দূরে তিনিই নিকটে, তিনি এই সকলের (জগতের) মধ্যে, তিনি এই সকলের বাহিরে।

৬

যস্তু সর্ব্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

যিনি সকল ভূতবর্গকে আত্মাতে এবং সকল ভূতবর্গে আত্মাকে দর্শন করেন (তিনি) সেই হেতু (কাহাকেও) ঘৃণা করেন না।

৭

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কোমোহঃ কঃশোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

যখন সর্ব্বভূতই আত্মা এইরূপ জ্ঞান জন্মে তখন সেই একত্বদর্শীর শোকই বা কি? এবং মোহই বা কি?

৮

সপর্য্যগাচ্ছু ক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

তিনি সর্ব্বগ শুদ্ধ অশরীর স্নায়ুবিহীন (ও) নির্ম্মল (তিনি) পাপদ্বারা বিদ্ধ নহেন (তিনি) সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভূ (তিনি) নিত্য বৎসরসকলকে যাথাতথ্যরূপে কর্ত্তব্য বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

৯

অন্ধন্তম প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যউ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা (কেবল) অবিদ্যাকে অর্থাৎ কর্ম্মকে উপাসনা করে (তাহারা) মোহান্ধকারে প্রবেশ করে এবং যাহারা (কেবল) বিদ্যাতে অর্থাৎ জ্ঞানে রত, তাহারা তাহা হইতে অধিক মোহান্ধকারে (প্রবেশ করে)।

১০

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যেন স্তদ্বিচচক্ষিরে॥

বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ (ফল) বলেন (এবং) অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা পৃথক্ (ফল) বলেন। যাহারা আমাদিগকে তাহা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ধীরগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়াছি।

১১

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

যিনি বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম (এই) উভয়কে সহ অর্থাৎ এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় জানেন (তিনি) অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ স্বাভাবিক কর্ম্ম ও জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ করেন।

১২

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততোভূয় ইব তে তমো যউ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥

যাহারা (কেবল) অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতিকে উপাসনা করে, তাহারা মোহান্ধকারে প্রবেশ করে এবং যাহারা(কেবল)সম্ভূতি অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্মে রত থাকে,তাহারা তাহা হইতে অধিকতর মোহান্ধকারে প্রবেশ করে।

১৩

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে ন স্তদ্বিচচক্ষিরে॥

যাঁহারা আমাদিগকে তাহা অর্থাৎ সম্ভব ও অসম্ভবের ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা সেই ধীরগণের এইরূপ (বচন) শুনিয়াছি। (তাঁহারা) সম্ভব অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্মোপাসনা হইতে পৃথক্ (ফল) বলেন (এবং) অসম্ভব অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা হইতে পৃথক্ (ফল) বলেন।

১৪

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদো ভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥

যিনি সম্ভূতি অর্থাৎ কার্য্য ব্রহ্মোপাসনা এবং অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা (এই) উভয়কে সহ অর্থাৎ এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় জানেন (তিনি) বিনাশ অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাদ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ অনৈশ্বর্য্যাদিকে অতিক্রম করিয়া অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা অমৃত লাভ করেন।

১৫

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

১৪। হে সূর্য্য! আমি সত্যধর্ম্মা, অতএব তুমি আমার দৃষ্টির নিমিত্ত হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় পাত্রদ্বারা আচ্ছাদিত সত্যের মুখ অপাবৃত কর।

১৬

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য-
প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং
তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

হে পোষক! হে একস! হে যম! হে সূর্য্য! হে প্রজাপতি পুত্র! তোমার রশ্মিসকলকে বিগতকর (ও) তেজ উপসংহৃত কর, তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা দেখি। ঐ যে পুরুষ ঐ তাহা আমি।

১৭

বায়ুরনিলমথেদং ভস্মান্তং শরীরং।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥

(প্রাণ) বায়ু অমৃতস্বরূপ বায়ুকে (প্রাপ্ত হউক) এবং শরীর ভস্মাবশেষ (হউক) ওঁ হে মন! স্মরণকর যাহা করিয়াছি স্মরণকর হে মন! স্মরণকর যাহা করিয়াছি স্মরণ কর।

১৮

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মৎ জুহুরানমেনো
ভূয়িষ্ঠান্তে নম উক্তিং বিধেম॥

হে অগ্নে! হে দেব! (তুমি) সকল কর্ম্ম জানিয়া ধননিমিত্ত অর্থাৎ ফলভোগের নিমিত্ত আমাদিগকে সুপথদ্বারা লইয়া যাও (এবং) কুটিল পাপকে আমাদিগ হইতে বিযুক্ত কর। তোমার নিমিত্ত বহুতর নমস্কার বাক্য বিধান করিতেছি।

ঈশোপনিষৎ সমাপ্ত।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যারত্ন

রাজ্যশাসন ও প্রজাশিক্ষা।

বর্ত্তমান বর্ষে বিগত মহরম উপলক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। এ প্রকার ঘটনা এই নূতন নহে; তবে এবার কিছু বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছিল। কাশীর মন্দিরোৎপাটন ব্যাপার আজিও আমরা ভুলি নাই, শ্যামবাজার দাঙ্গার কথা এখনও নূতনই রহিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতি বৎসর আরও কত শত দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া, ভারতবাসীর ও গবর্ণমেণ্টের কত অশান্তির কারণ উৎপাদন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা এক একটী করিয়া বিবেচনা করিলে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু একটু প্রণিধান পূর্ব্বক ইহার তত্ত্বোদ্ভেদের চেষ্টা করিলে তাদৃশ ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; প্রত্যুত ভবিষ্যতে প্রভূত অনর্থের মূলীভূত কারণ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। সে দিন বঙ্গেশ্বর ছোটলাট বাহাদুর পাটনা দরবারে এই বিষয়ে যে কএকটী সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই মনোযোগ সহকারে আলোচনা করা উচিত। এ বিষয়ে যেমন প্রজার কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, সেইরূপ গবর্ণমেণ্টেরও অনেকগুলি দায়িত্ব ও ক্ষমতা রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে স্থলে রাজদায়িত্ব বলবৎ এবং প্রজার দায়িত্ব অনেকাংশে রাজার দায়িত্বের উপর নির্ভর করে।

দুঃখের বিষয় আজি কালি গবর্ণমেণ্ট যে নীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, প্রজাশিক্ষা যে রাজ্যশাসনের একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা গবর্ণমেণ্ট এককালে ভুলিয়া গিয়াছেন। রাজপুরুষেরা ব্যয়সঙ্কোচ করিতে গিয়া, যে শিক্ষাসঙ্কোচক নীতির প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, তাহা ভারতের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। এই সঙ্কীর্ণ নীতির ফল শুভজনক নহে। ইহার সমস্ত দূষণীয়তা ভারতময় সংক্রমিত হইতেছে। আমরা এই নীতির অযৌক্তিকতা, বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শান্তিসুখ সংস্থাপনার্থে গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি দায়িত্ব ও ক্ষমতা

আছে। প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার তাহার অন্যতম। "রাজা" এই শব্দের সহিত উক্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত রহিয়াছে। ঐ দায়িত্ব ও ক্ষমতার পরিমাণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা করিয়াছেন। কেহ বলেন মানবজীবনের প্রত্যেক বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ করা উচিত। বাণিজ্য রাজার আদেশানুযায়ী চলিবে, প্রত্যেক প্রজার সাংসারিক ব্যয় রাজা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রভৃতি রাজার অনুমোদনানুযায়ী প্রকাশিত হইবে, এমন কি ধর্ম্ম কর্ম্মেও রাজানুশাসন বলবৎ থাকিবে। আবার এ দিকে প্রতিপক্ষগণ রাজার প্রজাসম্বন্ধে কার্য্যশক্তি অতি সঙ্কীর্ণ সীমাতে আবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু যত সঙ্কীর্ণ সীমাতেই রাজশক্তি আবদ্ধ হউক না, প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা যে, রাজার একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও অবিসম্বাদিত দায়িত্ব, তাহা সর্ব্ববাদী কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও সম্মানিত।

প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা যদি রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার উক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান উপায়। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক Adam Smith, রাজ্যসম্বন্ধে রাজার কর্ত্তব্য অতি সঙ্কীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে, প্রজাপুঞ্জের শিক্ষা, রাজ্যমাত্রেই বিশেষতঃ সুসভ্য ও সমুন্নত রাজার রাজ্যে একান্ত ও অপরিহার্য্যভাবে আবশ্যকীয়। যেমন প্রজামধ্যে কোন সংক্রামক ব্যাধি ব্যাপ্ত হইতে না পারে, এজন্য সতর্ক হওয়া প্রত্যেক রাজপুরুষের একটী প্রধান কর্ত্তব্য, সেইরূপ অজ্ঞানজনিত মানসিক ব্যাধির বিস্তৃতি নিবারণ চেষ্টাও রাজ্যরক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। এই অজ্ঞানতাজনিত মানসিক ব্যাধি নিরাকরণে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, সাধারণ শান্তিরক্ষা এক প্রকার অসম্ভব। যদি প্রজাপুঞ্জ অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মন সামান্য কারণেই বিচলিত হইয়া পড়ে। সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ে অতি অকিঞ্চিৎকর মতপার্থক্য ঘটিলেই উহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া বিষম অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে ও রাজ্যের সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া উঠে। Adam smith ধর্ম্ম বিষয়ে অনর্থপাতের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কার্য্যত আমরা তাহাই দেখিতে পাই। ভারতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি অশান্তিকর ঘটনা প্রজাকর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের মূলেই অকিঞ্চিৎকর অথবা ভ্রান্ত ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপাশঙ্কাই কারণ রূপে কার্য্যকরী হইয়াছে। শুধু ভারতে নহে, যেখানে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত প্রজা সমষ্টি রাজ্যের প্রধান অঙ্গ, সেই খানেই আমরা এই সত্যের প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাই। এমন কি সুসভ্য ইংলণ্ডেও এ প্রকার উদাহরণ নিতান্ত বিরল নহে। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে রোমান কাথোলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে জনৈক বিকৃতমস্তিষ্কের উত্তেজনায় শত শত অশিক্ষিত প্রজামণ্ডলীর সমবেত অভ্যুত্থান ও তৎসংসৃষ্ট বীভৎস নরহত্যা ও বিষম অশান্তি-উৎপাদন-ব্যাপার ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নহে। তৎপর ১৮৩০—৩১ অব্দে জাতীয় মহাসভাসংস্কার আইনের আন্দোলন ও আলোচনার সময়ে অশিক্ষিত জনসাধারণ মধ্যে যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ও রাজদ্রোহিতার অভিনয় হইয়াছিল, তাহারও কারণ কেবল একমাত্র প্রজামধ্যে সম্যক শিক্ষাবিস্তারের অভাব। ফলতঃ শিক্ষা বিহীনরাজ্য ও নিরব-

ছিন্ন অন্ধকারময় প্রাসাদ সমভাবাপন্ন। একে শান্তি সুখের আশা ও অন্তে দর্শন শক্তির বিকাশ চেষ্টা তুল্যাংশে অবৈজ্ঞানিক ও অসম্ভব। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা,রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রজাপুঞ্জের শিক্ষাভাবই প্রজার ধনপ্রাণরক্ষার প্রধান অন্তরায়। অতএব প্রজা মধ্যে শিক্ষাভাব দূরীকরণে যত্নবান হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

এখন দেখা যাউক শিক্ষাবিস্তার ব্যতীত প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষার আর কি উপায় আছে? অবশ্য আমরা একথা বলিতে চাহি না যে, শিক্ষাবিস্তারই প্রজারক্ষার কেবল এক মাত্র উপায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ বিষয়ে রাজার কতকগুলি ক্ষমতাও আছে। তবে সেই সকল ক্ষমতা পরিচালন সাময়িক আবশ্যকতাসাপেক্ষ। এগুলি যেমন অপরাধিবর্গের যাতনা ও শাস্তিপ্রদ,তেমনি তৎসংসৃষ্ট নিরপরাধিগণেরও ক্লেশদায়ক। বন্দুক, তরবারী,কারাগার সমূহের বহুল ব্যবহারে প্রজার ধনপ্রাণরক্ষা অসম্ভব নহে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত উপায় ও ইহার মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্টতর ও বাঞ্ছনীয় তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? প্রত্যেক সদ্বিবেচক ব্যক্তিই ইহার কেবল একমাত্র উত্তর-দানে সমর্থ। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে প্রথমোক্ত মতেরই সমর্থন করিবেন। আমাদের নিকট ইহা একটী জলন্ত সত্য বলিয়া প্রতীত হয় যে, যাহার হস্তে প্রাণদণ্ড করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার স্কন্ধে শিক্ষা বিস্তার করিবার গুরুতর দায়িত্বও ন্যস্ত রহিয়াছে। সমুচিত শিক্ষাবিস্তার থাকিলে কি আমরা বধ্যভূমির ভীষণ দৃশ্য ও কারাগারের নিদারুণ হৃদয়ভেদী চিত্র বর্ত্তমান আকারে দেখিতে পাইতাম? তাহা হইলে কি আজ অসংখ্য বন্দী, পাপের আবিলতা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক জীবনের স্বাধীনতা ও সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কারাগারের শোচনীয় অবস্থা আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করিত! তাহা হইলে কি আজ সুখের সংসারে আগুমান নরকের অস্তিত্ব থাকিত? কিন্তু কি বিড়ম্বনা, দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতে তাদৃশ শিক্ষাবিস্তার নাই। প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষাও অবশ্য কর্ত্তব্য, তাই অপরাধীর সমুচিত শাস্তি বিধানেরও আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এই আবশ্যকতা কি বাঞ্ছনীয়? ইহা কি নিষ্ঠুরতা ও নির্ম্মমতার কালিমায় জড়িত নহে? এই জন্যই বলিতেছি যে, প্রজাশিক্ষা রাজ্যরক্ষার একটী সামান্য উপায় বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে, প্রত্যুত ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান উপায়। আমরা বুঝিতে পারি না, গভর্ণমেণ্ট কোন্ নীতি অনুসারে রাজ্য রক্ষার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান উপায় হইতে স্বীয় দায়িত্ব উন্মোচন করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন। রাজা শুধু দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নহে, রাজ্য শুধু সৈন্যাবাসশ্রেণীর আধার নহে, প্রজা কেবল শাস্তিভোগের জন্য সৃষ্ট নহে। প্রজাচরিত্র সংগঠন রাজার অতি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই চরিত্রসংগঠনের স্থান ধর্ম্মাধিকরণ বা কারাগার নহে; ইহার শিক্ষক সৈনিক পুরুষ বা সশস্ত্র শান্তিরক্ষকগণ নহে। বিদ্যালয় ইহার প্রকৃত আলয়, জ্ঞানদাতা অধ্যাপক ইহার প্রকৃত শিক্ষক এই জন্যই বিদ্যালয় ও অধ্যাপক মণ্ডলীর সংখ্যা হ্রাস করা দূরে থাকুক, আরও বৃদ্ধি করা গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য, তাঁহাদের এ ভ্রান্ত নীতির পরিবর্ত্তন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানি যেমন প্রজাপুঞ্জের প্রয়োজন ও অভাব অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধেও উক্ত নিয়ম কার্য্যকারী হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ রাজার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য। আমরা এই শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের মতের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অসমর্থ। চিনি

বা অন্য কোন পণ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে না পাইলে ব্যক্তি বিশেষের অসুবিধা ঘটিতে পারে; কিন্তু তাহাতে অন্যের কি যায় আসে? কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে অভাব থাকিলে শুধু তাহার ক্ষতি এমত নহে, তাহার সমাজ ও রাজাও সেই ক্ষতির অংশী হইবেন। ধনসম্পত্তিসম্পন্ন সমৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে এই "অভাব ও পূরণ" নীতি অনেকাংশে ক্রিয়াশীল হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গমধ্যে এই নিয়ম কোন রূপেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। কোন কোন রাজপুরুষ একথাও বলিয়া থাকেন যে, দেশীয় দানশীল ব্যক্তিগণ স্বীয় বদান্যতাগুণে স্বদেশ মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবেন। অবশ্য আমরা স্বীকার করি, রাজ্যমধ্যে এরূপ অনেক মহামনা ব্যক্তি আছেন যাঁহারা স্বজাতির উন্নতিকল্পে শিক্ষা বিস্তারার্থ অকাতরে সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশীলা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং নড়াইল ও বরিশালনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমীদারবংশীয়গণ ও অপরাপর উন্নতমনা কতিপয় ব্যক্তি এই সৎকীর্ত্তির উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এতদ্বারা যতই মহদুপকার হউক না কেন, তাঁহাদের শুভ-সংকল্প যতই প্রসারিত কার্য্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হউক না কেন, তদ্দ্বারা কখনই প্রজাসাধারণের অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। পণ্যব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতা যেমন পণ্যদ্রব্যের অভাব মোচন করিতে পারে, বদান্য ব্যক্তিদিগের এই সাধুকার্য্যের প্রতিযোগিতা কোন মতেই শিক্ষা বিস্তারের অভাব পূরণ করিতে পারে না। পণ্যদ্রব্য উত্তম না হইলে ব্যবসায়ীর জীবিকা-হানির আশঙ্কা আছে, এবং এই জীবিকা হানির আশঙ্কাতেই সে প্রাণপণ উৎসাহে স্বীয় কার্য্যে অগ্রসর হয়। আমরা মানব-বদান্যতাকে যত উচ্চ আসনই দিই না কেন, এই জীবিকা লোপাশঙ্কা প্রণোদিত উৎসাহের নিকট হিতৈষিতাপ্রণোদিত উৎসাহ অতি নিস্তেজ। তাই বলিতেছি যে, "অভাব ও পূরণ" নীতির বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষানীতি পরিচালন, অদূরদর্শিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এইরূপ যে দিক হইতেই দেখা যাউক না কেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শিক্ষাবিস্তার রাজ্যরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান উপায় এবং এই শিক্ষাবিস্তারকার্য্য রাজার সর্ব্বপ্রধান দায়িত্বেরই অন্তর্নিবিষ্ট। ইহার জন্য রাজার পরমুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না, রাজাকে স্বহস্তে ও স্বযত্নে ইহার বিস্তৃতি সাধন করিতে হইবে।

প্রজা শিক্ষা রাজ্যরক্ষার মূলমন্ত্র হইলে, প্রজাপুঞ্জ যে কি অমৃতময় ফলের অধিকারী হয়, তাহা বিশেষ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যে সকল রাজ্যে এই মহামন্ত্রের বীজ উপ্ত হইয়াছে, সেই সকল রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই হইবে। এ বিষয়ে বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া আমরা পাঠকবর্গকে মার্কিণরাজ্যের ক্রমনির্ম্মাণ পদ্ধতি একটু প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিতে বলি। শিক্ষাবিস্তারের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত। স্কচ জাতি এ বিষয়ের জলন্ত উদাহরণ। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডের অবস্থা ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলে স্কটলণ্ডকে অসভ্য বর্ব্বর ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইত না। দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, অলসতা ও যথেচ্ছাচার স্কচজাতির সর্ব্বস্ব ভূষণ ছিল। ইংলণ্ডবাসিগণ স্কটলণ্ডবাসীদিগের নাম শুনিলে ঘৃণা ও উপহাস প্রকাশ করিত। কিন্তু যেমন ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় রাজবিপ্লবের অবসান হইল, অমনি জনৈক স্বদেশ প্রেমিক স্কচ পুরুষের প্রস্তাবানুসারে স্কটলণ্ডের সর্ব্বস্থানে পল্লীবিদ্যালয় সকল সংস্থা-

পিত হইল। স্কটলণ্ডে সাধারণ শিক্ষার বীজ উপ্ত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের উদার নীতির আশ্রয়ে ঐ বীজ যথাসময়ে ফুলফলবান বৃক্ষে পরিণত হইয়া স্কটলণ্ডে অধুনা শান্তির সুশীতল ছায়া বিতরণ করিতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে জাতি ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই জাতি ইংলণ্ডবাসীদিগের ঈর্ষা ও অনুকরণের পাত্র হইল। ইহার একমাত্র কারণ,কেবল স্কটজাতি মধ্যে সাধারণ শিক্ষাবিস্তার ও ইংলণ্ডে তাৎকালিক প্রজাশিক্ষার অভাব। প্রজাশিক্ষার তারতম্যে একই রাজার অধীনে, একই রাজ্যে একই জাতির মধ্যে কি প্রকার বিসদৃশ ফল উৎপন্ন হয়! রাজ্যশাসন পদ্ধতি যদি ঐতিহাসিক সত্যসাপেক্ষ হয়, প্রাগ্বিজ্ঞান যদি বাস্তবিকই উত্তরবিজ্ঞানের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছি, তাহাও অবশ্য সত্য স্বীকার করিতে হইবে। স্কটলণ্ডে শিক্ষা বিস্তার পরীক্ষার ফল অবিসম্বাদিত। অবিসম্বাদিতরূপে পরীক্ষিত সত্য রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থদর্শনে অন্য যুক্তির অপেক্ষা করে না। শাসন বিজ্ঞানে ও প্রজাশিক্ষায় এই মহৎ ফলপ্রসবিনী শক্তি পরীক্ষিত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং রাজার এই সত্যানুযায়ী রাজ্যশাসনে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। এই সত্যের অনুসরণে শান্তি, পরিবর্জ্জনে বিপদ।

শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী।

কবিতা।

বালিকা।

১

মূর্ত্তিমতী সরলতা তুমি এ সংসারে।
শোক-তাপে জর্জ্জরিত মানব-হৃদয়
হেরিয়া ও চাঁদ মুখ ভাসে সুখনীরে।
কি মধুর ভাবে মন বিমোহিত হয়!

২

মধুর মুরতি খানি হেরিলে নয়নে
সুর-বালা বলি মনে হয় অনুমান।
সাধ হয় হৃদি মাঝে বসায়ে যতনে,
কুসুমঅঞ্জলি পদে করি সমর্পণ।

৩

সতত চঞ্চল নেত্রে মৃগশিশু প্রায়,
কি যেন দেখিছ ওই সভয়ে চাহিয়া।
ভাব বুঝি মনে মনে "কেনবা হেথায়
আসিলাম অকারণে স্বরগ ত্যজিয়া?"

৪

অমিয়-জড়িত তব সুমধুর কথা
শুনিয়া হৃদয় যেন যায়রে গলিয়া।
ক্ষণ তরে ভুলে গিয়া হৃদয়ের ব্যথা,
আনন্দ হিল্লোলে প্রাণ উঠেরে নাচিয়া।

৫

অস্ফুট কৌমুদী-নিভ লাবণ্য-প্রভায়,
ফুটন্ত গোলাপ সম প্রফুল্ল আনন,
সংসার-বিপিন ক্ষণে উজলিয়া হায়!
শুখা'য়ে যেতেছে কত কে করে গণন?

৬

তুমিরে! মন্দারফুল নন্দনকাননে;
অথবা তুমিরে বুঝি স্বরগের জ্যোতি।
ডুবাতে প্রীতির নীরে, মানবের মনে,
আসিয়া এ ধরা ধামে, ছড়াতেছ ভাতি।

৭

পর-দুঃখে তব প্রাণ সতত কাতর।
কাঁদিয়া আকুল হও পরের বেদনে।
এ মধুর কোমলতা তোমা বিনা আর
নাহি বুঝি এ জগতে অপরের প্রাণে।

৮

তরুণ লতিকা সম সরল প্রকৃতি।
সংসারের কুটিলতা জাননা কেমন।
সতত সরল ভাব সকলের প্রতি,
ভার যেন সকলেরে আপন মতন।

শরচ্চন্দ্র দত্ত।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী (১১)।

হিন্দি, বিশেষতঃ ইহার শাখাবিশেষ ব্রজভাষা ও মৈথিলীভাষা বাঙ্গালার প্রধান উপাদান। বহু দিবস হিন্দী ভাষার প্রচলন হইলে ক্রমে ক্রমে ব্রজ ও মৈথিলীভাষার উৎপত্তি হয়। উহারাও একবিধ হিন্দী। কিন্তু, কি প্রকারে বা কোন্ কোন্ নিয়মের অধীন হইয়া হিন্দী হইতে উক্ত দুই ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা স্থির করা সুকঠিন। তদ্ব্যতীত মারহাটী, গুজরাটী,ভোজপুরী,সিন্ধী প্রভৃতি আরও কয়েকটী হিন্দির শাখা আছে; সে সকলের সহিত বাঙ্গালার বড় সংস্রব নাই। হিন্দীর ভূরি ভূরি শব্দ সেই সকল ভাষার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়; বিভক্তির আকৃতি বা ক্রিয়া-প্রকরণে তাহাদের মধ্যে প্রভূত ব্যত্যয় আছে। প্রাকৃত শব্দনিচয় কোথাও অল্পবিকৃত, কোথাও বা প্রকৃত অবস্থাতেই হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়। উহা হইতে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে তদ্রূপ কতকগুলি শব্দ প্রদত্ত হইল।

হিন্দী	বাঙ্গালা
গাভন	গাভিন
আধা	আধ
চাংদ	চাঁদ
মাঝ	মাঝ
হাথ	হাত
মুঠ	মুট
ভাত	ভাত
কাঁয়ত	কায়েত
দেউল	দেঁউল
অংধার	আঁধার
আপন	আপন
হিন্দী	বাঙ্গালা
বাম্মণ	বামন
মোটা	মোটা
বাসরু	বাছুর
গোলু	গোরু
বিচ্ছু	বিছা
মাউসী	মাসী
সাঁজ	সাঁজ
কছু	কিছু
জিব্‌হা	জিভা, জিবা
আটকল	আটকাল
উংচ	উঁচু
অংব	আঁব
চমার	চামার
কাকা	কাকা
উংটা	উংটা
পেট	পেট
টট্টু	টাট্টু
থংড	ঠাণ্ডা
যোড়া	যোড়া
কংকর	কাংকর
বাপ, বাবা,	বাপ, বাবা
সাংকু	সাঁকো
নাতু	নাতী
গেরু	গেরি
অজ	আজ
আরু	আর
কংধ	কাঁধ
অচংভ	আচম্বা
জেঠ	জেঠা
জেঠাঈ	জেঠাই

হিন্দী	বাঙ্গালা
আড়াল	আড়াল
কাল(কল্য)	কাল
পরসো	পরশু

পূর্ব্বোদ্ধৃত শব্দগুলির অধিকাংশই মারহাটী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাতেও পরিদৃষ্ট হয়।

উড়িষ্যাভাষার উৎপত্তি বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। ক্রিয়া-প্রকরণে বাঙ্গালাভাষা ইহার দ্বারা অনেকটা পরিপুষ্ট হইয়াছে। যথাস্থানে তৎসমুদায় নির্দ্দিষ্ট হইবে। উৎকল ও বাঙ্গালা ভাষার শব্দ সকল একরূপ। যে কোনও ভাষার একখানি অভিধান থাকিলেই উভয় ভাষার বার আনা শব্দের জন্য কোনও ভাবনা থাকে না। গ্রাম্য বা অপ্রচলিত শব্দ সকলে অনেকটা বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে গ্রন্থ প্রচলিত শব্দ সকল এক বলিয়া আর এস্থলে উল্লিখিত হইল না। তবে উৎকলের টুকি হইতে বাঙ্গালার টুক্, গুড় হইতে গুল, ও বিড়া হইতে বিঁড়া হইয়াছে। উহার গোটা, টি, টা প্রভৃতি বাঙ্গালাতেও প্রচলিত আছে। যঁহি, কাঁহি, নাঁহি, কেহি, কতেক, এধার, সেধার প্রভৃতি অপভ্রষ্ট হিন্দি শব্দ। এমন্ত, যেমন্ত, কেমন্ত, তেমন্ত, হইতেই বাঙ্গালায় এমন, যেমন, কেমন তেমন ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি থাকিলে, উৎকল ভাষা অতীব সুগম হইয়া আইসে।

আমরা যে যে ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি বলিয়াছি, অতঃপর কয়েকটী শব্দ দ্বারা ঐ সকল ভাষা হইতেই যে বাঙ্গালাভাষার সমুৎপত্তি, তাহাই বিশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করিব। অনেকের ধারণা যে, সংস্কৃত শব্দসকল অপভ্রষ্ট হইয়া একেবারে বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা আমাদের অনুমোদিত নহে। এবম্বিধ অনেক শব্দ বাঙ্গালায় প্রচরূপ থাকিলেও সকল শব্দই যে ঐরূপ, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, অপভ্রংশ-কাণ্ডে উভয় শব্দের মধ্যে বহুল পার্থক্য প্রত্যক্ষ হয় না; ক্রমশঃ সেই কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। মনে করুন, সংস্কৃত দীর্ঘি শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'দীঘি' হইতে পারে; কিন্তু বধূ হইতে যে একেবারে "বৌ" হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে কিছু কুণ্ঠিত হইতে হয়। সুতরাং, বধূ ও বৌ এতদুভয়ের মধ্যে অন্য কোন ভাষা আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। তদ্বিধ কয়েকটী শব্দই আমরা এস্থলে প্রদর্শন করিব।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	হিন্দী	উৎকল	বাঙ্গালা
পক্ক	পক্ক	পাক্কা	পকা	পাকা
পুস্তি	পোত্থি	পোথি	পোথি	পুথি
বড্	বড্ড	বড়া	বড়	বড়
গড্ডোল	গাড্ডল	গাড়ল	গাড়ল	গাড়ল
গড্ডুক	গড্ডুক	গাড়ুক	গাড়ু	গাড়ু
চতুষ্পদী	চউপদী	চৌপাই	"	চৌপায়া।
ক্ষার	ক্খার	ক্ছার	"	ছার
স্তম্ভ	থম্ভ	থংভ	থম	থাম
দধি	দহি	দহী	দহি	দই
দ্বার	দুবার	দুবার	দুয়ার	দুয়ার
দুগ্ধ	দুদ্ধ	দুধ	দুধ	দুদ
প্রস্তর	পত্থর	পথর	পথর	পাথর
বধূ	বহু	বহু	বউ	বৌ

সংস্কৃত পক্ক শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'পাকা' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; একথা বলিলে বক্তার দুঃসাহসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা প, ক ও ব এই তিনটী অক্ষরে 'পক্ক' শব্দ হইয়া 'পাকা' শব্দের বেলায় 'ব' কোথায় গেল? এবং দুইটি আকারই বা কোথা হইতে আসিল? সহজেই এরূপ প্রশ্ন মনে হইবে। একেবারে এতটা পার্থক্য হওয়াই অসম্ভব! এতদনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গেল, যে, সংস্কৃত 'পক্ক' হইতে প্রাকৃত 'পক্ক' হইয়াছে। প্রাকৃতে কেবল একটী 'ব'কার স্থানে একটী 'ক'কার আসিল। এক্ষণে ঐ প্রাকৃত 'পক্ক' হইতে হিন্দী 'পাক্কা' হওয়া কিছু আশ্চর্য্যকজনক নহে; কারণ, উহাতে কেবল একটী আকার বেশী। হিন্দীতে 'পক্কা' এইরূপও লিখিত হয়। তাহা হইলেই ঐ হিন্দী 'পক্কা, হইতে উৎকল 'পকা' ও তাহা হইতে বাঙ্গালায় পাকা হইতে পারে। যেহেতু, উৎকলে একটী 'ক'কারের লোপ এবং বাঙ্গালায় একটী আকার অধিক। এইরূপ, ক্রমশ একটী কম বা একটী বেশী দ্বারা অপভ্রংশ-ব্যাপার সমাধা হইয়া থাকে। একেবারে দুই চারিটী শব্দের কম বেশী বড় হয় না। অতএব, সংস্কৃত পক্ক হইতে বাঙ্গালার পাকা নহে। মধ্যে প্রাকৃত, হিন্দী ও উৎকল আছে। তাহা হইলেই পূর্ব্বোদ্ধৃত শব্দ গুলির দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে, যে, বাঙ্গালা ভাষা তত্তৎ ভাষা হইতে সমুৎপন্ন, তাহাতে আদৌ দ্বৈধী নাই।

অনেক সংস্কৃত শব্দও অপভ্রষ্ট হইয়া বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহাদের কতকগুলি সন্নিবেশিত হইল। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী হিন্দী বা অন্যান্য ভাষাতেও পরিলক্ষিত হইতে পারে।

সংস্কৃত	বাঙ্গালা
চ্যবন	চুয়ান
চেড়	চেলা
ছাদন	ছাওয়া
জটিত	জড়ান
যোজন	যোড়ন
ঝটিতি	ঝট
দদ্রু	দাদ
লগ্ন	লাগন
দীর্ঘি	দীঘি
ধোত্র	ধোতী
ননংদ	ননদ
নমন	নাবান
ফুৎ	ফুঁ
বর্দ্ধন	বাড়ান
বাটী	বাড়ী
পৃষ্ঠ	পীঠ
ঝট	ঝড়
তাপন	তাতান
তপ্ত	তত
তিক্ত	তিত
স্থান	থান
হংডী	হাঁড়ী
পরীক্ষা	পরক
পলায়ন	পালান
বল্কল	বাকল

এই তালিকার মধ্যে যে যে বাঙ্গালা শব্দ দেওয়া গেল, উহাদের মধ্যেও কোন কোনটি হিন্দী বা উৎকলে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। সকল গুলিই যে একেবারে সংস্কৃত ভাঙ্গা, সাহস করিয়া কোন ক্রমেই এমন কথা বলা যায় না। জনক-জননীর চিহ্ন সন্তানে থাকিবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি?

ক্রমশঃ হিন্দী ভাষার ন্যায় আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতেও আরবী ও পারসী শব্দের বহুল পরিমাণে সমাবেশ হইয়া পড়িয়াছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, কথোপকথনাদিতে আজকাল যত শব্দ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে সংস্কৃতমূলক শব্দ একার্দ্ধ, পারসী বা আরবী শব্দ অপরার্দ্ধ। তাহার দিঙ মাত্র নিদর্শন প্রদর্শিত হইতেছে। সংস্কৃত স্থান জাত 'ঠাঁই' শব্দ আর এখন আমাদের ব্যবহারে আসে না। ফার্সীর 'জগা'-জাত'জায়গা' শব্দই এখন উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ক্ষেত্রজাত খেত ছাড়িয়া এখন আমরা 'জমীন' জাত 'জমী' ধরিয়াছি। 'বলে'র বল এখন খুব কম; 'জোরে-র'ই জোর বেশী বেশী দেখা যাইতেছে। মত্ততা কেবল কয়েক জন ভদ্রলোকের কাছে; কিন্তু 'নেশা' ছোট বড় কাহারও কাছে বাকী নাই। নেকা, নেঙা, বোবা, হাবা, কালা, খাঁদার প্রচলিত শব্দ পূর্ব্বে কি ছিল, জানা যায় না। 'আবরণ' গিয়াছে; 'পরদা' চলিতেছে। 'কার্য্যালয়ে'র বদলে 'কারখানা' হইয়াছে। 'বিনিময়' নাই,'বদল' আছে। একার্থ ধাতুঘটিত'পরিচ্ছদ' ও 'পোষাকের' মধ্যে আমরা শেষটীরই বেশী বেশা আদর করিয়া থাকি। 'খাতির'এখন অদ্বিতীয়। 'খাঁকতির'ই বা কসুর কি? 'খোরাকির' জন্য সকলেই লালায়িত। যাহারা নহে, তাহারা 'খেতাব' ও 'খেলাতে'র জন্যই ব্যস্ত। জুতা, পয়জার, খড়ম, চোগা, চাপকান, জামা, এজার, টুপি, চশমা, ছড়িতেত কাহারও অভাব দৃষ্ট হয় না। পল্লীগ্রামে হট্টজাত 'হাট' আছে বটে, কিন্তু নগরে 'বাজার' 'দোকান' ভিন্ন কথা নাই। 'লাভে'র বেলায় খুব কম, কিন্তু 'নুকসানে'র বেলাতেই বেশী বেশী। সকলেই বলেন 'গরীব'; যিনি বড় মাতৃভাষাপ্রিয়, তিনি না হয়, উহার পর 'দুঃখী' কথাটি যোজনা করিয়া মাতৃভাষারই সেবকত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 'পসারে'র জন্য লোকে হাঁ করিয়া রহিয়াছে। 'আক্কেল' ছাড়া কে আছে? ঘরে বাহিরে, দোকানে বাজারে, পথে ঘাটে, ময়দানে বাগানে সর্ব্বত্রই 'জিনিষ'। এইরূপ নানা প্রকারে সংস্কৃত শব্দ স্থানে পারসিক ও আরবিক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। আর কত বলিব। আমরা এ বিষয় লইয়া আর অধিক আন্দোলন করিব না। এক্ষণে বঙ্গীয় ভাষার বিভক্তির আকৃতি ও ক্রিয়া প্রকরণের বিবরণ প্রকাশিত করিলেই আমাদের কার্য্য সমাধা হয়।

বিভক্তির আকৃতি।

আমাদের বিভক্তির আকৃতির অধিকাংশই মৈথিলী ভাষা হইতে সংগৃহীত। অন্যান্য ভাষার ন্যায় ইহারও সাত বিভক্তি। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া,চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী। কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। সংস্কৃত-ব্যতীত আর সকল প্রাচ্য ভাষাতেই সেই প্রথমা বিভক্তির লোপ হইতে দেখা যায়; সুতরাং, বাঙ্গালা ভাষাতেও কর্ত্তৃকারকের কোন চিহ্ন থাকে না। যথা, রাম যাইতেছে; গোরু ডাকিতেছে, উভয়ত্র কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন নাই।

মৈথিলী ভাষার কর্ম্মকারকে 'কেঁ' হয়। কিন্তু, মিথিলার প্রদেশবিশেষে কেবল 'কে' হইয়া থাকে। ঐ 'কে' হইতেই আমাদের কর্ম্মকারকে 'কে' ব্যবহৃত হয়। যথা, তোমাকে বলিব; তাহাকে ডাক। স্থল বিশেষে ঐ 'কে'র লোপও ঘটে। যথা, জল আন; ভাত খাও। বাঙ্গালার কর্ম্মকারকে কোনও কোনও স্থানে 'রে'ও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, আমারে ডাকিও; হরিরে সঙ্গে করিয়া আনিও। 'রে' পদ্যেই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গদ্যে উহার প্রয়োগ খুব কম। কোথা হইতে 'রে' আসিয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। পুনরুল্লেখ করিব না।

মৈথিলী ভাষার করণকারকে হিন্দীর 'সে' হইতে প্রথম প্রথম সঁ, সেঁ। হইয়াছিল। এক্ষণে উহারা প্রাচীন প্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত। ইদানীং মিথিলাবাসিগণ করণকারকে 'এ' ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুনা যায়, নানাকারণে মিথিলা প্রদেশের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্টতা ছিল। তজ্জন্যই বাঙ্গালাভাষা মৈথিলী ভাষার উপকরণ অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছে। আমাদের করণ কারকেও 'এ' প্রচলিত আছে। যথা; জলে আগুণ নিবে। অন্যান্য করণ চিহ্ন পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, তজ্জন্য এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইল না।

মৈথিলেয় সম্প্রদান চিহ্ন 'কে'। আমাদেরও তাহাই। সংস্কৃত-ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায় সম্প্রদানের তাদৃশ সার্থকতা দেখা যায়না। এজন্য হিন্দী প্রভৃতি কয়েকটী ভাষায় উহার উল্লেখও নাই। তত্তৎ ভাষায় সম্প্রদান কর্ম্মস্থানীয় হইয়া থাকে। বাঙ্গালার সম্প্রদানকেও কর্ম্ম বলিলে বলা যায়।

মৈথিলীর অপাদান চিহ্ন সঁ, সেঁ। হিন্দীর সহিত ইহার কতকটা সাম্য আছে। বাঙ্গালার অপাদান মৈথিলীর বিন্দু বিসর্গও গ্রহণ করে নাই। আমাদের অপাদান চিহ্ন থেকে, হইতে। মারহাটী থী, থকী হইতে বাঙ্গালার থেকে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত স্থিত্বা হইতে বাঙ্গালার থেকে হইয়াছে। স্থিত্বার অর্থ থাকিয়া। সুতরাং, ঘর থেকে অর্থাৎ ঘরে থাকার পর। এ কথাটী নিতান্ত অসঙ্গতও নহে। ত্রৈলিঙ্গী ভাষার অপাদান চিহ্ন 'ডু'; উহা হইতেই উৎকলের রু, ঠারু। ঠারুর অর্থ আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি। সংস্কৃত স্থা ধাতু স্থানে প্রাকৃতে 'থা' হয়। ক্রমে 'থা' হইতে 'ঠা' হইয়াছে। তাহা হইলেই 'ঠা' শব্দের অর্থ স্থান। 'ঠারু' শব্দের অর্থ স্থান হইতে। সুতরাং, গৃহ ঠারুর অর্থ গৃহের স্থান হইতে অর্থাৎ গৃহ হইতে। ইহাতে আমাদের 'থেকে'র সহিত বড় বিসম্বাদ ঘটিতেছে না। 'ঘরে থাকিয়া বাহির হইল' বা 'ঘরের স্থান হইতে বাহির হইল, একই কথা। আমাদের আর একটী অপাদান চিহ্ন হইতে। ইহা কোথা হইতে আসিল, তন্নির্ণয় এখনও আমাদের সাধ্যাতীত। কাহারও কাহারও মত, প্রাকৃতে পঞ্চমীর বহুবচনে 'হিংতো', 'সুংতো' হয়। ঐ হিংতো হইতেই আমাদের 'হইতে' হইয়াছে। আমরা এক্ষণে ইহার কোন প্রত্যুত্তর দিব না। সম্যক্ পরিজ্ঞাত না হইয়া কোনও কথা বলা আমাদের অনভ্যস্ত। জানিতে পারিলে সকলকে বিদিত;করিতে ত্রুটি করিবনা, তবে প্রাকৃতিক 'হিংতো' 'সুংতো' অপেক্ষাও সুসঙ্গত একটী কথা আমাদের মনে লাগিয়াছে। বলিতে পারিনা, যে সেইটী হইতেই আমাদের 'হইতে' উৎপন্ন। যাহা হউক, কতকটা সঙ্গত বলিয়া এস্থলে বিবৃত করা গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত 'ভূ' ধাতু প্রকৃতে 'হো' হইয়া হিন্দীতে 'হোয়' হইয়াছিল। উহাতেই 'ত'-যোগে 'হোয়ত' পদ অনেক স্থানেই হিন্দীতে দেখা যায়। উহা অসমাপিকা ক্রিয়া; এবং উহার অর্থ হইয়া। ব্রজভাষাতেও এই 'হোয়ত' অনেক দেখা যায়। যথা, ব্রজ হোয়ত আঅল। অর্থাৎ ব্রজ হইয়া আসিল। অদ্যাপি এতদ্দেশেও অপাদানে হইয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, কালীঘাট হইয়া বাড়ী যাইবে। হিন্দীর এই হোয়ত'কালক্রমে 'হোয়তে' হইয়া উচ্চারণসামঞ্জস্য প্রথম প্রথম বাঙ্গালায় 'হৈতে' হইয়াছিল; ভারতচন্দ্রাদির গ্রন্থে ভূরি ভূরি হৈতে'র প্রয়োগ আছে। উক্ত হৈতে' ই এক্ষণে 'হইতে

হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বোধ হয়, হিংতো অপেক্ষা এইটীই অধিক সুসংলগ্ন হয়। সম্প্রতি ষষ্ঠী ও সপ্তমীর বিবরণ প্রদত্ত হইলেই বিভক্তির ব্যাপার শেষ হইয়া যায়।

মৈথিল ভাষার ষষ্ঠীর চিহ্ন ক, কের ও র। 'ক' হিন্দীর 'কা' হইতে গৃহীত। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় ষষ্ঠী স্থানে কের বা কার এবং 'র'র ব্যবহার দেখা যায়; যথা,কতকের,অদ্যকার তাহার। কিন্তু, উৎকল ভাষার ষষ্ঠীর চিহ্ন কেবল 'র'। ভোজপুরীতেও কর, কেকর ইত্যাদি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হিন্দী কা, পাঞ্জাবী দা, মারহাটী চা, নেপালী কো, সিন্ধী জো, গুজরাটী নো। এতগুলি ভাষার ষষ্ঠী চিহ্ন পৃথক পৃথক। তজ্জন্য বাঙ্গালার 'র' মৈথিল বা উৎকল হইতে আসিয়াছে বলিলে, উহাদের 'র' কোথা হইতে এবং কি প্রকারে আসিল, তাহার নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। মারবারীদিগের কথোপকথনে ষষ্ঠীতে র প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং চাঁদ কবির পৃথ্বীরাজ-রাসনামক কাব্যেরও ষষ্ঠীস্থানে 'র' দেখা যায়। হিন্দীর মধ্যে পৃথ্বীরাজ-রাসই প্রাচীনতম গ্রন্থ। উহাতে সম্বন্ধ স্থানে 'র' থাকায়, পরবর্ত্তী গ্রন্থ সমূহে 'কা' কোথা হইতে আসিল, ইহা লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলেন ; যাহা হউক, ভোজপুরী 'কর' এই বিবাদের কতকটা নিরাকরণ করিয়াছে। উহা ক ও র'র মধ্যে অবস্থিত।*

*প্রাকৃত ভাষায় ষষ্ঠী স্থানে কেলক,কেরকও দেখা যায়। উহা হইতেই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভোজপুরী কর হইয়া থাকিবে। উহার 'কর"এর, মূল প্রাকৃত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু, প্রাকৃতে সংস্কৃতানুযায়ী কোন কোন স্থানে 'সস" হইয়া, আবার কোথাও বা 'কেলক" 'কেরক" হইল কিরূপে; ইহার মূলানুসন্ধান বড়ই দুরূহ। দুই এক জন সাহেব অনুমান করেন, সংস্কৃত 'কৃতক" হইতে প্রাকৃতের 'কেরক" হইয়াছে। আমাদের কিন্তু, ইহা ভাল বোধ হয় না।

উহার পূর্ব্বতন ভাষাগুলি ষষ্ঠীতে 'ক' লইয়াছে; এবং অধস্তন ভাষাগুলি সম্বন্ধে 'র' গ্রহণ করিয়াছে। তাহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে, যে, উড়িয়া, বাঙ্গালা ও আসামী ভাষা উহার পর প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

অধিকরণে মৈথিলীতে মেঁ, মোঁ পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। উহার আধুনিক অধিকরণ চিহ্ন 'এ'; বাঙ্গালাতেও অধিকরণে এ হয়। উৎকল ভাষার অধিকরণ চিহ্ন 'রে'। উহার সহিত বাঙ্গালার কোন সংশ্রব নাই।

কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালার কর্ম্মকারকের 'কে' প্রকৃত পক্ষে বিভক্তির চিহ্ন নহে। উহা 'প্রাক্ টেরক্ স্বার্থে' এই সূত্রানুযায়ী 'টি'র পূর্ব্বে অকাদেশ। কারক চিহ্ন হইলে সর্ব্বত্রই তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হইত।

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই। লেখক মহাশয় যে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন,তাহা তাঁহার এবংবিধ অসঙ্গত ধারণাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তিনি টি'র পূর্ব্বে যে অকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা সর্ব্বপ্রাতিপদিকের পক্ষে নহে। তদ্বিষয়ে মুগ্ধবোধের সূত্রে এই—

"ত্যাদিব্যাসভোসূক্তিস্ত্রিস্ত্রের্বাক্ প্রাক্ টের্ব্যকদশ্চ"।

ইহার অর্থ এই। ত্যাদ্যন্ত, অব্যয়, স, ভ ওস্ ভিন্ন বিভক্ত্যন্ত সর্ব্বনাম পদ, এবং কেবল সর্ব্বনাম শব্দের টির (অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণের) পূর্ব্বে বিকল্পে অক্ হয় এবং অব্যয়ের ক স্থানে দও হয়।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে তিঙন্তপদ, অব্যয়, স, ভ, ওস্ ভিন্ন বিভক্ত্যন্ত সর্ব্বনাম পদ এবং সর্ব্বনাম শব্দ ভিন্ন অন্যত্র অক্ হইতে পারে না। কিন্তু, লেখক মহাশয় উহার উদাহরণ দিয়াছেন, যথা, কন্যা এব কন্যকা। পাঠকগণ! এই 'কন্যা এব কন্যকা' স্বার্থে ক'র উদাহরণ। টির পূর্ব্বে অকের উদাহরণ নয়। তাহা হইলে, 'হরি'

এই শব্দের টির পূর্ব্বে অক্ করিলে 'হরকি' হইয়া পড়ে, 'হরক' হয় না। তবেই তাহা হইতে ক্রমে হরিকে কি প্রকারে হইবে।

লেখক মহাশয়ের মত, ঐ 'অকই' 'কে' হইয়া কর্ম্মকারকবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, রামক—রামকে।

যদি তাহাই হইল, তবে'হরকি'র ইকার স্থানে একার করিয়া 'হরকে ডাক' ইত্যাদিরূপ বাক্যে 'হরিকে' না 'হরকে, ডাকা যাইবে? কারণ, হরিশব্দে অক্ যোগে নিষ্পন্ন 'হরকি' স্থানেই কর্ম্মবৎ 'হরকে' হইয়াছে। অতএব, কাহাকে যে ডাকা যাইবে, সে বিষম সমস্যার কথা। আমাদের বোধ হয়,নাড়া চাড়া বিদ্যার দোষেই লেখকমহাশয় এরূপ বিভ্রান্ত হইয়াছেন। অপঠিত বিদ্যা বিদ্যাই নয়। যাহা হউক, এক্ষণে উহাকে স্বার্থে 'ক' ধরিয়া লইলেই বা কি হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। সকল প্রাতিপদিকের উত্তরও স্বার্থে ক প্রত্যয় হয় না। যাবাদি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর স্বার্থে ক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ক প্রত্যয় দ্বারা আর একটী শব্দ নিষ্পন্ন হয়। উহার উত্তর সুবাদি বিভক্তি যুক্ত হইলে, তবে তাহারা সুবন্ত পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। কন্যা শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' করিয়া কন্যকা শব্দ হইল। উহাতে বিভক্তি যোগ হইলে কন্যকাকে, কন্যকাদ্বারা, কন্যকাতে এইরূপ পদ বাক্যে প্রযুক্ত হইতে পারে। 'ক' প্রত্যয়ের রূপান্তরে 'কে' হইলে, কখনই উহাকে পদ বলিয়া গণ্যকরা যায় না। পদ না হইলেও বাক্যে প্রযুক্ত হইবেনা। অতএব,রামকে ডাক,হরিকে বল ইত্যাদি স্থলে স্বার্থে ক নহে ; কর্ম্মবিভক্তিস্থানীয় 'কে' নিশ্চিত। স্থলবিশেষে সেই বিভক্তির লোপ হয়, বলিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। তজ্জন্য জল খাও, বই পড় ইত্যাদি স্থলে জলকে, বইকে এরূপ প্রয়োগ হইবে না। সংস্কৃতেও 'মধুগৃহাণ' 'বারি পিব' ইত্যাদি স্থলে বিভক্তির লোপ হইয়াছে বলিয়া যে উহাদের উত্তর আদৌ বিভক্তি হয় নাই, এরূপ বলা অসঙ্গত। সুতরাং, আমাদের কর্ম্মকারকের 'কে' টির পূর্ব্বে অক্ বা স্বার্থে 'ক' কিছুই নহে। উহা বিভক্তির আকৃতিই বটে, তাহা নিঃসন্দেহ।

ষষ্ঠী-স্থানীয় 'র' লইয়াও লেখক মহাশয় 'টামোর্ণঃ'সূত্র দ্বারা ণ স্থানে র করিবার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বেচ্ছোক্তি এবমাদিক স্থলে শোভা পায় না, অন্যত্র পাইতে পারে। মূর্দ্ধন্য ণকারের ডকারবৎ উচ্চারণ হইলে অন্যত্রও তদ্রূপ হইবে, একথা সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার্য্য। প্রাকৃতাধ্যায়ে সংক্ষিপ্তসারের আর একটী সূত্র এই।

ইণঃ শসৃঙসোর্ণোঃ।

ইণ উত্তরয়োঃ শস্ঙসোঃ স্থানে ণো র্ভবতি, যথা, অগ্গিণো। ইহার অর্থ এই—ইকারান্ত, উকারান্ত, শব্দের পরস্থিত শস ও ঙস্ স্থানে ণো হয় ; যেমন অগ গিণো।

এস্থলে দ্বিতীয়ার বহুবচন ও পঞ্চমীর একবচন উভয় স্থলেই 'অগ্গিণো' হইয়াছে। উহারও মূর্দ্ধন্য ণকার স্থানে ডকার হইবার আপত্তি কি? তাহা হইলে তদুভয় স্থলেও বাঙ্গালার 'র'কার হইত। কিন্তু, বাঙ্গালার দ্বিতীয়ার বহুবচন বা পঞ্চমীর একবচনে রকার হয় না। অধিকন্তু,মূর্দ্ধন্য ণকারের ডকারবৎ উচ্চারণ হইতে পারে, রকারবৎ নয়। অতএব, উক্তরূপ মূর্দ্ধন্য ণকার হইতে বাঙ্গালার ষষ্ঠীর 'র' হয় নাই। আমরা একরকমে উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। বোধ করি, তাহা নিতান্ত অসঙ্গতও হইবে না।

মৈথিল ভাষায় অস্মদ ও যুষ্মদ শব্দের বহুবচনে 'হমরা' ও 'তোহরা' হয়। উহা হইতেই

বাঙ্গালার 'আমরা' 'তোমরা' হইয়াছে। সংস্কৃত এতদ্ শব্দ স্থানে মৈথিল ভাষার 'এহি'। উহা হইতেই বাঙ্গালার এই। সংস্কৃত যদ,হিন্দী জো, মৈথিল জে, বাঙ্গালা যে। সংস্কৃত তদ, হিন্দী সো, মৈথিল সে, বাঙ্গালা সে। অন্যান্য বিভক্তিতে তদ্শব্দস্থানে মৈথিলীতে 'তাহি' হইয়া থাকে। যথা, তাহি কেঁ, তাহি সঁ ইত্যাদি। উহা হইতেই উৎকল ভাষায় 'তাহা' হয়। যথা, তাহাকু, তাহা ঠারু। উৎকলের ন্যায় বাঙ্গালাতেও 'তাহা' ব্যবহৃত হইতেছে। যথা, তাহাকে, তাহাদ্বারা। অতএব, বাঙ্গালার 'তাহা' উৎকল হইতে গৃহীত ; এবং উৎকলের 'তাহা' মৈথিলীর 'তাহি' জাত, তাহা নিঃসন্দেহ।

সম্ভ্রমস্থলে তদ্ শব্দস্থানে মৈথিল ভাষায় তনিকা, তনিকাকে, এবং কিমুশব্দ স্থানে কনিকা কনিকাকে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উহা হইতেই আমাদের ভাষায় তিনি, তাঁহাকে এবং কনি, কাঁহাকে হইয়াছে। সংস্কৃত কোহি হইতে হিন্দী কেহি, মৈথিল কেহো, গ্রাম্য কেও, উৎকল কেহি, গ্রাম্য কেউ, বাঙ্গালা কেহ, গ্রাম্য কেউ নিষ্পন্ন, ইহা একরূপ অবধারিত। বিভক্তির আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইল। অতঃপর ক্রিয়া প্রকরণের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

বঙ্গীয় প্রবচনাবলী।

আজকাল বঙ্গভাষার প্রতি লোকের যেরূপ সাগ্রহ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তাহাতে বড়ই আশার উদয় হয়। যে অবধি ত্রিকালবর্শী ঋষিগণ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণয়নে ক্ষান্ত রহিয়াছেন। সেই অবধি আমাদের এই বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত বৃন্দ সেই মুনিঋষিগণের শাস্ত্র হইতে নীতিরত্ন উদ্ধার করিয়া সকল প্রবচনবাক্য প্রচার করিয়াছেন। সেই সকল প্রবচনাবলী আমাদের এই সংসারেতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই সকল প্রবচনাবলী আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের মুখেও যথেষ্ট শ্রবণ করিয়াছি। আমাদের দেশের লোকের সাংসারিক জীবনে কোনরূপ ঘাত প্রতিঘাত হইলেই তাহার মুখ হইতে প্রবচনাবলী স্ফুরিত হয়। ইয়ুরোপের প্রবচনাবলী গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া কত সংস্করণে বাহির হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে গণনা করিবে। বালকের পাঠ্যপুস্তকে অভিধানের চতুঃপার্শ্বে প্রবচনাবলী মুদ্রিত রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে প্রবচনাবলীর উন্নতি নিরীক্ষণ করা যায় না। যত্ন বিনা কিছুই সুরক্ষিত ও সুফলদায়ক হয় না। অস্মদ্দেশীয় প্রবচনাবলী যত্ন বিনা ক্রমে ক্রমে কালের অতল গর্ভে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। যাহাতে আমদের মধ্যে এই প্রবচনাবলীর পুনঃপ্রচার হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা উহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রবচন।

১। অবোধকে বুঝাব কত বোধ নাহি মানে।
ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে॥
২। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
৩। অতি ছোট হোয়না ছাগলে মুড়ে খাবে।
অতি বড় হোয়না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে॥
৪। অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হবে।
৫। অতি বুদ্ধির গলায় দড়ী।
বুদ্ধি জান গড়া গড়ী॥
৬। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

৭। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
৮। অতি বড় ঘরণী না পান ঘর।
অতি বড় রূপসী না পান বর॥
৯। অপব্যয় কোরনা, অভাব হবেনা।
১০। অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল,
মশা মারতে গালে চড়।
১১। আমি বেহায়া পেতেছি পাত,
কোন বেহায়া না দেবে ভাত।
১২। আপনার বেলায় আঁটি শাটি,
পরের বেলায় দাঁত কপাটী।
১৩। আর করিস্ না ভুয়ো জাঁক,
যেমন আছিস তেমনি থাক॥
১৪। আপ্রুচি খানা, পরুচি পর্না।
১৫। আপ ভাল ত জগৎ ভাল।
১৬। ইচ্ছা থাকে যার, উপায় হয় তার।
১৭। এত সুখ তোর কপালে,
তবে কেন তোর চট বগলে।
১৮। এগুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা, পেছুলেও ভেড়ের ভেড়ে।
১৯। এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে,
আর গাঁয়ে মাথা ধরে
২০। একের বোঝা দশের লাঠি।
২১। একে বুড়ি নাচুনি তায় নাতির বিয়ে।
২২। এক ভস্ম আর ক্ষার, দোষ গুণ কব কার।
২৩। কম্বলের লোম বাছতে গেলে কিছুই থাকেনা।
২৪। কপালে নাইক ঘি, ঠক্ ঠকালে হবে কি।
২৫। কল্লা দেখে আল্লা ডরায়।
২৬। কাকের মাংস কাকে খায় না,
জোঁকের গায়ে জোঁক বসেনা।
২৭। কপাল হোল এক পেসে,
সবই বলে ফ্যান খেসে।
২৮। কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি
২৯। কোথা কার কে, আমড়া ভাতে দে।
৩০। কারও হোল সর্ব্বনাশ,
কারও হোল পৌষ মাস।
৩১। কি সে নাই কি, বেগুণ পোড়ায় ঘি।
৩২। ক চুবনে মুক্তা ছড়ান।
৩৩। কথা টলার চেয়ে পা টলা ভাল।
৩৪। কথার মার বড় মার।
৩৫। কর যদি তাড়াতাড়ি,ভুলের হবে বাড়াবাড়ি
৩৬। কর্জ্জ করে যে, কষ্ট পায় সে।
৩৭। কর যদি কাজ ঠিক সময়ে,
সুফল হবে তার বিনিময়ে।
৩৮। কপট বন্ধু হয় খল,প্রকাশ্য শত্রু তবুও ভাল
৩৯। কুড়ে গরুর রাঙ্গা পালান।
৪০। কার শ্রাদ্ধ কেবা করে,
খোলা কেটে বামুন মরে।
৪১। কিঞ্চিৎ লিখনং, বিবাহেরি কারণং।
৪২। কল্লে যত্ন, মিলে রত্ন!
৪৩। কীর্ত্তির্য্যস্য স জীবতি।
৪৪। খলের পিরিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণেকে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।
৪৫। খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার;
৪৬। খোস খবরের ঝুটাও ভাল।
৪৭। খাট ভাঙ্গলেই ভুমি শয্যা।
৪৮। গজ পৃষ্ঠে যেবা যায়, মেউ দেখে সে ডরায়
৪৯। গোঁপ নাহিক বাবার কালে,
দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে॥
৫০। গতস্য শোচনা নাস্তি।
৫১। গঙ্গা মড়া এলে না।
৫২। গোড়া কেটে আগায় জল।
৫৩। গায়ের কালী ধুলে যায়,মনের কালী মলে যায়
৫৪। ঘরে ছুঁচার কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন
৫৫। ঘর জামায়ে পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচন সমান সুখ।
৫৬। ঘুটে কুড়ুনির ছেলে মোড়ল হয়েছে।
হেঁটে যেতে পারে না পাল্কি চেয়েছে॥
৫৭। ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।
৫৮। ঘু ঘু দেখছ ফাঁদ দেখনি।

৫৯। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।
৬০। চাচা আপ্না বাঁচা।
৬১। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
৬২। চোরে চোরে মাসতুত ভাই।
৬৩। চোখ দিয়েছেন বিধি, দেখ নানান্ নিধি।
৬৪। ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো।
৬৫। ছেঁড়া খোড়া সাড়ী আর সুন্দরী স্ত্রীলোক
ঘটাবেই পথমাঝে পেরেক আটক॥
৬৬। জন জামাই ভাগিনা, তিন নয় আপনা।
৬৭। জোর জার মুল্লুক তার।
৬৮। ঝিকে মেরে বৌকে সেখান।
৬৯। ঠক বাচ্‌তে গাঁ ওজড়।
৭০। ঠেটা ঢেঁকির বাদ্য বড়।
৭১। ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও টের
পায় না।
৭২। ঢিল দিয়ে ঢিল্ ভাঙ্গা।
৭৩। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
৭৪। তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।
৭৫। তাড়া তাড়ি কোরনা বিয়ে,
বিয়ে কর রয়ে শয়ে।
তাড়া তাড়ি কর বিয়ে.
পস্তাও তুমি বাড়ি গিয়ে॥
৭৬। দাতায় দান করে, কৃপণ ব্যাটা জলে মরে।
৭৭। দয়া চেয়ে ধর্ম্ম নাই,হিংসা চেয়ে পাপ নাই
৭৮। দশচক্রে ভগবান ভূত।
৭৯। দশে মিলে করি কাজ,
হারি জিতি নাহি লাজ।
৮০। দুঃখে প ড়ে হয় জ্ঞানী, যদিও না হয় ধ
৮১। দুষ্ট এ ড়ে চেয়ে খালি গোয়াল ভাল।
৮২। দাঁত থাকৃতে দাঁতের মর্য্যাদা,
বুঝলেনা, যে সে বড় গাধা।
৮৩। দোষ কর্‌লে একজন,নিন্দার ভাগি অন্যজন
৮৪। ধর্ম্মের বাড়া ধন নাই।
৮৫। ধান ভাঙ্‌তে শীবের গীত।
৮৬। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ,
যদি বর্ষায় মাঘের শেষ।
৮৭। ধরি মাচ না ছুই পানি।
৮৮। নাইবা দিলে তাই বা কি,
গুড়ে মণ্ডার অভাব কি।
৮৯। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।
৯০। নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।
৯১। নদ নদী আর সময়, কারও হাত ধরা নয়।
৯২। নিজের কোলে ঝোল সবাই টানে।
৯৩। নাচ্‌তে না জানলে উঠান বেঁকা।
৯৪। নিজে শুতে ঠাঁই পায়না
শঙ্করাকে ধরে টানে।
৯৫। নাতোয়ানের দুনা মালগুজারী।
৯৬। নিরাখালের খোদায় রাখাল।
৯৭। নচ দৈবাৎ পরং বল।
৯৮। নরম পেলে ফকিরে বেগার ধরে।
৯৯। নীচ যদি উচ্চ ভাসে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে
১০০। পড়াবি তো পড়া পো,
না পড়াস্ তো সভায় থো।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

মেঘদূত।

উত্তর মেঘ।

১

বিদ্যুত্বন্তং ললিত বনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহত মুরজাঃ স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময় ভুবস্তুঙ্গ মভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্ব্বিশেষৈঃ॥

"তব সম শোভা ওহে জলধর,
ধরে সে সাধের অলকানগর।
তোমার শরীরে খেলিছে বিজলী,
অলকায় শোভে সুন্দরী মণ্ডলী।
রামধনু তব দেহে শোভা পায়,
চিত্রিত প্রাচীর অলকার গায়।
তুমি কথা কও গভীর গরজে,
মৃদুল মুরজা অলকাতে বাজে।
তোমার অন্তর সলিলে পুরিত,
মণিময় ভূমে অলকা খচিত।
অতি উচ্চে তুমি কর হে বিহার
আকাশে অসংখ্য চূড়া অলকার॥

২

হস্তে লীলাকমললকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং।
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

দেখিতে সাধের অলকানগরে,
শোভে যুবতীরা কুসুম হারে।
কমল জিনিয়ে সুকোমল ভুজে,
অম্লান কমল সতত বিরাজে।
ঘন কৃষ্ণ বর্ণ অলকে সবার
সদা শোভে নবকুন্দফুলহার।
লোধ্র কুসুমের তুলিয়ে পরাগ,
চাঁদ মুখে মাখে করিয়ে সোহাগ।
নব কুরুবক যতনেতে আনি
দোলায় চূড়ায়, যত সোহাগিনী।
শ্রবণে শিরীষ, কদম্ব শিরেতে
পরে যুবতীরা আমোদ ভরেতে॥

৩

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা।
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাপ্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ

"বারমাস ফোটে পাদপে ফুল,
ধায় মধুকর হয়ে আকুল।
মৃণালে কমল সদাই শোভে,
ধায় হংসকুল কমল লোভে।
নাচিছে ময়ূর বিবিধ ছাঁদে,
শোভে পুচ্ছ তায় অসংখ্য চাঁদে।
কেকা রবে তারা দিক্ মাতায়,
কাননে কোকিল পঞ্চমে গায়।
চিরকালই নভে শশাঙ্ক হাসে,
তমরাশি হরি আনন্দে ভাসে।
সুধা ধবলিত প্রাসাদ গুলি,
হাসে নীরবেতে সন্তাপ ভুলি॥

৪

আনন্দোত্থং নয়ন সলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুম শরজাদিষ্ট সংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয় কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদ্যদস্তি॥

সুখময় সেই অলকাধামে
নাহি কোন কথা সন্তাপ নামে।
সুধুই আনন্দে নয়ন ঝরে,
জর্জ্জরিত সবে কুসুম শরে।
দিবারে যাতনা অপর বাণ,
জানেনা সে দেশে—এমন স্থান
প্রিয় সমাগমে বিরহক্লেশ,
রবি করে তম সম হয় শেষ।
বিচ্ছেদ যা হয় কলহ হ'তে,
প্রণয় কলহ যেন' মনেতে।
চিরকালই তথা যৌবন রহে
জানেনা বার্দ্ধক্য কাহারে কহে॥

৫

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধুরতিফলং কল্পবৃক্ষ প্রসূতং
ত্বদ্গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষাহতেষু ॥

যক্ষগণ তথা সুন্দরী সনে
ভ্রমে হর্ষভরে আনন্দ মনে।
স্ফটিকরচিত প্রাসাদে যায়,
রতিফলমধু আনন্দে খায়।
নির্ম্মল স্ফটিকে তারকা ছবি,
বোধ হয় যেন অসংখ্য রবি।
তোমার নিনাদ গম্ভীর যথা,
মধুর মৃদঙ্গ বাজয়ে তথা।
সুন্দর মধুর অলকাধাম,
জুড়ায় হৃদয় শুনিলে নাম।
আর কি তথায় যাব হে সখা!
পাব কি প্রিয়ার আবার দেখা?"

৬

মন্দাকিন্যাঃ পয়সি শিশিরৈঃ সেব্যমানামরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতা মুষ্টিনিক্ষেপ গূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥

মনোহর তরুর শীতল ছায়,
যক্ষবালাগণ আনন্দে ধায়।
অমর বাঞ্ছিত যক্ষের বালা,
কত রকমেতে করেহে খেলা,
কভু বা মাণিক লইয়া করে,
স্বর্ণ রেণু মাঝে লুকায় তারে।
আবার যতনে খুঁজিতে ধায়,
পদক্ষেপে সুধা ছোটে যে তায়।
মন্দাকিনী নীর হৃদয়ে ধ'রে,
ধায় সমীরণ সেবার তরে।
মন্দার নিচয় প্রদানি ছায়া,
আতপে লুকায় ননীর কায়া ॥

৭

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিত শিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃত করেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চ্চিস্তুঙ্গানভি মুখমপি প্রাপ্য রত্ন প্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফল প্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥

যখন গগনে শশাঙ্ক হাসে,
রহে যক্ষবালা নাগর পাশে।
মদনেতে মাতি নায়কগণ,
হরিবারে চায় কান্তার বসন
সলাজে সুন্দরী নায়কে ধরে,
বলে কত মত বিনয় করে।
গৃহেতে রতন প্রদীপ জ্বলে,
হরে অন্ধকার নিশীথ কালে
মনে ভাবে কুঙ্কুম লইয়ে করে
নিবায়ে প্রদীপ থাকি আঁধারে।
লাজেতে অবশ এতই হয়
নিবাইতে নারে প্রদীপচয় ॥

৮

নেত্রা নীতাঃ সতত গতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং সজল কণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্তাদৃশা যত্র জালৈ-
র্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জ্জরা নিষ্পতন্তি।

অলকা নগরে বারিদদল
পশি উচ্চ গৃহে রবষি জল,
মুছিয়া গৃহের প্রাচীরছবি
যায় পলাইয়া, মনেতে ভাবি
কি জানি কেহবা ধরিয়া তারে
রাখে গৃহ মাঝে আবদ্ধ করে;
তাই তাড়াতাড়ি গবাক্ষ দিয়ে
ধূমরূপ ধরি যায় পলাইয়ে।
সপ্ততল উচ্চ প্রাসাদ হতে,
যায় যবে মেঘ আকাশ পথে,
দেখিতে বড়ই সুন্দর হয়,
সুনীল আকাশে জলদ চয় ॥

৯

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুট জললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥

"নির্ম্মেঘ আকাশে চাঁদের হাসি
লভি চন্দ্রকান্ত-রতনরাশি
(বিতানে লম্বিত সুতায় গাঁথা)
বর্ষে জলবিন্দু মুকুতা যথা।
মদন-সমরে কাতর হলে,
গায়ে মাখে বারি অবলাদলে।
কান্তভুজ-পাশ শিথিল করি
উঠি গায়ে মাখে শীতল বারি ॥

১০

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতি যশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি ॥

যথায় কিন্নর সবে সুমধুর কণ্ঠরবে
দিন রাত কুবেরের যশঃ-গান গায়,
অমূল্য রতনময় সপ্ততল গৃহচয়
দেখিবে যাইয়া তুমি সেই অলকায়।
অলকার উপবনে অপ্সরা-অবিদ্যা সনে
কিন্নরে লইয়া সাথে ভ্রমে যক্ষগণ
কভু কল্পতরু ছায় মনোসুখে সবে ধায়
কভুবা সরসীনীরে করে সন্তরণ ॥

১১

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণ বিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥

দেখিবে সে অলকায় পথে গড়াগড়ি যায়
অপ্সরা অলক-ছিন্ন সুচারু কমল,
মন্দার শ্রবণ হতে পড়ে সে অলকাপথে
স্তনশোভা-হার-ছিন্ন-মুকুতাপটল
ছিন্ন ভিন্ন লতাপাতা ফুল হার যথা তথা
দেখিবে হে প্রত্যূষেতে পথের মাঝেতে,
অভিসার চিহ্ন বলে মনে যেন সে সকলে;
দেখিবে হে সখে তুমি যাইতে যাইতে ॥

১২

মত্বা দেবং ধনপতি সখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্।
সদ্রূভঙ্গ প্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ-
স্তস্যারব্ধশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥

অলকায় করে বাস যক্ষ মিত্র কুবের বাস,
তাই ভাবি ভয়ে যেন মকরকেতন
মধুকর গুণশালী শরাসন দূরে ফেলি
রিক্তহস্তে অলকায় করেন ভ্রমণ।
মনেতে বিশ্বাস স্থির প্রেমদৃষ্টি সুন্দরীর
ভ্রূধনুতে যুড়ি কারে করিলে সন্ধান
সহস্র কুসুম শরে যাহা না করিতে পারে
নিশ্চয় করিবে তাহা নারী-নেত্রবাণ ॥

১৩

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়াবিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥

বড়ই আশ্চর্য্য হায়! দেখিবে সে অলকায়
এক মাত্র কল্পতরু সবে করে দান।
বসন সুন্দর কত পায় তথা অবিরত
যক্ষবালা যাহা পরি মাতায় পরাণ।
প্রাণমন-মাতোয়ারা মধুর মধুর সুরা,
নব কিশলয় সহ কুসুমের হার
রক্ত সম লাক্ষারাগ অবলার অনুরাগ,
হয় যাতে, কল্পতরু দেয় ভার ভার ॥

১৪

তত্রাগারং ধনপতি গৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতোমে
হস্ত প্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥

রতন খচিত দ্বার রামধনু প্রায় যার
অপূর্ব্ব সুন্দর শোভা পাইবে দেখিতে,
অভাগার সেই গৃহ মনে রেখো অহরহ
কুবেরের গৃহ হতে কিছু উত্তরেতে।
দেখিবে তোরণ দ্বারে বিলম্বিত গুচ্ছ ভরে
শোভে বাল কল্পতরু, যারে প্রাণপণে
পুত্রসম স্নেহ ভরে বারি ঢালি নিজ করে
বর্দ্ধিত করেছে প্রিয়া অতি সযতনে ॥

১৫

বাপীচাস্মিন্ মরকত শিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্যহংসাঃ ॥
গৃহে মোর বিদ্যমান মরকতে নিরমাণ
সুন্দর সোপানশালী নির্ম্মল সরসী,
কনক কমলচয় সদাই প্রফুল্ল রয়,
মণিময় নালে বাঁধা হাসে দিবানিশি।
শুন ওহে প্রাণসখে, তোমার মূরতি দেখে
ছাড়ি সে সরসী নীর মরাল কখন,
যাবে না মানস সরে, বলিনু নিশ্চয় করে,
এমনি তোমার মূর্ত্তি মানসমোহন ॥

১৬

তস্যাস্তীরে রচিত শিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টন প্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্গোহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাংত্বমেব স্মরামি ॥
সেই সে সরসীতীরে কৃত্রিম পর্ব্বতশিরে
ইন্দ্রনীলে বিরচিত শিখর যাহার,
কনক কদলীতরু চারি দিকে শোভে চারু,
বড় আদরের ধন প্রিয়ার আমার।
সেই গিরিবর সম তব মূর্ত্তি অনুপম
হেরিয়া, কান্তার মুখ পড়িল মনেতে।
বিজলী তোমার শিরে, হেমরম্ভা গিরি পরে,
দুজনে সমান প্রিয় আমার কাছেতে ॥

১৭

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদন মদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥
দেখিবে সে গিরি পরে শোভে কুরুবক শিরে
মধুর মাধবী লতা মানসমোহিনী।
অশোক বকুল দুটি দুই পাশে পরিপাটী
নবকিশলয়ে শোভে দিবস রজনী।
অশোকের মনস্কাম প্রিয়ার চরণ বাম,
লভি পূর্ণ হয়, সুখে কুসুম বিকাশে।
বকুল আকুল মনে প্রিয়ামুখ সুধা পানে
চেয়ে থাকে পথ পানে আমার আবাসে ॥

১৮

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতি প্রৌঢ়বংশ প্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয় সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবস বিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥
সেই দুই তরু মাঝে সুন্দর কনক সাজে
শোভে দণ্ড ময়ূরের বিশ্রাম কারণ।
মণিময় যার মূল নাহি যায় সমতুল
স্ফটিকে প্রথিত থাকি বিতরে কিরণ।
দিবা অবসান হলে শিখি আশি কুতূহলে
বিশ্রাম কারণে বসে দণ্ডের উপরে।
প্রিয়া মোর ফুল্লমনে অলঙ্কার ধ্বনি সনে
নাচাইয়া তালে তালে কত খেলা করে ॥

১৯

এভিঃ সাধো হৃদয় নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিত বপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবন মধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্॥
বলিনু যে চিহ্ন গুলি, সে সকল নাহি ভুলি
যতনে হৃদয়ে রাখি করিও গমন।
মোর গৃহদ্বারোপরে আঁকিয়াছি যত্ন করে
শঙ্খপদ্ম প্রাণসখে করিও দর্শন।

আমার বিহনে হায় আর শোভা নাহি তায়
শ্রীবিহীন হইয়াছে বলিনু নিশ্চয়।
বিনা দিনকরপ্রভা পারে কি রাখিতে শোভা
সহস্র যতন করি কমলিনীচয় ?

২০

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথম কথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥
ত্বরিত গমন তরে করভ শরীর ধরে
আমার আলয়ে সখে করিও প্রবেশ।
বসি সেই গিরি পরে দেখো বন্ধু কৃপা করে
ভবনের অভ্যন্তর, দূরে যাবে ক্লেশ।
খদ্যোতমালার ন্যায় কত রত্ন শোভা পায়,
তারামালা সম শোভে গৃহের প্রাচীরে।
আলেখ্য সুন্দর কত আছে গৃহে মনোমত
তার মাঝে ছবি এক দেখো যত্ন করে।

২১

তন্বী শ্যামা শিখরি দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ ॥
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্যুবতি বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥
কৃশাঙ্গী যুবতী বামা, অপরূপ মনোরমা,
দশন মুকুতা সম মুখে শোভা পায়
ওষ্ঠ জিনি বিম্বফল, মৃগনেত্র সচঞ্চল,
কেশরী সমান শোভে যার মধ্যকায় ;
নিবীড় নিতম্বভরে গতি যার ধীরে ধীরে
পীন পয়োধরে যার হরে মুনিমন,
নিরজনে যেন তারে প্রথম যুবতী করে
বিধাতা যতন করে করিল সৃজন ॥

২২

তাং জানীথাঃ পরিমিত কথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যেশিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥
জীবিত আলেখ্য সম দ্বিতীয় পরাণ মম
সেই মোর জীবনসঙ্গিনী ;
আমি এবে অতি দূরে প্রিয়তমা শূন্য ঘরে
পতিপ্রাণা পতিবিরহিণী।
বিয়োগ-বিধুরা বালা, দারুণ বিরহ জ্বালা,
দুঃখে কাটে সুদীর্ঘ দিবস।
মনে হয় প্রণয়িনী শীতগ্রস্ত কমলিনী
সম এবে হয়েছে বিরব ॥

২৩

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকল ব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণ ক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি ॥
ঢালিয়া নয়ন জল আঁখি দুটি ছলছল,
বিবর্ণ অধর দীর্ঘশ্বাসে ;
রুক্ষ কেশ রুক্ষ বেশ হইয়াছে অবশেষ
মুখে আর বিজলী না হাসে।
করতলে মুখ রাখি দিবানিশি বসি থাকি
মোর চিন্তা করিছে সদাই ;
তুমি যেন শশধর ঢাকিয়াছ জলধর
প্রিয়া মোর হইয়াছে তাই ॥

২৪

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুর বচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বংহি তস্যপ্রিয়েতি ॥
দেখিবে অলকাপুরে হয়তো পূজিতে হরে
করে প্রিয়া কুসুম চয়ন ;
কিম্বা নির্নিমেষ আঁখি আঁকিতেছে বিধুমুখী
মোর চিত্র করিয়া যতন।
কিম্বা মধু ঝঙ্কারিণী শারিকাকে প্রণয়িনী
মোর কথা করিছে জিজ্ঞাসা ;
বলিছে আদর করে "মনে আছে প্রাণেশ্বরে,,
মনে আছে তাঁর ভালবাসা ?"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অদ্ভুত বৈরনির্য্যাতন।

১

বরিশাল জেলায় জয়নগর বলিয়া এক-খানি গ্রাম আছে। জয়নগরে নানাশ্রেণীর লোকের বাস থাকিলেও আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তথায় এক ঘর ব্রাহ্মণ ও এক ঘর মুসলমান ব্যতীত আর উল্লেখ যোগ্য সঙ্গতিপন্ন লোক কেহ ছিল না। বিশেষতঃ আমাদের বর্ণিত আখ্যায়িকার সহিত এক জন নীচজাতীয় শ্রমজীবী ব্যতীত অপর কাহার সংশ্রব নাই বলিয়া আমরা জয়নগরের অপরাপর অধিবাসিবর্গের বিবরণ বিবৃত করা অনাবশ্যক মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলাম।

আমাদের বর্ণিত ব্রাহ্মণ পরিবারে চারিটী লোক। ব্রাহ্মণ স্বয়ং, তাহার স্ত্রী ও একটী পুত্র এবং একজন ভৃত্য। ব্রাহ্মণের নাম নীলকমল চক্রবর্ত্তী, বয়স আনুমানিক ৪০। ৪২ বৎসর। নীলকমলের সহধর্ম্মিণীর নাম বিমলা দেবী, বয়স আন্দাজ ২৫ বৎসর। বিমলা দেবী গুণে সরস্বতী না হউক, রূপে লক্ষ্মী ছিল। ঐ কাল রূপই তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনের হেতু হইয়াছিল। নীলকমলের পাঁচ বছরের একটী পুত্র। পুত্রের নাম ননীগোপাল। ননীগোপাল যেমন রূপেও পরম সুন্দর, গুণেও তেমনি শান্তশিষ্ট। অতি কমনীয় কান্তি, যেন ননীরই গোপাল; দেখিলেই প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। নীলকমলের পিতৃপুরুষেরা গুরুগিরি ও যাজকক্রিয়া দ্বারা কিছু নগদ অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন; ভালরূপ বাড়ী ঘর দুয়ার, বাগ্-বাগিচা ও জমিজিরাত কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। নীলকমল ইদানীং যাজক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু গুরুগিরি পরিত্যাগ করে নাই। তাহার পৈতৃক অনেকগুলি শিষ্য ছিল। শিষ্যদের অনেকের অবস্থাই ভাল। নীলকমল মধ্যে মধ্যে শিষ্য বাড়ী গিয়া যথেষ্ট প্রণামী লইয়া আসিত। নিজোপার্জ্জিত সেই প্রণামীর টাকা পৈতৃক টাকাতে মিশাইয়া নীলকমল সুদি কারবার করিত। নীলকমলের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না, এই সুদি-কারবার দ্বারা কিন্তু সে কালে পাকা বাড়ী বাগ বাগিচা ও বিস্তর ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল।

আমরা যে মুসলমান পরিবারের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারাই গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। কালক্রমে জনবলের সহিত বিষয়-সম্পত্তির হ্রাস হইলেও এখনও একটী দুই চত্তরবিশিষ্ট প্রশস্ত একতালা পাকা বাড়ী, আমকাঁঠালাদি ফল ফুলরির একটী প্রকাণ্ড বাগিচা, সদর মফঃসলে দুইটী বৃহৎ পুষ্করিণী ও ৫০০ শত বিঘা আয়মা উক্ত মুসলমান পরিবারের একমাত্র বংশধর মুন্সী নৈমুদ্দিনের অধীনে বিদ্যমান থাকিয়া জয়নগরের মুন্সীসাহেবদিগের মানসম্ভ্রম অটুট রাখিয়াছিল। নৈমুদ্দিনের কোন পূর্ব্বপুরুষ কোন রাজসংসারে মুন্সিগিরি কর্ম্ম করিয়া বিষয় বিভবাদির সহিত 'মুন্সী' উপাধি লাভ করেন। পরে ঐ উপাধি কৌলিক হইয়া যায়। নৈমুদ্দিন লেখাপড়া জানিত না; তবুও লোকে তাহাকে 'নৈমুদ্দি মুন্সী' বলিয়া ডাকিত।

নৈমুদ্দিনের বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে। বর্ণ শ্যাম, চেহারা দোহারা, খুব গুণ্ডাগাণ্ডা। স্বভাব গোঁয়ার গোবিন্দ গোছের, কিন্তু মনটা খুব শাদা। পরোপকার নৈমুদ্দিনের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রবলের পীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে

রক্ষা, অতিথিসজ্জনের সৎকার এবং যাচক মাত্রকেই কিছু কিছু দান প্রভৃতি সাধু কার্য্য নৈমুদ্দিনের দ্বারা নিত্যই অনুষ্ঠিত হইত। এ সংসারে পরোপকার করিতে গেলে কেবল মাত্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিস্তার নাই, সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বিড়ম্বনাও ভোগ করিতে হয়। পরোপকার-ব্রতাবলম্বী নৈমুদ্দিনের ভাগ্যেও যে, সে বিড়ম্বনা ভোগ মাঝে মাঝে ঘটিত না এমত নহে। মধ্যে মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা উপলক্ষে অনেকের সহিত নৈমুদ্দিনের মোকর্দ্দমা বাধিত। তাহাতে তাহার অনেক অর্থ নষ্ট হইয়া যাইত। নৈমুদ্দিনের সংসারে তাহার একমাত্র সহধর্ম্মিণী, আর তাহাদের পরিচর্য্যার নিমিত্ত ২ জন দাসী, ১ জন ভৃত্য ব্যতীত আর কেহই ছিল না। বাগানের আম-কাঁঠাল, পুকুরের মাছ, নিজের খরচ বাদে নৈমুদ্দিন সব বিলাইয়া দিত, কখন বিক্রয় করিত না। নৈমুদ্দিনের চাষবাস ছিল না; আয়মাতে ঝর্ ঝরে হাজার টাকা আয় ছিল। নৈমুদ্দিন মিতব্যয়ী হইলে ঐ হাজার টাকা আয়ে পাড়াগাঁয়ে তাহার রাজার হালে চলিয়া যাইত। কিন্তু পরোপকার ও দানের দায়ে তাহার ঐ আয়ে কোনমতেই চলিত না, বর্ষে বর্ষে ঋণ হইয়া পড়িত। নৈমুদ্দিন আবশ্যকীয় আয় বাঁচাইয়া আর সে ঋণ শোধ দিতে পারে নাই। পরিশেষে ঐ ঋণের দায়েই হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অট্টালিকাবাসী নৈমুদ্দিনকে কুটিরবাসী হইতে হইয়াছিল। একা নৈমুদ্দিনের কেন, অপরিণামদর্শী অপব্যয়ীদিগের পরিণাম ফল এইরূপই দাঁড়াইয়া থাকে।

নৈমুদ্দিনের স্ত্রীর নাম ফাতেমা বিবি। ফাতেমা বিবি যেমন রূপবতী তেমনী বুদ্ধিমতী। ফাতেমা বিবি অপরিমিত ব্যয়ের নিমিত্ত স্বামীকে সততই ভৎর্সনা করিত। যাহাতে নৈমুদ্দিন আয় বুঝিয়া ব্যয় করে, সেজন্য সে নিয়তই বুঝাইত। বিবি ফাতেমা যে কৃপণস্বভাবা রমণী ছিলেন তাহা নহে, তবে ঋণ করিয়া ব্যয় করা তাহার মতে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সেইজন্যই তিনি স্বামীকে ভৎর্সনা করিতেন। নৈমুদ্দিন বুদ্ধিমতী বনিতার হিতবাক্য শুনিতনা, তজ্জন্যই তাহাকে শীঘ্রই দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হইয়াছিল। তবে পরোপকার ও দানের ফল ব্যর্থ হয় নাই; নৈমুদ্দিন ভবিষ্যতে সে ফলের ভোগী হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ঘটনাতেই পাঠকগণ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

২

পাঠক! নীলকমলের বাহ্য পরিচয় পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবারে একটু ভিতরকার পরিচয় প্রদান করিব। নীলকমল লোকটা বড়ই মিতব্যয়ী ছিল, বাঁসাখরচ ব্যতীত একটি অতিরিক্ত পয়সাও নীলকমল বাজে ব্যয় করিতে জানিত না। পাঠক! যদি নীলকমলকে কৃপণ বলিতে চাহেন, আমরা তাহাতে দুঃখিত নহি। নীলকমল কৃপণ হউক তাহাতে তত আসে যায় না; কিন্তু তাহার পরের সম্পত্তি দেখিলে কিছু চক্ষু টাটাইত। উহাই তাহার মহৎ দোষ ছিল। নিজের নগদ টাকা যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু ভূসম্পত্তি কিছুমাত্র ছিল না। সেইজন্য কলে-কৌশলে পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার স্পৃহাটা নীলকমলের বড়ই প্রবল ছিল। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নীলকমল সম্পত্তিশালী লোক দেখিয়া টাকা কর্জ্জ দিত।

নীলকমল ২০। ২৫ হাজার টাকার মালীক হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র ভূসম্পত্তি না থাকায়, মুন্সী নৈমুদ্দিনের ন্যায় মান সম্ভ্রম লাভ করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই। সে

সংস্কৃত	গাথা
যথা	যথ
রাত্র্যাঃ	রাত্তিয়ে
গ্লান	গিলান
স্ত্রী	ইস্তি
তুর্য্য	তুরীয়
ক্লেশ	কিলেশ
দেব্যাঃ	দেবিয়ে
০ নির্ম্মলান্	০নির্ম্মলং
আসনাৎ	আসনিনা
উর্দ্ধৌহস্তৌ	উর্দ্ধহস্তা
দদাসি	দদসি
রংস্যসে	রমিষ্যসি
উত্তিষ্ঠ	উত্থি
শৃণু	শুনুহি
ভবিষ্যসি	ভেষ্যি
শ্রুত্বা	শুনিত্য

উল্লিখিত শব্দ সকলের মধ্যে গিলান, তুরীয়, কিলেশ প্রভৃতি শব্দে সম্প্রসারণ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। বিশুদ্ধনির্ম্মলং, আসনিনা প্রভৃতি পদে 'সুপ্তিঙপ্রগ্রহেত্যাদি' পাণিনীয় বৈদিক সূত্রানুসারে সুপ্ ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। উর্দ্ধহস্তা স্থলে 'সুপাং সুলুক্' সূত্রের কার্য্য দেখা যাইতেছে; এবং রমিষ্যসি, শুনুহি প্রভৃতিতে প্রাকৃতবৎ কার্য্য প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএব গাথা, প্রাকৃত বা পালী স্বতন্ত্র ভাষা নহে। উহাদের পর ভাষাশব্দের যোগদ্বারা অনেকে প্রাকৃত ভাষা, পালী ভাষা এইরূপ বলিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তত্তৎ স্থলে ভাষা শব্দের অর্থান্তরগ্রহ করিতে হইবে। সাধুভাষা, গ্রাম্যভাষা বলিলে যেমন একটা স্বতন্ত্রভাষার বোধ হয় না, তদ্রূপ এস্থলেও প্রাকৃতভাষা বা পালীভাষা দ্বারা স্বতন্ত্র ভাষা বুঝাইবে না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।

চতুরাশ্রম।

(প্রথম প্রস্তাব।)

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দুজীবনের কোন বিশিষ্ট ছেদ নাই; উহা বিশৃঙ্খলতাময়। জীবন যেমন বিশৃঙ্খল, তৎসংসৃষ্ট কার্য্যকলাপও তদ্রূপ। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই প্রতীয়মান হয়—বিশেষ বর্ত্তমান কালে। কিন্তু তাহা নয়। হিন্দুজীবনের নিমেষমাত্রও অকারণ বিভক্ত নয়। হিন্দুজীবন গর্ভশয্যাহইতে অনন্তশয্যা পর্য্যন্ত স্বভাবের অনুকূলানুযায়ী বিভক্ত। এ কার্য্যে হিন্দু—ঋষিগণের যেরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, বোধ হয় জগতে অপর কোন জাতির তদ্রূপ লক্ষিত হয় না। তাঁহারা সে ভাগ যথোপযুক্তরূপে সজ্জিত করিয়া গিয়াছেন; সে স্তর পরস্পর শৃঙ্খলের ন্যায় গ্রথিত। উহা, অব্যবহিত পরবর্ত্তী গ্রন্থির সহিত দৃঢ় সংলগ্ন; কদাপি শ্লথ বা বিশ্লিষ্ট হইবারু নহে—উহাকে লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য নাই—একভাগ অতিক্রম করিয়া অন্যভাগের সহিত সম্মিলিত হইবার উপায় নাই। এই সময়-বিভাগই ইহ পরকালের ক্ষেমঙ্কর। ইহাতেই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কার্য্যে অভিনিবেশ করা যায়, ইহাতেই কার্য্য বিশেষে যথা সময়ে সময় পাওয়া যায়, কোন কার্য্যে "সময় নাই" বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয় না। অনন্ত কাল-সাগরে যদিও জীবন বিন্দুমাত্র, কিন্তু তাহাও বিভক্ত হইতে পারে। আর ঐ আয়ুষ্কালই মনুষ্যমেয়।

প্রথমতঃ জীবনকাল ভাগচতুষ্টয়ে বিভক্ত। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য।* ইহাই চতুরাশ্রম। এই আশ্রমচতুষ্টয় ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরাবলীর ন্যায় বিরাজমান ও সজ্জিত। এক সোপান পরিত্যাগ করিয়া সোপানান্তর দুরারোহ ও দুর্গম। ইহা একপদী হইলেও উচ্চ ও প্রশস্ত রাজপথের ন্যায় স্থিত ও জ্ঞানালোকে সর্ব্বদাই উজ্জ্বলীভূত। ইহা সাধারণ পথ, নির্ম্মল ও দোষস্পর্শশূন্য।

ব্রহ্মচর্য্য।

বালকসংগঠন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য এবং সংসার কাননের মূল। এই জন্য শিশুনির্ম্মাণ প্রথম লক্ষ্যস্থল। সহ্য করাইলে এই সার্দ্ধহস্তত্রয়-মিত কলেবরে সকলই সহ্য হয়; এজন্য কোমল বয়সে কঠোর নিয়ম পালন, এই জন্য নবীন দেহে কঠিন আঘাত। এই জন্যই প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্য।

প্রথম ভাগ ব্রহ্মচর্য্য বা গুরুসেবাকাল। এ সেবা অতি দুরূহ, কিন্তু জীবনের সংক্ষিপ্তসার। শৈশবের সংস্কার জীবনান্তে শেষ হয়। এইহেতু মৃতপিণ্ডবৎ শিশুর কিশোর-কোমল দেহে এই সুগুরু ভারার্পণ। সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে বালককে জনক-জননীর স্নেহ-পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সুদূর আবাসে গুরুবাসের মধ্যে প্রেরণ করা হইত। তাহার সহিত দাসদাসী বা অন্য অভিভাবক কেহই থাকিত না। তথায় পিতৃ-ভক্তি গুরুর প্রতি, মাতৃস্নেহ গুরুপত্নীর প্রতি, গৃহাসক্তি গুরুকুটীর ও মঠের প্রতি, সোদর-প্রেম সতীর্থের প্রতি, এবং লোকালয়প্রীতি নিবিড় অটবিভাগে অর্পণ করিয়া ভাবিকালের মঙ্গলের নিমিত্ত জ্ঞানার্জ্জনে তৎপর হইয়া তাহাকে একাগ্রচিত্তে গুরুসেবা করিতে হইত। নিয়তাহারী হইয়া অভিনিবেশ সহকারে স্বকীয় আদিষ্ট পথের অনুসরণ করায়, একাদশ ইন্দ্রিয়, একাদশ দাসের ন্যায় নিয়ত তাহার অনুগত এবং অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, স্নান ও পুষ্পাদি চয়ন উপলক্ষে নির্ম্মল বায়ুসেবনে তাহার দেহ সবল ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিত। ব্রতোপবাস ও পূজার্চ্চনা দ্বারা ভক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইত।

সংসারে যত কিছু অপ্রীতিকর, যত কিছু দুষ্কর, যত কিছু বিঘ্নজনক কার্য্য আছে, সেই সকলের শত আঘাতে সেই নবনীতকোমল মতি সুপরিপক্ক হইত। অতন্দ্রিতভাবে পাঠে অভিনিবেশ ও আচার্য্যের শুশ্রূষা, যতভাষ ও মিত বাক হইয়া ক্ষুৎপিপাসা, প্রগল্‌ভতা ও অভিমানসংযম এবং যান-বাহন-বসন-ভূষণ প্রভৃতি হইতে তাহাকে বহুদূরে অবস্থান করিতে হইত। "সর্ব্ববিষয় হইতে মনের সঙ্গহীনতা, স্বাধ্যায়ে একাগ্রতা, সাধুদিগের সহিত সঙ্গ, যথোচিতরূপে সর্ব্বভূতে দয়া, মিত্রতা, বিনয়, শৌচ, স্বধর্ম্মাচরণ, ক্ষমা, বৃথাবাক্যপরিত্যাগ, সর্ব্ববিষয়ে সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্বে সমতা, সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি, ঈশ্বরে দৃষ্টি ও ভক্তি, নির্জ্জনে বাস, গৃহাদির প্রতি অভিমানশূন্যতা, পবিত্র চীরপরিধান, সর্ব্ব-বিষয়েই সন্তোষ, স্বকীয় শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, আর্য্যশাস্ত্রে অনিন্দা, মন, বাক্য ও কর্ম্মের সংযম, সত্য, শম ও দমসম্পন্নতা, হরির গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ ও ধ্যান, নিষ্পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যোগ, দান, তপস্যা, জপ এবং আত্ম ও মহাজনপ্রিয় সদাচার পদ্ধতি অভ্যাস" ইত্যাদি বিষয় অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষা করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত আর যে যে কঠিন নিয়ম তাহার দেহমন

*ব্র। ঃ। মনু। ৭ম অ। হারীত।২২। ১০৬। অযোধ্যাকাণ্ড।

CORRECTION

নিষ্পিষ্ট করিত, তাহার দুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ব্রহ্মচারিণাং গুরুকুলবাসঃ। সন্ধ্যাদ্বয়োপাসনম্। কালদ্বয়মভিষেকাগ্নিকর্ম্মকারণম্। অপ্‌সু দণ্ডবন্মজ্জনম্। মেখলাদণ্ডাজিনোপবীতধারণম্। গুরোঃ প্রিয়হিতাচরণম্। গুর্ব্বনুজ্ঞাতভৈক্ষাভ্যবহরণম্। শ্রাদ্ধকৃত লবণ-শুক্তপর্য্যুষিতান্ন-নৃত্য-গীত-স্ত্রী-মধু-মাংসাঞ্জনোচ্ছিষ্ট-প্রাণিহিংসাশ্লীলপরিবর্জ্জনম্"।

২৮অ। বিষ্ণুসংহিতা।

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করিবে, সন্ধ্যাদ্বয়ে উপাসনা করিবে, উভয়কালে স্নান ও অগ্নিতে আহুতি করিবে। দণ্ডের ন্যায় জলে মজ্জন করিবে। মেখলা, দণ্ড, অজিন ও উপবীত ধারণ করিবে; গুরুর প্রিয়হিতাচরণ করিবে। গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু শ্রাদ্ধকৃত লবণ, শুক্ত ও পর্য্যুষিত অন্ন পরিত্যাগ করিবে। নৃত্য, গীত, স্ত্রী, মধু, মাংস, অঞ্জন, উচ্ছিষ্ট, প্রাণিহিংসা, ও অশ্লীলতা পরিত্যাগ করিবে।

"অস্য (গুরোঃ) গতিচেষ্টাভাষিতাদিকং ন অনুকুর্য্যাৎ"।

২৮অ। বিষ্ণুসংহিতা।

গুরুর গমন, চেষ্টা ও বাক্যাদি অনুকরণ করিবে না।

"যদি স্বেচ্ছায় নিদ্রাবশীভূত ব্রহ্মচারীর অজ্ঞাতে সূর্য্যদেব উদিত বা অস্তমিত হন, তবে দিনমাত্র উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিবে"।

২৮অ। বিষ্ণুসংহিতা।

"গুরোঃ কুলে প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
ব্রহ্মচর্য্য মধঃশয্যা * * * ॥
কুর্য্যাদধ্যয়নঞ্চৈব ব্রহ্মচারী যথাবিধি।
বিধিং ছিত্বা প্রকুর্ব্বাণো ন স্বাধ্যায় ফলং লভেৎ॥
শৌচাচারমশেষন্তু শিক্ষয়েদ্‌গুরুসন্নিধৌ।
* * হস্ত্যশ্বারোহণঞ্চৈব সংত্যজেৎ" ॥

হারীত।

কায়মনোবাক্যে গুরুকুলের প্রিয়াচরণ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য করিবে এবং অধঃশয্যায় শয়ন করিবে। * * নিয়মানুযায়ী অধ্যয়ন করিবে। বিধিত্যাগ করিয়া পাঠ করিলে তাহাতে কোন ফল দর্শেনা। * * গুরুর নিকট নানাবিধ শৌচাচার অভ্যাস করিবে। * হস্তী-অশ্বাদি আরোহণ ত্যাগ করিবে।

"প্রত্যহ জলপূর্ণ কুম্ভ, কুশ, পুষ্প এবং সমিধ আহরণ করিবে। আবশ্যক হইলে মৃত্তিকাদ্বারা গৃহাদি লেপন করিবে"।

উশনা।

"জিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ সততং বশ্যাত্মাক্রোধনঃ শুচিঃ
প্রযুঞ্জীত সদা বাচং মধুরাং হিতভাষিণীম্ ॥
অভ্যঙ্গকাঞ্জনোপানচ্ছত্রধারণ মেবচ।
কামং ক্রোধং ভয়ং নিদ্রাং গীতবাদিত্রনর্ত্তনম্ ॥
দ্যূতং জনপরীবাদং স্ত্রীপ্রেক্ষালাপনং তথা।
* * * * বিবর্জ্জয়েৎ" ॥

৩অ। উশনা।

সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয়, আত্মসংযমী, অক্রোধন ও শুচি হইবে। অভ্যঙ্গ, অঞ্জন, উপানৎ ও ছত্র ধারণ, কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা গীত, বাদিত্র, নর্ত্তন, অক্ষক্রীড়া, লোকের নিন্দা, দোষভাবে স্ত্রীলোক দর্শন ও আলাপন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে।

"শৌচারারবিচারার্থং ধর্ম্মশাস্ত্রমপি দ্বিজঃ।
পঠেত গুরুতঃ সম্যক্ * * *" ॥

ব্যাস।

দ্বিজ, শৌচাচার বিচারার্থ গুরুর নিকট সম্যগ্‌রূপে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে।

"বিদ্বেষ, হিংসা, পৈশুন্য, অর্কদর্শন, উন্মত্ততা

কজ্জলধারণ, আদর্শ, স্রগ্‌বিলেপন, বৃথা ভ্রমণ, অসন্তোষ ও দেহের শোভা পরিত্যাগ করিবে"।

ব্যাস।

"মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে, গুরুর আদেশ লইয়া অলোলুপভাবে সৎলোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া গুরুর আদেশ মতে তাহা ভোজন করিবে। বিপদগ্রস্ত হইলেও ভিক্ষাদ্রব্য ভিন্ন অন্য ধনাদি লইবে না। * * * গুরু শয়ন করিলে শয়ন করিবে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবে"।

ব্যাস।

"ব্রহ্মচারী অধ্যয়নকালে বাক্য, বাহু ও উদরের সংযম করিবে"।

শঙ্খ।

"জিহ্বা, উপস্থ, উদর ও হস্ত সুগুপ্ত হইবে"।

হারীত।

"সম্মানকে বিষের ন্যায় ত্যাগ ও অপমানকে সাদরে গ্রহণ ও অভ্যাস করিবে। নিত্য স্নাত ও শুচি হইয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করিবে, এবং দেবতার পূজা ও সমিধাদি আহরণ করিবে। পরোক্ষেও গুরুর নাম করিবে না। যেখানে তাঁহার নিন্দা বা পরীবাদ হইবে তথায় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া থাকিবে, নতুবা অন্যত্র গমন করিবে"।

২য়। মনু।

"এইরূপ গুরুসেবা করিয়া যিনি গুরুগৃহে চিরজীবন কৌমার অবস্থায় যাপন করেন, তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং যিনি কেশান্তের পর ছাব্বিশ বৎসর এইরূপে অবস্থান করত গৃহমেধী হন, তাঁহাকে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী কহে"।

ব্যাস।

আমরা বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিতে পারিলামনা। সেই সুকুমার দেহে কত অসহ্য আঘাত সহর্ষে ধারণ করিতে হইত, তাহা ভাবিলে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। বালসুলভ চঞ্চল ভাব পরিহার, আহার বিসর্জ্জন, ভিক্ষান্ন-মাত্রে দিনপাত এবং যান-বাহন-বসন-ভূষণ ও সর্ব্ববিধ বিলাসিতা হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতে হইত। স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল কার্য্য সম্পাদিত হইত। তখন বর্ত্তমানের ন্যায় অশ্ব রথ শিবিকারোহণে অপূর্ব্ব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পাঠাভ্যাসের ব্যবস্থা ছিল না। মৃদ্‌বারিতেই দেহ পবিত্র করিত, সুগন্ধ দ্রব্য সে স্থানের ত্রিপ্রান্তে অবস্থান করিতে পারিত না। এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় না থাকিলেও ঐহিক পারমার্থিক জ্ঞানের অসদ্‌ভাব ছিল না। * এই রূপে সেই মনুজশিশুতরু সংসারকাননে ফলোন্মুখ বিটপীতে পরিণত হইত। এইরূপে নিম্নশ্রেণীর পাঠ অভ্যাস করিতে হইত। যে এইরূপ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইত, তদুচ্চ শ্রেণীতে সে কেমন করিয়া উন্নীত হইবে?

শ্রীরামশঙ্কর রায়।

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন পরিষদ্ পূর্ব্বকালের বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারত ইতিহাস।

মেঘদূত।

৫৬

ত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎসিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।

যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ
সঙ্কল্পন্তে স্থিরগণ পদ প্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥
মিত্রবর দেখিবে হে হিমগিরি পর
শশাঙ্কশেখর যথা স্থাপিলা চরণ,

CORRECTIO

আজ(ও) পদচিহ্ন আছে বড় মনোহর ;
যাহার সর্ব্বদা পূজা করে সিদ্ধগণ।
দর্শন করিলে যারে,
অবহেলে সুরপুরে,
মহাপাপী যায় চলি ; সেই সে চরণে
পূজিও হে প্রাণসখে ভক্তিপূর্ণ মনে।

৫৭

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ॥
সকণ্টক বেণুরন্ধ্রে, পশিলে পবন
করিবে মধুর রব হিমালয় শিরে ;
কিন্নরীর কণ্ঠসুধা ভেদিয়া গগন
ত্রিপুরবিজয় গীত শুনাবে সুস্বরে।
করি মৃদু গরজন
কাঁপা'য়ে নিবিড় বন,
মুরজার মত ধ্বনি করো মিত্রবর
কন্দরে পশিয়া ; যথা বিরাজে শঙ্কর।

৫৮

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্য্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ॥
হিমালয় প্রান্তদেশে ক্রৌঞ্চগিরি পরে
প্রতিবর্ষে হংসগণ করে হে প্রয়াণ
যে গহ্বর দিয়া, সখে মানসসরোবরে,
(পরশুরামের যশ যথা বিদ্যমান)
সুদীর্ঘ শরীর ধ'রে
প্রবেশিও সে গহ্বরে,
বলিতেজঃখর্ব্বকারী বিষ্ণুপদ প্রায়
শরীর ধরিও সখে আমার কথায়।

৫৯

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥
অনন্ত অম্বরে ঊর্দ্ধে করিয়া গমন
দেখিবে কৈলাশ গিরি ; দশানন করে
বিছিন্ন যাহার মূল রয়েছে এখন ;
যাহে সুরবালাগণ প্রতিবিম্ব হেরে।
দেখিয়া তুষার রাশী
মনে হয় হরহাসি
একত্রিত হয়ে যেন শোভে নিরন্তর,
লক্ষ লক্ষ শ্বেত চূড়া ছাইছে অম্বর।

৬০

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃ কৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিত নয়ন প্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব॥
যবে তুমি হে বারিদ করিবে গমন
অমল ধবল শ্বেত হিমালয় শিরে,
বল দেখি কত শোভা ধরিবে তখন
সুনীল তোমার কায়া শ্বেতগিরি পরে?
বলদেব বীরবর
দেহে যথা নীলাম্বর
মানস মোহিত করে, তুমিও তখন
ধরিবে তেমতি শোভা হে বায়ুবাহন॥

৬১

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী॥
দেখিবে যখন তুমি দেব শূলপাণি
উরগ বলয় ত্যাগ করিয়া যতনে
দিয়াছেন নিজ কর, যে কর ভবানী
সপ্রেমে ধরিয়া সদা ভ্রমে ফুল্ল মনে।
তখন হে জলধর
ধরি দৃঢ় কলেবর
হইও সোপানমালা অতি সযতনে।
দেখো যেন ভবানীর না লাগে চরণে।

৬২

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ধর্ম্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জ্জিতৈর্ভীষয়েস্তাঃ॥
পাইয়া তথায় তোমা সুরবালাগণ,
সলিল করিয়া সুখে করিবে বিহার।
নিদাঘ বলিয়া কিন্তু যদি হে তখন
না ছাড়ে তোমায় ; তুমি কি করিবে তার?
করি ভীম গরজন
ভয়েতে আচ্ছন্ন মন
করিও তাদের, আমি বলিনু তোমায়।
ছাড়িবে নিশ্চয়, যদি মনে ভয় পায়।

৬৩

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখ পট প্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্॥
মানসসরেতে সখে করিয়া গমন,
বিহার করিও সুখে উচ্চ হিমালয়ে।
হৈমপদ্ম শালী নীর করিও গ্রহণ,
কাঁপাইও মৃদু কল্পতরুকিশলয়ে।
কভু বা মানসজলে
ছায়া দেখি কুতূহলে
ঐরাবত প্রতিরূপ করিও প্রকাশ ;
কভু বা ঢাকিও ঊর্দ্ধে সুনীল আকাশ।

৬৪

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজাল গ্রথিত মলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্॥
দেখিবে অলকাপুরী সেই গিরি পর,
জাহ্নবী দুকূল সম শরীরে যাহার ;
সপ্ততল গৃহ যার জলধরে ধরে
প্রাবৃটে, আদর ক'রে আপন মাথায়।
মুক্তামালাপ্রায় যার
শোভে সৌধ চারি ধার,
মানস মোহিত হয় যা'র শোভা দেখে,
তারে কি চিনিতে তুমি পারিবেনা সখে?
পূর্ব্বমেঘ সমাপ্ত।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গে উগ্রক্ষত্রিয়ের সামাজিক আসন।

উচ্চকুলে জন্ম, বিদ্যানুশীলন, সদনুষ্ঠান, সংখ্যাধিক্য, একদেশে বহুকাল ধরিয়া বাস এবং ধনসম্পত্তিই সামাজিক খ্যাতি-প্রতিপত্তির মূলীভূত কারণ। ঐ সকল গুণের ন্যূনাতিরেকে খ্যাতি-প্রতিপত্তিরও ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। ইহা কবিকল্পনা নহে—ঐতিহাসিক সত্য।

অতি প্রাচীনকালে যাবতীয় মনুষ্যই এক বর্ণের অন্তর্গত ছিল, পরে গুণকর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হয়। এ কথার প্রমাণ হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত। মহাভারতের এক স্থলে (বনপর্ব্বে) মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥"

"হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে পৃথিবীতে এক বর্ণ ছিল। পরে কর্ম্ম ক্রিয়ানুসারে চারিবর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

CORRECTION

আবার অন্যত্র (ভীষ্মপর্ব্বে-গীতাংশে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন ;—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"।

গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমিই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।

যজুর্ব্বেদেও লিখিত আছে ;—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরুতোঽস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়তঃ।

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্রের জন্ম হইয়াছে।

স্মৃতিকর্ত্তা মনুও বলিয়াছেন ;—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।"

"ব্রহ্মা, ভূলোকাদি বাহুল্যের নিমিত্ত মুখ, বাহু উরু এবং পাদদেশ হইতে যথাক্রমে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতিকে উৎপন্ন করেন।'

উপরিউক্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্লোকগুলির স্থূল অর্থ বিভিন্নরূপ হইলেও ভাবার্থ একই। সামাজিক কার্য্যসৌকর্য্যার্থ গুণকর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ন্যূনাতিরেকে অতি প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি মূল বর্ণে আর্য্য জাতি বিভক্ত হয়।

বহুকাল হইতে ভারতভূমিতে ব্রাহ্মণের বাস, বিবিধ দানমূল যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাগ্রণী, সর্ব্ববিদ্যার সারভূত তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলনে ব্রাহ্মণগণের জীবন বহুকাল ধরিয়া অতিবাহিত, সংখ্যাতেও ব্রাহ্মণের দলই পুষ্ট ; এবং জগতে যাহা কিছু সার সম্পত্তি তৎসমুদয়ই ব্রাহ্মণাধিকৃত। সুতরাং এমতাবস্থায় সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? কালের বশে জাতি গৌরব হীনপ্রভ হইলেও এবং ব্রাহ্মণ গণও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে গুণহীন হইয়া পড়িলেও, বহুকাল ধরিয়া তাঁহাদের সমাজে যে আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে, তাহা সহজে লুপ্ত হইবার নহে। যাহাহউক পূর্ব্বোক্ত গুণের তারতম্যানুসারে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের নিম্নেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সামাজিক আসন যথাক্রমে স্থাপিত হইয়াছিল। অদ্যাপিও সে আসন স্থানভ্রষ্ট হয় নাই।

পরে কালক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির পরস্পর সংসর্গে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। এই সঙ্করজাতি অনু লোম-প্রতিলোমভেদে দ্বিবিধ।

পূর্ব্বকালে সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥
মনু। ৩য় অধ্যায়।

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি। তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য। দ্বে বৈশ্যস্য। এক শূদ্রস্য॥
বিষ্ণুসংহিতা ২৪শ অধ্যায়।

"বিপ্রশ্চতস্রো বিন্দেত ভার্য্যাস্তিস্রস্তু ভূমিপঃ।
দ্বে চ বৈশ্যো যথাকামং ভার্য্যেকামপি চান্ত্যজঃ॥
অগ্নিপুরাণ।

"সবর্ণা বিবাহ প্রশস্ত। তবে ইচ্ছা করিলে, ব্রাহ্মণ যথাক্রমে চারি বর্ণের কন্যা ; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্যা, আর বৈশ্য, বৈশ্যা ও শূদ্রা এবং শূদ্র কেবলমাত্র শূদ্রাই বিবাহ করিবে। "উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় শ্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য।

এইরূপ বিবাহের ফলে যে সকল সন্তানের জন্ম, তাহারাই উচ্চশ্রেণীর অনুলোমজ সঙ্কর জাতির মধ্যে পরিগণিত।

পশ্চাল্লিখিত ছয়টি উচ্চশ্রেণীর অনুলোমজ সঙ্কর জাতি।

১ম মূর্দ্ধাবসিক্ত ..... (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়া)
২য় অম্বষ্ঠ ..... (ব্রাহ্মণ-বৈশ্যা)
৩য় মাহিষ্য ..... (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা)
৪র্থ পারশব ..... (ব্রাহ্মণ-শূদ্রা)
৫ম উগ্রক্ষত্রিয় ..... (ক্ষত্রিয়-শূদ্রা)
৬ষ্ঠ করণ ..... (বৈশ্য-শূদ্রা)

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥
বৈশ্যাশূদ্রোস্তু রাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥"
যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণের ঔরষে ক্ষত্রিয়াগর্ভে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রার গর্ভে নিষাদ বা পারশব জাতির উৎপত্তি। ক্ষত্রিয়ের ঔরষে বৈশ্যাগর্ভে মাহিষ্য এবং শূদ্রাগর্ভে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি। আর বৈশ্যের ঔরষে শূদ্রাগর্ভে করণ জাতির উৎপত্তি"।

ব্যভিচার বা যাদৃচ্ছিক সংসর্গ চিরকালই আছে। ঐরূপ অবৈধ সংসর্গে এখন যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সমাজে স্থান প্রাপ্ত হয় না। প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না। তখন গুপ্ত প্রণয়ের ফলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ঔরষে ক্ষত্রিয়াদি নিম্নবর্ণীয়া নারীর গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিত, তাহারা সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নানা জাতিতে বিভক্ত হওতঃ স্ব স্ব ব্যবসাদানুসারে সামাজিক আসন পরিগ্রহ করিত। এই সকল জাতিনিচয়ই এক্ষণে নবশায়ক বলিয়া পরিগণিত।

"গোপ মালি তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারজী।
কুল কর্ম্মকারশ্চ নাপিত নবশায়ক"॥

গোপ, মালি, তিলি, তাঁতি মোদক, বারুই, কুম্ভকার, ও নাপিত এই কয় জাতি নবশায়ক।

আমাদের কথা সপ্রমাণের নিমিত্ত আমরা ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে নিম্নে একটি বচন উদ্ধৃত করিলাম।

বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকার ইতি স্মৃতঃ
কুলালবৃত্ত্যা জীবেত নাপিতো বা ভবত্যতঃ।

"ব্রাহ্মণ গোপনে বৈশ্যার প্রতি আসক্ত হইয়া তদীয় গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন করেন, তাহারা কুম্ভকার বা নাপিত।"

এই গেল অনুলোম জাতির বিবরণ। নিম্ন জাতীয় পুরুষ উচ্চ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে অবৈধ উপায়ে যে পুত্র উৎপাদন করিত, তাহারাই প্রতিলোম জাতি বলিয়া খ্যাত। সমাজে তাহাদের স্থান বড়ই নিম্ন স্তরে।

মৌলিক জাতির মধ্যে বৈশ্য ও শূদ্র বঙ্গ দেশে অতি বিরল, একরূপ নাই বলিলেও চলে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মানসম্ভ্রম, প্রাধান্যপ্রতিপত্তি সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই সমান ; সুতরাং তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করাই অতিরিক্ত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় পরিত্যাগ করিলেই, বঙ্গদেশে প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বিষয়ে কায়স্থ, (করণ) বৈদ্য, (অম্বষ্ঠ) উগ্রক্ষত্রিয় এবং নবশায়কগণের সামাজিক আসন পর পর স্থাপিত। সত্য কথা বলিতে গেলে প্রসিদ্ধি বিষয়ে বোধ হয় উগ্রক্ষত্রিয়কেই সর্ব্ব নিম্নে দাঁড়াইতে হয়। জাতি অনুসারে বিচার করিতে গেলে উগ্রক্ষত্রিয়ের আসন দ্বিতীয় স্থানীয় হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু অপরাপর গুণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র জাতিগত উচ্চতায় কোন জাতি সামাজিক শ্রেষ্ঠাসন প্রাপ্ত হইতে পারেনা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, বিদ্যানুশীলন, সদনুষ্ঠান ধনসম্পত্তি এবং সংখ্যাধিক্যই জাতীয় প্রতিপত্তি বিস্তারের মূলীভূত কারণ। বঙ্গদেশে ঐ সকল

গুণে উগ্রক্ষত্রিয়জাতি বৈদ্য ও কায়স্থ অপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূন বলিয়া উহাদের নিম্নে অবস্থিতি করিতেছে।

(১)কায়স্থ ও বৈদ্যগণ বহুকাল হইতে বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন; উগ্রক্ষত্রিয়গণ কেবল মাত্র তিন শত বৎসর (১) এ দেশের অধিবাসী হইয়াছেন। বসতিকালের প্রাচীনতায়, সুতরাং, উগ্রক্ষত্রিয়েরা বৈদ্য ও কায়স্থ অপেক্ষা অনেক আধুনিক। প্রাচীন অপেক্ষা আধুনিকের প্রসিদ্ধি সম্ভবপর নহে।

(২) বৈদ্য ও কায়স্থজাতির বৃত্তি, চিকিৎসা ও চাকুরী। সুতরাং তাঁহারা বহুকাল হইতে অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলনে রত থাকিয়া আপনাদের অবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উগ্রক্ষত্রিয়গণের জাতীয় বৃত্তি যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্য (২) (ইহাঁরা পিতৃমাতৃ উভয় বৃত্তিই অবলম্বী)। উগ্রক্ষত্রিয়গণ, বঙ্গদেশে আসিয়াও অনেকদিন পর্য্যন্ত যে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সমরবিভাগীয় "উপাধি" এবং দেশীয় রাজাগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত "জাইগীর" তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে স্বাধীনতামূলক যুদ্ধ ও কৃষিবিদ্যার মর্য্যাদা অপেক্ষা অধীনতামূলক দাসত্ব লাভের উপায় অর্থকরী বিদ্যার গৌরব অধিক। তাহার প্রমাণ, আজকাল যিনি দু কথা লিখিতে পারেন বা দুকথা কহিতে পারেন, তাঁহারই নাম চারিদিকে প্রথিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ অদ্বিতীয় বঙ্গবীর দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কয়জনে অবগত আছেন! যদি তিনি মাসিকপত্র "জন্মভূমিতে "আমার জীবনচরিত" নামক প্রবন্ধে আত্মপরিচয় প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে কয়জন লোক তাঁহার নাম অবগত হইতে পারিত ? তাই বলিতেছিলাম, বঙ্গদেশে স্বাধীনতার আদর নাই, এ দেশে একজন প্রসিদ্ধ কৃষিব্যবসায়ী অপেক্ষা একজন সামান্য কেরাণীর মান অধিক (৩)। রাজপুতানার স্বাধীনতাপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ অদ্যাবধিও অর্থকরী বিদ্যাভ্যাসে বিরত। ক্ষত্রিয় সন্তান উগ্রক্ষত্রিয় যদিও মাতৃদোষে ক্ষত্রিয়াপেক্ষা জাত্যংশে হীন, কিন্তু স্বাধীনতা, তেজস্বিতা ও আত্মমর্য্যাদাসংরক্ষণে পিতা অপেক্ষা কোন অংশে পশ্চাৎপদ নহে। যাঁহারা কোন না কোন প্রকারে উগ্রক্ষত্রিয়ের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের কথার সত্যাসত্য বিচার করিয়া দেখিবেন। যে সময়ে কায়স্থ বৈদ্যগণ অর্থকরী বিদ্যায় সম্যকরূপে পারদর্শী হইয়া বঙ্গদেশোচিত মানসম্ভ্রমের দিব্য মাল্য গলদেশে ধারণ করিয়া শোভিত হইতেছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গবিজয় উপলক্ষে কতকগুলি স্বাধীনতা ও তেজস্বিতার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ উগ্রপ্রকৃতি উগ্রক্ষত্রিয় যোদ্ধৃবেশে এ দেশে আগমন করিয়া, স্বীয় স্বভাবসুলভ স্বাধীনতামূলক সৈনিক ও কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করতঃ বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন যুদ্ধের পরিবর্ত্তে দেশে শান্তিসংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উগ্রক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বনের সুযোগ ফুরাইয়া আসিল, তখন তাঁহাদের,স্বাধীনতা রক্ষার এক মাত্র উপায় কৃষিবৃত্তিই অবশিষ্ট রহিল। দেশের গুণে ও কালমাহাত্ম্যে উগ্রক্ষত্রিয়গণ মানের ভিখারী হইয়া পড়িলেন; দেশ এবং কালোচিত শিক্ষা উগ্রক্ষত্রিয়গণের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বিদ্যানুশীলনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অন্তঃকরণে বিপুল আনন্দের উদ্রেক হয়। কিন্তু হইলে হইবে কি, কায়স্থ ও বৈদ্যের সমকক্ষ হইতে এখনও অনেক দিন বাকী। ইহাও বঙ্গে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির সামাজিক অপ্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ।

(৩) বৈদ্য ও কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয় অপেক্ষা সকল গুণে সংখ্যায় অধিক এবং বঙ্গের সকল জেলাতেই উক্ত জাতিদ্বয়ের বাস। উগ্রক্ষত্রিয়, বৈদ্য ও কায়স্থ অপেক্ষা সংখ্যায় স্বল্পপরিমিত, এবং অন্যান্য জেলাতে ২/১০ ঘর থাকিলেও বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও হুগলী এই পাঁচটী জেলাই এই জাতির প্রধান বাসস্থল। সুতরাং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র উগ্রক্ষত্রিয় জাতির প্রসিদ্ধি সম্ভবেনা।

(৪) শাস্ত্রে যেমন সকল জাতির বিবরণ আছে, উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বিবরণও সেইরূপ আছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় গ্রন্থের পাঠক কয়জন? নানা জাতীয় ইতিহাসে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির বিবরণ যেরূপ সঙ্কলিত হইয়াছে, উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সেরূপ হয় নাই। হিন্দিভাষার "আগ্‌রাই" নামক পুস্তকে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির উৎপত্তির ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে (৪)। কিন্তু ঐ পুস্তক বঙ্গদেশের কয়জন পাঠ করিয়াছেন বা উহার নাম শ্রবণ করিয়াছেন? এক আগ-

(১) "রাজা মানসিংহ বাং ১০০১ সালে পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য উগ্রক্ষত্রিয় সৈন্য সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমন করেন। বর্দ্ধমানের দক্ষিণাংশে মোড়লমাড়ীতে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কতকগুলি সৈনিক পুরুষকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া যান। তাহারাই এতদ্দেশীয় উগ্রক্ষত্রিয়গণের আদি পুরুষ, সেই অবধি বাঙ্গালাদেশে উগ্রক্ষত্রিয়দিগের বসবাস"।

উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ।

(২) "উগ্রো যুদ্ধক্রিয়াবৃত্তিঃ।"

হলায়ুধকৃত অভিধানসর্ব্বস্ব।

"বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সদা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্য শিল্পকান্।"

২য় অধ্যায়, পরাশরসংহিতা।

(৩) কৃষিবৃত্তিতে যে কেবলই স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, তাহা নহে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে ধনাগমের নিমিত্ত যতগুলি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে কৃষিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পরন্তু লাঞ্ছিত মসীজীবী কেরাণী বাবুরা আমাদের কথায় বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের অবতারণা করেন জানিয়াই, তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিবার আমরা ভীষকরীজ চরকঋষির মত নিম্নে প্রকাশ করিলাম। "কৃষিকার্য্য দ্বারা যে ধনের আগম হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পশুপালন দ্বারা যে উপার্জ্জিত হয়, তাহাও উৎকৃষ্ট। বাণিজ্যের যে ধন আইসে, তাহাও মন্দ নহে। রাজসেবা অর্থাৎ রাজার আশ্রয়ে চাকুরী দ্বারা যে উপার্জ্জিত হয় তাহাই সর্ব্ব নিকৃষ্ট।"

(৪) "চন্দ্রসেন নামে এক চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা অগ্রবনে (আগ্‌রা) বাস করিতেন। সত্যশীল নামে এক ধনাঢ্য শূদ্রও ঐ নগরে বসতি করিতেন। সত্যশীলের চিত্রাঙ্গদা নাম্নী পরম রূপবতী এক দুহিতা ছিল। রাজা চন্দ্রসেন একদিন ঐ কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া সত্যশীলের নিকট ঐ কন্যা প্রার্থনা করেন। তাহাতে সত্যশীল বলেন যে, যদি মহারাজ, রাজপুরোহিত ও বহুতর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সহ আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া আমার কন্যার যথারীতি পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে, আপনাকে আমি এই কন্যা দান করিতে পারি। রাজা সম্মত হইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিলেন। কালক্রমে রাজার ঔরষে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে দুইটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বীরেন্দ্র ও কনিষ্ঠের নাম মহাবীরেন্দ্র। বীরেন্দ্রের বংশসম্ভূত অনেকেই বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেছেন, আর মহা বীরেন্দ্রের বংশধরগণ ও বীরেন্দ্রের বংশ সম্ভূত অন্যান্য সকলে এক্ষণে আগ্‌রা অঞ্চলে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও বসতি করিতেছেন। হিন্দি ভাষার আগ্‌রাই পুস্তকের ৫৩ পৃষ্ঠা)"।

উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ।

রাই পুস্তক কেন, অধ্যবসায় ও গবেষণা সহকারে হিন্দু ও পারস্য ভাষার গ্রন্থনিচয় এবং প্রাচীন রাজসংসারের "দপ্তরখানা" অন্বেষণ করিলে উগ্রক্ষত্রির জাতির অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। (৫)যে কাল পর্য্যন্ত জাতীয় ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়া সাধারণের চক্ষুগোচর না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত উগ্রক্ষত্রিয়জাতির সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ ঘটিবে না। (৬)। ইতিবৃত্তাভাব উগ্রক্ষত্রিয় জাতির পরিচয়-হীনতার একটী কারণ।

৫। উগ্রক্ষত্রিয়জাতির সামাজিক আচার ব্যবহার, বঙ্গদেশে আসিয়া, অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইলেও, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি যে সকল সদাচারগুণে এবং দান-ধ্যান-অতিথিসেবা প্রভৃতি সৎকার্য্যে উচ্চ জাতি বলিয়া সম্মানিত, উগ্রক্ষত্রিয়জাতি সে সকল সদাচার ও সৎক্রিয়াবিবর্জ্জিত না হইলেও, সাধারণ সদনুষ্ঠানে (বিদ্যা ও চিকিৎসালয়সংস্থাপন, বিদ্যোৎসাহপ্রদানের নিমিত্ত বৃত্তিপ্রদান, অনাথ-আশ্রম-প্রতিষ্ঠা, দীন-দরিদ্র-অন্ধ-খঞ্জ, দুর্ভিক্ষপীড়িত ও নিরাশ্রয় বিধবাকুলের নিমিত্ত বৃত্তিভাণ্ডারস্থাপন, তীর্থক্ষেত্রে অথিতিসেবার বন্দোবস্ত প্রভৃতি) ব্রাহ্মণাদি জাতি অপেক্ষা বহুলাংশে পশ্চাৎপদ।

(৬) যদিও উগ্রক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে অনেক জমিদার,মহাজন,ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী রহিয়াছেন, এবং দিন দিন ইঁহাদের মধ্যে ধনবানের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির সহিত ধনবিষয়ে উগ্রক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ হইতে এখনও বহুবিলম্ব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বহুদিন হইতে কায়স্থ ও বৈদ্যগণ অর্থকরী বিদ্যাদ্বারা বিপুল ধনসঞ্চয় করিয়া আপনাদের আর্থিক অবস্থা সম্যক্-প্রকারে উন্নত করিয়াছেন। উগ্রক্ষত্রিয়েরা একেত অল্পদিন এদেশে আসিয়াছেন, তার পর

(৫) রাজপুতানার পলিটিকেল এজেণ্ট স্বনামখ্যাত মহাত্মা কর্ণেল টডের অসাধারণ অধ্যবসায়, অলৌকিক গবেষণা ও অজস্র অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে, বোধহয়, ইদানীন্তন কালের ক্ষত্রিয়জাতির ইতিবৃত্ত "রাজস্থান" সঙ্কলিত হইত কিনা সন্দেহ। যদি কোন দ্বিতীয় টড্ উগ্রক্ষত্রিয়দিগের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে লেখনী ধারণ করিতেন, তাহা হইলে তাহাদেরও ইতিবৃত্ত যে সংগৃহীত হইত না এরূপ নহে। উগ্রক্ষত্রিয়দিগের ভাগ্যে দ্বিতীয় টড্ না মিলিতে পারে, কিন্তু টডের ন্যায় অধ্যবসায়-অনুসন্ধিৎসা থাকিলে এবং সেরূপ ভাবে অর্থ ব্যয়িত হইলে, অবশ্যই উগ্রক্ষত্রিয়জাতির ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে। কিন্তু উগ্রক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সেরূপ অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসাই বা কার আছে আর সেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতেই বা কয়জন মুক্তহস্ত? জাতীয় পত্র "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি", উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে বটে,কিন্তু প্রতিনিধির আজিও এমন অর্থ হয় নাই যে, নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া এই সুমহৎ ব্যাপারে হস্তপেক্ষ করিতে পারে। সময় হইলে এবং জীবিত থাকিলে, প্রতিনিধি অবশ্যই একদিন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইবে।

(৬) আমাদের এ কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। "উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ" নামক উগ্রক্ষত্রিয়জাতির শাস্ত্রীয় ইতিবৃত্ত এবং জাতীয় সমিতির মুখপত্র "উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি" দ্বারা ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতির সমাজে কয়েক বৎসরের মধ্যে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির খ্যাতি অনেক পরিমাণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহা বোধহয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

তাঁহাদিগকে অনেকদিন যাবত কেবলমাত্র কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল এবং এখনও উগ্রক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়াই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য জাতির লোকেরা যেমন সামান্য লেখাপড়া শিখিলেই চাকুরীর জন্য লালাইত হইয়া দেশত্যাগী হয়—অধীনতা-শৃঙ্খল গলদেশে করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে, উগ্রক্ষত্রিয়জাতির প্রকৃতি সেরূপ নহে। যদি কৃষিব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের উপায় থাকে, তবে ইহারা লেখাপড়া শিখিয়াও, চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না। স্বাধীনতাপ্রিয়তাই ইহার একমাত্র কারণ। কারণ যাহাই হউক,উগ্রক্ষত্রিয়জাতির ধনাভাব কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক। সাধারণ সদনুষ্ঠান যে উগ্রক্ষত্রিয় দ্বারা সচরাচর অনুষ্ঠিত হয় না, ইহাদের ধনাভাবই তাহার প্রধান কারণ। যাহা হউক অর্থ এবং অর্থের সদ্ব্যবহার ব্যতীত সাংসারিকের সামাজিক খ্যাতি-প্রতিপত্তিলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যে সকল কারণে উগ্রক্ষত্রিয়গণ বঙ্গদেশে জাত্যনুরূপ সামাজিক আসন প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার উল্লেখ করা গেল। উগ্রক্ষত্রিয়জাতির ক্রমোন্নতি দেখিয়া আশা হয়,সামাজিক প্রাধান্য-প্রতিপত্তি ও প্রসিদ্ধি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ইহাঁদের আসন আপেক্ষাকৃত উচ্চতর সোপানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। উগ্রক্ষত্রিয়জাতির কথা যখন গ্রন্থগত হইয়া সাধারণের শ্রুতিগোচর হইতে চলিয়াছে, বৎসর বৎসর যখন উগ্রক্ষত্রিয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, শিক্ষাস্রোত খরতর-বেগে প্রবাহিত হওয়ায়, যখন উগ্রক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বর্ষে বর্ষে বাড়িয়া উঠিতেছে, বাণিজ্য-ব্যবসায়-চাকুরী প্রভৃতি উপায় দ্বারা যখন উগ্রক্ষত্রিয়জাতির ধনাভাব ক্রমশঃ ঘুচিয়া আসিতেছে এবং বসতি বিষয়েও যখন দিন দিন প্রাচীনত্ব জন্মিতেছে, তখন আমাদের আশা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু আমাদের আশা অসঙ্গত না হইলেও, সাধারণ সদনুষ্ঠান ব্যতিরেকে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির অপ্রসিদ্ধি সহসা ঘুচিবে না।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী সামন্ত মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতিনিধিতে "উগ্রক্ষত্রিয়-বিধবা-বৃত্তিভাণ্ডার" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত বৃত্তিভাণ্ডার সংস্থাপনের নিমিত্ত উগ্রক্ষত্রিয়গণকে আহ্বান করিয়াছেন। সুবিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়ান মিরারের" সম্পাদক সে বিষয় স্বীয় পত্রে উল্লেখ করিয়া প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধলেখক ও উগ্রক্ষত্রিয় সাধারণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কি শিক্ষিত কি ধনী, কোন শ্রেণীর উগ্রক্ষত্রিয়কে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে না দেখিয়া আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। আমরাও প্রবন্ধ লেখকের সহিত উগ্রক্ষত্রিয়সাধারণকে উক্ত সাধু অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতেছি। যে সকল মহদনুষ্ঠানের উপর উগ্রক্ষত্রিয়জাতির খ্যাতি-প্রতিপত্তি নির্ভর করিতেছে, তন্মধ্যে "উগ্রক্ষত্রিয়-বিধবা-বৃত্তি-ভাণ্ডার" সংস্থাপন একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। মহারাজ যতীন্দ্র নাথ, এই বিধবা-বৃত্তি-ভাণ্ডার সংস্থপন করিয়া ইহপরকালের নিমিত্ত আপনার অক্ষয় যশ ও পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গেলেন। বর্ত্তমান সময়ে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে যেরূপ ধনশালী লোক রহিয়াছেন, তাহাতে দশ সহস্র টাকা মূলধনে এই বৃত্তিভাণ্ডার সংস্থাপিত হওয়া

বড় গুরুতর কথা নহে। ইচ্ছা করিলে দুই চারিজন উগ্রক্ষত্রিয়ই অক্লেশে এই সুমহৎ কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে পারেন।

তাই বলিতেছি, মাননীয় উগ্রক্ষত্রিয়গণ! কেবল উচ্চকুলে জন্ম বলিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিলে কোন ফল দর্শিবে না; যদি বঙ্গদেশে বংশানুরূপ সম্ভ্রমপ্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ থাকে, যদি বঙ্গের সর্ব্বত্র স্বীয় নাম সুপ্রথিত করিয়া উচ্চতর সোপানে সামাজিক আসন স্থাপন করিবার ইচ্ছা হয়, তবে অনতিবিলম্বে "উগ্রক্ষত্রিয়-বিধবা-বৃত্তিভাণ্ডার" সংস্থাপনে উদ্যোগী হউন এবং পর পর এবংবিধ সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে রত থাকুন। তাহা হইলেই জাতীয় কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে। কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইলেই অমরত্ব লাভ হইবে। যেহেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"।

পল্লী-সমাজ।

১। গত বারে আমরা বলিয়াছিলাম, খানাকুল-কৃষ্ণনগর একটী পীঠস্থান, এরূপ প্রবাদ আছে। তাহাতে আপত্তি করিয়া অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, প্রবাদ কেন, সত্য সত্যই উহা এক পীঠ-স্থান। তাঁহাদের মতে আমরা বাস্তবিককে অবাস্তবিক—আনুমানিক স্থির করিয়াছি। পীঠস্থান বলিয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগরের যে খ্যাতি ও প্রাধান্য আছে, আমরা তাহাকে জন-শ্রুতিতে পর্য্যবসিত করিয়াছি,—এইটীই আপত্তিকারীদের মর্ম্মান্তিক কষ্টের কারণ। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, এ প্রদেশ—অন্যতম পীঠস্থান বলিয়া, কেবল, প্রসিদ্ধ নয়, কিন্তু তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন, এখানে আদ্যাশক্তির স্তন নিপতিত হইয়াছিল (১)। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিতে অক্ষম হন, কোন্ স্তন এখানে পড়িয়াছিল। আর এক কথা যদি এখানে পীঠ আছে, তবে ভৈরব কোথায়? কেন না, যেখানেই পীঠ, সেই খানেই এক এক ভৈরব (শিব) বর্ত্তমান। ইহার মীমাংসাকালে তাঁহারা বলেন, ষণ্টেশ্বরই এখানকার ঐরূপ শিবলিঙ্গ অর্থাৎ ভৈরব। যাহা আরোপিত পীঠস্থান, তাহা জড়ুর বা ভগবতী-তলা নামে বিখ্যাত। যথায় ষণ্টেশ্বর দেবতা আবির্ভূত, তাহার নাম উবিদ্‌পুর। এই উভয় গ্রামের মধ্যে ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ক্রোশের ব্যবধান। যে যে স্থানে পীঠ রহিয়াছে, প্রায় কোন স্থানেই দেবী হইতে মহেশ্বর এত দূরবর্ত্তী নন। এতদ্ভিন্ন বিশেষ অনুসন্ধানে আরও যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, পশ্চাৎ প্রদত্ত হইতেছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় কাহারই অগোচর নাই—পীঠস্থান সর্ব্ব সমেত ৫১ একান্ন। এখানে তৎ-সমুদয়ের তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন! কেবল দক্ষিণ-বাম-স্তন-সংক্রান্ত কথাই আমাদের আলোচ্য ও বিবেচ্য। যথা,—

(১) দক্ষ-যজ্ঞে সতী, দেহ ত্যাগ করিলে, মহাদেব তাহা স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতেন। বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে এক এক অঙ্গ উড়াইয়া দেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হয়। উহাই পীঠ নামে খ্যাত।

সংখ্যা	অঙ্গের নাম	স্থানের নাম	ভৈরবীর নাম	ভৈরবের নাম
৩০	বাম স্তন	জালন্ধর	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
৩১	দক্ষিণ স্তন	রামগিরি	শিবানী	চণ্ড

এখন মিলাইয়া দেখা যাউক, কোন অংশেও অন্ততঃ ঐক্য হয় কি না।

যদি প্রতিবাদীরা বলেন, এখানে বামস্তন পতিত হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐ স্থানের নাম জালন্ধর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ঐ স্থানের নাম জড়ুর। জড়ুরের নামান্তর জালন্ধর (২) নয়। ভৈরবীর নাম ভগবতী, কিন্তু "ত্রিপুরমালিনী" নয়। ভৈরবের নাম "ভীষণ" নয়, কিন্তু ষণ্টেশ্বর। ষণ্টেশ্বরের অপর নাম "ভীষণ" নয় (৩)। এখানে যে বাম স্তন পতিত হয় নাই, তাহা প্রতিপন্ন হইল।

দক্ষিণ স্তনও কি এখানে পতিত হয় নাই? সে বিষয়ও বিচার্য্য বটে। যদি তাহা হইত, তবে স্থানের নাম "রামগিরি" হইত, কিন্তু স্থানের নাম জড়ুর, তাহা উপরেই বলিয়া আসিয়াছি। দেবীর নাম "ভগবতী" না হইয়া "শিবানী" হইলে, তবে আংশিক ইষ্টসিদ্ধি হইত। ভৈরবও "চণ্ড" নহেন—অত্রত্য ভৈরব ষণ্টেশ্বর। অতএব সপ্রমাণ হইল, এখানে আদ্যাশক্তির স্তন পতিত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ ছিল ও আছে, তাহা অমূলক।

২। বিদ্যাসাগর মহাশয় খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সমীপবর্ত্তী পাতুলের বর্ণনা-স্থলে লিখিয়াছেন,—"পাতুলের সন্নিকটে কোটরী নামে যে গ্রাম আছে, তথায় বৈদ্যজাতীয় উত্তম উত্তম চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহাদের অন্যতমের হস্তে আমার চিকিৎসাভার অর্পিত হইল।"

এই লিপি লক্ষ্য করিয়া গত বারে আমরা টীকা করিয়াছিলাম,—

"এখানে দুইটী ভুল হইয়াছে। প্রথম ভ্রম—গ্রামের নাম কোটরী নয়, কোটরা। দ্বিতীয় ভ্রম—ঠিক্ কোটরায় বৈদ্য ছিল না, এখনও নাই। রাধানগরই বৈদ্যের বাস-স্থল। ঐ ভ্রান্তি-সংঘটনের কারণ এই,—রাধানগর নামে তিন চারি জেলায় গ্রাম আছে। বাঁকুড়া জেলায় এক রাধানগর আছে। উহা বস্ত্রের জন্য খ্যাত। হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সীমাস্থিত রাধানগরের পরিচয় দিবার সময় ঐ অঞ্চলের কেহ কেহ কোটরা-রাধানগর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দূরবর্ত্তী স্থানের লোক; তিনি কোটরা-রাধানগর স্থলে "কোটরী" করিবেন, ইহা সঙ্গত।"

আমাদের আপত্তি-কারকেরা বলেন,—কোটরার নিকটে "সাহানপুর" নামে যে গ্রাম আছে, তথায়ও বৈদ্যের বসতি ছিল এবং এখনও রহিয়াছে। অতএব রাধানগরের চিকিৎসকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন,

(২) কাঙ্গাড়া-বিভাগে এই জালন্ধর অবস্থিত।

(৩) ষণ্টেশ্বরের পূজকদিগকেও জিজ্ঞাসা করায়, "ভীষণ" ভৈরবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

সাহানপুরের চিকিৎসকেরা করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি?

সাহানপুর ও রাধানগর উভয় গ্রামই চিকিৎসকের খনি-স্বরূপ বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিকিৎসক, রাধাগরনিবাসী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম, "কোটরী-নিবাসী কবিরাজ শ্রীধর সুধাকরের চিকিৎসায় রোগ-নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলাম।" তাঁহার ভ্রম-সংশোধনার্থে তৎকালেই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, শ্রীধর সুধাকর,কোটরা-নিবাসী নন,রাধানগরে তাঁহার বসতি ছিল(৪)।

৩। পণ্ডিত-প্রবর মধুসূদন বাচস্পতি মহোদয়ের বিরচিত বলিয়া—

"যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জ্বালয়ে মমের বাতি।
পুন গৃহে তার, জ্বলিবে না আর,
নিশিতে প্রদীপ-ভাতি॥"

এই কবিতা উদ্ধৃত করা গিয়াছিল, উহা তাঁহার কৃত নয়; সুপ্রবীণ কবিপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহোদয় উহার প্রণেতা। সুতরাং "কেমন ভাবশুদ্ধ" এই প্রশংসা, বাচস্পতি মহাশয়ের উপর অর্পিত হইলেও, তাহা মজুমদার মহাশয়ের নিকট গিয়া উপনীত হইয়াছে। সুতরাং এই বার বাচস্পতি মহাশয়ের প্রকৃত কবিতা দেখাইতে হইল। তাঁহার বিরচিত ও সঙ্কলিত "বসন্তসেনা," "ছন্দোমালা" ও"মাধবীলতা" এই তিন খানি পুস্তকের সমাচার আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। তন্মধ্যে "বসন্তসেনা" সংস্কৃত "মৃচ্ছকটিক" নাটকের অনুবাদ ১২৭০সালে ১২ই ফাল্গুনে উহার প্রথম মুদ্রাঙ্কন হয়; এখন উহার তৃতীয় সংস্করণ চলিতেছে। উহা নামে অনুবাদ, কার্য্যতঃ কিন্তু অনুবাদের মত বোধ হয় না। "ছন্দোমালার" পৃথক্ পরিচয় অনাবশ্যক। নামকরণেই উহার উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, ছন্দঃ-বিষয়েই উহার অধিকার। শেষোক্ত তৃতীয় পুস্তক অমুদ্রিত। সম্প্রতি উহার পাণ্ডুলিপি পর্য্যন্তও নষ্ট হইয়াছে। বাচস্পতি মহোদয়ের বিদ্যোৎসাহী জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাগ্যে উহার কয়েকটী কবিতা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতে সমর্থ হইলাম। "মাধবীলতার" গল্পভাগের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই,—এক রাজপুত্রের বিমাতা, সপত্নীতনয়ের প্রাণহানির চেষ্টা করিয়াছিল। রাজনন্দন তাহা জ্ঞাত হইয়া প্রাসাদ হইতে পলায়নোদ্যত হন। রাজকুমার এই সময়ে অবিবাহিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার প্রেয়সীও তাঁহার সঙ্কল্প অবগত হইয়া সহচারিণী হইতে চাহিলেন। তাঁহারা রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিয়দ্দূর গমনের পর নিবিড়-গম্ভীর অরণ্যানী-মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। নৃপকুমার-বনিতা মাধবীলতাকে চণ্ডালপল্লীতে থাকিতে হইল। চণ্ডালের নারীরা, তাঁহাকে এক দিন দেখিয়া তাঁহার অপরূপ রূপে বিমোহিত হইয়া তাহাদের সমীপস্থ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মাধবীলতা কহিলেন—

সদৃশীমনুগন্তুমীহতে
ন পরমাধিসমাকুলেত্যতঃ।
কুমুদম্পরিহায় পদ্মিনীং,
ভজতাৎ দ্বন্দ্বচর-প্রিয়া নিশি॥

যিনি মনঃপীড়ায় কাতরা, তিনি আপন অনুরূপার নিকটেই গমন করেন। চক্রবাকী কুমুদিনীকে বর্জ্জন করিয়া পদ্মিনীর সমীপস্থা হউক।

(৪) ঐ রাধানগর গ্রামেই এখনও উক্ত কবিরাজের পুত্রেরা বাস করেন।

চক্রবাকী রাত্রিতে বিরহিণী। এদিকে পদ্মিনীও দিবাকরের অভাবে বিরহিণী। চন্দ্রসোহাগিনী কুমুদিনীর সংসর্গ, সুতরাং তাহার কেন ভাল লাগিবে?

ঐ পুস্তকের বাঙ্গালা কবিতা দুই চারিটী পাঠকগণকে উপহার দিলাম। সরস্বতী, ভগবতী ও কবিগণের বন্দনা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল। যথা,—

শরদিন্দু শুভে শিবে, শুভদে সারদে,
বীণাপাণি বাণি বাগ্‌বাদিনি বরদে। (ক)

ওগো গিরীশনন্দিনি! তুমি গিরিশনন্দিনী (৫)
ব'লে দিব সব ভূতগণে। (খ)।

সাক্ষী আছে দুই জন, গুহ আর গজানন
আর জানে ভক্ত-সমুদয় (গ)।

যাঁহাদের মুখবাণী অনুপমা অনুমানি'
অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে সুধা নিরুপমা।
ধন্য সেই কবিগণ, অন্য নাহি হেন জন
কার সনে কি বলিয়া কি দিব উপমা॥ (ঘ)।

এই সকল কবিতা পাঠ করিয়া বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "মধু খুড়ো, এ যে দেখ্‌ছি, ভারতচন্দ্রের প্রায় কাছাকাছি হয়েছে।"

"বসন্তসেনা"হইতে অধিক উদ্ধৃত করিবার যোগ্য কবিতা থাকিলেও স্থানাভাবে একটীমাত্র এখানে তুলিয়া দিলাম—

"এ পোড়া পেটের দায়, প্রাণ যায় মান যায়,
জাতি কুল তেজ লাজ, কিছুই ত রয় না।
তবে কেন তার লাগি, হও এত দুখভাগী,
সে ত অসময়ে তব, কোন দুখ সয় না॥
বাজাও জ্ঞানের ঢাক, দাও অলভের হাঁক,
জেগে থাক, দেখ যেন মোহ-নিদ্রা হয় না।
বিষম ইন্দ্রিয় চোর, হরে ধন ক'রে জোর,
দেখ, যেন ধর্ম্ম-ধন লুটে পুটে লয় না॥
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণে, যে বা জয় করেছে।
সংসারের মায়া-জাল হ'তে যেবা তরেছে।
খল রিপু অহঙ্কার, যার বশ হয়েছে।
তাহার কৈবল্যধাম হাতে ধরা রয়েছে॥
হে শিরোমুণ্ডক! মাথা মুড়ায়েছ বটে।
বাহিরে জানাও তুমি আছ অকপটে॥
না করিয়া থাক যদি মানের মুণ্ডন।
মাথা মুড়াইয়া বল কোন্ প্রয়োজন॥
যে জনার মনে নাহি কিছুই বিকার।
সে মাথা মুড়ান বলি যথার্থ তাহার॥"

এই বাচস্পতি মহাশয়, কুমার কৃষ্ণনাথের (৬) সভায় আদর্শ বঙ্গীয় কবি ছিলেন। তিনিই সভাপণ্ডিতের কার্য্যে ও কবিতা-যুদ্ধে কুমারের সাহায্য করিতেন। আনুমানিক ১২৯৪ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গিয়াছেন। বাচস্পতির বংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। প্রাচীনত্বের একটীমাত্র নিদর্শন এই, হুমায়ুনের সমসাময়িক "সাহিত্য-দর্পণের" এক প্রতিলিপি ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষের হস্তলিখিত। অদ্যাপি তাহা বিদ্যমান আছে।

"বিদ্যানিধিরতঃ খ্যাতো বিদ্যানিধিরুপাধিতঃ।
শ্রীরামহরিবিপ্রোঽভূদ্ ভরদ্বাজ-কুলোদ্ভবঃ॥১॥
শাকে গ্রহেভমুনিচন্দ্রমিতে শুভেঽহ্নি,
তৎসুহৃদা লঘুধিয়া গুণিনাং নিদেশাৎ।
পদ্যেন পুস্তকমিদং রচিতং প্রযত্না-
দালোচ্য কাব্যনিবহানিহ রাজধান্যাং॥২॥
হিতকামনয়া কৃতং ময়া,
সুকুমারপ্রতিভাবতামিদং।

(৫) এখানে শ্লেষ করা হইয়াছে। গিরীশ শব্দে হিমালয় ও মহাদেব দুইই হয়। এখানে হিমালয়ই লক্ষ্য। গিরিশ—অর্থে মহাদেব।

(৬) মহারাণী স্বর্ণময়ী ইঁহারই পত্নী।

যদি বোধ-লবোহপি জায়তে,
নিতরাং বাঞ্ছিতলাভবানহং ॥৩॥
শ্রীমধুসূদন রচিতা
শুকমুখ-গলিতা যথা নৃণাং বাণী।
কবিতারস-রসিকানাং
ছন্দোমালা ভবেন্মুদে কিমিয়ং” ॥ ৪ ॥

“ছন্দোমালা” হইতে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়াই নিরস্ত হওয়া গেল। উহাতে এত অত্যুত্তম বাঙ্গালা কবিতা আছে যে, তাহা প্রদর্শন করিতে গেলে, আমাদিগকে বিব্রত হইতে হয়। কোন্ কবিতা রাখিয়া, কোন্ কবিতা পাঠককে দেখাইব, ইহাই চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। এই কারণেও বটে, আর আমাদের প্রদত্ত গতবারের বংশ-তালিকার যাথার্থ্য প্রতিপাদন জন্যও বটে কেবল সংস্কৃত কবিতাই উদ্ধৃত করা গিয়াছে। এই বংশে আর এক বঙ্গীয় কবির উদ্ভব হইয়াছিল। কবির নাম অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন। তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্যের নাম “মনোহর বিবরণ”। উহার রচনা বড়ই মধুর। তাঁহার আর একখানি পুস্তক অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

সর্ব্বাধিকারিগণের বাস-গ্রহণের কিছু পরে যাঁহাদের রাধানগরে বাস ঘটিয়াছিল, সেই আগমবাগীশদিগের প্রসঙ্গ এস্থলে প্রথমে আলোচিত হইতেছে।

সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের সন্তান কিশোর আগমবাগীশ রাধানগরে আসিয়া বসতি করেন। তাঁহার আগমভূষণ উপাধিও অনেককে বলিতে শুনিয়াছি। ফল কথা, তিনি তন্ত্র শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কয়োড়ি গাঁই সম্ভূত। কিশোর আগমবাগীশের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বৈদ্যবাটী ও সেওড়াপুলিতে বসবাস করিতেন। তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া খানা-কুলকৃষ্ণনগরের অন্তর্গত সোণাটিকুরি গ্রামে বাস করেন, পরে রাধানগরে উঠিয়া আইসেন।

বাঙ্গালা চণ্ডী প্রণেতা বঙ্গের সুপ্রথিত কবি কেশরী মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের সহিত এই গোষ্ঠীর সংস্রব আছে। কয়োড়ি গাঁই, সপ্তশতী অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণের। এই কথা কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং ইঁহারা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন; অনেক কাল হইতে রাঢ়ীয় সম্প্রদায়-নিবিষ্ট হইয়াছেন।

অনেক পল্লীগ্রামের রীতি—যে গ্রামে প্রাচীন প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে, সেই খানেই আদ্যা-শক্তি যে মগ্ন থাকেন, ইহা অনেকেরই বিশ্বাস। তান্ত্রিক গোষ্ঠী হইলেই তাঁহাদের শাপে টেঙরা মাছকে মরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে সে অভিযোগ নাই। ইঁহারা টেঙরা মারেন নাই। শুনিয়াছি, এই বংশীয় গুরু-প্রসাদ আগমবাগীশ, নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে একদা অন্যমনস্ক হইয়া অমাবস্যার দিন পূর্ণিমা তিথি বলিয়াছিলেন। অবশেষে রাত্রিতে নাকি ভগবতী, রাজাকে শঙ্খ দেখান। শঙ্খই, চন্দ্রের স্থানীয় হইয়াছিল। চন্দ্র ও শঙ্খ উভয়েই শ্বেত-বর্ণ। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিস্তর নিষ্কর ভূমি সম্প্রদান করেন। এই গোষ্ঠী মার্জ্জিত শ্রোত্রিয়। বিদ্যা ও জ্ঞানে ইঁহারা চির-প্রসিদ্ধ। এ বংশে কন্যা বিক্রয় দোষ নাই। অদ্যাপি যে দোষ ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই, ইহা অতি সুখের বিষয়। তন্ত্র, আগম, নিগম ব্যতি-রেকে ইঁহাদের ভবনে বিস্তর ভক্তি-শাস্ত্রীয় পুঁথি ছিল। মহা-শঙ্খের মালা, পঞ্চমুণ্ডীর আসন ইত্যাদি ইঁহাদের গৌরবের বস্তু।

“গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো
ন চ পূর্ণো ন চাংশশ্চ”।

এই শ্লোকার্দ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য, ইঁহাদের বাটীর গ্রন্থালোচনে মীমাংসিত হয়। বৈষ্ণব ও গোস্বামীরা উহার ব্যাখ্যা করেন, গৌরাঙ্গ ভগ-বানের ভক্ত বা অংশ নহেন, কিন্তু তিনি পূর্ণ।

আগমবাগীশের গ্রন্থে ও টীকাতে সিদ্ধান্ত হইল, যে, গৌরাঙ্গ পূর্ণব্রহ্ম বা ব্রহ্মের অংশ অর্থাৎ কলা নহেন, কিন্তু তিনি ভক্ত।

এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কিশোর আগম-বাগীশ মহাশয় মদ্যকে দুগ্ধে পরিণত করিয়া-ছিলেন। তিনিই প্রথমে “আগমবাগীশ” উপাধি-বিমণ্ডিত হন। তিনি ঘণ্টেশ্বরের দেবা-লয়ের সন্নিহিত পলাশ-তরুতলে যোগাসন স্থাপন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণানন্দ সরস্বতীর ভূসম্পত্তি, ধনরত্ন, মণিমাণিক্যাদি কিছুই ছিল না। তিনি অবিবাহিতাবস্থায় গতাসু হন। কিশোরের সন্ততি রাজেন্দ্র আগমবাগীশের বাক্‌সিদ্ধি হইয়াছিল। তিনি সদাই উলঙ্গ থাকিতেন। রাধানগরের মাঠে গুরুপ্রসাদ আগমবাগীশ কর্ত্তৃক ত্রিকোণ-গৃহে পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও “আনন্দময়ী” নাম্নী কালী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ত্রিকোণ যন্ত্র বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ। তাই, ত্রিকোণাকার দেবালয় তাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চতু-ষ্কোণ ও গোলাকার ভবন, সচরাচর দেখিতে পাই। আর কোথাও ত্রিকোণ গৃহ আছে বলিয়া আমরা কখন শুনি নাই। কেবল ত্রিকোণ গৃহ নয়, উহাতে সিদ্ধ আসন, পঞ্চ-মুণ্ডীর পীঠ আছে। মহাশঙ্খের মালা আজও ইঁহার বংশীয়গণের অধিকারে আছে। বীজমন্ত্রের সংযোগে ইহাঁদের দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয় ও সন্ধি-পূজাদি সেই কারণেই সংক্ষেপে ও শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইঁহাদের নিজ বাস্ত বাটীতেও সিদ্ধপীঠ অর্থাৎ পঞ্চমুণ্ডীর স্থান আছে। ইহাই-নাকি আনন্দময়ীর সিদ্ধ পীঠ অপেক্ষাও বিশেষ জাগ্রৎস্থল। কৃষ্ণনগরের কণাদ, রাধানগরের আগমবাগীশ তুল্য প্রখ্যাত।(৭)

আগমবাগীশের বংশতালিকা।

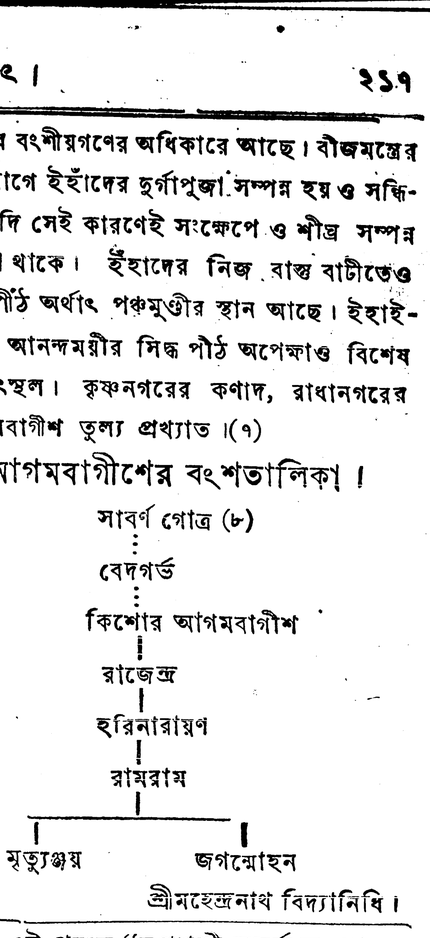

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

(৭) এই প্রবন্ধে “সপ্তশতী অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্ম-ণের” পরিবর্ত্তে ‘সপ্তশতী ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত’ হইবে। ২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮) যে নামের নীচে বিন্দু বিন্দু আছে, তথায় পুত্র না বুঝাইয়া তদ্বংশীয় বুঝাইবে।

উপনিষৎ।

(ঈশা)

১

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্ ॥

পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে সমস্তই, পরমাত্মদ্বারা আচ্ছাদন করিবেক। অর্থাৎ সকল বস্তুই পরমাত্মসত্তাদ্বারা প্রকাশমান এইরূপ জ্ঞান করিবেক। সেই বিরাগদ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবে। কাহার ও ধনে অভিলাষ করিবে না।

২

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়িনান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

এই সংসারে (অগ্নিহোত্রাদি) কর্ম্মসকল নিষ্পাদন করিয়াই শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক। তুমি মনুষ্য ; ইহা ভিন্ন কোন উপায় নাই, যাহাদ্বারা তোমাতে (পাপ) কর্ম্ম লিপ্ত হইবে না।

৩

অসুর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যেকেচাত্মহনো জনাঃ

যাহারা আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মোন্নতি সাধন করেনা; তাহারা দেহ ত্যাগ করিয়া অন্ধতমসাবৃত অর্থাৎ মোহান্ধকারাচ্ছন্ন অসুর্য্য নামক লোক অর্থাৎ অসুরলোক প্রাপ্ত হয়।

৪

অনেজদেকং মনসোজবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি॥

(পরমাত্মা) গতিবিহীন এক মন হইতেও বেগবান্ ইন্দ্রিয় সকল ইহাকে পায় নাই (ইনি) পূর্ব্বেই গিয়াছেন অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়েরই অগোচর। অতএব ধাবমান অপর সকলকে অর্থাৎ মন প্রভৃতি অতিক্রম করেন (ইনি) নিত্য, তাঁহার অধিষ্ঠানে বায়ু কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতেছে।

৫

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

তিনি চল তিনি অচল, তিনি দূরে তিনিই নিকটে, তিনি এই সকলের (জগতের) মধ্যে ও তিনি এই সকলের বাহিরে।

৬

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

যিনি সকল ভূতবর্গকে আত্মাতে এবং সকল ভূতবর্গে আত্মাকে দর্শন করেন (তিনি) সেই হেতু (কাহাকেও) ঘৃণা করেন না।

৭

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কোমোহঃ কঃশোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

যখন সর্ব্বভূতই আত্মা এইরূপ জ্ঞান জন্মে তখন সেই একত্বদর্শীর শোকই বা কি? এবং মোহই বা কি ?

৮

সপর্য্যগাচ্ছু ক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

তিনি সর্ব্বগ শুদ্ধ অশরীর স্নায়ুবিহীন (ও) নির্ম্মল (তিনি) পাপদ্বারা বিদ্ধ নহেন (তিনি) সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভূ (তিনি) নিত্য বৎসরসকলকে যাথাতথ্যরূপে কর্ত্তব্য বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

৯

অন্ধন্তম প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যউ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যাহারা (কেবল) অবিদ্যাকে অর্থাৎ কর্ম্মকে উপাসনা করে (তাহারা) মোহান্ধকারে প্রবেশ করে এবং যাহারা (কেবল) বিদ্যাতে অর্থাৎ জ্ঞানে রত, তাহারা তাহা হইতে অধিক মোহান্ধকারে (প্রবেশ করে)।

১০

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যেন স্তদ্বিচচক্ষিরে॥

বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ (ফল)বলেন (এবং) অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা পৃথক্ (ফল) বলেন। যাহারা আমাদিগকে তাহা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ধীরগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়াছি।

১১

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

যিনি বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম (এই) উভয়কে সহ অর্থাৎ এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় জানেন (তিনি) অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ স্বাভাবিক কর্ম্ম ও জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ করেন।

১২

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততোভূয় ইব তে তমো যউ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥

যাহারা (কেবল) অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতিকে উপাসনা করে, তাহারা মোহান্ধকারে প্রবেশ করে এবং যাহারা(কেবল)সম্ভূতি অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্মে রত থাকে,তাহারা তাহা হইতে অধিকতর মোহান্ধকারে প্রবেশ করে।

১৩

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে ন স্তদ্বিচচক্ষিরে॥

যাঁহারা আমাদিগকে তাহা অর্থাৎ সম্ভব ও অসম্ভবের ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা সেই ধীরগণের এইরূপ (বচন) শুনিয়াছি। তাঁহারা) সম্ভব অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্মোপাসনা হইতে পৃথক্ (ফল) বলেন (এবং) অসম্ভব অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা হইতে পৃথক্ (ফল) বলেন।

১৪

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদো ভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥

যিনি সম্ভূতি অর্থাৎ কার্য্য ব্রহ্মোপাসনা এবং অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা (এই) উভয়কে সহ অর্থাৎ এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় জানেন (তিনি) বিনাশ অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাদ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ অনৈশ্বর্য্যাদিকে অতিক্রম করিয়া অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা অমৃত লাভ করেন।

১৫

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

১৪। হে সূর্য্য ! আমি সত্যধর্ম্মা, অতএব তুমি আমার দৃষ্টির নিমিত্ত হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় পাত্রদ্বারা আচ্ছাদিত সত্যের মুখ অপাবৃত কর।

১৬

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য-
প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং
তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

হে পোষক! হে একস! হে যম! হে সূর্য্য! হে প্রজাপতি পুত্র ! তোমার রশ্মিসকলকে বিগতকর (ও) তেজ উপসংহৃত কর, তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা দেখি। ঐ যে পুরুষ ঐ তাহা আমি।

১৭

বায়ুরনিলমথেদং ভস্মান্তং শরীরং।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥

(প্রাণ) বায়ু অমৃতস্বরূপ বায়ুকে (প্রাপ্ত হউক) এবং শরীর ভস্মাবশেষ (হউক) ওঁ হে মন! স্মরণকর যাহা করিয়াছি স্মরণকর হে মন! স্মরণকর যাহা করিয়াছি স্মরণ কর।

১৮

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মৎ জুহুরানমেনো
ভূয়িষ্ঠান্তে নম উক্তিং বিধেম॥

হে অগ্নে! হে দেব! (তুমি) সকল কর্ম্ম জানিয়া ধননিমিত্ত অর্থাৎ ফলভোগের নিমিত্ত আমাদিগকে সুপথদ্বারা লইয়া যাও (এবং) কুটিল পাপকে আমাদিগ হইতে বিযুক্ত কর। তোমার নিমিত্ত বহুতর নমস্কার বাক্য বিধান করিতেছি।

ঈশোপনিষৎ সমাপ্ত।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যারত্ন

রাজ্যশাসন ও প্রজাশিক্ষা।

বর্ত্তমান বর্ষে বিগত মহরম উপলক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। এ প্রকার ঘটনা এই নূতন নহে; তবে এবার কিছু বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছিল। কাশীর মন্দিরোৎপাটন ব্যাপার আজিও আমরা ভুলি নাই, শ্যামবাজার দাঙ্গার কথা এখনও নূতনই রহিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতি বৎসর আরও কত শত দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া, ভারতবাসীর ও গবর্ণমেণ্টের কত অশান্তির কারণ উৎপাদন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা এক একটী করিয়া বিবেচনা করিলে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু একটু প্রণিধান পূর্ব্বক ইহার তত্ত্বোদ্ভেদের চেষ্টা করিলে তাদৃশ ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; প্রত্যুত ভবিষ্যতে প্রভূত অনর্থের মূলীভূত কারণ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। সে দিন বঙ্গেশ্বর ছোটলাট বাহাদুর পাটনা দরবারে এই বিষয়ে যে কএকটী সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই মনোযোগ সহকারে আলোচনা করা উচিত। এ বিষয়ে যেমন প্রজার কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, সেইরূপ গবর্ণমেণ্টেরও অনেকগুলি দায়িত্ব ও ক্ষমতা রহিয়াছে। এ সব স্থলে রাজদায়িত্ব বলবৎ এবং প্রজার দায়িত্ব অনেকাংশে রাজার দায়িত্বের উপর নির্ভর করে।

দুঃখের বিষয় আজি কালি গবর্ণমেণ্ট যে নীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, প্রজাশিক্ষা যে রাজ্যশাসনের একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা গবর্ণমেণ্ট এককালে ভুলিয়া গিয়াছেন। রাজপুরুষেরা ব্যয়সঙ্কোচ করিতে গিয়া, যে শিক্ষাসঙ্কোচক নীতির প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, তাহা ভারতের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। এই সঙ্কীর্ণ নীতির ফল শুভজনক নহে। ইহার সমস্ত দূষণীয়তা ভারতময় সংক্রমিত হইতেছে। আমরা এই নীতির অযৌক্তিকতা, বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শান্তিসুখ সংস্থাপনার্থে গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি দায়িত্ব ও ক্ষমতা

আছে। প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার তাহার অন্যতম। "রাজা" এই শব্দের সহিত উক্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত রহিয়াছে। ঐ দায়িত্ব ও ক্ষমতার পরিমাণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা করিয়াছেন। কেহ বলেন মানবজীবনের প্রত্যেক বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ করা উচিত। বাণিজ্য রাজার আদেশানুযায়ী চলিবে, প্রত্যেক প্রজার সাংসারিক ব্যয় রাজা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রভৃতি রাজার অনুমোদনানুযায়ী প্রকাশিত হইবে, এমন কি ধর্ম্ম কর্ম্মেও রাজানুশাসন বলবৎ থাকিবে। আবার এ দিকে প্রতিপক্ষগণ রাজার প্রজাসম্বন্ধে কার্য্যশক্তি অতি সঙ্কীর্ণ সীমাতে আবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু যত সঙ্কীর্ণ সীমাতেই রাজশক্তি আবদ্ধ হউক না, প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা যে, রাজার একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও অবিসম্বাদিত দায়িত্ব, তাহা সর্ব্ববাদী কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও সম্মানিত।

প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা যদি রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার উক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান উপায়। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক Adam Smith, রাজ্যসম্বন্ধে রাজার কর্ত্তব্য অতি সঙ্কীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে, প্রজাপুঞ্জের শিক্ষা, রাজ্যমাত্রেই বিশেষতঃ সুসভ্য ও সমুন্নত রাজার রাজ্যে একান্ত ও অপরিহার্য্যভাবে আবশ্যকীয়। যেমন প্রজামধ্যে কোন সংক্রামক ব্যাধি ব্যাপ্ত হইতে না পারে, এজন্য সতর্ক হওয়া প্রত্যেক রাজপুরুষের একটী প্রধান কর্ত্তব্য, সেইরূপ অজ্ঞানজনিত মানসিক ব্যাধির বিস্তৃতি নিবারণ চেষ্টাও রাজ্যরক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। এই অজ্ঞানতাজনিত মানসিক ব্যাধি নিরাকরণে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, সাধারণ শান্তিরক্ষা এক প্রকার অসম্ভব। যদি প্রজাপুঞ্জ অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মন সামান্য কারণেই বিচলিত হইয়া পড়ে। সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ে অতি অকিঞ্চিৎকর মতপার্থক্য ঘটিলেই উহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া বিষম অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে ও রাজ্যের সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া উঠে। Adam smith ধর্ম্ম বিষয়ে অনর্থপাতের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কার্য্যতঃ আমরা তাহাই দেখিতে পাই। ভারতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি অশান্তিকর ঘটনা প্রজাকর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের মূলেই অকিঞ্চিৎকর অথবা ভ্রান্ত ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপাশঙ্কাই কারণ রূপে কার্য্যকরী হইয়াছে। শুধু ভারতে নহে, যেখানে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত প্রজা সমষ্টি রাজ্যের প্রধান অঙ্গ, সেই খানেই আমরা এই সত্যের প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাই। এমন কি সুসভ্য ইংলণ্ডেও এ প্রকার উদাহরণ নিতান্ত বিরল নহে। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে রোমান কাথোলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে জনৈক বিকৃতমস্তিষ্কের উত্তেজনায় শত শত অশিক্ষিত প্রজামণ্ডলীর সমবেত অভ্যুত্থান ও তৎসংসৃষ্ট বীভৎস নরহত্যা ও বিষম অশান্তি-উৎপাদন-ব্যাপার ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নহে। তৎপর ১৮৩০—৩১ অব্দে জাতীয় মহাসভাসংস্কার আইনের আন্দোলন ও আলোচনার সময়ে অশিক্ষিত জনসাধারণ মধ্যে যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ও রাজদ্রোহিতার অভিনয় হইয়াছিল, তাহারও কারণ কেবল একমাত্র প্রজামধ্যে সম্যক শিক্ষাবিস্তারের অভাব। ফলতঃ শিক্ষা বিহীনরাজ্য ও নিরব-

ছিন্ন অন্ধকারময় প্রাসাদ সমভাবাপন্ন। একে শান্তি সুখের আশা ও অন্যে দর্শন শক্তির বিকাশ চেষ্টা তুল্যাংশে অবৈজ্ঞানিক ও অসম্ভব। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা,রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রজা-পুঞ্জের শিক্ষাভাবই প্রজার ধনপ্রাণরক্ষার প্রধান অন্তরায়। অতএব প্রজা মধ্যে শিক্ষাভাব দূরী-করণে যত্নবান হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

এখন দেখা যাউক শিক্ষাবিস্তার ব্যতীত প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষার আর কি উপায় আছে? অবশ্য আমরা একথা বলিতে চাহি না যে, শিক্ষাবিস্তারই প্রজারক্ষার কেবল এক মাত্র উপায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ বিষয়ে রাজার কতকগুলি ক্ষমতাও আছে। তবে সেই সকল ক্ষমতা পরিচালন সাময়িক আবশ্যকতাসাপেক্ষ। এগুলি যেমন অপরাধিবর্গের যাতনা ও শাস্তি-প্রদ,তেমনি তৎসংসৃষ্ট নিরপরাধিগণেরও ক্লেশ-দায়ক। বন্দুক, তরবারী,কারাগার সমূহের বহুল ব্যবহারে প্রজার ধনপ্রাণরক্ষা অসম্ভব নহে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত উপায় ও ইহার মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্টতর ও বাঞ্ছনীয় তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? প্রত্যেক সদ্বিবেচক ব্যক্তিই ইহার কেবল একমাত্র উত্তর-দানে সমর্থ। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে প্রথমোক্ত মতেরই সমর্থন করিবেন। আমাদের নিকট ইহা একটী জলন্ত সত্য বলিয়া প্রতীত হয় যে, যাহার হস্তে প্রাণ-দণ্ড করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার স্কন্ধে শিক্ষা বিস্তার করিবার গুরুতর দায়িত্বও ন্যস্ত রহিয়াছে। সমুচিত শিক্ষাবিস্তার থাকিলে কি আমরা বধ্যভূমির ভীষণ দৃশ্য ও কারাগারের নিদারুণ হৃদয়ভেদী চিত্র বর্ত্তমান আকারে দেখিতে পাইতাম? তাহা হইলে কি আজ অসংখ্য বন্দী, পাপের আবিলতা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক জীবনের স্বাধীনতা ও সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কারাগারের শোচনীয় অবস্থা আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করিত! তাহা হইলে কি আজ সুখের সংসারে আণ্ডামান নরকের অস্তিত্ব থাকিত? কিন্তু কি বিড়ম্বনা, দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতে তাদৃশ শিক্ষা-বিস্তার নাই। প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষাও অবশ্য কর্ত্তব্য, তাই অপরাধীর সমুচিত শাস্তি বিধা-নেরও আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এই আবশ্য-কতা কি বাঞ্ছনীয়? ইহা কি নিষ্ঠুরতা ও নির্ম্মমতার কালিমায় জড়িত নহে? এই জন্যই বলিতেছি যে, প্রজাশিক্ষা রাজ্যরক্ষার একটী সামান্য উপায় বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে, প্রত্যুত ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান উপায়। আমরা বুঝিতে পারি না, গভর্ণমেণ্ট কোন্ নীতি অনু-সারে রাজ্য রক্ষার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান উপায় হইতে স্বীয় দায়িত্ব উন্মোচন করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন। রাজা শুধু দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নহে, রাজ্য শুধু সৈন্যাবাসশ্রেণীর আধার নহে, প্রজা কেবল শাস্তিভোগের জন্য সৃষ্ট নহে। প্রজাচরিত্র সংগঠন রাজার অতি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই চরিত্রসংগঠনের স্থান ধর্ম্মাধিকরণ বা কারাগার নহে; ইহার শিক্ষক সৈনিক পুরুষ বা সশস্ত্র শান্তিরক্ষকগণ নহে। বিদ্যালয় ইহার প্রকৃত আলয়, জ্ঞানদাতা অধ্যাপক ইহার প্রকৃত শিক্ষক এই জন্যই বিদ্যালয় ও অধ্যাপক মণ্ড-লীর সংখ্যা হ্রাস করা দূরে থাকুক, আরও বৃদ্ধি করা গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য, তাঁহাদের এ ভ্রান্ত নীতির পরিবর্ত্তন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানি যেমন প্রজাপুঞ্জের প্রয়োজন ও অভাব অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, বিদ্যা-শিক্ষা সম্বন্ধেও উক্ত নিয়ম কার্য্যকারী হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ রাজার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদা-সীন থাকা কর্ত্তব্য। আমরা এই শ্রেণীর পণ্ডিত-দিগের মতের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অসমর্থ। চিনি

বা অন্য কোন পণ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে না পাইলে ব্যক্তি বিশেষের অসুবিধা ঘটিতে পারে; কিন্তু তাহাতে অন্যের কি যায় আসে? কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে অভাব থাকিলে শুধু তাহার ক্ষতি এমত নহে, তাহার সমাজ ও রাজাও সেই ক্ষতির অংশী হইবেন। ধনসম্পত্তিসম্পন্ন সমৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে এই "অভাব ও পূরণ" নীতি অনেকাংশে ক্রিয়াশীল হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গমধ্যে এই নিয়ম কোন রূপেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। কোন কোন রাজপুরুষ একথাও বলিয়া থাকেন যে, দেশীয় দানশীল ব্যক্তিগণ স্বীয় বদান্যতাগুণে স্বদেশ মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবেন। অবশ্য আমরা স্বীকার করি, রাজ্যমধ্যে এরূপ অনেক মহামনা ব্যক্তি আছেন যাঁহারা স্বজাতির উন্নতিকল্পে শিক্ষা বিস্তারার্থ অকাতরে সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশীলা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং নড়াইল ও বরিশালনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমীদারবংশীয়গণ ও অপরাপর উন্নতমনা কতিপয় ব্যক্তি এই সৎকীর্ত্তির উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এতদ্বারা যতই মহদুপকার হউক না কেন, তাঁহাদের শুভ-সংকল্প যতই প্রসারিত কার্য্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হউক না কেন, তদ্দ্বারা কখনই প্রজাসাধারণের অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। পণ্যব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতা যেমন পণ্যদ্রব্যের অভাব মোচন করিতে পারে, বদান্য ব্যক্তিদিগের এই সাধু-কার্য্যের প্রতিযোগিতা কোন মতেই শিক্ষা বিস্তারের অভাব পূরণ করিতে পারে না। পণ্য-দ্রব্য উত্তম না হইলে ব্যবসায়ীর জীবিকা-হানির আশঙ্কা আছে, এবং এই জীবিকা হানির আশঙ্কাতেই সে প্রাণপণ উৎসাহে স্বীয় কার্য্যে অগ্রসর হয়। আমরা মানব-বদান্যতাকে যত উচ্চ আসনই দিই না কেন, এই জীবিকা লোপাশঙ্কা প্রণোদিত উৎসাহের নিকট হিতৈ-ষিতাপ্রণোদিত উৎসাহ অতি নিস্তেজ। তাই বলিতেছি যে, "অভাব ও পূরণ" নীতির বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষানীতি পরিচালন, অদূরদর্শিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এইরূপ যে দিক হইতেই দেখা যাউক না কেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শিক্ষাবিস্তার রাজ্যরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্ব-প্রধান উপায় এবং এই শিক্ষাবিস্তারকার্য্য রাজার সর্ব্বপ্রধান দায়িত্বেরই অন্তর্নিবিষ্ট। ইহার জন্য রাজার পরমুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না, রাজাকে স্বহস্তে ও স্বযত্নে ইহার বিস্তৃতি সাধন করিতে হইবে।

প্রজা শিক্ষা রাজ্যরক্ষার মূলমন্ত্র হইলে, প্রজাপুঞ্জ যে কি অমৃতময় ফলের অধিকারী হয়, তাহা বিশেষ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যে সকল রাজ্যে এই মহা-মন্ত্রের বীজ উপ্ত হইয়াছে, সেই সকল রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই হইবে। এ বিষয়ে বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া আমরা পাঠকবর্গকে মার্কিণরাজ্যের ক্রমনির্ম্মাণ পদ্ধতি একটু প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিতে বলি। শিক্ষাবিস্তারের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত। স্কচ জাতি এ বিষয়ের জলন্ত উদাহরণ। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডের অবস্থা ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলে স্কটলণ্ডকে অসভ্য বর্ব্বর ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইত না। দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, অলসতা ও যথেচ্ছাচার স্কচজাতির সর্ব্বস্ব ভূষণ ছিল। ইংলণ্ডবাসিগণ স্কটলণ্ডবাসী-দিগের নাম শুনিলে ঘৃণা ও উপহাস প্রকাশ করিত। কিন্তু যেমন ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় রাজবিপ্লবের অবসান হইল, অমনি জনৈক স্বদেশ প্রেমিক স্কচ পুরুষের প্রস্তাবানুসারে স্কটলণ্ডের সর্ব্বস্থানে পল্লীবিদ্যালয় সকল সংস্থা-

পিত হইল। স্কটলণ্ডে সাধারণ শিক্ষার বীজ উপ্ত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের উদার নীতির আশ্রয়ে ঐ বীজ যথাসময়ে ফুলফলবান বৃক্ষে পরিণত হইয়া স্কটলণ্ডে অধুনা শান্তির সুশীতল ছায়া বিতরণ করিতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে জাতি ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই জাতি ইংলণ্ডবাসীদিগের ঈর্ষা ও অনুকরণের পাত্র হইল। ইহার একমাত্র কারণ,কেবল স্কটজাতি মধ্যে সাধারণ শিক্ষাবিস্তার ও ইংলণ্ডে তাৎকালিক প্রজাশিক্ষার অভাব। প্রজাশিক্ষার তারতম্যে একই রাজার অধীনে, একই রাজ্যে একই জাতির মধ্যে কি প্রকার বিসদৃশ ফল উৎপন্ন হয়! রাজ্যশাসন পদ্ধতি যদি ঐতিহাসিক সত্যসাপেক্ষ হয়, প্রাগ্বিজ্ঞান যদি বাস্তবিকই উত্তরবিজ্ঞানের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছি, তাহাও অবশ্য সত্য স্বীকার করিতে হইবে। স্কটলণ্ডে শিক্ষা বিস্তার পরীক্ষার ফল অবিসম্বাদিত। অবিসম্বাদিতরূপে পরীক্ষিত সত্য রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থদর্শনে অন্য যুক্তির অপেক্ষা করে না। শাসন বিজ্ঞানে ও প্রজাশিক্ষায় এই মহৎ ফলপ্রসবিনী শক্তি পরীক্ষিত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং রাজার এই সত্যানুযায়ী রাজ্যশাসনে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। এই সত্যের অনুসরণে শান্তি, পরিবর্জ্জনে বিপদ।

শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী।

কবিতা।

বালিকা।

১

মূর্ত্তিমতী সরলতা তুমি এ সংসারে।
শোক-তাপে জর্জ্জরিত মানব-হৃদয়
হেরিয়া ও চাঁদ মুখ ভাসে সুখনীরে।
কি মধুর ভাবে মন বিমোহিত হয়!

২

মধুর মুরতি খানি হেরিলে নয়নে
সুর-বালা বলি মনে হয় অনুমান।
সাধ হয় হৃদি মাঝে বসায়ে যতনে,
কুসুমঅঞ্জলি পদে করি সমর্পণ।

৩

সতত চঞ্চল নেত্রে মৃগশিশু প্রায়,
কি যেন দেখিছ ওই সভয়ে চাহিয়া।
ভাব বুঝি মনে মনে "কেনবা হেথায়
আসিলাম অকারণে স্বরগ ত্যজিয়া?"

৪

অমিয়-জড়িত তব সুমধুর কথা
শুনিয়া হৃদয় যেন যায়রে গলিয়া।
ক্ষণ তরে ভুলে গিয়া হৃদয়ের ব্যথা,
আনন্দ হিল্লোলে প্রাণ উঠেরে নাচিয়া।

৫

অস্ফুট কৌমুদী-নিভ লাবণ্য-প্রভায়,
ফুটন্ত গোলাপ সম প্রফুল্ল আনন,
সংসার-বিপিন ক্ষণে উজলিয়া হায়!
শুখা'য়ে যেতেছে কত কে করে গণন?

৬

তুমিরে! মন্দারফুল নন্দনকাননে;
অথবা তুমিরে বুঝি স্বরগের জ্যোতি।
ডুবাতে প্রীতির নীরে, মানবের মনে,
আসিয়া এ ধরা ধামে, ছড়াতেছ ভাতি।

৭

পর-দুঃখে তব প্রাণ সতত কাতর।
কাঁদিয়া আকুল হও পরের বেদনে।
এ মধুর কোমলতা তোমা বিনা আর
নাহি বুঝি এ জগতে অপরের প্রাণে।

৮

তরুণ লতিকা সম সরল প্রকৃতি।
সংসারের কুটিলতা জাননা কেমন।
সতত সরল ভাব সকলের প্রতি,
ভাব যেন সকলেরে আপনার মতন।

শরচ্চন্দ্র দত্ত।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী (১১)।

হিন্দি, বিশেষতঃ ইহার শাখাবিশেষ ব্রজভাষা ও মৈথিলীভাষা বাঙ্গালার প্রধান উপাদান। বহু দিবস হিন্দী ভাষার প্রচলন হইলে ক্রমে ক্রমে ব্রজ ও মৈথিলীভাষার উৎপত্তি হয়। উহারাও একবিধ হিন্দী। কিন্তু, কি প্রকারে বা কোন্ কোন্ নিয়মের অধীন হইয়া হিন্দী হইতে উক্ত দুই ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা স্থির করা সুকঠিন। তদ্ব্যতীত মারহাটী, গুজরাটী,ভোজপুরী,সিন্ধী প্রভৃতি আরও কয়েকটী হিন্দির শাখা আছে; সে সকলের সহিত বাঙ্গালার বড় সংশ্রব নাই। হিন্দীর ভূরি ভূরি শব্দ সেই সকল ভাষার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়; বিভক্তির আকৃতি বা ক্রিয়া-প্রকরণে তাহাদের মধ্যে প্রভূত ব্যত্যয় আছে। প্রাকৃত শব্দনিচয় কোথাও অল্পবিকৃত, কোথাও বা প্রকৃত অবস্থাতেই হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়। উহা হইতে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে তদ্রূপ কতকগুলি শব্দ প্রদত্ত হইল।

হিন্দী	বাঙ্গালা
গাভন	গাভিন
আধা	আধ
চাংদ	চাঁদ
মাঝ	মাঝ
হাথ	হাত
মুঠ	মুট
ভাত	ভাত
কায়ত	কায়েত
দেউল	দেউল
অংধার	আঁধার
আপন	আপন

হিন্দী	বাঙ্গালা
বাম্মণ	বামন
মোটা	মোটা
বাসরু	বাছুর
গোলু	গোরু
বিচ্ছু	বিছা
মাউসী	মাসী
সাঁজ	সাঁজ
কছু	কিছু
জিব্‌হা	জিভা, জিবা
অটকল	আটকাল
উংচ	উঁচু
অংব	আঁব
চমার	চামার
কাকা	কাকা
উল্টা	উল্টা
পেট	পেট
টট্টু	টাট্টু
থংড	ঠাণ্ডা
ঘোড়া	ঘোড়া
কংকর	কাংকর
বাপ, বাবা,	বাপ, বাবা
সাংকু	সাঁকো
নাতু	নাতী
গেরু	গেরি
অজ	আজ
আরু	আর
কংধ	কাঁধ
অচংভ	আচম্বা
জেঠ	জেঠা
জেঠাঈ	জেঠাই

হিন্দী	বাঙ্গালা
আড়াল	আড়াল
কাল(কল্য)	কাল
পরসো	পরশু

পূর্ব্বোদ্ধৃত শব্দগুলির অধিকাংশই মারহাটী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাতেও পরিদৃষ্ট হয়।

উড়িষ্যাভাষার উৎপত্তি বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। ক্রিয়া-প্রকরণে বাঙ্গালাভাষা ইহার দ্বারা অনেকটা পরিপুষ্ট হইয়াছে। যথা-স্থানে তৎসমুদায় নির্দ্দিষ্ট হইবে। উৎকল ও বাঙ্গালা ভাষার শব্দ সকল একরূপ। যে কোনও ভাষার একখানি অভিধান থাকিলেই উভয় ভাষার বার আনা শব্দের জন্য কোনও ভাবনা থাকে না। গ্রাম্য বা প্রচলিত শব্দ সকলে অনেকটা বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে গ্রন্থ প্রচলিত শব্দ সকল এক বলিয়া আর এস্থলে উল্লিখিত হইল না। তবে উৎকলের টুকি হইতে বাঙ্গালার টুকু, গুড় হইতে গুল, ও বিড়া হইতে বিঁড়া হইয়াছে। উহার গোটা, টি, টা প্রভৃতি বাঙ্গালাতেও প্রচলিত আছে। যঁহি, কাঁহি, নাঁহি, কেহি, কতেক, এধার, সেধার প্রভৃতি অপভ্রষ্ট হিন্দি শব্দ। এমন্ত, যেমন্ত, কেমন্ত, তেমন্ত, হইতেই বাঙ্গালায় এমন, যেমন, কেমন তেমন ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি থাকিলে, উৎকল ভাষা অতীব সুগম হইয়া আইসে।

আমরা যে যে ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি বলিয়াছি, অতঃপর কয়েকটী শব্দ দ্বারা ঐ সকল ভাষা হইতেই যে বাঙ্গালাভাষার সমুৎপত্তি,তাহাই বিশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করি। অনেকের ধারণা যে, সংস্কৃত শব্দসকল অপভ্রষ্ট হইয়া একেবারে বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা আমাদের অনুমোদিত নহে। এবম্বিধ অনেক শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত থাকিলেও সকল শব্দই যে ঐরূপ, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, অপভ্রংশ-কাণ্ডে উভয় শব্দের মধ্যে বহুল পার্থক্য প্রত্যক্ষ হয় না; ক্রমশঃ সেই কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। মনে করুন, সংস্কৃত দীর্ঘি শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'দীঘি' হইতে পারে; কিন্তু বধূ হইতে যে একেবারে "বৌ" হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে কিছু কুণ্ঠিত হইতে হয়। সুতরাং, বধূ ও বৌ এতদুভয়ের মধ্যে অন্য কোন ভাষা আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। তদ্বিধ কয়েকটী শব্দই আমরা এস্থলে প্রদর্শন করিব।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	হিন্দী	উৎকল	বাঙ্গালা
পক্ক	পক্ক	পাক্কা	পকা	পাকা
পুস্তি	পোত্থি	পোথি	পোথি	পুথি
বড্	বড্ড	বড়া	বড়	বড়
গড্ডোল	গাড্ডল	গাড়ল	গাড়ল	গাড়ল
গড্ডুক	গড্ডুক	গাড়ুক	গাড়ু	গাড়ু
চতুষ্পদী	চউপদী	চৌপাই	"	চৌপায়া।
ক্ষার	ক্খার	ক্ছার	"	ছার
স্তম্ভ	থম্ভ	থংভ	থম	থাম
দধি	দহি	দহী	দহি	দই
দ্বার	দুবার	দুবার	দুয়ার	দুয়ার
দুগ্ধ	দুদ্ধ	দুধ	দুধ	দুদ
প্রস্তর	পত্থর	পথর	পথর	পাথর
বধূ	বহূ	বহু	বউ	বৌ

সংস্কৃত পক্ক শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'পাকা' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; একথা বলিলে বক্তার দুঃসাহসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা প, ক্ ও ব এই তিনটী অক্ষরে 'পক্ক' শব্দ হইয়া 'পাকা' শব্দের বেলায় 'ব' কোথায় গেল? এবং ইটি আকারই বা কোথা হইতে আসিল? সহজেই এরূপ প্রশ্ন মনে হইবে। একেবারে এতটা পার্থক্য হওয়াই অসম্ভব! এতদনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গেল, যে, সংস্কৃত 'পক্ক' হইতে প্রাকৃত 'পক্ক' হইয়াছে। প্রাকৃতে কেবল একটী 'ব'কার স্থানে একটী 'ক'কার আসিল। এক্ষণে ঐ প্রাকৃত 'পক্ক' হইতে হিন্দী 'পাক্কা' হওয়া কিছু আশ্চর্য্যকজনক নহে; কারণ, উহাতে কেবল একটী আকার বেশী। হিন্দীতে 'পক্কা' এইরূপও লিখিত হয়। তাহা হইলেই ঐ হিন্দী 'পক্কা, হইতে উৎকল 'পকা' ও তাহা হইতে বাঙ্গালায় পাকা হইতে পারে। যেহেতু, উৎকলে একটী 'ক'কারের লোপ এবং বাঙ্গালায় একটী আকার অধিক। এইরূপ, ক্রমশ একটী কম বা একটী বেশী দ্বারা অপভ্রংশ-ব্যাপার সমাধা হইয়া থাকে। একেবারে দুই চারিটী শব্দের কম বেশী বড় হয় না। অতএব, সংস্কৃত পক্ক হইতে বাঙ্গালার পাকা নহে। মধ্যে প্রাকৃত, হিন্দী ও উৎকল আছে। তাহা হইলেই পূর্ব্বোদ্ধৃত শব্দ গুলির দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে, যে, বাঙ্গালা ভাষা প্রকৃতং ভাষা হইতে সমুৎপন্ন, তাহাতে আদৌ দ্বিধা নাই।

অনেক সংস্কৃত শব্দও অপভ্রষ্ট হইয়া বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহাদের কতকগুলি সন্নিবেশিত হইল। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী হিন্দী বা অন্যান্য ভাষাতেও পরিলক্ষিত হইতে পারে।

সংস্কৃত	বাঙ্গালা
চ্যবন	চুয়ান
চেড়	চেলা
ছাদন	ছাওয়া
জটিত	জড়ান
যোজন	যোড়ন
ঝটিতি	ঝট
দদ্রু	দাদ
লগ্ন	লাগন
দীর্ঘি	দীঘি
ধোত্র	ধোতী
ননংদ	ননদ
নমন	নাবান
ফুৎ	ফুঁ
বর্দ্ধন	বাড়ান
বাটী	বাড়ী
পৃষ্ঠ	পীঠ
ঝট	ঝড়
তাপন	তাতান
তপ্ত	তত
তিক্ত	তিত
স্থান	থান
হংডী	হাঁড়ী
পরীক্ষা	পরক
পলায়ন	পালান
বল্কল	বাকল

এই তালিকার মধ্যে যে যে বাঙ্গালা শব্দ দেওয়া গেল, উহাদের মধ্যেও কোন কোনটি হিন্দী বা উৎকলে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। সকল গুলিই যে একেবারে সংস্কৃত ভাঙ্গা, সাহস করিয়া কোন ক্রমেই এমন কথা বলা যায় না। জনক-জননীর চিহ্ন সন্তানে থাকিবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি?

ক্রমশঃ হিন্দী ভাষার ন্যায় আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতেও আরবী ও পারসী শব্দের বহুল পরিমাণে সমাবেশ হইয়া পড়িয়াছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, কথোপকথনাদিতে আজকাল যত শব্দ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে সংস্কতমূলক শব্দ একার্দ্ধ, পারসী বা আরবী শব্দ অপরার্দ্ধ। তাহার দিঙ মাত্র নিদর্শন প্রদর্শিত হইতেছে। সংস্কত স্থান জাত 'ঠাঁই' শব্দ আর এখন আমাদের ব্যবহারে আসে না। ফার্সীর 'জগা'-জাত'জায়গা' শব্দই এখন উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ক্ষেত্রজাত খেত ছাড়িয়া এখন আমরা 'জমীন' জাত 'জমী' ধরিয়াছি। 'বলে'র বল এখন খুব কম; 'জোরে-র'ই জোর বেশী বেশী দেখা যাইতেছে। মত্ততা কেবল কয়েক জন ভদ্রলোকের কাছে; কিন্তু 'নেশা' ছোট বড় কাহারও কাছে বাকী নাই। নেকা, নেঙা, বোবা, হাবা, কালা, খাঁদার প্রচলিত শব্দ পূর্ব্বে কি ছিল, জানা যায় না। 'আবরণ' গিয়াছে; 'পরদা' চলিতেছে। 'কার্য্যালয়ে'র বদলে 'কারখানা' হইয়াছে। 'বিনিময়' নাই,'বদল' আছে। একার্থ ধাতুঘটিত'পরিচ্ছদ' ও 'পোষাকের' মধ্যে আমরা শেষটীরই বেশী বেশী আদর করিয়া থাকি। 'খাতির'এখন অদ্বিতীয়। 'খাঁকতির'ই বা কসুর কি? 'খোরাকির' জন্য সকলেই লালায়িত। যাহারা নহে, তাহারা 'খেতাব' ও 'খেলাতে'র জন্যই ব্যস্ত। জুতা, পয়জার, খড়ম, চোগা, চাপকান, জামা, এজার, টুপি, চশমা, ছড়িতেত কাহারও অভাব দৃষ্ট হয় না। পল্লীগ্রামে হট্টজাত 'হাট' আছে বটে, কিন্তু নগরে 'বাজার' 'দোকান' ভিন্ন কথা নাই। 'লাভে'র বেলায় খুব কম, কিন্তু 'নুকসানে'র বেলাতেই বেশী বেশী। সকলেই বলেন 'গরীব'; যিনি বড় মাতৃভাষাপ্রিয়, তিনি না হয়, উহার পর 'দুঃখী' কথাটি যোজনা করিয়া মাতৃভাষারই সেবকত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 'পসারে'র জন্য লোকে হাঁ করিয়া রহিয়াছে। 'আক্কেল' ছাড়া কে আছে? ঘরে বাহিরে, দোকানে বাজারে, পথে ঘাটে, ময়দানে বাগানে সর্ব্বত্রই 'জিনিষ'। এইরূপ নানা প্রকারে সংস্কৃত শব্দ স্থানে পারসিক ও আরবিক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। আর কত বলিব। আমরা এ বিষয় লইয়া আর অধিক আন্দোলন করিব না। এক্ষণে বঙ্গীয় ভাষার বিভক্তির আকৃতি ও ক্রিয়া প্রকরণের বিবরণ প্রকাশিত করিলেই আমাদের কার্য্য সমাধা হয়।

বিভক্তির আকৃতি।

আমাদের বিভক্তির আকৃতির অধিকাংশই মৈথিলী ভাষা হইতে সংগৃহীত। অন্যান্য ভাষার ন্যায় ইহারও সাত বিভক্তি। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী। কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। সংস্কৃত-ব্যতীত আর সকল প্রাচ্য ভাষাতেই সেই প্রথমা বিভক্তির লোপ হইতে দেখা যায়; সুতরাং, বাঙ্গালা ভাষাতেও কর্ত্তৃকারকের কোন চিহ্ন থাকে না। যথা, রাম যাইতেছে; গোপাল ডাকিতেছে, উভয়ত্র কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন নাই।

মৈথিলী ভাষার কর্ম্মকারকে 'কেঁ' হয়। কিন্তু, মিথিলার প্রদেশবিশেষে কেবল 'কে' হইয়া থাকে। ঐ 'কে' হইতেই আমাদের কর্ম্মকারকে 'কে' ব্যবহৃত হয়। যথা, তোমাকে বলিব; তাহাকে ডাক। স্থল বিশেষে ঐ 'কে'র লোপও ঘটে। যথা, জল আন; ভাত খাও। বাঙ্গালার কর্ম্মকারকে কোনও কোনও স্থানে 'রে'ও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, আমারে ডাকিও; হরিরে সঙ্গে করিয়া আনিও। 'রে' পদ্যেই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গদ্যে উহার প্রয়োগ খুব কম। কোথা হইতে 'রে' আসিয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। পুনরুল্লেখ করিব না।

মৈথিলী ভাষার করণকারকে হিন্দীর 'সে' হইতে প্রথম প্রথম সঁ, সোঁ হইয়াছিল। এক্ষণে উহারা প্রাচীন প্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত। ইদানীং মিথিলাবাসিগণ করণকারকে 'এ' ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুনা যায়, নানাকারণে মিথিলা প্রদেশের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্টতা ছিল। তজ্জন্যই বাঙ্গালাভাষা মৈথিলী ভাষার উপকরণ অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছে। আমাদের করণ কারকেও 'এ' প্রচলিত আছে। যথা; জলে আগুন নিবে। অন্যান্য করণ চিহ্ন পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, তজ্জন্য এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইল না।

মৈথিলেয় সম্প্রদান চিহ্ন 'কে'। আমাদেরও তাহাই। সংস্কৃত-ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায় সম্প্রদানের তাদৃশ সার্থকতা দেখা যায়না। এজন্য হিন্দী প্রভৃতি কয়েকটী ভাষায় উহার উল্লেখও নাই। তত্তৎ ভাষায় সম্প্রদান কর্ম্মস্থানীয় হইয়া থাকে। বাঙ্গালার সম্প্রদানকেও কর্ম্ম বলিলে বলা যায়।

মৈথিলীর অপাদান চিহ্ন সঁ, সোঁ। হিন্দীর সহিত ইহার কতকটা সাম্য আছে। বাঙ্গালার অপাদান মৈথিলীর বিন্দু বিসর্গও গ্রহণ করে নাই। আমাদের অপাদান চিহ্ন থেকে, হইতে। মারহাটী থী, থকী হইতে বাঙ্গালার থেকে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত স্থিত্বা হইতে বাঙ্গালার থেকে হইয়াছে। স্থিত্বার অর্থ থাকিয়া। সুতরাং, ঘর থেকে অর্থাৎ ঘরে থাকার পর। এ কথাটী নিতান্ত অসঙ্গতও নহে। তৈলিঙ্গী ভাষার অপাদান চিহ্ন 'ডু'; উহা হইতেই উৎকলের রু, ঠারু। ঠারুর অর্থ আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি। সংস্কত স্থা ধাতু স্থানে প্রাকৃতে 'থা' হয়। ক্রমে 'থা' হইতে 'ঠা' হইয়াছে। তাহা হইলেই 'ঠা' শব্দের অর্থ স্থান। 'ঠারু' শব্দের অর্থ স্থান হইতে। সুতরাং, গৃহ ঠারুর অর্থ গৃহের স্থান হইতে অর্থাৎ গৃহ হইতে। ইহাতে আমাদের 'থেকে'র সহিত বড় বিসম্বাদ ঘটিতেছে না। 'ঘরে থাকিয়া বাহির হইল' বা 'ঘরের স্থান হইতে বাহির হইল, একই কথা। আমাদের আর একটী অপাদান চিহ্ন হইতে। ইহা কোথা হইতে আসিল, তন্নির্ণয় এখনও আমাদের সাধ্যাতীত। কাহারও কাহারও মত, প্রাকৃতে পঞ্চমীর বহুবচনে 'হিংতো', 'সুংতো' হয়। ঐ হিংতো হইতেই আমাদের 'হইতে' হইয়াছে। আমরা এক্ষণে ইহার কোন প্রত্যুত্তর দিব না। সম্যক্ পরিজ্ঞাত না হইয়া কোনও কথা বলা আমাদের অনভ্যস্ত। জানিতে পারিলে সকলকে বিদিত;করিতে ত্রুটি করিবনা, তবে প্রাকৃতিক 'হিংতো' 'সুংতো' অপেক্ষাও সুসঙ্গত একটী কথা আমাদের মনে লাগিয়াছে। বলিতে পারিনা, যে সেইটী হইতেই আমাদের 'হইতে' উৎপন্ন। যাহা হউক, কতকটা সঙ্গত বলিয়া এস্থলে বিবৃত করা গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত 'ভূ' ধাতু প্রকৃতে 'হো' হইয়া হিন্দীতে 'হোয়' হইয়াছিল। উহাতেই 'ত'-যোগে 'হোয়ত' পদ অনেক স্থানেই হিন্দীতে দেখা যায়। উহা অসমাপিকা ক্রিয়া; এবং উহার অর্থ হইয়া। ব্রজভাষাতেও এই 'হোয়ত' অনেক দেখা যায়। যথা, ব্রজ হোয়ত আঅল। অর্থাৎ ব্রজ হইয়া আসিল। অদ্যাপি এতদ্দেশেও অপাদানে হইয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, কালীঘাট হইয়া বাড়ী যাইবে। হিন্দীর এই হোয়ত'কালক্রমে 'হোয়তে' হইয়া উচ্চারণ-সাম্যজন্য প্রথম প্রথম বাঙ্গালায় 'হৈতে' হইয়াছিল; ভারতচন্দ্রাদির গ্রন্থে ভূরি ভূরি হৈতে'র প্রয়োগ আছে। উক্ত হৈঁতে' ই এক্ষণে 'হইতে

হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বোধ হয়, হিংতো অপেক্ষা এইটীই অধিক সুসংলগ্ন হয়। সম্প্রতি ষষ্ঠী ও সপ্তমীর বিবরণ প্রদত্ত হইলেই বিভক্তির ব্যাপার শেষ হইয়া যায়।

মৈথিল ভাষার ষষ্ঠীর চিহ্ন ক, কের ও র। 'ক' হিন্দীর 'কা' হইতে গৃহীত। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় ষষ্ঠী স্থানে কের বা কার এবং 'র'র ব্যবহার দেখা যায়; যথা,কতকের,অদ্যকার তাহার। কিন্তু, উৎকল ভাষার ষষ্ঠীর চিহ্ন কেবল 'র'। ভোজপুরীতেও কর, কেকর ইত্যাদি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হিন্দী কা, পাঞ্জাবী দা, মারহাটী চা, নেপালী কো, সিন্ধী জো, গুজরাটী নো। এতগুলি ভাষার ষষ্ঠী চিহ্ন পৃথক পৃথক। তজ্জন্য বাঙ্গালার 'র' মৈথিল বা উৎকল হইতে আসিয়াছে বলিলে, উহাদের 'র' কোথা হইতে এবং কি প্রকারে আসিল, তাহার নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। মারবারীদিগের কথোপকথনে ষষ্ঠীতে র প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং চাঁদ কবির পৃথ্বীরাজ-রাসনামক কাব্যেরও ষষ্ঠীস্থানে 'র' দেখা যায়। হিন্দীর মধ্যে পৃথ্বীরাজ-রাসই প্রাচীনতম গ্রন্থ। উহাতে সম্বন্ধ স্থানে 'র' থাকায়, পরবর্ত্তী গ্রন্থ সমূহে 'কা' কোথা হইতে আসিল, ইহা লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলেন; যাহা হউক, ভোজপুরী 'কর' এই বিবাদের কতকটা নিরাকরণ করিয়াছে। উহা ক ও র'র মধ্যে অবস্থিত।*

*প্রাকৃত ভাষায় ষষ্ঠী স্থানে কেলক,কেরকও দেখা যায়। উহা হইতেই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভোজপুরী কর হইয়া থাকিবে। উহার 'কর"এর, মূল প্রাকৃত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু, প্রাকৃতে সংস্কৃতানুযায়ী কোন কোন স্থানে 'স্স" হইয়া, আবার কোথাও বা 'কেলক" 'কেরক" হইল কিরূপে; ইহার মূলানুসন্ধান বড়ই দুরূহ। দুই এক জন সাহেব অনুমান করেন, সংস্কৃত 'কৃতক" হইতে প্রাকৃতের 'কেরক" হইয়াছে। আমাদের কিন্তু, ইহা ভাল বোধ হয় না।

উহার পূর্ব্বতন ভাষাগুলি ষষ্ঠীতে 'ক' লইয়াছে; এবং অধস্তন ভাষাগুলি সম্বন্ধে 'র' গ্রহণ করিয়াছে। তাহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে, যে, উড়িয়া, বাঙ্গালা ও আসামী ভাষা উহার পর প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

অধিকরণে মৈথিলীতে মেঁ, মোঁ পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। উহার আধুনিক অধিকরণ চিহ্ন 'এ'; বাঙ্গালাতেও অধিকরণে এ হয়। উৎকল ভাষার অধিকরণ চিহ্ন 'রে'। উহার সহিত বাঙ্গালার কোন সংশ্রব নাই।

কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালার কর্ম্মকারকের 'কে' প্রকৃত পক্ষে বিভক্তির চিহ্ন নহে। উহা 'প্রাক্ টেরক্ স্বার্থে' এই সূত্রানুযায়ী 'টি'র পূর্ব্বে অকাদেশ। কারক চিহ্ন হইলে সর্ব্বত্রই তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হইত।

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই। লেখক মহাশয় যে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন,তাহা তাঁহার এবংবিধ অসঙ্গত ধারণাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তিনি টি'র পূর্ব্বে যে অকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা সর্ব্বপ্রাতিপদিকের পক্ষে নহে। তদ্বিষয়ে মুগ্ধবোধের সূত্রে এই—

"ত্যাদিব্যাসভোসৃক্তিস্ত্রিস্ত্রের্বাক্ প্রাক্ টের্ব্যকদশ্চ"।

ইহার অর্থ এই। ত্যাদ্যন্ত, অব্যয়, স, ভ ওস্ ভিন্ন বিভক্ত্যন্ত সর্ব্বনাম পদ, এবং কেবল সর্ব্বনাম শব্দের টির (অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণের) পূর্ব্বে বিকল্পে অক্ হয় এবংঅব্যয়ের ক স্থানে দও হয়।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে তিঙন্তপদ, অব্যয়, স, ভ, ওস্ ভিন্ন বিভক্ত্যন্ত সর্ব্বনাম পদ এবং সর্ব্বনাম শব্দ ভিন্ন অন্যত্র অক্ হইতে পারে না। কিন্তু, লেখক মহাশয় উহার উদাহরণ দিয়াছেন, যথা, কন্যা এব কন্যকা। পাঠকগণ! এই 'কন্যা এব কন্যকা' স্বার্থে ক'র উদাহরণ। টির পূর্ব্বে অকের উদাহরণ নয়। তাহা হইলে, 'হরি'

এই শব্দের টির পূর্ব্বে অক্ করিলে 'হরকি' হইয়া পড়ে, 'হরক' হয় না। তবেই তাহা হইতে ক্রমে হরিকে কি প্রকারে হইবে।

লেখক মহাশয়ের মত, ঐ 'অকই' 'কে' হইয়া কর্ম্মকারকবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, রামক—রামকে।

যদি তাহাই হইল, তবে'হরকি'র ইকার স্থানে একার করিয়া 'হরকে ডাক' ইত্যাদিরূপ বাক্যে 'হরিকে' না 'হরকে, ডাকা যাইবে? কারণ, হরিশব্দে অক্ যোগে নিষ্পন্ন 'হরকি' স্থানেই কর্ম্মবৎ 'হরকে' হইয়াছে। অতএব, কাহাকে যে ডাকা যাইবে, সে বিষম সমস্যার কথা। আমাদের বোধ হয়,নাড়া চাড়া বিদ্যার দোষেই লেখকমহাশয় এরূপ বিভ্রান্ত হইয়াছেন। অপঠিত বিদ্যা বিদ্যাই নয়। যাহা হউক, এক্ষণে উহাকে স্বার্থে 'ক' ধরিয়া লইলেই বা কি হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। সকল প্রাতিপদিকের উত্তরও স্বার্থে ক প্রত্যয় হয় না। যাবাদি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর স্বার্থে ক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ক প্রত্যয় দ্বারা আর একটী শব্দ নিষ্পন্ন হয়। উহার উত্তর সুবাদি বিভক্তি যুক্ত হইলে, তবে তাহারা সুবন্ত পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। কন্যা শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' করিয়া কন্যকা শব্দ হইল। উহাতে বিভক্তি যোগ হইলে কন্যকাকে, কন্যকাদ্বারা, কন্যকাতে এইরূপ পদ বাক্যে প্রযুক্ত হইতে পারে। 'ক' প্রত্যয়ের রূপান্তরে 'কে' হইলে, কখনই উহাকে পদ বলিয়া গণ্যকরা যায় না। পদ না হইলেও বাক্যে প্রযুক্ত হইবেনা। অতএব,রামকে ডাক,হরিকে বল ইত্যাদি স্থলে স্বার্থে ক নহে; কর্ম্মবিভক্তিস্থানীয় 'কে' নিশ্চিত। স্থলবিশেষে সেই বিভক্তির লোপ হয় বলিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। তজ্জন্য জল খাও, বই পড় ইত্যাদি স্থলে জলকে, বইকে এরূপ প্রয়োগ হইবে না। সংস্কৃতেও 'মধুগৃহাণ' 'বারি পিব' ইত্যাদি স্থলে বিভক্তির লোপ হইয়াছে বলিয়া যে উহাদের উত্তর আদৌ বিভক্তি হয় নাই, এরূপ বলা অসঙ্গত। সুতরাং, আমাদের কর্ম্মকারকের 'কে' টির পূর্ব্বে অক্ বা স্বার্থে 'ক' কিছুই নহে। উহা বিভক্তির আকৃতিই বটে, তাহা নিঃসন্দেহ।

ষষ্ঠী-স্থানীয় 'র' লইয়াও লেখক মহাশয় 'টামোর্ণঃ'সূত্র দ্বারা ণ স্থানে র করিবার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বেচ্ছোক্তি এবম্প্রাদিক স্থলে শোভা পায় না, অন্যত্র পাইতে পারে। মূর্দ্ধন্য ণকারের ডকারবৎ উচ্চারণ হইলে অন্যত্রও তদ্রূপ হইবে, একথা সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার্য্য। প্রাকৃতাধ্যায়ে সংক্ষিপ্তসারের আর একটী সূত্র এই।

ইণঃ শসঙসোর্ণোঃ।

ইণ উত্তরয়োঃ শস্ঙসোঃ স্থানে ণো র্ভবতি, যথা, অগ্গিণো। ইহার অর্থ এই—ইকারান্ত, উকারান্ত, শব্দের পরস্থিত শস ও ঙস্ স্থানে ণো হয়; যেমন অগ গিণো।

এস্থলে দ্বিতীয়ার বহুবচন ও পঞ্চমীর একবচন উভয় স্থলেই 'অগ্গিণো' হইয়াছে। উহারও মূর্দ্ধন্য ণকার স্থানে ডকার হইবার আপত্তি কি? তাহা হইলে তদুভয় স্থলেও বাঙ্গালার 'র'কার হইত। কিন্তু, বাঙ্গালার দ্বিতীয়ার বহুবচন বা পঞ্চমীর একবচনে রকার হয় না। অধিকন্তু,মূর্দ্ধন্য ণকারের ডকারবৎ উচ্চারণ হইতে পারে, রকারবৎ নয়। অতএব, উক্তরূপ মূর্দ্ধন্য ণকার হইতে বাঙ্গালার ষষ্ঠীর 'র' হয় নাই। আমরা একরকমে উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। বোধ করি, তাহা নিতান্ত অসঙ্গতও হইবে না।

মৈথিল ভাষায় অস্মদ ও যুষ্মদ শব্দের বহুবচনে 'হমরা' ও 'তোহরা' হয়। উহা হইতেই

বাঙ্গালার 'আমরা' 'তোমরা' হইয়াছে। সংস্কৃত এতদ্ শব্দ স্থানে মৈথিল ভাষার 'এহি'। উহা হইতেই বাঙ্গালার এই। সংস্কৃত যদ,হিন্দী জো, মৈথিল জে, বাঙ্গালা যে। সংস্কৃত তদ, হিন্দী সো, মৈথিল সে, বাঙ্গালা সে। অন্যান্য বিভক্তিতে তদ্শব্দস্থানে মৈথিলীতে 'তাহি' হইয়া থাকে। যথা, তাহি কেঁ, তাহি সঁ ইত্যাদি। উহা হইতেই উৎকল ভাষায় 'তাহা' হয়। যথা, তাহাকু, তাহা ঠারু। উৎকলের ন্যায় বাঙ্গালাতেও 'তাহা' ব্যবহৃত হইতেছে। যথা, তাহাকে, তাহাদ্বারা। অতএব, বাঙ্গালার 'তাহা' উৎকল হইতে গৃহীত ; এবং উৎকলের 'তাহা' মৈথিলীর 'তাহি' জাত, তাহা নিঃসন্দেহ।

সম্ভ্রমস্থলে তদ্ শব্দস্থানে মৈথিল ভাষায় তনিকা, তনিকাকে, এবং কিমুশব্দ স্থানে কনিকা কনিকাকে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উহা হইতেই আমাদের ভাষায় তিনি, তাঁহাকে এবং কনি, কাঁহাকে হইয়াছে। সংস্কৃত কোহি হইতে হিন্দী কেহি, মৈথিল কেহো, গ্রাম্য কেও, উৎকল কেহি, গ্রাম্য কেউ, বাঙ্গালা কেহ, গ্রাম্য কেউ নিষ্পন্ন, ইহা একরূপ অবধারিত। বিভক্তির আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইল। অতঃপর ক্রিয়া প্রকরণের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

বঙ্গীয় প্রবচনাবলী।

আজকাল বঙ্গভাষার প্রতি লোকের যেরূপ সাগ্রহ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তাহাতে বড়ই আশার উদয় হয়। যে অবধি ত্রিকালবর্শী ঋষিগণ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণয়নে ক্ষান্ত রহিয়াছেন। সেই অবধি আমাদের এই বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত বৃন্দ সেই মুনিঋষিগণের শাস্ত্র হইতে নীতিরত্ন উদ্ধার করিয়া সকল প্রবচনবাক্য প্রচার করিয়াছেন। সেই সকল প্রবচনাবলী আমাদের এই সংসারেতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই সকল প্রবচনাবলী আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের মুখেও যথেষ্ট শ্রবণ করিয়াছি। আমাদের দেশের লোকের সাংসারিক জীবনে কোনরূপ ঘাত প্রতিঘাত হইলেই তাহার মুখ হইতে প্রবচনাবলী স্ফূরিত হয়। ইয়ুরোপের প্রবচনাবলী গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া কত সংস্করণে বাহির হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে গণনা করিবে। বালকের পাঠ্যপুস্তকে অভিধানের চতুঃপার্শ্বে প্রবচনাবলী মুদ্রিত রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে প্রবচনাবলীর উন্নতি নিরীক্ষণ করা যায় না। যত্ন বিনা কিছুই সুরক্ষিত ও সুফলদায়ক হয় না। অস্মদ্দেশীয় প্রবচনাবলী যত্ন বিনা ক্রমে ক্রমে কালের অতল গর্ভে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। যাহাতে আমদের মধ্যে এই প্রবচনাবলীর পুনঃপ্রচার হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা উহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রবচন।

১। অবোধকে বুঝাব কত বোধ নাহি মানে।
ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে॥
২। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
৩। অতি ছোট হোয়না ছাগলে মুড়ে খাবে।
অতি বড় হোয়না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে॥
৪। অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হবে।
৫। অতি বুদ্ধির গলায় দড়ী।
বুদ্ধি জান গড়া গড়ী॥
৬। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

৭। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
৮। অতি বড় ঘরণী না পান ঘর।
অতি বড় রূপসী না পান বর॥
৯। অপব্যয় কোরনা, অভাব হবেনা।
১০। অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল,
মশাঁ মারতে গালে চড়।
১১। আমি বেহায়া পেতেছি পাত,
কোন বেহায়া না দেবে ভাত।
১২। আপনার বেলায় আঁটি শাটি,
পরের বেলায় দাঁত কপাটী।
১৩। আর করিস্ না ভুয়ো জাঁক,
যেমন আছিস তেমনি থাক॥
১৪। আপ্রুচি খানা, পরুচি পর্না।
১৫। আপ ভাল ত জগৎ ভাল।
১৬। ইচ্ছা থাকে যার, উপায় হয় তার।
১৭। এত সুখ তোর কপালে,
তবে কেন তোর চট বগলে।
১৮। এগুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা, পেছুলেও ভেড়ের ভেড়ে।
১৯। এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে,
আর গাঁয়ে মাথা ধরে
২০। একের বোঝা দশের লাঠি।
২১। একে বুড়ি নাচুনি তায় নাতির বিয়ে।
২২। এক ভস্ম আর ক্ষার, দোষ গুণ কব কার।
২৩। কম্বলের লোম বাছতে গেলে কিছুই থাকেনা।
২৪। কপালে নাইক ঘি, ঠক্ ঠকালে হবে কি।
২৫। কল্লা দেখে আল্লা ডরায়।
২৬। কাকের মাংস কাকে খায় না,
জোঁকের গায়ে জোঁক বসেনা।
২৭। কপাল হোল এক পেসে,
সবই বলে ফ্যান খেসে।
২৮। কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি
২৯। কোথা কার কে, আমড়া ভাতে দে।
৩০। কারও হোল সর্ব্বনাশ,
কারও হোল পৌষ মাস।
৩১। কি সে নাই কি, বেগুণ পোড়ায় ঘি।
৩২। ক চুবনে মুক্তা ছড়ান।
৩৩। কথা টলার চেয়ে পা টলা ভাল।
৩৪। কথার মার বড় মার।
৩৫। কর যদি তাড়াতাড়ি,ভুলের হবে বাড়াবাড়ি
৩৬। কর্জ্জ করে যে, কষ্ট পায় সে।
৩৭। কর যদি কাজ ঠিক সময়ে,
সুফল হবে তার বিনিময়ে।
৩৮। কপট বন্ধু হয় খল,প্রকাশ্য শত্রু তবুও ভাল
৩৯। কুড়ে গরুর রাঙ্গা পালান।
৪০। কার শ্রাদ্ধ কেবা করে,
খোলা কেটে বাবুন মরে।
৪১। কিঞ্চিৎ লিখনং, বিবাহেরি কারণং।
৪২। কল্লে যত্ন, মিলে রত্ন!
৪৩। কীর্ত্তির্য্যস্য স জীবতি।
৪৪। খলের পিরিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণেকে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।
৪৫। খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার;
৪৬। খোস খবরের ঝুটাও ভাল।
৪৭। খাট ভাঙ্গলেই ভূম্ শয্যা।
৪৮। গজ পৃষ্ঠে যেবা যায়, মেউ দেখে সে ডরায়
৪৯। গোঁপ নাহিক বাবার কালে,
দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে॥
৫০। গতস্য শোচনা নাস্তি।
৫১। গঙ্গা মড়া এলে না।
৫২। গোড়া কেটে আগায় জল।
৫৩। গায়ের কালী ধুলে যায়,মনের কালী মলে যায়
৫৪। ঘরে ছুঁচার কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন
৫৫। ঘর জামায়ে পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচন সমান সুখ।
৫৬। ঘুটে কুড়ুনির ছেলে মোড়ল হয়েছে।
হেঁটে যেতে পারে না পাল্কি চেয়েছে॥
৫৭। ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।
৫৮। ঘু ঘু দেখছ ফাঁদ দেখনি।

৫৯। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।
৬০। চাচা আপ্না বাঁচা।
৬১। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
৬২। চোরে চোরে মাসতুত ভাই।
৬৩। চোখ দিয়েছেন বিধি, দেখ নানান্ নিধি।
৬৪। ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো।
৬৫। ছেঁড়া খোড়া সাড়ী আর সুন্দরী স্ত্রীলোক
ঘটাবেই পথমাঝে পেরেক আটক॥
৬৬। জন জামাই ভাগিনা, তিন নয় আপনা।
৬৭। জোর জার মুল্লুক তার।
৬৮। ঝিকে মেরে বৌকে সেখান।
৬৯। ঠক বাচ্‌তে গাঁ ওজড়।
৭০। ঠেটা ঢেঁকির বাদ্য বড়।
৭১। ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও টের
পায় না।
৭২। ঢিল দিয়ে ঢিল্ ভাঙ্গা।
৭৩। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
৭৪। তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।
৭৫। তাড়া তাড়ি কোরনা বিয়ে,
বিয়ে কর রয়ে শয়ে।
তাড়া তাড়ি কর বিয়ে.
পস্তাও তুমি বাড়ি গিয়ে॥
৭৬। দাতায় দান করে, কৃপণ ব্যাটা জলে মরে।
৭৭। দয়া চেয়ে ধর্ম্ম নাই,হিংসা চেয়ে পাপ নাই
৭৮। দশচক্রে ভগবান্ ভূত।
৭৯। দশে মিলে করি কাজ,
হারি জিতি নাহি লাজ।
৮০। দুঃখে প ড়ে হয় জ্ঞানী, যদিও না হয় ধ
৮১। দুষ্ট এ ড়ে চেয়ে খালি গোয়াল ভাল।
৮২। দাঁত থাকৃতে দাঁতের মর্য্যাদা,
বুঝলেনা, যে সে বড় গাধা।
৮৩। দোষ কর্‌লে একজন,নিন্দার ভাগি অন্যজ
৮৪। ধর্ম্মের বাড়া ধন নাই।
৮৫। ধান ভাঙ্‌তে শীবের গীত।
৮৬। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ,
যদি বর্ষায় মাঘের শেষ।
৮৭। ধরি মাচ না ছুই পানি।
৮৮। নাইবা দিলে তাই বা কি,
গুড়ে মণ্ডার অভাব কি।
৮৯। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।
৯০। নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।
৯১। নদ নদী আর সময়, কারও হাত ধরা নয়।
৯২। নিজের কোলে ঝোল সবাই টানে।
৯৩। নাচ্‌তে না জানলে উঠান বেঁকা।
৯৪। নিজে শুতে ঠাঁই পায়না
শঙ্করাকে ধরে টানে।
৯৫। নাতোয়ানের দুনা মালগুজারী।
৯৬। নিরাখালের খোদায় রাখাল।
৯৭। নচ দৈবাৎ পরং বল।
৯৮। নরম পেলে ফকিরে বেগার ধরে।
৯৯। নীচ যদি উচ্চ ভাসে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে
১০০। পড়াবি তো পড়া পো,
না পড়াস্ তো সভায় থো।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

মেঘদূত।

উত্তর মেঘ।

১

বিদ্যুত্বন্তং ললিত বনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহত মুরজাঃ স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময় ভুবস্তুঙ্গ মভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্ব্বিশেষৈঃ॥

"তব সম শোভা ওহে জলধর,
ধরে সে সাধের অলকানগর।
তোমার শরীরে খেলিছে বিজলী,
অলকায় শোভে সুন্দরী মণ্ডলী।
রামধনু তব দেহে শোভা পায়,
চিত্রিত প্রাচীর অলকার গায়।
তুমি কথা কও গভীর গরজে,
মৃদুল মুরজা অলকাতে বাজে।
তোমার অন্তর সলিলে পুরিত,
মণিময় ভূমে অলকা খচিত।
অতি উচ্চে তুমি কর হে বিহার
আকাশে অসংখ্য চূড়া অলকার॥

২

হস্তে লীলাকমললকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং।
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

দেখিতে সাধের অলকানগরে,
শোভে যুবতীরা কুসুম হারে।
কমল জিনিয়ে সুকোমল ভুজে,
অম্লান কমল সতত বিরাজে।
ঘন কৃষ্ণ বর্ণ অলকে সবার
সদা শোভে নবকুন্দফুলহার।
লোধ্র কুসুমের তুলিয়ে পরাগ,
চাঁদ মুখে মাখে করিয়ে সোহাগ।
নব কুরুবক যতনেতে আনি
দোলায় চূড়ায়, যত সোহাগিনী।
শ্রবণে শিরীষ, কদম্ব শিরেতে
পরে যুবতীরা আমোদ ভরেতে॥

৩

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা।
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাপ্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ

"বারমাস ফোটে পাদপে ফুল,
ধায় মধুকর হয়ে আকুল।
মৃণালে কমল সদাই শোভে,
ধায় হংসকুল কমল লোভে।
নাচিছে ময়ূর বিবিধ ছাঁদে,
শোভে পুচ্ছ তায় অসংখ্য চাঁদে।
কেকা রবে তারা দিক্ মাতায়,
কাননে কোকিল পঞ্চমে গায়।
চিরকালই নভে শশাঙ্ক হাসে,
তমরাশি হরি আনন্দে ভাসে।
সুধা ধবলিত প্রাসাদ গুলি,
হাসে নীরবেতে সন্তাপ ভুলি॥

৪

আনন্দোত্থং নয়ন সলিলং যত্র নান্যৈনিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুম শরজাদিষ্ট সংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয় কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলুবয়ো যৌবনাদ্যদস্তি॥

সুখময় সেই অলকাধামে
নাহি কোন কথা সন্তাপ নামে।
সুধুই আনন্দে নয়ন ঝরে,
জর্জ্জরিত সবে কুসুম শরে।
দিবারে যাতনা অপর বাণ,
জানেনা সে দেশে—এমন স্থান
প্রিয় সমাগমে বিরহক্লেশ,
রবি করে তম সম হয় শেষ।
বিচ্ছেদ যা হয় কলহ হ'তে,
প্রণয় কলহ যেন' মনেতে।
চিরকালই তথা যৌবন রহে
জানেনা বার্দ্ধক্য কাহারে কহে॥

৫

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধুরতিফলং কল্পবৃক্ষ প্রসূতং
ত্বদ্গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষাহতেষু॥

যক্ষগণ তথা সুন্দরী সনে
ভ্রমে হর্ষভরে আনন্দ মনে।
স্ফটিকরচিত প্রাসাদে যায়,
রতিফলমধু আনন্দে খায়।
নির্ম্মল স্ফটিকে তারকা ছবি,
বোধ হয় যেন অসংখ্য রবি।
তোমার নিনাদ গভীর যথা,
মধুর মৃদঙ্গ বাজয়ে তথা।
সুন্দর মধুর অলকাধাম,
জুড়ায় হৃদয় শুনিলে নাম।
আর কি তথায় যাব হে সখা!
পাব কি প্রিয়ার আবার দেখা?"

৬

মন্দাকিন্যাঃ পয়সি শিশিরৈঃ সেব্যমানামরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতা মুষ্টিনিক্ষেপ গূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ॥

মনোহর তরুর শীতল ছায়,
যক্ষবালাগণ আনন্দে ধায়।
অমর বাঞ্ছিত যক্ষের বালা,
কত রকমেতে করেহে খেলা,
কভু বা মাণিক লইয়া করে,
স্বর্ণ রেণু মাঝে লুকায় তারে।
আবার যতনে খুঁজিতে ধায়,
পদক্ষেপে সুধা ছোটে যে তায়।
মন্দাকিনী নীর হৃদয়ে ধ'রে,
ধায় সমীরণ সেবার তরে।
মন্দার নিচয় প্রদানি ছায়া,
আতপে লুকায় ননীর কায়া॥

৭

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিত শিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃত করেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চ্চিস্তুঙ্গানভি মুখমপি প্রাপ্য রত্ন প্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফল প্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ॥

যখন গগনে শশাঙ্ক হাসে,
রহে যক্ষবালা নাগর পাশে।
মদনেতে মাতি নায়কগণ.
হরিবারে চায় কান্তার বসন
সলাজে সুন্দরী নায়কে ধরে,
বলে কত মত বিনয় করে।
গৃহেতে রতন প্রদীপ জ্বলে,
হরে অন্ধকার নিশীথ কালে
মনে ভাবে কুঙ্কুম লইয়ে করে
নিবায়ে প্রদীপ থাকি আঁধারে।
লাজেতে অবশ এতই হয়
নিবাইতে নারে প্রদীপচয়॥

৮

নেত্রা নীতাঃ সতত গতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং সজল কণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ-
র্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জ্জরা নিষ্পতন্তি।

অলকা নগরে বারিদদল
পশি উচ্চ গৃহে রবষি জল,
মুছিয়া গৃহের প্রাচীরছবি
যায় পলাইয়া, মনেতে ভাবি
কি জানি কেহবা ধরিয়া তারে
রাখে গৃহ মাঝে আবদ্ধ করে;
তাই তাড়াতাড়ি গবাক্ষ দিয়ে
ধূমরূপ ধরি যায় পলাইয়ে।
সপ্ততল উচ্চ প্রাসাদ হতে,
যায় যবে মেঘ আকাশ পথে,
দেখিতে বড়ই সুন্দর হয়,
সুনীল আকাশে জলদ চয়॥

৯

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুট জললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ॥

"নির্ম্মেঘ আকাশে চাঁদের হাসি
লভি চন্দ্রকান্ত-রতনরাশি
(বিতানে লম্বিত সুতায় গাঁথা)
বর্ষে জলবিন্দু মুকুতা যথা।
মদন-সমরে কাতর হলে,
গায়ে মাখে বারি অবলাদলে।
কান্তভুজ-পাশ শিথিল করি
উঠি গায়ে মাখে শীতল বারি॥

১০

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতি যশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি॥

যথায় কিন্নর সবে সুমধুর কণ্ঠরবে
দিন রাত কুবেরের যশঃ-গান গায়,
অমূল্য রতনময় সপ্ততল গৃহচয়
দেখিবে যাইয়া তুমি সেই অলকায়।
অলকার উপবনে অপ্সরা-অবিদ্যা সনে
কিন্নরে লইয়া সাথে ভ্রমে যক্ষগণ
কভু কল্পতরু ছায় মনোসুখে সবে ধায়
কভুবা সরসীনীরে করে সন্তরণ॥

১১

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণ বিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্॥

দেখিবে সে অলকায় পথে গড়াগড়ি যায়
অপ্সরা অলক-ছিন্ন সুচারু কমল,
মন্দার শ্রবণ হতে পড়ে সে অলকাপথে
স্তনশোভা-হার-ছিন্ন-মুকুতাপটল
ছিন্ন ভিন্ন লতাপাতা ফুল হার যথা তথা
দেখিবে হে প্রত্যূষেতে পথের মাঝেতে,
অভিসার চিহ্ন বলে মনে যেন সে সকলে;
দেখিবে হে সখে তুমি যাইতে যাইতে॥

১২

মত্বা দেবং ধনপতি সখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্।
সভ্রূভঙ্গ প্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষমোঘৈ-
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ॥

অলকায় করে বাস যক্ষ মিত্র কৃতি বাস,
তাই ভাবি ভয়ে যেন মকরকেতন
মধুকর গুণশালী শরাসন দূরে ফেলি
রিক্তহস্তে অলকায় করেন ভ্রমণ।
মনেতে বিশ্বাস স্থির প্রেমদৃষ্টি সুন্দরীর
ভ্রূধনুতে যুড়ি কারে করিলে সন্ধান
সহস্র কুসুম শরে যাহা না করিতে পারে
নিশ্চয় করিবে তাহা নারী-নেত্রবাণ॥

১৩

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ॥

বড়ই আশ্চর্য্য হায়! দেখিবে সে অলকায়
এক মাত্র কল্পতরু সবে করে দান।
বসন সুন্দর কত পায় তথা অবিরত
যক্ষবালা যাহা পরি মাতায় পরাণ।
প্রাণমন-মাতোয়ারা মধুর মধুর সুরা,
নব কিশলয় সহ কুসুমের হার
রক্ত সম লাক্ষারাগ অবলার অনুরাগ,
হয় যাতে, কল্পতরু দেয় ভার ভার॥

১৪

তত্রাগারং ধনপতি গৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে
হস্ত প্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ॥

রতন খচিত দ্বার রামধনু প্রায় যার
অপূর্ব্ব সুন্দর শোভা পাইবে দেখিতে,
অভাগার সেই গৃহ মনে রেখো অহরহ
কুবেরের গৃহ হতে কিছু উত্তরেতে।
দেখিবে তোরণ দ্বারে বিলম্বিত গুচ্ছ ভরে
শোভে বাল কল্পতরু, যারে প্রাণপণে
পুত্রসম স্নেহ ভরে বারি ঢালি নিজ করে
বর্দ্ধিত করেছে প্রিয়া অতি সযতনে ॥

১৫

বাপীচাস্মিন্ মরকত শিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্যহংসাঃ ॥
গৃহে মোর বিদ্যমান মরকতে নিরমাণ
সুন্দর সোপানশালী নির্ম্মল সরসী,
কনক কমলচয় সদাই প্রফুল্ল রয়,
মণিময় নালে বাঁধা হাসে দিবানিশি।
শুন ওহে প্রাণসখে, তোমার মূরতি দেখে
ছাড়ি সে সরসী নীর মরাল কখন,
যাবে না মানস সরে, বলিনু নিশ্চয় করে,
এমনি তোমার মূর্ত্তি মানসমোহন ॥

১৬

তস্যাস্তীরে রচিত শিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টন প্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্গোহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাংত্বমেব স্মরামি ॥
সেই সে সরসীতীরে কৃত্রিম পর্ব্বতশিরে
ইন্দ্রনীলে বিরচিত শিখর যাহার,
কনক কদলীতরু চারি দিকে শোভে চারু,
বড় আদরের ধন প্রিয়ার আমার।
সেই গিরিবর সম তব মূর্ত্তি অনুপম
হেরিয়া, কান্তার মুখ পড়িল মনেতে।
বিজলী তোমার শিরে, হেমরম্ভা গিরি পরে,
দুজনে সমান প্রিয় আমার কাছেতে ॥

১৭

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদন মদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥
দেখিবে সে গিরি পরে শোভে কুরুবক শিরে
মধুর মাধবী লতা মানসমোহিনী।
অশোক বকুল দুটি দুই পাশে পরিপাটী
নবকিশলয়ে শোভে দিবস রজনী।
অশোকের মনস্কাম প্রিয়ার চরণ বাম,
লভি পূর্ণ হয়, সুখে কুসুম বিকাশে।
বকুল আকুল মনে প্রিয়ামুখ সুধা পানে
চেয়ে থাকে পথ পানে আমার আবাসে ॥

১৮

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতি প্রৌঢ়বংশ প্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয় সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবস বিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥
সেই দুই তরু মাঝে সুন্দর কনক সাজে
শোভে দণ্ড ময়ূরের বিশ্রাম কারণ।
মণিময় যার মূল নাহি যায় সমতুল
স্ফটিকে প্রথিত থাকি বিতরে কিরণ।
দিবা অবসান হলে শিখি আশি কুতূহলে
বিশ্রাম কারণে বসে দণ্ডের উপরে।
প্রিয়া মোর ফুল্লমনে অলঙ্কার ধ্বনি সনে
নাচাইয়া তালে তালে কত খেলা করে ॥

১৯

এভিঃ সাধো হৃদয় নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিত বপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবন মধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্॥
বলিনু যে চিহ্ন গুলি, সে সকল নাহি ভুলি
যতনে হৃদয়ে রাখি করিও গমন।
মোর গৃহদ্বারোপরে আঁকিয়াছি যত্ন করে
শঙ্খপদ্ম প্রাণসখে করিও দর্শন।

আমার বিহনে হায় আর শোভা নাহি তায়
শ্রীবিহীন হইয়াছে বলিনু নিশ্চয়।
বিনা দিনকরপ্রভা পারে কি রাখিতে শোভা
সহস্র যতন করি কমলিনীচয় ?

২০

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথম কথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥
ত্বরিত গমন তরে করভ শরীর ধরে
আমার আলয়ে সখে করিও প্রবেশ।
বসি সেই গিরি পরে দেখো বন্ধু কৃপা করে
ভবনের অভ্যন্তর, দূরে যাবে ক্লেশ।
খদ্যোতমালার ন্যায় কত রত্ন শোভা পায়,
তারামালা সম শোভে গৃহের প্রাচীরে।
আলেখ্য সুন্দর কত আছে গৃহে মনোমত
তার মাঝে ছবি এক দেখো যত্ন করে।

২১

তন্বী শ্যামা শিখরি দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ ॥
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্যুবতি বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥
কৃশাঙ্গী যুবতী বামা, অপরূপ মনোরমা,
দশন মুকুতা সম মুখে শোভা পায়
ওষ্ঠ জিনি বিম্বফল, মৃগনেত্র সচঞ্চল,
কেশরী সমান শোভে যার মধ্যকায় ;
নিবীড় নিতম্বভরে গতি যার ধীরে ধীরে
পীন পয়োধরে যার হরে মুনিমন,
নিরজনে যেন তারে প্রথম যুবতী করে
বিধাতা যতন করে করিল সৃজন ॥

২২

ত্বাং জানীথাঃ পরিমিত কথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যেশিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥
জীবিত আলেখ্য সম দ্বিতীয় পরাণ মম
সেই মোর জীবনসঙ্গিনী ;
আমি এবে অতি দূরে প্রিয়তমা শূন্য ঘরে
পতিপ্রাণা পতিবিরহিণী।
বিয়োগ-বিধুরা বালা, দারুণ বিরহ জ্বালা,
দুঃখে কাটে সুদীর্ঘ দিবস।
মনে হয় প্রণয়িনী শীতগ্রস্ত কমলিনী
সম এবে হয়েছে বিরব ॥

২৩

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূনমেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকল ব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণ ক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি ॥
ঢালিয়া নয়ন জল আঁখি দুটি ছলছল,
বিবর্ণ অধর দীর্ঘশ্বাসে ;
রুক্ষ কেশ রুক্ষ বেশ হইয়াছে অবশেষ
মুখে আর বিজলী না হাসে।
করতলে মুখ রাখি দিবানিশি বসি থাকি
মোর চিন্তা করিছে সদাই ;
তুমি যেন শশধর ঢাকিয়াছ জলধর
প্রিয়া মোর হইয়াছে তাই ॥

২৪

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুর বচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বংহি তস্যপ্রিয়েতি ॥
দেখিবে অলকাপুরে হয়তো পূজিতে হরে
করে প্রিয়া কুসুম চয়ন ;
কিম্বা নির্নিমেষ আঁখি আঁকিতেছে বিধুমুখী
মোর চিত্র করিয়া যতন।
কিম্বা মধু ঝঙ্কারিণী শারিকাকে প্রণয়িনী
মোর কথা করিছে জিজ্ঞাসা ;
বলিছে আদর করে "মনে আছে প্রাণেশ্বরে,
মনে আছে তাঁর ভালবাসা ?"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অদ্ভুত বৈরনির্য্যাতন।

১

বরিশাল জেলায় জয়নগর বলিয়া এক-খানি গ্রাম আছে। জয়নগরে নানাশ্রেণীর লোকের বাস থাকিলেও আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তথায় এক ঘর ব্রাহ্মণ ও এক ঘর মুসলমান ব্যতীত আর উল্লেখ যোগ্য সঙ্গতিপন্ন লোক কেহ ছিল না। বিশেষতঃ আমাদের বর্ণিত আখ্যায়িকার সহিত এক জন নীচজাতীয় শ্রমজীবী ব্যতীত অপর কাহার সংশ্রব নাই বলিয়া আমরা জয়নগরের অপরাপর অধিবাসিবর্গের বিবরণ বিবৃত করা অনাবশ্যক মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলাম।

আমাদের বর্ণিত ব্রাহ্মণ পরিবারে চারিটী লোক। ব্রাহ্মণ স্বয়ং, তাহার স্ত্রী ও একটী পুত্র এবং একজন ভৃত্য। ব্রাহ্মণের নাম নীলকমল চক্রবর্ত্তী, বয়স আনুমানিক ৪০। ৪২ বৎসর। নীলকমলের সহধর্ম্মিণীর নাম বিমলা দেবী, বয়স আন্দাজ ২৫ বৎসর। বিমলা দেবী গুণে সরস্বতী না হউক, রূপে লক্ষ্মী ছিল। ঐ কাল রূপই তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনের হেতু হইয়াছিল। নীলকমলের পাঁচ বছরের একটী পুত্র। পুত্রের নাম ননীগোপাল। ননীগোপাল যেমন রূপেও পরম সুন্দর, গুণেও তেমনি শান্তশিষ্ট। অতি কমনীয় কান্তি, যেন ননীরই গোপাল; দেখিলেই প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। নীলকমলের পিতৃপুরুষেরা গুরুগিরি ও যাজকক্রিয়া দ্বারা কিছু নগদ অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন; ভালরূপ বাড়ী ঘর দুয়ার, বাগ্-বাগিচা ও জমিজিরাত কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। নীলকমল ইদানীং যাজক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু গুরুগিরি পরিত্যাগ করে নাই। তাহার পৈতৃক অনেকগুলি শিষ্য ছিল। শিষ্যদের অনেকের অবস্থাই ভাল। নীলকমল মধ্যে মধ্যে শিষ্য বাড়ী গিয়া যথেষ্ট প্রণামী লইয়া আসিত। নিজোপার্জ্জিত সেই প্রণামীর টাকা পৈতৃক টাকাতে মিশাইয়া নীলকমল সুদি কারবার করিত। নীলকমলের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না, এই সুদি-কারবার দ্বারা কিন্তু সে কালে পাকা বাড়ী বাগ বাগিচা ও বিস্তর ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল।

আমরা যে মুসলমান পরিবারের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারাই গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। কালক্রমে জনবলের সহিত বিষয়-সম্পত্তির হ্রাস হইলেও এখনও একটী দুই চত্তরবিশিষ্ট প্রশস্ত একতালা পাকা বাড়ী, আমকাঁঠালাদি ফল ফুলরির একটী প্রকাণ্ড বাগিচা, সদর মফঃসলে দুইটী বৃহৎ পুষ্করিণী ও ৫০০ শত বিঘা আয়মা উক্ত মুসলমান পরিবারের একমাত্র বংশধর মুন্সী নৈমুদ্দিনের অধীনে বিদ্যমান থাকিয়া জয়নগরের মুন্সীসাহেবদিগের মান-সম্ভ্রম অটুট রাখিয়াছিল। নৈমুদ্দিনের কোন পূর্ব্বপুরুষ কোন রাজসংসারে মুন্সিগিরি কর্ম্ম করিয়া বিষয় বিভবাদির সহিত 'মুন্সী' উপাধি লাভ করেন। পরে ঐ উপাধি কৌলিক হইয়া যায়। নৈমুদ্দিন লেখাপড়া জানিত না; তবুও লোকে তাহাকে 'নৈমুদ্দি মুন্সী' বলিয়া ডাকিত।

নৈমুদ্দিনের বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে। বর্ণ শ্যাম, চেহারা দোহারা, খুব গুণ্ডাগাণ্ডা। স্বভাব গোঁয়ার গোবিন্দ গোছের, কিন্তু মনটা খুব শাদা। পরোপকার নৈমুদ্দিনের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রবলের পীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে

রক্ষা, অতিথিসজ্জনের সৎকার এবং যাচক মাত্রকেই কিছু কিছু দান প্রভৃতি সাধু কার্য্য নৈমুদ্দিনের দ্বারা নিত্যই অনুষ্ঠিত হইত। এ সংসারে পরোপকার করিতে গেলে কেবল মাত্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিস্তার নাই, সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বিড়ম্বনাও ভোগ করিতে হয়। পরোপকার-ব্রতাবলম্বী নৈমুদ্দিনের ভাগ্যেও যে, সে বিড়ম্বনা ভোগ মাঝে মাঝে ঘটিত না এমত নহে। মধ্যে মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা উপলক্ষে অনেকের সহিত নৈমুদ্দিনের মোকর্দ্দমা বাধিত। তাহাতে তাহার অনেক অর্থ নষ্ট হইয়া যাইত। নৈমুদ্দিনের সংসারে তাহার একমাত্র সহধর্ম্মিণী, আর তাহাদের পরিচর্য্যার নিমিত্ত ২ জন দাসী, ১ জন ভৃত্য ব্যতীত আর কেহই ছিল না। বাগানের আম-কাঁঠাল, পুকুরের মাছ, নিজের খরচ বাদে নৈমুদ্দিন সব বিলাইয়া দিত, কখন বিক্রয় করিত না। নৈমুদ্দিনের চাষবাস ছিল না; আয়-মাতে ঝর্ ঝরে হাজার টাকা আয় ছিল। নৈমুদ্দিন মিতব্যয়ী হইলে ঐ হাজার টাকা আয়ে পাড়াগাঁয়ে তাহার রাজার হালে চলিয়া যাইত। কিন্তু পরোপকার ও দানের দায়ে তাহার ঐ আয়ে কোনমতেই চলিত না, বর্ষে বর্ষে ঋণ হইয়া পড়িত। নৈমুদ্দিন আবশ্যকীয় আয় বাঁচাইয়া আর সে ঋণ শোধ দিতে পারে নাই। পরিশেষে ঐ ঋণের দায়েই হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অট্টালিকাবাসী নৈমুদ্দিনকে কুটিরবাসী হইতে হইয়াছিল। একা নৈমুদ্দিনের কেন, অপরিণামদর্শী অপব্যয়ীদিগের পরিণাম ফল এইরূপই দাঁড়াইয়া থাকে।

নৈমুদ্দিনের স্ত্রীর নাম ফাতেমা বিবি। ফাতেমা বিবি যেমন রূপবতী তেমনী বুদ্ধিমতী। ফাতেমা বিবি অপরিমিত ব্যয়ের নিমিত্ত স্বামীকে সততই ভৎর্সনা করিত। যাহাতে নৈমুদ্দিন আয় বুঝিয়া ব্যয় করে, সেজন্য সে নিয়তই বুঝাইত। বিবি ফাতেমা যে কৃপণস্বভাবা রমণী ছিলেন তাহা নহে, তবে ঋণ করিয়া ব্যয় করা তাহার মতে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সেইজন্যই তিনি স্বামীকে ভৎর্সনা করিতেন। নৈমুদ্দিন বুদ্ধিমতী বনিতার হিত-বাক্য শুনিতনা, তজ্জন্যই তাহাকে শীঘ্রই দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হইয়াছিল। তবে পরোপকার ও দানের ফল ব্যর্থ হয় নাই; নৈমুদ্দিন ভবিষ্যতে সে ফলের ভোগী হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ঘটনাতেই পাঠকগণ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

২

পাঠক! নীলকমলের বাহ্য পরিচয় পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবারে একটু ভিতরকার পরিচয় প্রদান করিব। নীলকমল লোকটা বড়ই মিতব্যয়ী ছিল, বাঁসাখরচ ব্যতীত একটি অতিরিক্ত পয়সাও নীলকমল বাজে ব্যয় করিতে জানিত না। পাঠক! যদি নীলকমলকে কৃপণ বলিতে চাহেন, আমরা তাহাতে দুঃখিত নহি। নীলকমল কৃপণ হউক তাহাতে তত আসে যায় না; কিন্তু তাহার পরের সম্পত্তি দেখিলে কিছু চক্ষু টাটাইত। উহাই তাহার মহৎ দোষ ছিল। নিজের নগদ টাকা যথেষ্ঠ ছিল বটে, কিন্তু ভূসম্পত্তি কিছুমাত্র ছিল না। সেইজন্য কলে-কৌশলে পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার স্পৃহাটা নীলকমলের বড়ই প্রবল ছিল। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নীলকমল সম্পত্তিশালী লোক দেখিয়া টাকা কর্জ্জ দিত।

নীলকমল ২০। ২৫ হাজার টাকার মালীক হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র ভূ-সম্পত্তি না থাকায়, মুন্সী নৈমুদ্দিনের ন্যায় মান সম্ভ্রম লাভ করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই। সে

কারণেও বটে, আর লোভের বশবর্ত্তী হইয়াও বটে, নীলকমলের চক্ষু নৈমুদ্দিনের ভূসম্পত্তির উপর অনেক দিন হইতেই পতিত হইয়াছিল। সদাই ইচ্ছা কি উপায়ে নৈমুদ্দিনের বিষয় আশয় নিজের কুক্ষিগত হয়। নীলকমলের বাঞ্ছা পূর্ণ হইতে অধিক দিন বাকী থাকে নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে নৈমুদ্দিনের সম্পত্তির আয়ে কুলাইত না; তাহাকে মধ্যে মধ্যে ঋণ করিতে হইত। ঋণের জন্যও ভাবিতে হইত না। "হরে ভাত খেসে, না আমি হাত ধুইয়াই আছি।" নৈমুদ্দিন চাইতে না চাইতেই নীলকমল টাকার থলে তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিত। এইরূপে ২।৪ বৎসরে যখন ঋণের মাত্রা বেশী বেশী দাঁড়াইল, তখন নীলকমল সুযোগ বুঝিয়া কড়া তাগাদা আরম্ভ করিল। ইতি পূর্ব্বে কিন্তু নীলকমল টাকার কথা ঘুণাক্ষরেও মুখে আনে নাই। যাহা হউক নৈমুদ্দিন টাকা দিতে পারিল না; আরও কিছু নগদ লইয়া সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি নীলকমলের নিকট বন্ধক রাখিয়া সুদে আসলে জড়াইয়া ৫ হাজার টাকার এক তমসুক লিখিয়া দিল। পাঠক, এইখানে একটী কথা জানিয়া রাখুন। যখন এই তমসুক লিখিত পড়িত হয়, তখন ঐ ৫ হাজার টাকার মধ্যে আসল দেড় হাজার টাকা মাত্র, অবশিষ্ট সাড়ে তিন হাজার টাকাই সুদ। দায়ে পড়িয়া নৈমুদ্দিনকে সুদের টাকা আসলে গণ্য করিয়া দিতে হইল। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর যায়, নীলকমল আর টাকার আলাপ করেনা; নৈমুদ্দিনও নাকে কাটি দিয়া হাঁচেনা। ৩।৪ বৎসর গত হইলে ঋণ পাঁচ হাজারের দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইল। তখন নীলকমল দাঁও বুঝিয়া একেবারে সমুদায় টাকা পাইবার জন্য তাগাদা করিয়া বসিল। নৈমুদ্দিন টাকা দিতে পারিল না। সময় চাহিল, কিন্তু বন্দীর প্রার্থনা করিল, নীলকমল তাহার কোন প্রার্থনাই গ্রাহ্য করিল না। তাহা করিবে কেন, নীলকমল যে মাচ ধরিবার জন্য এতদিন ধরিয়া চার করিয়া আসিতেছিল, সেই চারে যখন মৎস্য পড়িয়াছে, তখন সে কি আর তাহা ছাড়িতে পারে? নীলকমল একেবারে দশটী হাজার টাকার দাবী দিয়া নালিস করিল। বলা বাহুল্য তমসুকের সমুদয় টাকা মায় সুদ খরচা ডিক্রি হইল। সম্পত্তি নিলামে উঠিল। নীলকমল স্বীয় বনিতা বিমলা দেবীর নামে প্রকাশ্য নিলামে মুন্সী নৈমুদ্দিনের সমুদয় সম্পত্তি—পাঁচশত বিঘা আয়মা, বাগান, বাড়ী পুষ্করিণী ও অন্যান্য অস্থাবর দ্রব্য সামগ্রী সমুদয় ডাকিয়া লইল। নৈমুদ্দিন অনন্যোপায় হইয়া নীলকমলের শরণাগত হইয়া পড়িল। নৈমুদ্দিন নীলকমলকে কহিল "তুমি আমার সমুদয় সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে আমার আর দুঃখ নাই, কিন্তু আমাদিগকে বাড়ীর বাহির করিও না; বাড়ীখানি ছাড়িয়া দাও। ভিক্ষা করিয়া খাইয়াও পৈতৃক ভিটায় বাস করিয়া কতক শান্তিলাভ করিব।" নৈমুদ্দিনের প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইল এবং নীলকমলকে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ করিল। নীলকমল সে অনুরোধ শুনিল না। যদিও বা নীলকমল শুনিত, কিন্তু বিমলা দেবীর পাকা ঘরে বাস করিতে বাঞ্ছা হইয়াছে, সে কিছুতেই রাগ মানিল না। নীলকমল সহধর্ম্মিণীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আদালত অবলম্বন করতঃ সস্ত্রীক নৈমুদ্দিনকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। নৈমুদ্দিন ও তাহার স্ত্রী ফাতেমা বিবি হাপুস নয়নে কান্দিতে কান্দিতে কেবল মাত্র স্ব স্ব পরিধেয় বস্ত্রমাত্র গ্রহণ করিয়া

বাড়ীর বাহির হইয়া গেল—ধনমানে গৌরবান্বিত নৈমুদ্দিন আজ অদৃষ্ট চক্রের পরিবর্ত্তনে পথের ভিখারী হইল। যাহার সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি ছিলনা, সেই নীলমমল—সেই পাষণ্ড নীলকমল আজ কৌশল ক্রমে নৈমুদ্দিনকে বিপন্ন করিয়া প্রভূত ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইল। ধন্য অদৃষ্ট! তোমার লীলা বুঝা ভার।

নৈমুদ্দিন আর জয়নগরে অবস্থিতি করিল না। জয়নগরের তিন মাইল দূরবর্ত্তী গোপালপুর নামক এক খানি ক্ষুদ্র পল্লীতে এক খানি সামান্য কুড়ে ঘর বাঁধিয়া নৈমুদ্দিন ফাতেমা বিবির সহিত অতি মনোকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিল এবং আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে কষ্টে-শ্রষ্টে কোন মতে তাহাদের দিন গুজ্‌রান হইতে লাগিল।

৩

নৈমুদ্দিন যে সে মুসলমান নহে; পাঠান কুলে তাহার জন্ম। ক্রোধ ও প্রতিহিংসা পাঠানের জাতিগত ধর্ম্ম। কুটিরে বাস করিয়া নৈমুদ্দিন যতই কষ্ট পাইতে লাগিল, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি ততই তাহার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্বীয় অদৃষ্ট ও নীলকমলের নীচ স্বার্থপরতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নৈমুদ্দিন এক দিন নিশাভাগে সেই পর্ণকুটিরের অভ্যন্তরে প্রতিহিংসাবশে হঠাৎ ক্রোধ প্রাপ্ত হইয়া উঠিল। সহধর্ম্মিণী ফাতেমা বিবি নিদ্রিতা ছিল, তাহাকে জাগাইল। ফাতেমা নিদ্রোত্থিতা হইয়া প্রকৃতিস্থা হইলে নৈমুদ্দিন কহিল "দেখ ফাতেমা, পাষণ্ড নীলকমলের আচরণ মনে করিয়া আমি আজ ক্রোধে বিচলিত হইয়াছি; তোন মতেই সুস্থ হইতে পারিতেছি না। আমি এই রাত্রেই সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বাড়ী গমন করিব। শুনিয়াছি সে আজ শিষ্য বাড়ী হইতে গৃহে আসিয়াছে। আমি এখনি গিয়া বাহির হইতে তাহার শয়নগৃহের দ্বার বন্ধ করতঃ আগুণ লাগাইয়া দিব। পাপিষ্ঠ সপরিবারে পুড়িয়া মরিলে তবে আমার মনে শান্তি হইবে। আমি চলিলাম তুমি সতর্ক থাক, আমি কার্য্য সামাধা করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।" ফাতেমা বিবি স্বামীর কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, কহিল "তুমি কি খেপিয়াছ? এক পাপে এই দশা ঘটিয়াছে, আবার নরহত্যা করিয়া দোজকে যাইবে। আমার মাথা খাও, তুমি তোমার ও ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প ত্যাগ কর। খোদার কাছে আর গোণা করিও না"। ফাতেমা বিবি এইরূপে কত কথা বলিয়া নৈমুদ্দিনকে প্রবোধ দিতে লাগিল। নৈমুদ্দিন একে পাঠান, তাহাতে আবার প্রবল প্রতিহিংসানল তাহার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, এখন ধর্ম্মসংযুক্ত কথা তাহার কর্ণে স্থান পাইবে কেন। সে কিছুতেই ফতেমার কথা শুনিল না, বৈরনির্য্যাতন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবিলম্বে এক গাছি কাষ্ঠ নির্ম্মিত রুল ও একটী দেশলায়ের বাক্স লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। ফাতেমা অবাক্ হইয়া কুটির-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

নীলকমল আজিও পৈতৃক বাড়ী ত্যাগ করিয়া নৈমুদ্দিনের পাকা বাড়ীতে গমন করে নাই, নিজের বাড়ীতেই রহিয়াছে; শীঘ্রই যাইবে এইরূপ বাঞ্ছা আছে। অদৃষ্টদেবীর কি বিচিত্র লীলা! নীলকমলের বাসনা পূর্ণ হইল না—তাহার ভাগ্যে আর অট্টালিকা বাস ঘটিয়া উঠিল না। ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া নীলকমলকে পৈতৃক ভিটাও পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হইতে হইল।

নীলকমলের বাড়ী দুই প্রস্থ। একটী সদর একটী মফঃসল। বাড়ীখানি চতুর্দ্দিকে সটা

প্রাচীর দ্বারা ঘেরা। ভিতর বাড়ীর ভিটায় চারি খানি ঘর। দক্ষিণদুয়ারি ঘরই বাড়ীর মধ্যে প্রধান ঘর। ঐ ঘরে নীলকমলের মালামাল থাকে এবং উহাই তাহাদের শয়ন গৃহ। পূর্ব্বদুয়ারি ঘরে রসুইবাস হয়, উত্তর দুয়ারি ঘরে অপরাপর দ্রব্যসামগ্রী থাকে। পূর্ব্বের ভিটায় যে ঘর, তাহার দুয়ার সদর বাড়ীর দিকে; উহাই বৈঠকখানা। সদর বাড়ীর পূর্ব্বদিকে সদর দরজা, দক্ষিণের ভিটায় একখানি গোগৃহ। সদর বাড়ীর উত্তরের ভিটায় কোন ঘর নাই। বৈঠকখানা ঘরের উত্তর দক্ষিণে ২ খণ্ড প্রাচীর; ঐ প্রাচীর খণ্ডদ্বয়ই ভিতর বাড়ীকে সদর বাড়ী হইতে পৃথক করিয়াছে। দক্ষিণদুয়ারি ঘরের পূর্ব্বের দিকে একটী খিড়কি দরজা আছে। সদর দরজা ব্যতীত বাড়ী হইতে বহির্গমনের আর একটী ছোট দরজা দক্ষিণদুয়ারি ঘরের পূর্ব্ব পার্শ্বের উত্তর ধারের প্রাচীরে সংলগ্ন আছে; ঐ দরজা দিয়া স্ত্রীলোকেরা স্নানের ঘাটে যাতায়াত করে। দক্ষিণদুয়ারি ঘরের পশ্চাদ্‌ভাগে প্রাচীরের ভিতরে অনেকটা পরিসর জায়গা; তথায় একটি কাঁঠালের গাছ বাটির ভিতর বলিয়া সে গাছের ফল চোরে লইতে পারে না; তাই গাছটীকে যত্ন করিয়া তথায় রাখা হইয়াছে। দক্ষিণদুয়ারি ঘরে বেশী জিনিষ পত্র কিছুই থাকে না। একধারে একটি লোহার সিন্দুক ও একটি কাঁঠালের বড় বাক্স এবং যে ধারে খিড়কি সেই ধারের উত্তর পার্শ্বে একখানি পালঙ্ক আর দক্ষিণ ধারে এক খানা তক্তপোষ। পালঙ্কে নীলকমলের শয্যা, আর তক্তপোষে ননীগোপালকে লইয়া বিমলা শয়ন করে। ভৃত্যটি বাহির বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে থাকে। নীলকমল বাড়ী থাকিলে রাত্রে আর অপর লোক কেহ থাকে না। বলা বাহুল্য রজনীতে সদর ও খিড়কি দরজা বন্ধ থাকে।

আজ দশ দিন পরে নীলকমল শিষ্য বাড়ী হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে। রাত্রি ১টা বাজিয়াছে। নীলকমল কিছু পূর্ব্বেই আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দক্ষিণদুয়ারি ঘরে পালঙ্কোপরি নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে; বিমলাদেবীও ননীগোপালকে লইয়া তক্তপোষে শুইয়াছে। ননীগোপাল ঘুমাইয়াছে, বিমলা এখনও নিদ্রিতা হয় নাই, বিছানায় এধার ওধার করিতেছে; যেন মনে কোন গুরুতর চিন্তা উপস্থিত হইয়া বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। গৃহের উভয় দ্বারই ভিতর হইতে রুদ্ধ, ঘর অন্ধকারময়—কোন আলো নাই। যে রাত্রির কথা বলা হইতেছে, সে রাত্রিও অন্ধকারময়, তবে আকাশ পরিষ্কার আছে। নীলকমলের বাটীর সদর ও খিড়কি দরজা আজিও পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইয়াছে; ভৃত্যটী বৈঠকখানায় নিদ্রিতাবস্থায় শয়ান আছে। চারিদিকে কোন সাড়া শব্দ নাই, সমুদয় নিস্তব্ধ।

বৈরনির্য্যাতনব্রতে দৃঢ়সঙ্কল্প নৈমুদ্দিন গোপালপুর হইতে বহির্গত হইয়া একবারে নীলকমলের বাটীর খিড়কী দরজার নিকট আসিয়া উপনীত হইল, দেখিল দ্বার রুদ্ধ। নৈমুদ্দিন বাটীর চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিল বাটী প্রবেশের কোন উপায় নাই। দাঁড়াইয়া খানিক ক্ষণ মনে মনে কি ভাবিল, ভাবিয়া কিছু দূরে চলিয়া গেল; কিঞ্চিৎ কাল পরে একখানি এঁকোওয়ালা বাঁশ লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। দক্ষিণদুয়ারি ঘরের পশ্চাদ্‌ভাগে যে কাঁঠালের গাছটি ছিল, তাহার একটী ডাল ঠিক প্রাচীরের উপরিভাগে পড়িয়াছিল। প্রাচীরের যে অংশে সেই ডালটী সংলগ্ন ছিল, ঠিক সেইখানে বাঁশ লাগাইয়া, তদবলম্বনে নৈমুদ্দিন অনায়াসেই প্রাচীরের শীর্ষদেশে আরোহণ করিতে সক্ষম হইল; এবং প্রাচীরের উপর

তিত ডাল বহিয়া কাঁঠাল গাছে উঠিল। পরে তাহাকে গাছ হইতে মাটিতে নামিতে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। নৈমুদ্দিন এইরূপ কৌশলে ভিতর বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে খিড়কি দরজার খিল খুলিল। পাছে কেহ কোনরূপ সন্ধান পায়, এই আশঙ্কায় খিড়কি দরজা দিয়া বাটীর বাহিরে গিয়া বাঁশখানি স্থানান্তরিত করিল। বাঁশখানি স্থানান্তরিত হইলে, নৈমুদ্দিন পুনরায় বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া খিড়কি দরজাটি ভেজাইয়া দিল, কিন্তু খিল দিল না। নৈমুদ্দিন শীঘ্র শীঘ্র এই সকল কার্য্য এত সাবধানে সম্পন্ন করিল যে, একটী কীটও তাহা জানিতে পারিল না। নৈমুদ্দিন কাঁঠাল গাছের আড়ালে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল; কি জানি পাছে কেহ বা দেখিতে পায়! পাপকার্য্য করিতে হইলে প্রতিপদক্ষেপেই লোকের এইরূপ আশঙ্কা হইয়া থাকে।

নৈমুদ্দিন কি উপায়ে গৃহে অগ্নি প্রদান করিবে তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। হাজার হউক নৈমুদ্দিন ভদ্র বংশের সন্তান, এ কাল পর্য্যন্ত সৎক্রিয়াই তৎকর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে, পাপকার্য্য সাধন করিতে সহসা তাহার হস্ত অগ্রসর হইল না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া নৈমুদ্দিন আর ক্রোধ সামলাইতে পারিল না, অগ্নি দেওয়াই স্থির করিল। দেশলাইয়ের বাক্স হইতে একটি কাটী বাহির করিয়া যেমন জ্বালিতে যাইবে, অমনি খিড়কি দরজার কপাট ঠেলিয়া একটী লোক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। নবাগত লোকটীকে দেখিতে পাইয়াই নৈমুদ্দিনের হস্তস্থিত কাটিটী পড়িয়া গেল, হাত কাঁপিতে লাগিল, নৈমুদ্দিন একটু সরিয়া কাঁঠালগাছের আড়ালে দণ্ডায়মান হইল।

লোকটি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণদুয়ারি ঘরের খিড়কি দরজায় তিনটি টোকা মারিল। টোকা দিবার অর্দ্ধ মিনিট পরেই খিল খুলিয়া কে যেন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। প্রথমে নৈমুদ্দিন মনে করিয়াছিল এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই চোর হইবে। সেই জন্য সে নিজ অভিপ্রায় আজ আর সিদ্ধ হইল না ভাবিয়া, কোন মতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু যখন দেখিল নূতন লোকটি দ্বারে টোকা দিবা মাত্র একটি লোক বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। সে পরবর্ত্তী ঘটনা অবগত হইবার জন্য সেইখানেই দাঁড়াইয়া উৎসুক চিত্তে কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অতঃপর আমাদিগকে যে অতি কুৎসিত ও লোমহর্ষণ ঘটনা বিবৃত করিতে হইবে, তাহা লিখিতে লেখনী সঙ্কুচিত হইতেছে, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে! কিন্তু উপায় কি! ঘটনাটী আমাদের কল্পনা প্রসূত নহে, যাহা সত্য সত্যই পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন ঘটিয়াছিল, আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের এই আখ্যায়িকার বর্ণিত স্থান ও ব্যক্তিবর্গের নাম কল্পিত। কিন্তু ঘটনাটী সম্পূর্ণ সত্যমূলক। কোন গুঢ় কারণ বশতঃ আমরা প্রকৃত নামের স্থলে কল্পিত নাম ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।

নৈমুদ্দিন কাঁটাল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া উকি মারিয়া দেখিতে পাইল, ঐ ব্যক্তি দ্বয় ঘরের পশ্চাদ্‌ভাগে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু খানিক আসিয়া আর আসিল না; দাঁড়াইল। একজন বলিল "ভাই আজ যাও, আমার স্বামী বাটী আসিয়াছে, অন্য সময়ে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। অপর ব্যক্তি কহিল, "না তাহা হইতেছে না; যখন আমি

আসিয়াছি, তখন আর কোন ক্রমেই ছাড়িব না। তোমার স্বামী আসিয়াছে, সে সংবাদ আমাকে পূর্ব্বে দাও নাই কেন? দোষ কাহার? এখন বুঝি আমি কষ্ট করিয়া আসিয়া মিছা-মিছি ফিরিয়া যাইব?" পাঠক! বোধ হয় আপনারে বুঝিতে বাকী নাই যে, পূর্ব্বালাপ কারিণীই, হতভাগ্য নীলকমলের কুলকলঙ্কিনী বনিতা বিমলাদেবী। আর ঐ পুরুষটী কে চিনিয়াছেন কি? ঐ পাপাত্মা, ঐ পাপিয়সী বিমলার উপপতি।

নৈমুদ্দিন যদিও অন্ধকারে উহাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল না, কিন্তু অনুভবে ও গলার স্বরে উভয়কেই চিনিতে পারিল। গ্রামের চৌকিদার চণ্ডালজাতীয় গদাই হলদারই যে নীলকমলের পত্নী বিমলাদেবীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া কুৎসিৎ অভিপ্রায় সাধন করিতে আগমন করিয়াছে, তাহা নৈমুদ্দিনের বুঝিতে বাকী রহিল না। এই ঘটনা অবগত হইয়া নৈমুদ্দিনের মনে কিছু আনন্দ হইল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "শালা বামুন যেমন শয়তান তার উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে। কল্য এ কথা চারিদিকে প্রচার করিয়া বেটার জাত মারিয়া দিব।" নৈমুদ্দিন নীলকমলের প্রতি ক্রোধ বশতঃ এরূপ বলিল বটে, কিন্তু ইহাও মনে মনে বলিতে লাগিল "বেটী বামুনীর কি আক্কেল ও কাণ্ড! তোর এমন উপযুক্ত স্বামী, এমন সোণারচাঁদ ছেলে, এমন বিষয়-আশয়, এত টাকাকড়ি, খাবার পর্‌বার কিছুরই কোন অভাব নাই; এ সকল বিদ্যমানেও তুই কি না উপপতি করিলি। হা নচ্ছার! তোর প্রবৃত্তিকেও ধন্য! গদাই হালদার একে জেতে চণ্ডাল, তাতে অতি কুৎসিত, নীচ চৌকি-দারী ও মজুরী তাহার ব্যবসা। আর তুই হলি কোথা বামুনের মেয়ে, তোর এমন রূপ, তুই কি বেটী আর লোক পেলি না, তা গদা চৌকিদারের সহিত মরিতে গেলি! খোদা! তোমার লীলা খেলা বুঝা ভার, এক ইতর কথায় বলে "পিরিতে মজেছে মন, কি হাড়ি কিবা ডোম্" এ যে দেখ্‌ছি কাযেও তাই হলো।" নৈমুদ্দিন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় ঘরে ছেলে কান্দার মত শব্দ হইল। বিমলা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ননী-গোপালকে কোলে লইয়া পুনরায় তথায় উপ-নীত হইল; ননীগোপাল মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। পুনরায় অপূর্ব্ব প্রণয়ী-যুগ-লের কথোপকথন চলিতে লাগিল।

বিমলা। এই দেখ ভাই ছেলে উঠিয়াছে, আজ্ তুমি ফিরিয়া যাও।

গদাই। ছেলে শুয়াইয়া রাখিয়া আইস না কেন?

বিমলা। ছেলেকে শুয়াইতে গেলেই কান্দিয়া উঠিবে, অমনি কর্ত্তা জানিতে পারিবে; তখন সব দিক নষ্ট হইবে। তাই বলিতেছি তুমি আজ্ চলিয়া যাও।

গদাই। বটে বামুনি, আজ বুঝি ভাতার পাইয়াছিস্, আচ্ছা থাক্ আমি চলিলাম, এই পর্য্যন্তই শেষ হলো।

বিমলা। না ভাই তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও, রাগ্ করিও না; কি উপায় করিলে সব দিক্ বজায় থাকে তাহাই বল, করিতেছি।

বিমলার কথা শুনিয়া কামোন্মত্ত নরপশু গদাই যাহা বলিল, তাহা শ্রবণ করিয়া নৈমুদ্দি-নের হৃদয় চমকিয়া উঠিল। মনে করিল "উঃ! কি পাপিষ্ঠ! কি পাপিষ্ঠ! বেটা বলে কি? নরাধম চণ্ডাল হইয়া যখন অনায়াসে ব্রাহ্মণ কন্যা হরণ করিতে পারিয়াছে—বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইতে পারিয়াছে, তখন উহার অসাধ্য

ছুই নাই। কিন্তু পাপিষ্ঠ কামান্ধ হইয়া এমনি দিগ্‌বিদিকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে সামান্য ইন্দ্রিয়-লালসা পরিতৃপ্তির জন্য নর-ত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না! হা শ্বর! এ মানুষ, না হিংস্র পশু!" নৈমুদ্দিন ইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিমলাদেবীর উত্তর তীক্ষা করিতে লাগিল। পাঠক! পাপাত্মা মুকের প্রস্তাব শুনিবেন কি? পাষণ্ড গদাই মলার কাকুতি মিনতি দেখিয়া বলিল "নে র চালাকি করিতে হইবে না। আমার তি তোর যত ভালবাসা তা সব জানা য়াছে।

বিমলা। কেন ভাই, আমার ভাল বাসার টি কি? বল, কি করিলে ভাল বাসা নায়, তাহাই করিতেছি।

গদাই। করিতে পার্‌বি।

বিমলা। অবশ্যই পারিব। তুমি বলিয়াই দেখ না।

গদাই। বলিব আর কি, যাহাতে আমা-দের আশু সুখের পথের কণ্টক ঘুচে তাহাই করনা কেন।

বিমলা। আমাদের সুখের পথের কণ্টক ক? এবং কি উপায়েই বা সে কণ্টক চিতে পারে?

গদাই। সুখের পথের কণ্টক তোমার ই ছেলে ননীগোপাল। ইহাকে কেন ঘুচাইয়া ওয়া যাউক না?

গদাই যে এরূপ প্রস্তাব করিবে, বিমলা হা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে পুত্র হত্যার থা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল! বলিল "না াই তাহা পারিব না।"

"হুঁ তা পার্‌বি কেন, এইত তোর লবাসার পরিচয়; থাক্ তুই তোর ছেলে য়ে, আমি চলিলাম" এই বলিয়া গদাই গম-নোদ্যত হইলে, বিমলাদেবী ফাঁপরে পড়িল। এক দিকে পুত্রস্নেহ; অন্য দিকে উপপতির প্রণয়; একবার মনে হইতে লাগিল, এমন সোণার চাঁদ ছেলেকে কেমন করিয়া হত্যা করিব, আবার মনে হইল তাহাই ত এ কণ্টক থাকিতে যে উপপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না, তাহাকেও ত চটাইলে চলিবে না।" মনে মনে এই রূপ আন্দোলন করিতে করিতে পাপিনীর হৃদয় হইতে অপত্যস্নেহ দূরীভূত হইল—প্রবল কামবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। অমনি বলিল "না ভাই রাগ করিও না, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

গদাই। এক খানা ধারাল দা লইয়া আইস।

বিমলা। দা কোথায় আছে জানি না, অন্ধকারে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

গদাই। কেন রান্নাঘর হইতে বঁটীখানি লইয়া আইস না কেন?

বিমলা। তুমি ননীগোপালকে ধর, আমি বঁটীখানি লইয়া আসি।

গদাই ননীগোপালকে মাটিতে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই বাহুমূল ধরিয়া রাখিল, দুধের ননীগোপাল ঘুমের ঘোরে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। অবোধ জানিতে পারিল না; তাহার কালসাপিনী কুলটা জননী হৃদয় হইতে সমস্ত দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়া—পাষাণে বুক বাঁধিয়া পাষণ্ড উপপতির মনরক্ষার জন্য আজ তাহাকে বধ করিতে উদ্যতা হইয়াছে।

বিমলা অবিলম্বে ধারাল বঁটি লইয়া উপ-স্থিত হইল। গদাই তাহাকে কহিল "আর দেখ্ কি, এইত আমি ধরিয়াছি, ঘুমে ঘাড় লুটাইয়া পড়িয়াছে; দাও কোপ্।"

বিমলা কহিল "আমি ভাই পারিব না, আমার মন কেমন কর্‌ছে; আমি ধরি, তুমি

কাট।"গদাই বিমলার হাত হইতে বঁটি লইয়া কহিল "হা অকর্ম্মা, কোন কাজের নও, তুমি আমার মত করিয়া ধর, আমি কাজ সাবাড় করিয়া দিই! বিমলা ননীগোপালের দুই হাত চাপিয়া ধরিল। গদাই ননীগোপালকে কাটিবার নিমিত্ত বঁটি উত্তোলন করিল।

পাঠক! এমন কুলনাশিনী পুত্রঘাতিনী পাপিয়সী রমণী কখন আপনার চক্ষে পড়িয়াছে কি? উপপতির মনরক্ষার্থে অনেক কুলটাকে স্বামী হত্যা করিতে শুনিয়াছি, কিন্তু জারের প্রীতি সাধনের জন্য কখন কাহাকেও প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণবিনাশ করিতে শুনি নাই। হা পাপিয়সি! তোর হৃদয়ে কি কিছুমাত্র দয়ামায়া নাই! একে ত উপযুক্ত স্বামীসত্ত্বে অপাত্রে সতীত্বরত্ন অর্পণ করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিয়াছিস্, তার পর আবার প্রিয়তম পুত্রের প্রাণসংহার করিয়া পাপের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে চলিলি! হতভাগিনি! তুই মানুষ না পাষাণ? তোর যে পুত্রের চাঁদমুখ দেখিলে লোকের মন মোহিত হয়, যাহার অমিয়জড়িত আধ আধ কথা শুনিলে প্রাণ শীতল হইয়া যায়, তোর—কেবল তোর নয়,তোর হতভাগ্য স্বামীর হৃদয়রত্ন, সর্ব্বস্বধন সেই ননীগোপালকে তুই কোন্ প্রাণে—হা পাপিয়সি! হা কলঙ্কিনি! হা কালসাপিনি! তুই কোন্ কঠিন প্রাণে সেই নিদ্রিত ননীগোপালকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিস! হা ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিতে! হা স্বৈরিণি! তুই এতই কামান্ধ হইলি যে, 'মা' এই মধুর নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠানুভব করিলি না? আর রে পাষণ্ড চণ্ডাল গদাই! তুই কামের বশীভূত হইয়া যে কি ভীষণ পাপ অর্জ্জন করিতে চলিলি, তাহা কি বারও ভাবিয়া দেখিলি না। ব্রাহ্মণ পত্নীর সতীত্বরত্ন হরণ করিয়া একেত অনন্ত নরক সঞ্চয় করিয়াছিস্, তার পর নিরী ব্রাহ্মণ-বালক বধ করিয়া কি ভয়ানক পাপে অভিনয় করিতে উদ্যত হইয়াছিস্! তো গতি মুক্তির উপায় কি? পাপাত্মন! তা কি একবারও ভাবিয়া দেখিলি-না! নরাধম! মনে করিয়াছিস্ তোর এই সুখের পথে কণ্ট এই সুকুমার ব্রাহ্মণ তনয়কে হত্যা করি নির্ব্বিবাদে ঐ পাপিয়সীর সহিত পাপবৃ চরিতার্থ করিবি! রে হতভাগ্য! রে অল্পায়ু! তোর যে পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, তাহা কি জানিতে পারিস্ নাই? সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান কি তোদের ন্যায় নরপশুর ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দে তবে যে তাঁহার পবিত্র "ন্যায়বান" নামে কলঙ্ক হইবে। হা অন্ধ! তুই এদিকে নির্দ্দোষী নিদ্রিত ব্রাহ্মণতনয়ের প্রাণবধের নিমিত্ত অস্ত্র উত্তো লন করিয়াছিস্,কিন্তু তোর পশ্চাদ্ভাগে কৃতান্ত দেব যে তোর প্রাণসংহারার্থ—তোর পাপ জী নের পাপ লীলা সাঙ্গ করিবার জন্য দণ্ড উত্তো লন করিয়াছেন তাহা কি দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছিস্ না? হা নরাধম! একা তো অপরাধ কি! যে তোর মত প্রবল কামরিপু বশীভূত হয়, সে তোরই মত হিতাহিত বি র্জ্জিত হইয়া আত্মবিনাশের উপায় উদ্ভাব করিয়া থাকে।

ভগবানের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! নৈমুদ্দিন বৈরনির্য্যাতনক্রিয়া সাধন করি আসিয়াছিল—যে নীলকমলকে সপরিবারে ধ্ব করিয়া স্বীয় প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করি আসিয়াছিল; এই লোমহর্ষণ হৃদয়দ্রাবি ঘটনা সন্দর্শন করিয়া সেই নৈমুদ্দিন ক্রো অধীর হইয়া উঠিল। যেমন পাপাত্মা গদাই নিদ্রিত ননীগোপালের গলদেশে বঁটী বসাই দিবার নিমিত্ত হস্ত উত্তোলন করিয়াছে, অম নৈমুদ্দিন পশ্চাদ্দিক হইতে দ্রুতবেগে ছুটি

গিয়া গদায়ের মস্তকে সজোরে হস্তস্থিত রুলের আঘাত করিল। বঁটী গদায়ের হাত হইতে পড়িয়া গেল, বিমলা চমকিয়া উঠিল; গদাই পাপের ফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। নৈমুদ্দিন বেগতিক দেখিয়া সেই রুল গাছটি হাতে করিয়াই খিড়্কি দরজা দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল

নৈমুদ্দিন পলায়ন করিলে পাপিয়সী বিমলার জ্ঞানের উদয় হইল। সে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। নিদ্রিত ননীগোপালকে তাড়াতাড়ি তক্তপোষে শুয়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। উপপতির দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। ভাবিতে লাগিল "খুনিত পলায়ন করিল, এখন উপায় কি? এখন সামাল পড়িবে কিসে"! কুলটা রমণীর পাপ বুদ্ধির অভাব নাই! ক্রমে দুইটী গুরুতর পাপ উপার্জ্জন করিয়া মন কঠিন করিয়াছে, আবার এবারে তৃতীয় মহাপাপের আয়োজন করিতে উদ্যতা হইল। গদাইয়ের মস্তকের রক্তে বিমলার বস্ত্র রঞ্জিত হইয়াছিল, মাটীতেও রক্তের ঢেউ খেলিতেছিল। পাপিয়সী সেই সকল রক্ত নিদ্রিত নীলকমলের বিছানায় ও পরিধেয় বস্ত্রে লাগাইয়া দিল,কতক নিজের তক্তপোষের বিছানায় লাগাইল; আর বঁটীখানি পালঙ্কের উপরিস্থিত গদির নিচে লুকাইয়া রাখিল। পরে আপনার বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করিয়া অন্য একখানি বস্ত্র পরিধান করিল। এই সমুদয় কার্য্য নিমিষে সম্পন্ন করিয়া বাটীর সদর দরজা খুলিয়া অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো তোমরা কে কোথায় আছ দৌড়িয়া আইস, আমার স্বামী—গদাই চৌকিদারকে খুন করিয়া ফেলিল।" এইরূপ বারম্বার চীৎকার করায় পাড়ার লোক জমিয়া গেল; ক্রমে গ্রামের পঞ্চায়ত আসিল। সকলেই বাটীর ভিতর গিয়া দেখে যে, গদাই চৌকিদার খুন হইয়া পড়িয়া আছে। বাটীতে এত যে কাণ্ড, এত যে গোলমাল, নীলকমল তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই, পথশ্রমে অতি কাতর হইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। ক্রমে কোলাহল অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে নীলকমল জাগিয়া উঠিল। জাগরিত হইয়া যাহা দেখিল ও যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। পুলিসে রাত্রেই খবর গেল। যথাসময়ে দারোগা অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া লাস তদারক করলেন। বিমলাদেবীর অমানুষিক গুণেই বঁটীখানি বাহির হইয়া পড়িল। আমরা একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সে কথা না বলিলে বিমলাদেবীর গুণের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। বিমলা বঁটীখানি লুকাইয়া রাখিবার পূর্ব্বেই উহা দ্বারা মৃত গদায়ের শরীরের ৫।৭ স্থলে আঘাত করিতে ভুলে নাই। পাছে মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া গিয়া নীলকমল মুক্তিলাভ করে, সেই ভয়ে পতিপরায়ণা (?) বিমলা এই কার্য্য করিয়া রাখিয়াছিল। বিমলার এজাহার লইয়া নীলকমলকে খুনি আসামী সাব স্ত করিয়া সবইন্স্পেক্টর মহাশয় বঁটী ও লাস সহ আসামীকে মাজিষ্টরিতে চালান দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মোকর্দ্দমা দায়রা সোপরদ্ধ করিলেন।

৪

বরিশালের যেমন আদালতে আজ লোকে লোকারণ্য। আজ নীলকমল চক্রবর্ত্তীর বিচারের দিন। বিচারপতি গ্রাণ্ট সাহেব আজ সকালে সকালে কাছারি আসিয়াছেন। ৫ জন জুরি নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ভারতেশ্বরী বাদী বলিয়া গবর্ণমেণ্ট প্লিডার এক দিকে, অপরদিকে অর্থাৎ নীলকমলের দিকে

দুই জন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও জেলার প্রধান প্রধান চারি জন উকিল নিযুক্ত রহিয়াছেন, ১১ টা বাজিবা মাত্র পুলিস চারিজন প্রহরী নীলকমলকে বন্দীভাবে আনিয়া আসামীর কাঠ-রায় দাঁড় করাইল। নীলকমল বিষণ্ণবদনে জজ সাহেবের দিকে তাকাইয়া জোড় হাত করিয়া রহিল।

খুন সপ্রমাণের নিমিত্ত নীলকমলের বিপক্ষে অনেক গুলি সাক্ষীর এজাহার গ্রহণ করা হইল। আমরা তাহার মধ্য হইতে নীলকমলের সহধর্ম্মিণী বিমলাদেবীর এজা-হারের মর্ম্ম বিবৃত করিলাম। বিমলাদেবী বলিল "ঘটনার রাত্রে আমি ও আমার স্বামী এবং আমার পুত্র ননীগোপাল এক ঘরে দ্বার-রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। মৃত গদাই চৌকিদার যেরূপ নিত্য নিত্য চৌকি দেয়, সেরূপ সে দিনও সে চৌকি দিতে আসিয়া-ছিল। আমার স্বামী ঘটনার দিবস শিষ্য বাড়ী হইতে আসিয়া ভাত খাইতে বসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করেন, "গদাই চৌকিদার আমার অনুপস্থিতিতে চৌকিদেওয়া উপলক্ষে প্রত্যহ নিশাভাগে আমার বাড়ী আসিত কেন।" আমি তদুত্তরে বলি "সে কেন আমা-দের বাটী আসিবে। আমি স্ত্রীলোক একলা বাটী থাকি, বাহিরের ঘরে চাকর থাকে এবং বাড়ীর দুই দরজাই বন্ধ থাকে; সে কিরূপে রাত্রে ভিতরে আসিবে। ভদ্র লোকের ঘরের বৌয়ের নিকট রাত্রে তাহার প্রয়োজন কি?" আমার কথা শুনিয়া আমার স্বামী আমাকে বলেন "সে বেটা বদমাইস্ আমি শুনিয়াছি প্রত্যহ রাত্রে সে আমার বাড়ী আসে। তুই যে নষ্ট হইয়াছিস্ তাহা আমার জানিতে বাকী নাই। আচ্ছা থাক্ ইহার প্রতিফল পাইবি" এই বলিয়া আমাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করেন। পরে আমার সহিত আর বাক্যালাপ না করিয়া শয়ন গৃহে গিয়া পালঙ্কে শয়ন করেন। স্বামী আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করায় আমার মনে কষ্ট হয়; সে দিন আমি মনোদুঃখে আহারাদি করি না। আমার পুত্র ননী-গোপালকে খাওয়াইয়া তাহাকে লইয়া শয়ন করিতে যাই। চিন্তায় সে রাত্রি আমার ঘুম হয় না। আমার স্বামীও সে রাত্রে নিদ্রা যান নাই। রাত্রি যখন দুপর তখন গদাই চৌকি-দার চৌকি দিতে আসিলে আমার স্বামী শয্যা হইতে উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া বাহিরে যান এবং "গদাই" "গদাই" করিয়া ডাকিতে থাকেন। গদাই ডাক শুনিয়া ভিতরে আইসে। গদাই বাড়ীর ভিতরে আসিলে আমার স্বামী তাহাকে তামাক সাজিতে বলেন। গদাই যখন তামাক সাজে সেই সময় আমার স্বামী তাহাকে বলেন "হেঁরে শালা পাজি তুই রোজ রাত্রে আমার বাড়ীর ভিতর আসিস্ কেন?" গদাই বলে "সে কি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনার বাড়ীর ভিতর আমি রাত্রে কি জন্য আসিব? আপনার পরিজন হচ্ছেন আমার মা বলেন কি কর্ত্তা" এই কথা বলিয়া গদাই যেমন উপুড় হইয়া কল্‌কেয় আগুন তুলিতেছে, অমনি আমার স্বামী, পিঁড়ার কোণে এই বঁটী খানি (টেবিলস্থ বঁটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ছিল, উহা লইয়াই গদাইকে "শালা মিথ্যবাদী বদমাইস যেমন কর্ম্ম তেমন ফল ভোগ কর" বলিয়া ৭।৮ কোপ বসাইয়া দিল। গদাই "বাপরে 'মলামরে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলে বঁটীতে কার্য্য শেষ হইল না দেখিয়া উঠানে একটী ধান ভানা চুরুন পড়িয়া ছিল, তদ্দ্বারা মস্তকে আঘাত করিবামাত্র গদাই মরিয়া গেল, শেষে আমার দিকে আক্রমণ করিলে, আমি প্রাণভয়ে দৌড়িয়া গিয়া লোক ডাকিতে লাগিলাম। লোক আসিতে আসিতে

আমার স্বামী বঁটী খানি পালঙ্কের গদির নীচে লুকাইয়া রাখিয়া কপট নিদ্রা গেল। শেষে লোক আসিয়া বাটী পুরিয়া গেলে পর, তখন উঠিয়া বলিল, 'এসব ঘটনার আমি বিন্দুবিসর্গ জানি না।' দোহাই ধর্ম্ম-অবতার! আমি পর-কালের ভয়ে আপনার নিকট মিথ্যা বলিতে পারিব না। মিথ্যা বলিলে পাছে আমার ছেলের অমঙ্গল হয় সেই জন্য যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহাই সত্য বলিলাম। আপনি দয়া করিয়া আমার স্বামীকে এ যাত্রা অব্যাহতি প্রদান করুন।" পাঠক বিমলার সাক্ষ্য শুনি-লেন ত!

সমুদয় সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গেলে জজ সাহেব নীলকমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বিরুদ্ধে ত খুন করা সপ্রমাণ হইয়া গেল। এখন তোমার কিছু বলিবার আছে?" নীলকমল করযোড় করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিল "ধর্ম্মাবতার! আমি এ খুনের বিষয় ঘুণা-ক্ষরেও অবগত নহি। আমার স্ত্রীও যে সকল কথা বলিল, তাহারও বিষয় আমি কিছুমাত্র জানি না। আমার আর কিছু বলিবার নাই! হুজু-রের বিচারে যে রূপ ভাল হয়, করিতে আজ্ঞা হউক"। জজ সাহেব জুরিদিগের মত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা সকলেই একমত হইয়া নীল-কমলকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। জজসাহেবও জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া নীলকমলের নরহত্যার নিমিত্ত প্রাণদণ্ডের অনুমতি প্রদান করিলেন। নীলকমল স্বীয় সহধর্ম্মিণীর দিকে একবার ফিরিয়া তাকাল, দেখিল বিমলার মুখে একটু ঈষৎ হাস্যের রেখা দেখা দিয়াছে। নীলকমল আর সে দিকে তাকাইতে পারিল না।

৫

কে বলে আজিও জগতে সত্যের সম্মান নাই, কে বলে পাপী পাপ করিয়াও নিস্তার পায়, নির্দোষী অকারণে দণ্ড ভোগ করে। পাঠক! অধর্ম্মের জয় ও ধর্ম্মের পরাজয় দেখিয়া আপনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন, পাপ পুণ্যের ভেদাভেদের প্রতি আপনার অনাস্থা জন্মিয়া গিয়াছে। ভয় নাই! আপনাকে নিরাশ হইতে হইবে না। দেখুন, ঘটনাচক্রে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়! বিচারালয়ের জনতার ভিতর একটী লোক একগাছি রক্তমাখা কাঠের রুল ও একটী দেশলায়ের বাক্স হাতে করিয়া এক ধারে দণ্ডায়মান হইয়া বিচার দেখিতে-ছিল। সামান্য লোক জ্ঞানে তাহার প্রতি কাহারই লক্ষ্য পড়ে নাই। যেমন জজ সাহেবের মুখ হইতে নীলকমলের প্রাণদণ্ডের আদেশ বহির্গত হইয়াছে, অমনি সে ভীড় ঠেলিয়া একেবারে আসামীর কাঠরার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "দোহাই ধর্ম্মাবতার! মোকদ্দমার বিচার হয় নাই, নির্দ্দোষীকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। আসামী এই খুনের বিন্দুবিসর্গও জানে না; এ খুনের সম্পূর্ণ দায়ী আমি।" আগন্তুক ব্যক্তির মুখ হইতে এই সকল বাক্য বহির্গত হইতে না হইতে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ফারিত নেত্রে তাহার পানে দৃষ্টি করিল। জজসাহেব, উকিল, ব্যারিষ্টার এবং দর্শকমণ্ডলী সকলেই তাহার মুখে খুনের প্রকৃত রহস্য শুনিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন। নীলকমলের মনে আশার উদয় হইল, বিমলার প্রফুল্ল মুখখানি শুকাইয়া গেল।

পাঠক! ইহাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? এ ব্যক্তি আপনাদের পূর্ব্বপরিচিত মুন্সী নৈমুদ্দিন। যাহার অসাধারণ ক্ষমতাবলে পাপিষ্ঠ গদায়ের হস্ত হইতে সুকুমার শিশু ননী-গোপাল পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, গদাই স্বীয় কর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছিল,

তাহারই অনুগ্রহে আজ তাঁহার পরম অপকারী শত্রু নীলকমল প্রাণদান পাইল, আর পাপিয়সী বিমলা আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জগতের সমক্ষে ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয় প্রদর্শন করিল। জজসাহেবের জিজ্ঞাসা ক্রমে নৈমুদ্দিন আপনার সাংসারিক অবস্থা হইতে বর্ত্তমান ঘটনা পর্য্যন্ত সমুদয় বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলে, সকলেই শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। নীলকমল ও বিমলা সরল ভাবে সকল কথাই স্বীকার করিল। জজসাহেব নীলকমলকে প্রাণদণ্ডের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। বিমলার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। জজসাহেব অনুগ্রহ করিয়া নৈমুদ্দিনকেও মুক্তি দিলেন। এই বিচারে সকলেই সুখী হইল।

নীলকমল অব্যাহতি লাভ করিয়া নৈমুদ্দিনের পদপ্রান্তে লুটাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। নীলকমল সে দিবস ও তাহার পর দিবস নৈমুদ্দিনকে জেলায় রাখিয়া, যে সকল সম্পত্তি নৈমুদ্দিনের নিকট হইতে লইয়াছিল, তৎসমুদয় এবং নিজের স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি ও নগদ ৪০ হাজার টাকা, একখানি দানপত্র দ্বারা তাহাকে দান করিয়া কিছু টাকা সহ ননীগোপালকে সঙ্গে লইয়া তীর্থবাসী হইল। নৈমুদ্দিন অপরিণামদর্শিতা ও অমিত ব্যয়িতার ফল পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিল; এক্ষণে পরোপকার ও দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ পাঁজা।

স্বর্গীয় রামলোচন তা (৩)।

রামলোচন তাহেরপুর রাজ ইষ্টেটের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন, সকল দিকেই অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া বিশৃঙ্খল রাজ সংসারের জীর্ণসংস্কারে মনোযোগী হইলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে ৫টী গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপস্থিত রহিয়াছে। ১ম ঋণ পরিশোধ ২য় জমিদারী বন্দোবস্ত; ৩য় বাকী কর আদায়; ৪র্থ ব্যয় সঙ্কোচ, ৫ম লুপ্তপ্রায় রাজকীয় ক্রিয়া কলাপের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তিনি আপনার কার্য্যকে এইরূপে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথমে ঋণ পরিশোধের উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টিত হইলেন।

কোষাগারে একটী পয়সা নাই পরন্তু ৩ লক্ষ টাকা দেনা রহিয়াছে। তাহেরপুররাজ্যের প্রজাগণ বড়ই রাজভক্ত। তাহারা রাজার ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বহুবার ন্যায্য রাজস্ব ব্যতীত চাঁদা প্রদান করিয়াও রাজাকে ঋণমুক্ত করিতে পারে নাই। "রাজার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলে তাহারা জমিজমাতে কায়েমী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে" এই প্রলোভনে তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ বার বার তাহাদের সহিত প্রতারণা করিয়াছে। বলা বাহুল্য কর্ম্মচারীদিগের বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত প্রজারা উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিলেও রাজা সেই অর্থের এক আনামাত্রও প্রাপ্ত হন নাই; সুতরাং তিনি কিরূপে ঋণমুক্ত হইবেন। রামলোচন এই সকল অবস্থা অবগত হইয়া পুনরায় সমগ্র খাসমহালের প্রধান প্রধান প্রজাবর্গকে তলব করিলেন। একটী নির্দ্দিষ্ট দিন ধার্য্য করিয়াই তাহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল; ঐ নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রায় সমুদয় আহূত প্রজাই রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রজাগণ উপস্থিত হইলে রাজা চন্দ্রশেখর বাহাদুর তাহাদের সমক্ষে নূতন দেওয়ানের স্বভাব-চরিত্রের পরিচয় প্রদান ও নিয়োগে বিবরণ বিবৃত করিলেন। রাজার কথা শেষ হইলে রামলোচন নিজের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের বিষয়, এবং রাজসংসারের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন করিয়া প্রজাদিগের রাজভক্তির জন্য তাহাদিগের অশেষরূপ প্রশংসা করিলেন। প্রজারা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার নাম শ্রবণ করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল। প্রজাগণ যুক্তি করিয়া নূতন দেওয়ানকে পাঁচশত মুদ্রা 'নজর' দিতে উদ্যত হইলে, নিস্পৃহ রামলোচন কহিলেন "বাপু সকল, তোমাদের রাজভক্তির বিষয় পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। কিন্তু তোমাদিগের নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে। আমি "নজর" গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোমাদিগকে আহ্বান করি নাই। তোমাদিগকে তোমাদের রাজার অবস্থা দেখাইতে ডাকিয়াছি। শুনিয়াছি তোমরা বহুবার চাঁদা প্রদান করিয়াছ, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। তাই আমার প্রার্থনা যে, বারবার এই বার তোমরা দয়া করিয়া যাহাতে রাজা ঋণ মুক্ত হন তাহার উপায় কর। এ পাঁচশত টাকা আমায় দিতে হইবে না, তোমরা রাজাকে যে চাঁদা দিবে এ টাকা তাহারই মধ্যে গণ্য হইবে। রাজার ঋণ পরিশোধরূপ বিভ্রাট মিটিয়া গেলেই আমি সমগ্র মহাল জরিপজমাবন্দী করিয়া তোমাদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিব। বন্দোবস্তের নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র "সেলামী" গ্রহণ করা হইবে না। রাজার তিন লক্ষ টাকা ঋণ, আমি অধিক কিছু বলিব না, যাহার যাহা জমা তোমরা তাহাই ভিক্ষা বা সেলামী স্বরূপ রাজাকে প্রদান কর। নূতন দেওয়ানের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া এবং নিস্পৃহতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রজাদের বড়ই ভক্তি এবং বিশ্বাস জন্মিল। তাহেরপুরের রাজার প্রজারা বিছু যোত্রশালী এবং পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তাহারা বড়ই রাজভক্ত। বিশেষতঃ রাজা চন্দ্রশেখরকে তাহারা পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত। প্রজারা পরস্পর যুক্তি করিয়া দেওয়ানের প্রস্তাবেই সম্মত হইয়া চলিয়া গেল। অচিরেই প্রায় লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় হইল।

এইরূপে তহবিলে লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইলে রামলোচন রাজার উত্তমর্ণদিগকে আহ্বান করিলেন। ক্রমে ক্রমে মহাজনেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি উহাদিগের সহিত দেনা পাওনার হিসাব করিয়া বুঝিতে পারিলেন কেবল কর্ম্মচারিগণের দোষেই এত টাকা ঋণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক জনের নিকট দশ হাজার টাকা কর্জ্জ করা হইয়াছিল, তাহাকে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে, এখনত সে ২০হাজার টাকা পাইবে। আর উত্তমর্ণদিগের সুদের হারও বড় বেশী বেশী। সকল মহাজনের নিকটই প্রায় এইরূপ ধরণের বাকী। তিনি এই সকল দেখিয়া বড়ই চটিয়া গেলেন। প্রথমে রাজাকে তাঁহার বিষয় পর্য্যবেক্ষণে অমনোযোগিতার নিমিত্ত ভৎর্সনা করিয়া উত্তমর্ণদিগকে কহিলেন "তোমরা যাহা সুদ পাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়ছে। এক্ষণে যদি আসল টাকা লইয়া রাজাকে খালাস দিতে পার, তবে আমি অদ্যই তোমাদের সমুদয়

দেনা পরিকার করিয়া দিতে পারি। যদি তাহাতে সম্মত না হও উপায় দেখিতে পার।" উত্তমর্ণেরা নানাদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মত সম্মত। রামলোচন তৎক্ষণাৎ সমুদয় টাকা গণিয়া দিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিলেন। ৩ লক্ষ টাকা ঋণ প্রায় লক্ষ টাকাতেই পরিশোধিত হইল।

ঋণ পরিশোধ হইলে, রামলোচন বিশ্বাসী ও কার্য্যদক্ষ আমিন নিযুক্ত করতঃ সমুদয় খাসমহাল জরিপ করিয়া জমাবন্দী করিলেন। বলা বাহুল্য এইরূপে জরিপ জমাবন্দীতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল হইল। রাজার কিছু বেশী আয় বৃদ্ধি হইল, সে জন্য রাজাও, দেওয়ানের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রজারাও জমিজমায় মনোমত স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া কিছু লাভবান হইল ও মফঃস্বলস্থ কর্ম্মচারিবর্গের অযথা অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইল। সুতরাং রামলোচন তাহাদেরও প্রীতিভাজন হইলেন।

দুইটী গুরুতর কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে, রামলোচন পত্তনী মহালের বাকী কর আদায়ে মনোযোগী হইলেন। তাহেরপুরের পত্তনীদারগণ প্রায় অনেকেই রাজার আত্মীয় ও কুটুম্ব, দুই এক জন অপর লোক। পত্তনীদার দিগের নিকট প্রায় লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী। অনেকে ২।৩ সনের খাজানা না দেওয়াতেই এরূপ অসঙ্গত বাকী পড়িয়াছিল। রামলোচন জমানবিস্‌কে পত্তনীদারদিগের হিসাব প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন। হিসাব প্রস্তুত হইলে দেখিলেন, রাজার কুটুম্বদিগের মধ্যেই বেশী বেশী বাকী রহিয়াছে। রাজার যে কুটুম্বটির নিকট অধিক পরিমাণে বাকী পড়িয়াছিল, তাহাকে একবার সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আহবান করিলেন। তিনি রাজার কুটুম্ব ব্যক্তি, এক জন কর্ম্মচারির পত্র পাইবা মাত্রই যে তিনি শীঘ্র আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, ইহা কিছু সম্ভবানহে। যথা-সময়ে উপস্থিত না হওয়ায়,পুনরায় তাঁহার নিকট পত্র পাঠান হইল। এইরূপ৩।৪খানি পত্র পাইয়া তিনি সদরকাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন দেওয়ানজি পূর্ব্বেই একটু চটিয়া ছিলেন,সুতরাং রাজকুটুম্বকে বড় একটা খাতির লৌকিকতা করিলেন না। তাহাতে রাজকুটুম্ব মহাশয়ের মনে বড় অভিমান জন্মিল। তেজস্বী রামলোচন তাহা বুঝিতে পারিয়া অন্য আলাপ না করিয়াই তাঁহাকে কহিলেন "মহাশয় আপনার নিকট প্রায় ১৫ হাজার টাকা খাজানা বাকী পড়িয়াছে। আপনারা মহালের খাজানা আদায় করিয়া বেশ সুখে বাবুগিরি করিতেছেন, আর আপনাদের রাজা ঋণ করিয়া সদর খাজানা দিয়া আসিতেছেন। আত্মীয় হইয়া আপনাদের এরূপ ব্যবহার ভাল দেখায় না। যাহা হউক আপনি সত্বর খাজানা গুলি পরিষ্কার করিয়া দিন্।" টাকার কথা শুনিয়া রাজকুটুম্ব মহাশয় হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "আপনি নূতন আসিয়াছেন আজিও সকল বিষয় অবগত হইতে পারেন নাই, আমরা রাজকুটুম্ব, আমাদের টাকা এইরূপেই পড়িয়া থাকে ; আমরা ইচ্ছানুসারে দিয়া থাকি। এখন সে কথা যাউক, আপনি নূতন দেওয়ান হইয়াছেন, আমি প্রায় এক বৎসর মোসহারা পাই নাই, হাজার টাকা পরিমাণ বাকী পড়িয়াছে, আপনি সেইটা চুকাইয়া দিন।" রামলোচন তাঁহার কথা শুনিয়া তেলে বেগুনে জলিয়া গেলেন, কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন ; "বেশ বলিয়াছেন,আপনারা টাকা না দেওয়াতেইত রাজা ঋণী হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই জন্য আপনাদের পাওনাও আপনারা

প্রাপ্ত হন নাই। আপনি আপনার দেয়১৫হাজার টাকার মধ্য হইতে হাজার টাকা বাদ রাখিয়া অবশিষ্ট ১৪ হাজার টাকা ফেলিয়া দিন্।" মহাশয় ও কথা ছাড়িয়া দিউন, আপনার উহাতে প্রয়োজন কি ? আমি রাজার সহিত বুঝিব" এই বলিয়া রাজকুটুম্ব মহাশয় কাছারি হইতে উঠিবার উপক্রম করিলে, উগ্রপ্রকৃতি রামলোচন ঈষৎ তীব্রভাবে কহিলেন "মহাশয় "খাজানা না দিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, অদ্যই আপনাকে খাজানা দিতে হইবে।" রাজকুটুম্ব স্বপ্নেও ভাবেন নাই রাজার একজন কর্ম্মচারী তাঁহার ন্যায় মান্য গণ্য ব্যক্তিকে ওরূপ কড়া ভাবে কোন কথা বলিতে সাহসী হইবে! কিন্তু এক্ষণে অসম্ভাবিতরূপে আপনাকে অপমানিত হইতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং রামলোচনের দিকে তাকাইয়া কহিলেন "তুমি বড়ই বে আদব, কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা জাননা" তোমার ন্যায় ব্যক্তির আমার নিকট ওরূপ ভাবে খাজানা চাহিবার কোন ক্ষমতা নাই।" আচ্ছা থাক্ রাজাকে বলিয়া ইহার প্রতিবিধান করিতেছি।" এই বলিয়া যেমন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি তেজস্বিতার প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি নির্ভীক রামলোচন গম্ভীর স্বরে "হিঁয়া কোই হ্যায়" বলিবামাত্র একজন হিন্দুস্থানী চোপ্‌দার সম্মুখীন হইয়া কহিল "কিয়া হুকুম মহারাজ।" রামলোচন রাজকুটুম্বের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া চোপদারকে হুকুম দিলেন "এই আদ্‌মিকো, বাহার লে জাকে উস্কো কাণ্ পাকড়কে আবি রূপায়া আদায় করকে লেও।" রামলোচনের মুখে এইরূপ অচিন্তিত অবমাননার কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুটুম্ব অবাক্ হইয়া গেলেন এবং লজ্জা ও ঘৃণায় অধোমুখ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কাছারি ভরা লোক রামলোচনের কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। চোপ্‌দার দেওয়ানের ভয়ে, রাজকুটুম্বকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে আরম্ভ করিলে, তিনি দেখিলেন গতিক বড় ভাল নহে, ভাগ্যে আরও হয়ত কি আছে! এই ভাবিয়া কহিলেন "দেওয়ান্‌জি! আমার সঙ্গেত এখন টাকা নাই আপনি আমায় রাজার সহিত দেখা করিতে দিউন, টাকার যোগাড় করিয়া দিতেছি।" দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামলোচন কহিলেন "তাহা হইবে না, এইখান হইতে টাকা দিয়া উঠিয়া যাইতে হইবে।" রাজকুটুম্ব আর কোন উত্তর না করিয়া একপত্র লিখিয়া রাজা চন্দ্রশেখরের নিকট পাঠাইলেন।

রাজা স্নানার্থ তৈল মাখিতেছিলেন, এমত সময়ে জনৈক প্রহরী রাজার হস্তে পত্র প্রদান করিল। রাজা—পত্র পাঠ করিয়া প্রহরী দ্বারা কাছারি হইতে একজন কর্ম্মচারীকে আহ্বান করত, সমুদয় ব্যাপার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া দেওয়ানকে এক চিরকুট লিখিয়া পাঠাইলেন। চিরকুটের মর্ম্ম এই "আপনি অদ্যকার মত কুটুম্ব বাবুটীকে ছাড়িয়া দিউন, পরে টাকা আদায় করিলেই চলিবে।" রামলোচন রাজার স্বহস্তলিখিত চিরকুট পাইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ; এবং সেই চিরকুটের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলেন "আমার হুকুম যখন রদ হইল, তখন আমি আর আপনার কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত নহি, আমার ইস্তফামঞ্জুর করিয়া পাঠাইবেন।" রাজা উহার মর্ম্ম অবগত হইয়া বিষম প্রমাদ গণিলেন এবং তৈলাক্ত গাত্রেই কাছারি উপস্থিত হইয়া কহিলেন "দেওয়ান জি! আমি ইঁহার জামিন হইতেছি এক হপ্তার মধ্যে আমি স্বয়ং আপনাকে দশ হাজার টাকা দিব, আপনি অদ্যকার মত ইহাঁকে ছাড়িয়া দিউন।

রামলোচন, রাজা চন্দ্রশেখরের মুখে এই কথা শুনিয়া একটু শান্ত হইলেন। রাজা কুটুম্বকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন "আপনি কথিত ৭ দিবসের মধ্যে টাকা সংগ্রহ করিয়া দিউন নইলে আপনার ও আমার উভয়েরই নিস্তার নাই। দেওয়ানের হুকুম আমিও অমান্য করিতে সাহসী নহি। যদি আপনি কোন মতে এই সাত দিনের মধ্যে সমুদায় টাকা সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে যাহা অনাটন পড়িবে তাহা আমার নিকট হইতে গোপনে হাওলাত করিয়া লইয়া বাকী পরিশোধ করিবেন।" কুটুম্ব মহাশয় রাজার মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন দেওয়ানের কিরূপ ক্ষমতা ও রাজার নিকট তাঁহার কিরূপ খাতির। বলা বাহুল্য তিনি সপ্তাহ মধ্যেই বাকী টাকা কাছারিতে হাজির করিয়া দিলেন। রাজার অপরাপর পত্তনীদারগণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র কর্জ্জু পত্র করিয়া যে যেরূপে পারিল, বাকী টাকা সংগ্রহ করিয়া দিল। এইরূপে ২।৩ মাসের মধ্যে পত্তনী মহালের সমুদয় বকেয়া টাকা আদায় হইল। তদবধি সকলে রামলোচনকে বাঘের ন্যায় ভয় করিয়া চলিত।

এইরূপ বুদ্ধি কৌশল ও কার্য্যতৎপরতা গুণে রামলোচন, ধনাগারে লক্ষাধিক মুদ্রা সঞ্চিত করিয়া ব্যয় সঙ্কোচের প্রতি মনোযোগী হইলেন। তাহেরপুরের রাজার জমিদারীতে পূর্ব্বে ৮০।৯০ হাজার টাকা আয় ছিল। রামলোচন নূতন বন্দোবস্ত দ্বারা লক্ষাধিক টাকা আয় করেন। অপব্যয় ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের চুরি বন্ধ না করিতে পারিলে এ আয়ে কিছুতেই রাজকীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে না, এই সকল চিন্তা করিয়া তিনি এই হুকুম প্রচার করিলেন যে "আমার বিনা মঞ্জুরীতে অতঃপর আর কোনরূপ ব্যয় হইবেনা। প্রত্যহ আদি খরচের তালিকা পরিদর্শন করিয়া মঞ্জুর করিলে তদনুসারে কার্য্য হইবে। এই আদেশ প্রচারিত হইলে, কর্ম্মচারিরা বড়ই প্রমাদ গণিল। সুচতুর দেওয়ানের চক্ষে ধূলি দিয়া আর লুণ্ঠন ক্রিয়া চলিবে না। রাজসভায় নিকট তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। শীঘ্রই তাহাদের সে সুযোগ ঘটিল। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ রামলোচনের সে ঘটনায় হিত বই অহিত হইল না। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত আমরা তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

নূতন আদেশ প্রচার হইলে এক দিবস ভাণ্ডারের দারোগা রাজমাতার দৈনিক খোরাকীর সহী করিবার নিমিত্ত দেওয়ানের নিকটে আসিয়া উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন রাজমাতার পাকে মোট ৪ জন লোক আহার করে, কিন্তু ঐ ফর্দ্দে যে পরিমাণ দ্রব্যের জায় লিখিত ছিল তাহা অন্যূন ৩০জন লোকের খাদ্যের উপযোগী। একাল পর্য্যন্ত ঐ ফর্দ্দ মোতাবেক কার্য্য হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি কহিলেন আমি জানিতে চাহি "রাজার মাতা মানুষী না রাক্ষসী?' আমি এ অসঙ্গত ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারি না; বলিয়া ফর্দ্দখানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন; এবং নিজে ৫ জন লোকের উপযোগী খাদ্য দ্রব্যের এক তালিকা প্রস্তুত করতঃ তাহাতে সহী করিয়া তদনুসারে রাজমাতার খোরাকী দিতে অনুমতি দিলেন। পূর্ব্ব তালিকার জিনিসের যে বরাদ্ধ ছিল তাহার মূল্য অন্যূন দশ টাকা। তিনি সেই স্থলে ৩ টাকা করিয়া দিলেন।

ক্রমশঃ—

বিষমসংসার।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(দুইটি চিত্র—দেব অসুর)

১। ভীষণচাঁদ।

"Men who are oppressed do not look back as they know only too well that an evil destiny is following them"

Victor Hugo

ভাদ্র মাস। গঙ্গার জল কাণায় কাণায় হইয়াছে। পূর্ণিমা তিথি। দিবাকর পশ্চিম সাগরে ডুবিতে না ডুবিতেই পূর্ব্ব আকাশে অমনি রূপার থালার ন্যায় নিশানাথ উদিত হইলেন। নির্ম্মেঘ নীলাকাশে দুটি একটি করে তারা দেখা দিতে লাগিল। ছেলে ছোকরা, বাবু ভায়ারা, সাঁজের বেলায় গঙ্গার ধার দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মনের সুখে কত কি গল্প করিতে লাগিলেন। কেহ রাজা বাদ্‌সা মারিতে সুরু করিলেন, কেহ দেশউদ্ধারের পালা যুড়ে দিলেন, কেহ বা বাগ্‌যুদ্ধের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে, ক্ষুদ্র বরাহনগর গ্রামে অকস্মাৎ হুলুস্থুল পড়ে গেল। সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে একদিকে ছুটিতে লাগিল। কারণ কি? কেহই জানে না, কেহই কিছু ঠিক বল্‌তে পারে না। সকলেই কেবল ছোটে, এবং ছুটিতে ছুটিতে বাজারের দিকে যায়, এবং সেখানে এক দঙ্গল বাঁধে। সেখানেও কিছুই দেখ তে পায়না। পরে একজনের মুখে এক কথা শুনে, সেই কথায় আবার রং চড়াইয়া আর এক জনকে বলে, এবং তিল্‌কে তাল করে। এই রূপে ঘণ্টাখানেক কাল হুলস্থুল পড়ার পরে, এক এক করে যার যার কাজে সেই সেই চলিয়া গেল। গ্রামের ক্ষণস্থায়ী গোলমাল মিটিয়া গেল। আবার তথায় শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

এই ক্ষণস্থায়ী শান্তিভঙ্গের মূলকারণ একটি বিরাট পুরুষ। তাহার নাম ভীষণচাঁদ। তাহার আকৃতি দেখিলেই হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয় বটে। তাহার চেহারা অতি বদ্‌খৎ, সর্ব্বাঙ্গ কশাঘাতের চিহ্নে পরিপূর্ণ। হাতে ও পায়ে লৌহবলয়ের চিহ্ন পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তাহার মুখ ও রং ঠিক কাফ্রিদের ন্যায়। কিন্তু সে জাতিতে কাফ্রি নহে, হিন্দু, কায়স্থ। তাহার বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে। শরীর বলিষ্ঠ। চোখ দুটি জবা ফুলের ন্যায় লাল। দেখিলেই বোধ হয় যেন সে গাঁজায় চুর হইয়া আছে। মনুষ্যমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র যেমন কটমট করিয়া মানুষের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করে, সেও সেইরূপ এক এক বার মানুষের দিকে তাকাইয়া হৃদয়ের তীব্রভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র গ্রামবাসী

মাত্রেরই হৃদয়ে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল; সকলেই ভাবিয়াছিল এ ব্যক্তি ডাকাইতের সর্দ্দার এবং গ্রামে বুঝি ডাকাইত পড়ে। যখন সে ব্যক্তি বলিল সে ডাকাইতের সর্দ্দার নহে, ডাকাইতি করিতেও আইসে নাই, সে কালাপাণি পারে বন্দীভাবে ছিল, এবং এখন খালাস পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন সকলেই সমাশ্বস্ত হইয়া যার যার কাজে চলিয়া গেল, এবং গ্রামের হুলস্থূলও থামিল। কিন্তু সে যখন আবার বলিল, সে সারাদিন কিছুই আহার করে নাই, তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ও কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, আর সারাদিন চলিয়া বেড়াইয় সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে রাতটুকু কাটাইবার জন্য একটু থাকিবার জায়গা এবং যৎকিঞ্চিৎ আহারের প্রার্থী, তখন কেহই আর তাহার দিকে ফিরেও তাকাইল না।

ভীষণচাঁদ পথশ্রান্তিতে একান্ত কাতর ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত অধীর হইয়া সদর রাস্তা দিয়া বরাবর চলিতে লাগিল। সে পেছন ফিরে একবারও তাকাইতে লাগিল না; সে জানিত যে দুরদৃষ্ট ব্যতীত আর কিছুই হতভাগ্য ব্যক্তিদিগের অনুসরণ করে না। কিয়দ্দূর গমন করিলে আর তাহার পা চলিল না। সে পথিমধ্যে বসিয়া পড়িল; এবং ক্ষণকাল পরে নিজের বোচকাটি মাথায় দিয়া শুইয়া রহিল। এমন সময়ে সেই পথ দিয়া একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যাইতেছিল। সে একটী গৃহস্থের বাটীর চাকরাণী। পথিমধ্যে একটী লোককে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সেই স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা! তুমি এমন সময়ে এখানে পড়িয়া কি ক'চ্ছ"? ভীষণ চাঁদ কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমার কপালে কি চোখ নাই, তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আমি ঘুমুচ্ছি।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "বাছা! একি ঘুমনের জায়গা, এখনই যে গাড়ী চাপা পড়িয়া মরিবে।"

ভীষণচাঁদ কিঞ্চিৎ নরমভাবে কহিল, "তবে আর যাই কোথা? আমার সঙ্গে পয়সা কড়ি নাই। আমায় কেহই জায়গা দিলে না।"

স্ত্রীলোক। "তুমি কি এ রাস্তার সব বাড়ীতেই ঢু মেরেছিলে।"

ভীষণচাঁদ। "হাঁ এ রাস্তার দুধারে সব বাড়ীতেই ঢু মেরেছিলাম। কেহই ঢুকতে দিলে না; বাড়ীর চাকর ব্যাটারা লাঠি নিয়ে আমায় মারতে এল। তারা মনে কল্লে আমি বুঝি হয় বাঘ, না হয় সাপ।

স্ত্রীলোক। "আচ্ছা বাছা! তুমি আর একটু এগিয়ে যাও। ঐ যে গঙ্গার ধারে দেবালয় দেখা-যাইতেছে, তুমি ঐখানে যাও। ওখানথেকে কেহ তোমাকে হাঁকাইবে না।"

ভীষণচাঁদ আর বাক্যব্যয় না করিয়া নিজের বোচ্‌কা ঘাড়ে করিয়া উঠিল, এবং দেবালয়ের দিকে দ্রুতপদে গমন করিল।

২। সচ্চিদানন্দ স্বামী।

"অদৃষ্ট-চক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি,
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন;
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে আহা, বলে কোনজন?"

পলাশির যুদ্ধ।

"Wealth, and the high estate of pride,
With what untimely speed they glide,
How soon depart!
Bid not the shadowy phantoms stay;
The vassals of a mistress they,
Of fickle heart.
These gifts in Fortune's hands are found
Her swift revolving wheel turns round,
And they are done!
No rest the inconstant goddess knows,
But changing, and without repose,
Still hurries on."

Longfellow.

বরাহনগরে গঙ্গাতীরে বাসুদেবের একটি সুন্দর মন্দির আছে। সচ্চিদানন্দস্বামী এই দেবালয়ের স্থাপয়িতা। তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে পুষ্পাদি চয়ন করিয়া স্বয়ংই বাসুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। অনন্তর স্বহস্তে রন্ধনাদি করিরা বাসুদেবের ভোগ দিয়া থাকেন। তাঁহার বয়স প্রায় অশীতি বৎসর হইবে; কিন্তু শরীর এখনও সবল ও সুস্থ আছে। তাঁহার নাকে তিলক, কণ্ঠে তুলসির মালা, গায়ে নামাবলী, হাতে হরিনামের মালা। তাঁহার প্রশান্ত কমনীয় মূর্ত্তি দেখিলেই হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়। মুখখানি যেন বিকসিত কমল। ঠোঁঠ দুখানিতে যেন হাসি মাখা রহিয়াছে। তাঁহার একটি মাত্র পরিচারক। সেই পরিচারকের বয়স তাঁহার অপেক্ষা চারি পাঁচ বৎসর মাত্র কম হইবে। সচ্চিদানন্দস্বামী সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত দেবার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকেন; অপরাহ্ন হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত অশেষ প্রকারে বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিয়া বেড়ান। রোগীর রুগ্ন শয্যায় এবং মৃতকল্প ব্যক্তির আসন্ন সময়ে তিনি উপস্থিত থাকিবেনই থাকিবেন। ঔষধ, পথ্য, সুশ্রূষাদি দ্বারা রোগের উপশম করাই তাঁহার প্রথম কার্য্য। আসন্ন কালের দারুণ যন্ত্রণা প্রশমিত করা এবং কষ্টকর মৃত্যুকে সুখকর জ্ঞান করান তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য। মাতৃপিতৃহীন শিশুসন্তানের তিনিই মাতা পিতা। পতিবিয়োগবিধুরা যুবতীর তিনিই আশ্রয় ও সৎযুক্তি দাতা।

সচ্চিদানন্দস্বামী বিষ্ণু উপাসক। বিষ্ণু পালন কর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা; সুতরাং সচ্চিদানন্দস্বামী পরোপকারব্রতে দীক্ষিত। এ ধর্ম্মে, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিতে হয়। অপকারের প্রতিশোধ উপকার এই ধর্ম্মের মহামন্ত্র। ক্ষমা, তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ আশ্রয় না করিলে এ ধর্ম্ম যাজনা করা যায় না। কেহ আমার অনিষ্ট করিল, তাহাতে রাগ করিলে এ ধর্ম্ম যাজনা করা চলিবে না। যে অনিষ্ট করে, তাহার সুশিক্ষা হয় নাই, এই মনে করিয়া, যাহাতে সে ঐ কুপথ পরিত্যাগ করে তাহার মত তাহাকে শিক্ষা দান করিলে এ ধর্ম্ম যাজনা করা হয়। এই ধর্ম্মভাব শৈশব কাল হইতেই সচ্চিদানন্দের হৃদয়ে নিহিত থাকে; কাল সহকারে উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার এই পরিণত অবস্থায় একেবারে পূর্ণবিকাশভাব প্রাপ্ত হয়।

সচ্চিদানন্দ এখন উদাসীন বটে। কিন্তু তিনি এক সময়ে সংসারী ছিলেন; এবং সংসারের সুখ দুঃখ পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করিয়াছিলেন। তিনি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান; সুতরাং শৈশবে দারিদ্র্য দুঃখও বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। অতি কিশোর বয়সেই তিনি মাতৃ পিতৃহীন হন; সুতরাং তিনি কুড়ান ছেলের ন্যায় পরান্নে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। আশৈশব পরান্নে প্রতিপালিত হইলে সাধারণতঃ স্বাভাবিকী স্বাধীনবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে নিস্তেজ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সচ্চিদানন্দের সেই বৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছিল তিনি কিঞ্চিৎ সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া একটি সামান্য চাকরিতে নিযুক্ত হন। তিনি নিকশ কুলীন, বংশ মর্য্যাদায় অতি প্রধান; এজন্য বর্দ্ধমান জিলার একটি প্রধান জমীদার তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক লইয়া গিয়া স্বীয় একমাত্র

তনয়ার সঙ্গে তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সেই জমীদারের তখন পুত্র সন্তান ছিল না; সুতরাং জামাতাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ ও পালন করিতে লাগিলেন, এবং আপনার জমীদারীর সমস্ত ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিলেন। জমীদার দুহিতাও অতি সুশীলা ও বিশুদ্ধস্বভাবা ছিলেন। তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে নিরতিশয় পবিত্র প্রণয় জন্মিয়াছিল। এ নব দম্পতী বিবাহের পরদিন হইতেই একেবারে সুখের সাগরে গা ঢালিয়া দিলেন; এবং অশেষ প্রকারে ভোগ সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমান্বয়ে চৌদ্দ বৎসর এইরূপ মহাসুখে তাঁহাদের সময় যাইতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান তাঁহাদের পরিণয় বন্ধন দৃঢ় করিল। কিন্তু চিরদিন এক সমান কাহারও কিছুতেই যায় না। দুঃখান্তে সুখভোগ, সুখান্তে দুঃখভোগ সংসারে অপরিহার্য্য। চৌদ্দ বৎসর তাঁহাদের জীবনস্রোত প্রশান্তভাবে বহিয়া গেল। চৌদ্দ বৎসর অন্তে সেই স্রোতে তরঙ্গ উঠিল; জীবনগতি অন্যরূপ হইল। শ্বশুর জামায়ে মনান্তর ঘটিল, পিতা কন্যায় অকৌশল হইল। কারণ অতি তুচ্ছ, কারণ অতি সামান্য। মানুষের মনের গতি বুঝা ভার। চপলা চমকবৎ এখন এ দিকে, অন্য সময়ে আর এক দিকে। এ গতিরোধ করে কার সাধ্য?

কি কারণে কোন সময়ে যে কিরূপ ঘটে তাহা বলে কার সাধ্য? এক সময়ে একটি সামান্য কথায় রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে, মারামারি, কাটাকাটি হয়, নগর উপনগর জ্বলিয়া যায়। আবার আর এক সময়ে আর একটি কথায় শান্তি সংস্থাপিত হয়, যুদ্ধ বিগ্রহ থামিয়া যায়, জনশূন্য দেশ লোকারণ্য হইয়া পড়ে। এক সময়ে অনল রাশিও জ্বলিয়া উঠে না, অন্য সময়ে আবার অগ্নি স্ফুলিঙ্গমাত্র একেবারে সব ছারখার করিয়া ফেলে। অতি তুচ্ছ কারণে জমীদারের হৃদয়ে অনল জ্বলিয়া উঠিল; সেই অনলে তিনি স্বহস্তে জামাতা কন্যাকে আহুতি দিলেন।

সচ্চিদানন্দ নিজ পোষ্যবর্গ লইয়া শ্বশুর বাটী পরিত্যাগ করিলেন। সে গ্রাম ছাড়িলেন, সে দেশ ছাড়িলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পুত্র কন্যা সঙ্গে লইয়া তাঁহায় অনুসরণ করিলেন। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে সচ্চিদানন্দের অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন তাঁহার অবস্থা তাহার অপেক্ষাও শোচনীয় হইল। তখন তিনি একাকী, পরান্নভোজী ও পরাবশথশায়ী ছিলেন। এখন তিনি একাকী নন। এখন তাঁহাকে পরের বাড়ী থাকিলে চলিবে না। এখন তিনি পরের অন্ন খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। এখন তাঁহার থাকিবার স্থান চাই। এখন তাঁহার পোষ্যবর্গকে রাখিবার স্থান চাই। এবং এখন তাঁহার প্রতিদিন পয়সা চাই। প্রয়োজন উপায় উদ্ভাবনের প্রসূতি। সচ্চিদানন্দ স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, এবং চতুর্দ্দশ বৎসর বিষয় কর্ম্ম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নৈরাশ্য সাগরে নিমগ্ন হইয়াও একেবারে হা'ল ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন;—

"তুফানে পড়েছি কিন্তু ছাড়িব না হা'ল,
আজিকে বিফল হ'ল, হ'তে পারে কা'ল।"

সচ্চিদানন্দ এই চতুর্দ্দশ বৎসর বিস্তর লোকের উপকার করিয়াছিলেন; এই চতুর্দ্দশ বৎসরে বিস্তর লোকের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল; কিন্তু তিনি এখন দেখিতে লাগিলেন যে, সে সকল লোকের এক জনও

আর তাঁহার দিকে ঘেঁসে না। তাহাদের অনেকে আবার এখন তাঁহাকে চিনিতেও পারে না। আর তাঁহার নিকট যে সকল লোকের মাথা বিক্রি হইয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে গালী দিয়া বেড়ায়। সচ্চিদানন্দ লোকের এরূপ আচরণ দর্শনে ক্ষুভিত হইলেন না। ইহাতে তাঁহার নৈরাশ্য বাড়িল না। ইহাতে তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় আরও বাড়িল। তিনি এখন সংসার চিনিলেন; কিন্তু ইহাকে সংসারের প্রকৃত অবস্থা মনে না করিয়া উহার বিকৃত অবস্থা জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পথে পথে কাটাইয়া অবশেষে একটি লোকের বাটীতে আশ্রয় লইলেন, এবং বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হইবার বাসনায় একটি কারবারে নিযুক্ত হইলেন।

সঙ্গিনীর অঙ্গাভরণ গুলিই তাঁহার এই কারবারের মূলধন হইল। জীবনে সচরাচর সুসময় ও দুঃসময় ঘটিয়া থাকে। সুসময়ে যাহা করা যায় তাহাই সুফলদায়ী হয়, আর দুঃসময়ে যাহা করা যায় তাহাই কুফলদায়ী হয়। সুসময় কতকাল স্থায়ী, আর দুঃসময়ই বা কতকাল স্থায়ী তাহারও কোনও ঠিকানা নাই। তবে সংসারে এই মাত্র দেখা যায় যে, একবার দুঃসময় আসিলে উহা আর শীঘ্র যাইতে চায় না। সচ্চিদানন্দের এখন দুঃসময় পড়িয়াছে। এখন তিনি যাহা করিবেন তাহাই মন্দ হইবে; এখন তাঁহার উপস্থিত অন্নে ছাই পড়িবে, এখন তাঁহার নৌকা ভরাডুবী হইবে, এখন তাঁহার নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক রটিবে। তাঁহার কারবারের প্রথম উদ্যমে তিনি বিফলমনোরথ হইলেন। কিন্তু তাঁহার আশা ভঙ্গ হইল না; তাঁহার উদ্যম শিথিল হইল না। আহা! সংসারে আশা না থাকিলে যে, দুঃখী মানবের অবস্থা কি হইত তাহা বলা যায় না। তিনি আশামাত্র অবলম্বন সম্বল করিয়া বিদেশে যাত্রা করিলেন। এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীও আশামাত্র অবলম্বন করিয়া সেই গৃহস্থের বাটীতে থাকিয়াই অতি কষ্টে পুত্র ও কন্যাটীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাদের লালন পালন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে দিন যাইতে লাগিল। সুদিন হউক আর কুদিন হউক, কোনও দিনই কাহারও জন্যে থাকে না। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর অতীত হইল। স্বামীর কোনও সংবাদ নাই। এমন সময়ে একদিন ডাকে একখানি চিঠি আসিল। চিঠিখানি সচ্চিদানন্দের স্বহস্তে লিখিত। তিনি চিঠিখানি পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। ব্যস্তসমস্ত হইয়া চিঠি খুলিলেন। চিঠিখানি সুসমাচার আনিয়াছে। সচ্চিদানন্দ দিন পাইয়াছেন। তিনি এবার কারবারে সফলমনোরথ হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণপতি বিপুল অর্থ লাভ করিয়াছেন, এবং আগামী কল্য তিনি বাটী আসিতেছেন। তাঁহার পত্নীর চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। রাত্রি প্রভাতে তিনি স্বামী পাইবেন; রাত্রি প্রভাতে আবার তাঁহার সকল ক্লেশের অবসান হইবে। কিন্তু সে রাত্রি প্রভাতে যে আবার তাঁহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে তাহা তিনি তখন কিছুই জানিতে পারিলেন না। পুত্র কন্যা কোলে করিয়া তিনি শয়ন করিলেন, বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার ঘুম হইল না। সন্তান দুটি মায়ের কোলে ঘুমাইতে লাগিল। নিশাবসানের ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে সচ্চিদানন্দের সহধর্ম্মিণীর একটু ক্ষণস্থায়ী তন্দ্রা হইল। তন্দ্রাভিভূত হইয়া তিনি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মন চঞ্চল হইল। তাঁহার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, কে যেন তাঁহার সন্তান দুইটির গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিল। জননী

সন্তানস্নেহে উন্মাদিনী। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আলোক জ্বালিলেন এবং সন্তান দুইটির মুখের দিকে অনিমিষ লোচনে তাকাইলেন। তাহাদের মুখকমল প্রফুল্ল। তাহারা গভীর নিদ্রায় অভিভূত। জননীর মন সচ্ছন্দ হইল। তিনি আর শয়ন করিলেন না। তাঁহার গৃহে আলোকটী জ্বলিতে লাগিল। তিনি বসিয়া রহিলেন। কত কি ভাবিতে লাগিলেন, এবং সময়ে সময়ে এক এক বার চকিত হইতে লাগিলেন।

নিশাবসান প্রায়। পূর্ব্বদিক ধূসর বর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এমন সময়ে অকস্মাৎ কড়িকাঠ থেকে দড়ি গাছির মত কি একগাছ খসিয়া পড়িল; তাঁহার পুত্র ও কন্যা উভয়ের গায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ছেলেটি ও মেয়েটি একবারমাত্র চেঁচিয়ে উঠিল, আর কথা কহিল না, আর চোখ মেলিল না। তাহাদের অকস্মাৎ সর্পাঘাত ঘটিল! বিষধরের বিষের জ্বালায় তাহাদের প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল! জননী স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া বাক্ সরিল না। তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িল না। তিনি মৃত সন্তান দুইটি বক্ষে করিয়া নাচিতে লাগিলেন। এবার তিনি উন্মাদিনী হইলেন।

এ দিকে রাত্রি প্রভাত হইল। পূর্ব্বদিক লাল রংএ রঞ্জিত করিয়া দিনমণি আকাশে সমুদিত হইলেন। সচ্চিদানন্দের পত্নীর কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইল। তিনি মৃত সন্তান দুইটিকে শয্যায় শয়ন করাইয়া কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিলেন; এবং এক এক বার গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে লাগিলেন, আবার গৃহের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে একপ্রকার তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। এমন সময়ে বোধ হইল কে যেন বাড়ী ঢুকিতেছে। সচ্চিদানন্দপত্নী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সদর দরজার দিকে গেলেন। তিনি বাঙ্গালীর মেয়ে। তিনি কুলবধূ। কিন্তু মনের এ প্রকার অবস্থায় এখন আর তাঁহার লজ্জাসরম কিছুই নাই। তিনি যেন একেবারে আত্মবিস্মৃতা। তাঁহার মুখে ঘোমটা নাই। তাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত হইয়া কতক মুখের উপর পড়িয়াছে, কতক বা পেছনদিকে ঝুলিতেছে। তিনি লোকের সাড়া পাইয়া সেই দিকে ছুটিলেন। দেখিলেন, তাঁহার প্রাণপতি হাস্যবিকসিত মুখে বাড়ী ঢুকিতেছেন। প্রিয়তমের মুখে হাসি দেখিয়া তাঁহারও মুখে মধুর হাসি প্রকাশ পাইল। তিনি এ ভাবে স্বামীসমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তদীয় করযুগল ধারণ করিলেন; এবং কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিলেন, "নাথ। আমি একটি বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। তুমি বাড়ী ছিলে না, আমি ইহার কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া তোমারই আগমন প্রতীক্ষায় ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিলাম।"

সচ্চিদানন্দ। "প্রিয়ে! বল বল, ব্যাপারখানা কি? তোমাকে এত অস্থির দেখাচ্ছে কেন?"

স্ত্রী। "নাথ! তুমি কাছে না থাকায় আমি অস্থির হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া সুস্থির হইয়াছি। তুমি বল দেখি এখন আমি কি করি। আমি যে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

সচ্চিদানন্দ। "কেন, কি হয়েছে? তুমি কোন্ বিষয়ের কি ঠিক করিতে পারিতেছ না।"

স্ত্রী। "বিষয় অতি সামান্য অথচ অতি গুরুতর। এক ব্যক্তি আজ কয়েক বৎসর হইল আমার নিকট দুইটি মহামূল্য রত্ন গচ্ছিত রাখেন। রাখিবার সময়ে বলেন, 'তুমি অতি সাবধানে ও যত্নে এই রত্ন দুইটি রাখিবে। কিন্তু এ দুটি রত্ন তোমার নিজের মনে করিও না। তুমি ইহার রক্ষকমাত্র। আমার প্রয়োজন হইলে আমি চাহিব, তখন তুমি আমায় ফিরাইয়া দিবে।"

সচ্চিদানন্দ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, "তার পর তার পর।"

স্ত্রী। "তিনি আজ সেই রত্ন দুইটি ফেরত চাহিতেছেন। কিন্তু রত্ন দুইটির উপর আমার বড় নজর পড়িয়াছে, ফিরাইয়া দিতে আমার মন সরিতেছে না।"

সচ্চিদানন্দ সাবেগে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! তিনি যখন চাহিতেছেন তখন তাঁহার রত্ন তাঁহাকেই দাও।"

স্ত্রী। "আচ্ছা নাথ! তাঁহার রত্ন তাঁহাকেই দিলাম।" অতি মৃদুস্বরে এই কথা বলিতে না বলিতে, সচ্চিদানন্দপত্নী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন; এবং তাঁহার আত্মা শান্তি নিকেতনে চলিয়া গেল।

সচ্চিদানন্দ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার বাক্‌রোধ ঘটিল। তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অনিমেষ লোচনে মৃত পত্নীরদিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি যে গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা সচ্চিদানন্দের এরূপ আকস্মিক বিপদ্‌পাত দেখিয়া নিকটে আসিয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

যখন এ দুর্ঘটনা ঘটিল, তখন সচ্চিদানন্দের বয়স ৩০ বৎসরের অধিক ছিল না। জীবন পরীক্ষার স্থল। সচ্চিদানন্দের অগ্নিপরীক্ষা হইতে লাগিল। এরূপ পরীক্ষায় দুর্ব্বল ছারখার হইয়া যায় এরূপ পরীক্ষায় সবল অভ্যুন্নত হইয়া উঠে।

সচ্চিদানন্দ ক্ষণকাল নীরবে ও অধোবদনে থাকিলেন; একটি হৃদ্‌বিদারক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; "ভগবন! তোমারই ইচ্ছা," মুখে এই কথাটি বলিলেন; এবং অচিরে মৃত পত্নী, পুত্র ও কন্যার শেষ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর কতিপয় বৎসর যাবতীয় তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে গঙ্গাতীরে দেবমন্দির স্থাপন করিলেন; এবং তথায় এক প্রস্তরময় বাসুদেব মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। মানুষের হিংসায়, মানুষের রোষে তাঁহার জীবন গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি মানুষকে দোষ দিলেন না; মানুষের শিক্ষাকে দোষ দিলেন। অনন্তর যেরূপ শিক্ষা পাইলে মানুষ অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া সৎ পথের পথিক হইতে পারে, সাধ্যমত তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সচ্চিদানন্দ জীবনে অশেষ প্রকারে ক্লেশ পাইয়াছেন। সংসারে জীবগণ অহরহঃ অশেষ প্রকারে যাতনা ভোগ করিতেছে। সুতরাং সচ্চিদানন্দস্বামী যতদূর সাধ্য জীবের জীবনের যাতনাবিমোচন করিবার জন্য স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন। শ্রীসূর্য্যকুমার অধিকারী।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

পণ্ডিত কালিদাস সার্ব্বভৌমের ঔরসে ও গুণবতী মাহেশ্বরী দেবীর গর্ভে বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাল্‌না গ্রামে ১৮১২ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তারানাথ মাতামহাশ্রয়ে প্রতিপালিত

হন, সার্ব্বভৌম মহাশয় আবার বিবাহ করেন। পঞ্চমবর্ষীয় তারানাথ বিদ্যাশিক্ষার্থ পিতা কর্ত্তৃক কালনায় আনীত হন। খোঁড়া কৃষ্ণমোহন নাম ধেয় জনৈক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তারানাথের বাল্যশিক্ষা সমাপিত হয়। এই সময়ে প্রতিভাশালী তারানাথের বাল্য আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকে বলিতেন, উত্তর কালে এই বালকের পাণ্ডিত্যের সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হইবে। বাস্তবিক তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল। শুভঙ্করী অঙ্ক শাস্ত্রে তারানাথ অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ধূলদস্তী তারানাথকে কেহ অঙ্কে পরাভব করিতে পারিতেন না।

অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তারানাথ পিতার নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তারানাথ পিতার ও তাঁহার জেষ্ঠতাতপুত্র বর্দ্ধমানের জজ পণ্ডিত ও সদর আমিন পণ্ডিত তারিণী প্রসাদ ন্যায়রত্নের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অমরকোষ, ভট্টিকাব্য, কুমারসম্ভব ও শিশুপালবধ কাব্য অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। এই সময়ে স্বর্গীয় রামকমল সেন মহাশয় কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা হইতে কাল্‌নায় সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তিনি তারানাথ ও তাঁহার জেষ্ঠতাতপুত্র তারাকান্তের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অধ্যয়নার্থ উভয়কে কলিকাতায় আনয়ন করেন। প্রথমতঃ সার্ব্বভৌম মহাশয় বালকদ্বয়কে কলিকাতায় প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাহার কারণ, তৎকালে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, কলিকাতায় বালকগণকে পাঠাইলে তাহারা হয় নাস্তিক নয় খৃষ্টান হইয়া যাইবে। এই ভাবে অনেকে তৎকালে কলিকাতায় অধ্যয়নার্থ বালকগণকে পাঠাইতেন না। এই জন্য সার্ব্বভৌম মহাশয় সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে ধার্ম্মিক রামকমল বাবুর আগ্রহাতিশয় সন্দর্শন করিয়া আর তাঁহার কথায় দ্বিরুক্তি করিলেন না। বাবু রামকমল সেন মহাশয় তৎকালে কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ১৮৩০ খৃঃ অব্দের ১০ই মে তারিখে তারানাথকে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশ্রেণীতে প্রবিষ্ট করিয়া দেন, এই সময়ে তারানাথের বয়স অষ্টাদশ বর্ষের কিঞ্চিত অধিক।

তারানাথ অলঙ্কারশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন বটে, কিন্তু অলঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তারানাথ মুহূর্ত্ত কালও বৃথায় অতিবাহিত করিতেন না। অলঙ্কারশ্রেণীতে অবধারিত সময় অধ্যয়ন করিয়া অবশিষ্ট কাল প্রতিদিন কাব্য ও বেদান্তের শ্রেণীতে গিয়া এই শ্রেণীর পাঠ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে মুদ্রিত পুস্তকের অভাব নিবন্ধন সংস্কৃতপাঠার্থী ছাত্রগণকে স্বহস্তে গ্রন্থ লিখিয়া লইতে হইত। তারানাথ স্বহস্তে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, পাতঞ্জল, মীমাংসা, উপনিষদ, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন। দিবসে অধ্যয়ন হেতু সময় পাইতেন না, এই জন্য সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া গ্রন্থ নকল করিতেন। এইরূপ কঠোর পরিশ্রমে তারানাথ কয়েক মাস মধ্যে সমস্ত সংস্কৃত কাব্য নাটক প্রভৃতি আয়ত্ত করেন। অলঙ্কারশ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে তারানাথ লীলাবতী ও বীজগণিতের অঙ্ক শিক্ষা করেন। তৎকালে সংস্কৃত কলেজে, পণ্ডিত জয় গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় কাব্য, অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্র মহাশয় জ্যোতিষশাস্ত্র, পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রী মহাশয় বেদান্ত, ও পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয় ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। ইঁহারা সকলেই তারানাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সন্দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। বেদান্তের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী মহাশয় এই জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "যত্র যত্র মৎসন্দেহো বিদ্যতে তত্রৈব তারা পৃচ্ছতি, তারা অগ্রে ধাবতি"। তারানাথ ১৮৩১ খৃঃ অব্দের ৯ই মে তারিখে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ ন্যায়ের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন এবং প্রায় চারি বৎসরের মধ্যে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধিগত করেন। দর্শনশাস্ত্রের বিচারে তৎকালে তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। মহাভারত তারানাথের যাবজ্জীবন আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ ছিল। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে যে মহাভারত গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়, তিনি তাহার আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দেন। প্রুফ দেখিতে গিয়া তাঁহার সমগ্র গ্রন্থ কণ্ঠস্থ হইয়া পড়ে। তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্মৃতি, বেদান্ত, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল ও উপনিষৎ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নকালে অলঙ্কার শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। কলেজের অধ্যক্ষ সাহেব তারানাথকে ঐ পদ প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি ছাত্রজীবনেই একজন অসাধারণ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হন। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অতিশয় ভাল বাসিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিদিন বৈকালে কলেজের ছুটির পর তাঁহার ঠনঠনিয়াস্থ বাসভবনে গমন করিয়া তাঁহার নিকট অলঙ্কার অধ্যয়ন করিয়া আসিতেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে তারানাথ ল-কমিটী ও মুন্‌সেফী পরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের ১৫ জানুয়ারি তারিখে তারানাথ কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং তৎকালে শিক্ষাসমিতির সদস্যগণ তাঁহাকে "তর্কবাচস্পতি" এই মহাসম্মানসূচক উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

স্বাধীনচেতা বাচস্পতি মহাশয় খবৃত্তিকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র বর্দ্ধমানের জজপণ্ডিত ও সদর আমিন পণ্ডিত তারিণীপ্রসাদ ন্যায়রত্ন পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জেলায় জজ পণ্ডিতের পদ উঠাইয়া দিয়া কেবল সদর আমিনী পদ রাখেন। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে বাচস্পতি মহাশয়কে এই পদ প্রদান করিবার জন্য নিয়োগপত্র আইসে। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে তাঁহার কোন এক আত্মীয়া স্ত্রীলোক তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য খাদ্যদ্রব্যের সহিত বিষ প্রয়োগ করেন। ইহার কারণ বোধ হয় ঈর্ষ্যা। কুলপ্রদীপ তারানাথ স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, পরশ্রীকাতরা রমণীর তাহা সহ্য হইল না। এই জন্য বিষ প্রয়োগে তাঁহার জীবননাশের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাহার পাপ বাসনা পূর্ণ হয় নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় বাচস্পতি মহাশয় সে যাত্রা রক্ষা পান। জনৈক বিশ্বস্তা বৃদ্ধা দাসী তাহার পৈশাচিক অভিসন্ধি অবগত হইয়া বাচস্পতি মহাশয়কে সতর্ক করিয়া দেন। সেই সময় হইতে তিনি স্বহস্তে নিরামিশ ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। তদবধি তিনি যাবজ্জীবন নিরামিষাশী ছিলেন।

আর একবার তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে বাটী যাইতে-

ছিলেন। সাতগেছে নামক গ্রামের সমীপবর্ত্তী হইলে ঐ নৌকাখানি জলমগ্ন হয়। তিনি অতি কষ্টে জয়ঘোষ নামক এক ভৃত্যের সহিত গঙ্গাতীরে উত্তীর্ণ হন এবং সে যাত্রাও রক্ষা পান।

কিয়দ্দিন পরে তিনি কাল্না হইতে কাশী গমন করেন। তত্রত্য হনুমানঘাটের জনৈক পরমহংসের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে অতীব জটিল শ্রীহর্ষকৃত "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" নামক গ্রন্থ এবং কাশীস্থ অন্যান্য পণ্ডিতগণের নিকট মহাভাষ্য সহিত পাণিনীয় ব্যাকরণ, সভাষ্য বেদ বেদান্ত, মীমাংসাদর্শন, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি গৃহাগত হইয়া বাটীতে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করতঃ নানাদিগ্দেশ হইতে আগত বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করিতে প্রবৃত্ত হন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বাচস্পতি মহাশয় একজন স্বাধীনচেতা মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি কোন কারণে কাহারও গলগ্রহ হইতে ইচ্ছা করিতেন না। তিনি বিদ্যাদানার্থে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন বটে,কিন্তু কাহারও নিকট দানগ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিতেন, অন্যের নিকট দান গ্রহণ বা কোন প্রকার সাহায্য লইয়া অধ্যাপকের ব্যবসায় অবলম্বন করা অপেক্ষা কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা ছাত্রগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। এইজন্য তিনি বস্ত্রের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে এদেশে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী হয় নাই। তিনি বিলাতী সূতা ক্রয় করিয়া তন্তুবায়গণকে দিতেন, তাহারা তাঁহার আদেশ মত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত। তিনি তাঁহার সমস্ত বস্ত্র বিক্রয়ার্থ চারিদিকে রপ্তানি করিতেন। ইহার দ্বারা তাঁহার প্রচুর ধনাগম হইত। তিনি তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে অসংখ্য ছাত্রের ভরণপোষণ করিয়া বিদ্যাদান করিতেন। অপর পক্ষে অম্বিকাকালনায় প্রায় দ্বাদশ শত তন্তুবায় এইরূপে তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইত।

সম্ভবতঃ ১৮৪০ খৃঃ অব্দে বাচস্পতি মহাশয় মেদিনীপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী রাধানগর গ্রামে বস্ত্র ব্যবসায়ের নিমিত্ত এক কুঠী নির্ম্মাণ করেন। তিনি প্রতি মাসে ৪।৫ সহস্র টাকার বিলাতী সূতা ক্রয় করিয়া তথায় প্রেরণ করিতেন। এই স্থানে তন্তুবায়গণ দ্বারা যে সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা তিনি কাশী, মীর্জাপুর, কাণপুর, গোয়ালিয়র, মথুরা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি দূরদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতেন। তৎকালে রেলগাড়ী অথবা ষ্টীমার ছিল না, তিনি গোযান এবং মুটের দ্বারা সর্ব্বত্র বস্ত্র প্রেরণ করিতেন। বস্ত্র ব্যবসায়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি যে কোন বস্ত্র দেখিয়া বলিতে পারিতেন, কত নম্বরের সূতার কত নথীতে সেই বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকে তাঁহার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। রাধানগরে অবস্থান কালে তত্রত্য অধ্যাপকেরা মনে করিতেন, ইনি এক জন বিদেশীয় বস্ত্রব্যবসায়ী মহাজন মাত্র। বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার বাৎসরিক মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে কয়েক বার তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা তাঁহার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হন।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে বাচস্পতি মহাশয় নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আময়ন করিয়া ব্যবসা করেন; তাহাতে তাঁহার প্রায় লক্ষাধিক টাকা লাভ হয়। এই সময়ে তিনি কাল্নায় এক বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি তণ্ডুল ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এইজন্য

তিনি গ্রামের মধ্যে বহুসংখ্যক ঢেঁকী বসাইয়া ধান্য ক্রয় করিয়া তণ্ডুল প্রস্তুত করাইতেন। এই ব্যবসায়ের দ্বারা তিনি বিপুল ধন সঞ্চয় করেন। প্রত্যুত বাচস্পতি মহাশয় যখন যে ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন,তাহাতেই বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন। কোনও ব্যবসায়ে কখনও তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

এইরূপ নানাপ্রকার বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন, এমন সময়ে ১৮৪৪ খৃঃ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা হইতে ২৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কাল্না গ্রামে বাচস্পতি মহাশয়ের বাটীতে পদব্রজে অকস্মাৎ উপনীত হইয়া দেখিলেন, বাচস্পতি মহাশয় বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,"সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হইয়াছে; ঐ পদে আপনাকে অধিষ্ঠিত হইতে হইবেক। অতএব আপনার প্রশংসাপত্রগুলি আমাকে প্রদান করুন এবং আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করুন"। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি নানাপ্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমার যথেষ্ট উপায় হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ এই সকল বিদ্যার্থীকে অন্নদিয়া অধ্যাপনা করিয়া থাকি। কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে আমার এ প্রকার কোনরূপ ব্যবসায় চলিবে না।" প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "এই স্থল অপেক্ষা কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে বৈষয়িক ও শাস্ত্রসম্বন্ধীয় ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত ভালরূপ চলিবে। যে সময়ে আপনি কালেজের অধ্যাপনা কার্য্যে আবদ্ধ থাকিবেন, ঐ সময়ে আপনার ব্যবসায়ের যাহা তত্ত্বাবধান করিতে হইবে, তাহা আমি নিজে অবসর লইয়া করিব।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয় সন্দর্শন করিয়া তিনি অগত্যা আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং তাহা লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইয়া মার্শেলসাহেব রিপোর্ট করায়, গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে বাচস্পতি মহাশয়কে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তিনি ১৮৪৫খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে কলিকাতায় আগমন করিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিলেন। ছাত্রগণ বাচস্পতি মহাশয়ের অধ্যাপনায় অতিশয় প্রীত হইতে লাগিল। এই সময়ে অনেক বিদেশীয় ছাত্র আসিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের বাসায় নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত।

বাচস্পতি মহাশয় ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে কিরাতার্জ্জুনীয় ও শিশুপালবধ এই দুই মহাকাব্য কাশী হইতে আনীত মল্লিনাথের টীকাসহ সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত করেন। এই গ্রন্থদ্বয় হইতে তাঁহার যাহা লাভ হইয়াছিল, তৎসমস্ত তিনি স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া জ্যোতিষাধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্র মহাশয়কে প্রদান করেন। তৎপরে তিনি কাশী হইতে আনীত মল্লিকনাথের টীকাসহ মাঘ-ভারবি কাব্যদ্বয় এবং লীলাবতী ও বীজগণিত মুদ্রিত করেন। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে বৈয়াকরণভূষণসার তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। তিনি ১৮৫১ খৃঃ অব্দে মল্লিনাথকৃত টীকাসহ রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব প্রকাশ এবং সরল সংস্কৃত ভাষায় শব্দার্থরত্ন নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই বৎসর সংস্কৃত বাক্য রচনা শিক্ষার্থ বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যমঞ্জরী নামক আর একখানি গ্রন্থ তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। বাচস্পতি মহাশয় ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে মহাবীরচরিত, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ধনঞ্জয়-

বিজয়ব্যায়োগের টীকা, ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ছন্দোমঞ্জরী, ১৮৬১ খৃঃ অব্দে সানুবাদ গয়া-মাহাত্ম্য ও গয়াশ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি মুদ্রিত এবং ১৮৬২ খৃঃ অব্দে পাণিনীয় সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণের সরলানাম্নী টীকা প্রস্তুত করেন। এই উপাদেয় গ্রন্থখানি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে বাচস্পতি মহাশয় রত্নাবলী নাটিকা এবং ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে সিদ্ধান্তবিন্দুসার ও ব্রহ্মস্তোত্রব্যাখ্যা নামক গ্রন্থদ্বয় মুদ্রিত করেন। উড়িষ্যার অন্তঃপাতী ঢেঙ্কানল প্রদেশের রাজা ঐ সময়ে কলিকাতায় আগমন করেন। এই বৈদান্তিক রাজা প্রতিদিন ত্রিশজন ছাত্রকে স্বয়ং বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন। ইঁহার অনুরোধেই বাচস্পতি মহাশয় প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। তিনি ১৮৬৬খৃঃ অব্দে তুলাদানাদিপদ্ধতি নামক একখানি গ্রন্থ রচনা এবং এই বৎসরেই কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্য্যন্ত ও সমগ্র বেণীসংহার নাটকের টীকা প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করেন। ১৮৬৭খ্রীঃ অব্দে আশুবোধ নামক এক নূতন সংস্কৃত ব্যাকরণ তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত ও মুদ্রিত হয়। বাচস্পতি মহাশয় ১৮৬৯খ্রীঃ অব্দ হইতে ৭০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত শব্দস্তোম মহানিধি নামক একখানি সংস্কৃত অভিধান পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেন। তিনি ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ধাতুরূপাদর্শ, ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে স্বরচিত টীকাসহ বৃত্তরত্নাকর, মুদ্রারাক্ষস নাটক, মালবিকাগ্নিমিত্র নাকট ও পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী সূত্র; ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে সটীক হিতোপদেশ, মুক্তাবলী টীকাসহ ভাষাপরিচ্ছেদ ও সটীক সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী এবং ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে সটীক ভামিনীবিলাস খণ্ডকাব্য, দণ্ডীকৃত দশকুমার চরিত ও বাণভট্ট বিরচিত সংস্কৃত কাদম্বরীর টীকা, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, কবিকল্পদ্রুম, পরিভাষেন্দুশেখর, বহুবিবাহবাদ ও গায়ত্রীব্যাখ্যা মুদ্রিত করেন।

বাচস্পতি মহাশয় প্রাগুক্ত পুস্তক সরল মুদ্রিত করিয়া সংস্কৃতানুরাগী বিদ্যার্থিগণের অধ্যয়নের পন্থা কতদূর সুগম করিয়া দিয়াছেন এবং পাঠার্থিগণ তজ্জন্য তাঁহার নিকট কতদূর উপকৃত, তাহা লেখনী বর্ণন করিতে অক্ষম। প্রত্যুত বাচস্পতি মহাশয় সংস্কৃতশাস্ত্রের কণ্টকাবৃত পথ পরিষ্কৃত করিয়া সুগম রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এখন যে কেহ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সেই পথের পথিক হইতে পারেন।

বাচস্পত্যভিধান তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। অষ্টাদশ বর্ষকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি এই সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন। চারি পেজী ফরমার ব্রং প্রাইমার অক্ষরে মুদ্রিত ৫৬০০ পৃষ্ঠায় এই অভিধান সমাপ্ত হইয়াছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, এবং ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রাঙ্কণ শেষ হয়। উহা মুদ্রিত করিতে ৮০,০০০ আশি হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। তৎসমস্ত তাঁহার কুলদীপক পুত্র পণ্ডিত জীবানন্দ বি, এ, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রদান করেন। গবর্ণমেণ্ট পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রায় দুই শত পুস্তক এবং বিজয় নগরের মহারাজা পঞ্চ সহস্র মুদ্রায় পঞ্চাশ খানি পুস্তক ক্রয় করেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব মধ্যে মধ্যে তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে "এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ সংস্কৃত লার্নিং" বলিতেন, তাহা বাস্তবিক অত্যুক্তি নহে। তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ বাচস্পত্যভিধান তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে কঠোর মানসিক শ্রমে দুইবার তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন। দুই বারই তাঁহার জীবন-সংশয় সমুপস্থিত হয়। কিন্তু তৎকর্ত্তৃক এক মহৎ কার্য্য

সংসাধিত হইবে, এই জন্য ভগবান তাঁহার প্রাণদান দেন।

বাচস্পতি মহাশয় ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে লিঙ্গানুশাসন নামক এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রিত করেন। যে বৎসর আমাদিগের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ডিউক অব্ এডিনবরা কলিকাতায় আগমন করেন, সেই বৎসর বাচস্পতি মহাশয় "রাজপ্রশস্তি" নামে একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। তিনি ধাত্ত্বর্থা দ্বারা রাজপুত্রের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ হালদার।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতির আবেদন।

উগ্রক্ষত্রিয়পাঠকগণ, বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির" ৬ষ্ঠ অধিবেশনে * যে সকল মন্তব্য অবধারিত হয়, তন্মধ্যে একাদশ মন্তব্যে স্থিরীকৃত হয় যে, "মাননীয় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত এইচ্, এইচ্, রিস্‌লি সাহেব বাহাদুর যে জাতিমালা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাহাতে উগ্রক্ষত্রিয়-জাতি সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। উক্ত পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ কালে যাহাতে ঐ ভ্রম সংশোধিত হয়, সেজন্য সাহেব বাহাদুরের সংগৃহীত বিবরণের যথার্থ প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে অবগত করা নিতান্ত আবশ্যক। ঐ প্রতিবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ভার শ্রীযুক্ত হরিদাস সাঁই মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল।"

এতদনুসারে যে আবেদনপত্র প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহার সানুবাদ অনুলিপি প্রকাশিত হইল। ভরসা করি এই আবেদনের ফলাফল সত্বরেই সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব।

---

*এই অধিবেশনের মন্তব্যগুলি দ্বিতীয় খণ্ড প্রতিনিধির চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আবেদনপত্র।

To

THE HON'BL H. H. RISLEY
B. A. C.S., C.I.E., &c.
Secretary to the Government of Bengal
in the Revenue Department.

Sir,

We the undersigned members of the Ugra-Kshattriya-Samiti most respectfully beg leave to submit the following review of the account of our caste as embodied in the official edition of your "Tribes and Castes of Bengal" and hope you may be pleased to favour them with as much consideration as you may be able to afford in the varied business of your official life. It would not, we trust, be quite out of place to mention here that some time ago when the draft articles of the work under notice were circulated piecemeal, we had the honour to submit certain criticisms on this very subject; but to

our regret and disappointment, no notice seems to have been taken of them. As, however, a desire has been intimated in the preface to the edition under review, of supplying omissions and correcting mistakes, we venture again to submit our humble remarks and pray that you would, with your usual love for truth and the heavy responsibility of an ethnologist, take them into your earnest consideration and incorporate the results to which they would give rise, in the next edition.

To begin with the nomenclature assigned to the Urga-Kshattriyas. In all humility we beg to point out that as "Baman" is but a corruption of Brahman and "Kaiyath" of Kayastha so is the term "Aguri" a corruption of Ugra-Kshattriyas. It is the outsiders only who betake to these foul epithets when speaking contemptuously of a caste. The word "Aguri" is sometimes used colloquially for Ugra-Kshattriya and may therefore be set down in Italics by the side of the latter just in the same way in which the synonyms of other castes have been treated in the book; thus, Ugra-Kshattriya, *Aguri*.

2. Our second objection consists in the use of the word "cultivating" in reference to our caste. By "cultivating caste" we generally understand a caste the members of which are all ploughmen. It may be, as no doubt it is, that there are some among the Ugra-Kshattriyas who drive the plough with their own hands; but that can in no way, justify the inference that the whole caste is a cultivating one. In fact, the number of those among them who are mere cultivators of the soil would bear but a microscopic proportion to those who take to agriculture as a profession and so the word "cultivating" can hardly be applied to them. We would, in this place, humbly suggest the substitution of the word *agricultural* for cultivating in as much as the former is more extensive in its signification and may therefore comprehend the varied classes of the Ugra-Kshattriyas holding tenures, under-tenures, raiyati holding, &c.

3. In the next place, we beg leave to protest against the statement that "the Aguris are *popularly believed* to be the modern representatives of the Ugras or Ugra-Kshattriyas mentioned in Manu Chapter X-9." Here the words *popularly believed* are objectionable in so far as they would go to indicate that the belief is not founded upon any trustworthy authority. Of course, the corruptions and colloquialisms can have no place in books of authority and hence the difficulty of

identifying the "Aguris" with the Ugras of Manu. It is only the Sanskrit word-books or books of synonyms that may throw some light in this direction. We would therefore quote three most eminent authorities on the subject of synonyms in support of our contention :—

"শূদ্রা ক্ষত্রিয়য়োরুগ্রঃ"

অমরকোষ।

i.e. An Ugra is the offspring of a Kshattrya by a wife of the Sudra class.

Bharat Mallic the well known annotator of Amarkosh thus comments upon it :—

"অয়ং (উগ্রঃ) আঘরীতি প্রসিদ্ধঃ"

ভরত মল্লিক।

i.e. This caste is known as Aghori.

In *Sabdakalpadrum* we have it as follows :—

উগ্রঃ—"আগুরীতি প্রসিদ্ধঃ"

i.e. The Ugras or Ugra-Kshattriyas pass under the name of Aguris.

"আগুরীতি প্রসিদ্ধঃ"

বাচস্পত্য।

i.e. In colloquial language, they are called Aguris.

Now that the identity between the Ugras and Aguris has been established, it is to be hoped that the sentences in question will be so altered as to make it clear that we do really come from, and represent the Ugras of ancient times.

4. Our fourth objection is taken up with the English translation of verse 9 chapter X of Manu, as embodied in the article under notice. The *sloka* runs as follows :—

"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জ্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥"

And the translation given is :—

"From a Kshttriya by a Sudra girl is born a creature called an Ugra (cruel) which has a nature partaking both of Kshattriya and of Sudra and finds its pleasure in savage conduct."

But Kulluk Bhatta, the beet known commentator of Manu thus paraphrases the Sloka :—

"ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়ামূঢ়ায়াং ক্রূরচেষ্টঃ ক্রূরকর্ম্মতিশ্চ ক্ষত্রশূদ্রস্বভাব উগ্রাখ্যঃ পুত্রোজায়তে॥"

which when rendered into English stands thus :—

"From a Kshattriya, on a *wife* of the Sudra class springs a creature called Ugra with a nature partly warlike and partly servile, ferocious in his manners and cruel in his acts."

SIR WILLIAM JONES.

Now, the defects which have crept into the translation in question are :—

(1) The omission of the word wife after Sudra leaves room for doubt as to the legitimate birth of our great ancestor, whereas the insertion of it proves beyond doubt that the caste in question is the product of a regular wedlock.

(2) "Taking pleasure in savage conduct" is not the correct translation of the passage "ক্রূরাচারবিহারবান্।" The correct version of it, as Sir Willam Jones interprets, is "ferocious in manners and cruel in acts."

5. The fifth defect that calls for comments consists more in omission than in commission. In Chapter X of Manu, says the author, is laid down that to catch and kill the animals that live in holes, is the occupation of the Ugra-Kshattriyas. There are various kinds of animals that live in holes, but which of them are enjoined to be caught and killed by the Ugra-Kshattriyas, our learned author makes no attempt to determine.

To avoid misconception, however, we should like to quote the explanation given by Kulluk Bhatta upon this point :—

"ক্ষত্রাদীনাং বিলবাসি গোধাদি বন্ধনং।"

i.e., of the animals that live in holes, the *Godha* (a species of alligator) and a few others only are worth being caught and killed by the group of castes beginning with Kshattriys.

Thus it is seen that to catch and kill some specified classes of animals was, according to Manu, the occupation of the Ugra-Kshattriyas and that the catching and killing of those very animals was also the occupation of the Kshattriyas themselves. But this can not be the occupation of the Kshattriyas in the sense in which occupation is generally understood. This *sloka* is therefore to be construed not as implying the occupation of the Kshattriya and Ugra-Kshattriyas but as simply specifying certain classes of animals to be hunted by them.

Besides, Manu is not the only authority ; there are other law-givers such as Ushana, Gautam, Harit, &c., quotations from whose works bearing upon this point would have been as much decisive and authoritative as those from Manu. In a work like the one under notice, it was really disapointing to find only one authority quoted and that even in a mutilated state, and the rest overlooked. We may, however, be permitted to quote here a few of the passages from other works tauching upon this point :—

(*a*) দ্বিজাতি শুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্রকরণানাং।

কুল্লুকভট্টধৃত উশনঃ সংহিতা।

To serve the twiceborn, to superintend the paddy and other kinds of wealth, to attend the king (in times of war) and guard the forts and seraglio, are the various occupations of the Parasavs, Karans and Ugra-Kshattriyas.

" (*b*) উগ্রো যুদ্ধক্রিয়াবৃত্তিঃ"

হলায়ুধ।

i.e. Warfare is the occupation of e Ugra-Kshattriyas.

In Chapter X of Manu, we have e following :—

) ক্ষত্রিয়াঙ্শূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জ্জন্তু রুগ্রো নাম প্রজায়তে॥

which means,

"From a Kshattriya on a wife of he Sudra class springs a creature alled Ugra, with a nature partly warlike and partly servile, ferocious in his manners and cruel in his acts."

The above *sloka* is in itself sufficient to support the views we take in respect to the occupation of the Ugra-Kshattriyas. What other occupation than warfare may be characteristic, nay, possible for a man who is born with a warlike nature and is ferocious in manners and cruel in acts ?

6. The division of the caste into several sub-castes next comes in for consideration. The Ugra-Kshattriyas have erroneously been divided into seven sub-castes instead of two ; *viz.*, Jana and *Suta*. Burdwania, Kasipuria Bagha, &c., represent only the several sub-sections into which the Sutas are divided but are not sub-castes. It is therefore inconsistent with all rules for legitimate division to take them as cognate species with Jana and Suta. This is what is called a Cross-Division in logic and is just the same as the division of the human race into Frenchmen, Asiatics, Aryans and Non-Aryans.

In fact, Jana and Suta are the only two sub-castes into which the Ugra-Kshattriyas are divided. The latter, however, comprises within itself four different sections *viz.*, (1) Chagrami or Chagnaya, (2) Paschima Taraffi, (3) Kashipuri, and (4) Baragrami. These sub-sections, as is evident, derived their names from the locality they settled in and have very little difference from the main body of the Suta sub-caste as regards the observance of social rites and customs. But such is not the case with the Jana sub-caste. The difference existing between it and the Suta sub-caste is comparatively greater and intermarriage among these two, is strictly prohibited. The first *Sradh* is performed by the former on the twelvth, and by the latter on the 30th day after death. As is usual in such cases, each sub-caste may arrogate to itself some sort of undefined superiority but never is one heard "to taunt the other with being bastards." It is a statement altogether without foundation and quite undeserving of mention. It should be omitted.

7. The distinction of Kulin from Maulik forms the next subject of criticism. The writer distinguishes the former by the titles Kesh, Pai, Shyam

and Paul. But this is not a sufficient distinction; a man may belong to any of the said families and yet he may not be a Kulin. To be a Kulin, therefore, it is essentially necessary that one must belong to one or other of the above families and hold the title of Chaudhuri too.

8. Our eighth and last objection refers to the social status of the caste as mentioned in the book. We agree with the author in thinking that the social status of the Ugra-Kshattriyas, as of all other castes, varies in different places; but nowhere is it so miserably degraded as to be indentified with the hunting and fishing castes. As regards the existence of such a section of the Ugra Kshattryas in Eastern Bengal, we can only say that we are altogether ignorant of it. As far, however, as the position of the Ugra-Kshattriyas in Burdwan and Western Bengal is concerned, we beg leave emphatically to assert that they always take rank higher than the Naba-sakhas.

In conclusion, we beg to submit that the above observations have been made in all humility and earnestness, and that special care has been taken to render the same faithful and of a representative character. Under the circumstances we beg leave to express a hope that our humble remarks and suggestions will be taken into your favourable consideration and alterations made in accordance therewith in the account of our caste, when the book goes to the press for the next edition.

We have the honour to be
Sir,
Your most obedient Servants,

Nikunja Behari Chaudhuri.
President, Ugra-Kshattriya-Samiti.

Pratab Chandra Roy, C. I. E.
Nrisingha Murari Panja, B. A.
Kalidas Chaudhuri.
Kumud Behari Samanta.
Binod Behari Chaudhuri.
Benawari Lal Hati, B. L.
Hem Chandra Chaudhuri, L. M. S.
Haradhan Ta.
Bijoy Narain Kundu.
Haridas Sai.
Nibaran Chandra Hui, B. L.
Radha Gobind Chaudhuri, M. B.
Gosta Behari Kundu.
Rajani Kanta Konar, B. L.
Srishchandra Ta.
Editor, Ugra-Kshattriya-Pratinidhi

অনুবাদ।

মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত এইচ্ এইচ্ রিস্‌লি, বি, এ; সি, এস; সি, আই, ই। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগীয় সেক্রেটারী মহোদয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আমরা উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতির নিম্ন-স্বাক্ষরিত

সভ্যগণ যথাবিহিত সম্মান সহকারে ভবদীয় সমীপে জাতিমালা (ট্রাইবস্ এণ্ড কাস্‌টস্ অব বেঙ্গল) নামক গ্রন্থের সরকারী সংস্করণে উগ্রক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ বিবরণের নিম্নলিখিত সমালোচনা ভবৎ সমীপে প্রেরণ করিতেছি। ভরসা করি, আপনি আপনার রাজকীয় কার্য্যময় জীবনের বিবিধ কার্য্যের মধ্যে যে পরিমাণ সুবিবেচনার সহিত উহা সমালোচনা করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। বোধ হয়, এখানে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, কিছুকাল পূর্ব্বে যখন উল্লিখিত গ্রন্থের খস্‌ড়া প্রবন্ধ সকল খণ্ডাকারে প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা তখন ঠিক এই সকল বিষয়ের এই সমালোচনা করিয়া মহাশয়ের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের পক্ষে বড়ই অনুতাপ ও নৈরাশ্যের বিষয় এই যে, সে সকল প্রতিবাদের কোন তথ্য লওয়া হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক এক্ষণে সমালোচ্য গ্রন্থের মুখবন্ধে, "যে সকল বিষয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই এবং সন্নিবিষ্ট বিষয় মধ্যে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী সংস্করণে গৃহীত ও সংশোধিত হইবে", এইরূপ একটী ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে দর্শন করিয়া আমরা পুনরায় আমাদের এই ক্ষুদ্র মন্তব্যগুলি ভবৎ সন্নিধানে প্রেরণ করিয়া, প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আপনার স্বভাবসিদ্ধ সত্যপ্রিয়তা গুণে এবং জাতীয়তত্ত্ব-সংগ্রাহকের গুরুতর দায়িত্ব স্মরণ করিয়া আমাদের এই প্রস্তাবগুলি সুবিবেচনার সহিত পরিগ্রহ করত পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থভুক্ত করিবেন।

গ্রন্থে উগ্রক্ষত্রিয়দিগকে যে নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাই আমাদের প্রথম আপত্তির কারণ। আমরা সম্পূর্ণ বিনীতভাবে নিবেদন করিতে চাহি যে, 'বামুন' যেমন ব্রাহ্মণের, 'কায়েত' যেমন কায়স্থের অপভ্রংশ, "আগুরী"ও তেমনি উগ্রক্ষত্রিয়ের অপভ্রংশ মাত্র। কোন জাতির কথা লইয়া ঘৃণা বা তাচ্ছল্য প্রকাশ করিবার সময়, অপর জাতিরা এই সকল অপভ্রষ্ট শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। কখন কখন চলিত ভাষায় উগ্রক্ষত্রিয়ের পরিবর্ত্তে "আগুরি" শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেই জন্য এই শব্দটীকেও অন্যান্য জাতির প্রতিবাক্যের ন্যায় ইটালিক অক্ষরে উগ্রক্ষত্রিয়ের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে; যথা, উগ্রক্ষত্রিয়, আগুরী।

২। আমাদের জাতির প্রতি "কাল্‌টিভেটিং" অর্থাৎ "চাসা" শব্দ প্রয়োগ করায় আমাদের দ্বিতীয় আপত্তির কারণ হইয়াছে। "কাল্‌টিভেটিং কাস্‌ট" বলিলে আমরা সচরাচর সেই জাতিকেই বুঝি, যে জাতি স্বহস্তে হল চালনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হইতে পারে, সুধু হইতে পারে কেন, নিশ্চয়ই, উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কতকগুলি হলাকর্ষক আছে; কিন্তু তা বলিয়া সমগ্র জাতিকে চাসা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কোন প্রকারে ন্যায়ানুমোদিত নহে। বস্তুতঃ এই জাতির মধ্যে কৃষি ব্যবসায়ীর অনুপাতে কর্ষকের সংখ্যা এতই বিরল যে, ইহাদের সম্বন্ধে "কাল্‌টিভেটিং" শব্দটী ব্যবহার করিলে কষ্টপ্রয়োগ হইয়া দাঁড়ায়। সে জন্য এস্থলে আমাদের বিনীত নিবেদন যে, "কাল্‌টিভেটিং" শব্দের স্থলে "এ্যাগ্‌রিকালচারেল" অর্থাৎ "কৃষিব্যবসায়ী" শব্দটী ব্যবহার করিতে আদেশ হয়। কেননা, শেষোক্ত শব্দের অর্থ অপেক্ষাকৃত ব্যাপক; তদ্দ্বারা জোদ্দার, কোরফাদার, রায়ত প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর জোত জমাওয়ালা ব্যক্তি ও কৃষিব্যবসায়ীকে বুঝাইতে পারে।

৩। "মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে যে উগ্রজাতির উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান সময়ের আগুরিরা তাহাদের বংশধর বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস"। সাহেব মহোদয়ের এই কথা আপত্তিজনক। ইহারই প্রতিবাদ আমাদের তৃতীয় আপত্তির মূল। "সাধারণ লোকের বিশ্বাস" বলিলে স্বতঃই বিশ্বাসযোগ্য বা প্রকৃষ্ট প্রমাণের অভাব অনুসূচিত হয়। প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রে বা প্রামাণিক গ্রন্থে অপভ্রংশ এবং চলিত কথার ব্যবহার না থাকায় মনুসংহিতার 'উগ্র'দিগের সহিত এখনকার আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয়দিগের একতা নির্দ্ধারণ একটু শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন সংস্কৃত অভিধানই কেবল এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোক প্রদান করিতে পারে। তজ্জন্য আমরা স্বপক্ষ সমর্থন হেতু তিন খানি সর্ব্বপ্রধান অভিধান হইতে বচন উদ্ধৃত করিব ;—

"শূদ্রা ক্ষত্রিয়য়োরুগ্রঃ"

অমরকোষ।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ঔরষে শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত যে পুত্র, তাহার নাম উগ্র।

অমরকোষের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ভরত মল্লিক এ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন :--

"অয়ং (উগ্রঃ) আম্বরীতি প্রসিদ্ধঃ"

ভরত মল্লিক।

অর্থাৎ ইহারাই আম্বরী বলিয়া পরিচিত।

শব্দকল্পদ্রুমে ইহা এইরূপ আছে ;—

উগ্রঃ—"আগুরীতি প্রসিদ্ধঃ"

অর্থাৎ উগ্র বা উগ্রক্ষত্রিয়েরাই আগুরী নামে খ্যাত।

বাচস্পত্যভিধানেও এইরূপ লিখিত আছে ;—

"আগুরীতি প্রসিদ্ধঃ"

বাচস্পত্য।

অর্থাৎ ইহাদিগকে আগুরী বলে।

এক্ষণে যখন সপ্রমাণ হইল যে, উগ্র এবং আগুরী একই জাতি তখন আশা করা যাইতে পারে যে, উপরোদ্ধৃত বাক্যটী এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে যাহাতে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, প্রকৃতপক্ষে আমরাই এক্ষণে প্রাচীন উগ্রজাতির বংশধর।

৪। আমাদের চতুর্থ আপত্তি মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকের ইংরাজী অনুবাদ লইয়া। শ্লোকটী এই ;—

"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জ্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥"

ইহার অনুবাদ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে ;—

শূদ্র বালিকার গর্ভে উৎপন্ন, ক্ষত্রিয়ের যে পুত্র, তাহাকেই উগ্র (ক্রূর) বলে ; ইহার স্বভাব ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র ভাবাক্রান্ত এবং যে অসভ্য নিষ্ঠুর আচরণে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করে।

কিন্তু মনুসংহিতার সুপ্রসিদ্ধ এবং প্রধান টীকাকার কুল্লূকভট্ট এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন ;—

"ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়ামুগ্রায়াং ক্রূরচেষ্টঃ ক্রূরকর্ম্মরতিশ্চ ক্ষত্রশূদ্রস্বভাব উগ্রাখ্যঃ পুত্রোজায়তে"

ইহার অর্থ এই,--পরিণীতা শূদ্রকন্যার গর্ভে উৎপন্ন, ক্ষত্রিয়ের যে ক্রূরকর্ম্মা এবং দুর্দ্দান্ত স্বভাববিশিষ্ট পুত্র, সেই উগ্রক্ষত্রিয়। তাহার স্বভাবে ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রের লক্ষণ যুগপৎ পরিলক্ষিত হয়। *

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদের আলোচ্য অনুবাদে কি কি দোষ প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, "পরিণীতা" শব্দের

* ইহা বলা আবশ্যক যে, মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম জোনস্ও উক্ত শ্লোকের এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

অভাবে আমাদের মহৎ আদিপুরুষের বৈধ জন্মে সন্দেহ আইসে ; কিন্তু উক্ত শব্দের ব্যবহারে আর সেরূপ কোন সন্দেহ আসিতে পারে না, এবং উগ্রক্ষত্রিয় জাতি যে যথারীতি পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভোৎপন্ন তাহা প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ "ক্রূরাচারবিহারবান্" বাক্যের অর্থে "অসভ্য নিষ্ঠুর আচরণে পরিতুষ্ট" এরূপ বুঝায় না। ইহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে (যেমন সার উইলিয়ম জোনস্ বলিয়াছেন) "ক্রূরকর্ম্মা এবং দুর্দ্দান্ত স্বভাববিশিষ্ট।

৫। কৃতদোষ অপেক্ষা প্রকৃত বিষয়ের অপহ্নবই এবার আমাদের আলোচনার বিষয়। গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, 'মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, বিলবাসী জন্তুদিগের বধ বন্ধনই উগ্রক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তি।' বিলে নানা প্রকার জন্তুই বাস করিয়া থাকে, তন্মধ্যে কোনগুলি উগ্রক্ষত্রিয়দিগের বধ্য এবং ধর্ত্তব্য তদ্বিষয় মীমাংসা করিতে আমাদের সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার কোনই প্রয়াস পান নাই। যাহা হউক এতৎসম্বন্ধে যাহাতে আর ভ্রম প্রমাদ না ঘটে, তজ্জন্য আমরা কুল্লূকভট্টকৃত টীকা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতে বাসনা করি।

"ক্ষত্রাদীনাং বিলবাসি গোধাদি বন্ধনং।"

অর্থাৎ বিলবাসী জন্তুদিগের মধ্যে গোধা প্রভৃতি কয়েকটী জন্তুই ক্ষত্রিয়াদি জাতির বধবন্ধনের উপযুক্ত।

তবেই দৃষ্ট হইতেছে যে,মনুর মতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট জন্তুর বধবন্ধনই উগ্রক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তি ; এবং ঠিক সেই সেই জন্তুর বধবন্ধন ক্ষত্রিয়দিগেরও অন্যতম বৃত্তি। কিন্তু বৃত্তি শব্দ সাধারণতঃ যে অর্থে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, সে অর্থে গোধাদির বধবন্ধন ক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তি হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই শ্লোক ক্ষত্রিয় বা উগ্রক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তি নির্দ্দেশক নহে, কেবল তাহাদের মৃগয়ার উপযোগী কতকগুলি জন্তু নির্দ্দেশ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

আবার, মনুই একমাত্র শাস্ত্রকর্ত্তা নহেন ; তদ্ব্যতীত উশনা, গৌতম, হারিত প্রভৃতিও অনেকানেক সংহিতাকার রহিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ে মনুর বচন যেরূপ প্রামাণিক, তাঁহাদের বচনও সেইরূপ প্রামাণিক। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থের ন্যায় একখানি গ্রন্থে অপরাপর শাস্ত্রকারদিগের মত উপেক্ষিত হইয়া কেবলমাত্র একজন শাস্ত্রকর্ত্তার মত উদ্ধৃত এবং তাহাও আবার বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। যাহাহউক এতৎসম্বন্ধে আমরা অপরাপর গ্রন্থ হইতে গুটী কয়েক বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিতে চাহি।

(a) দ্বিজাতি শুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা
দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্রকরণানাং।

কুল্লূকভট্টধৃত উশনঃ সংহিতা।

"দ্বিজাতিশুশ্রূষা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা রাজসেবা (যুদ্ধকালে) ও দুর্গ এবং অন্তঃপুরাদি রক্ষাই পারশব, উগ্র এবং করণ জাতির বৃত্তি।

"(b) উগ্রো যুদ্ধক্রিয়াবৃত্তিঃ"

হলায়ুধ।

"যুদ্ধই উগ্রক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তি"।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে ;—

(c) ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জ্জন্তু রুগ্রো নাম প্রজায়তে।

অর্থাৎ পরিণীতা শূদ্রকন্যার গর্ভে উৎপন্ন, ক্ষত্রিয়ের যে ক্রূরকর্ম্মা এবং দুর্দ্দান্ত স্বভাব বিশিষ্ট পুত্র, সেই উগ্রক্ষত্রিয় ; তাহার স্বভাবে ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রের লক্ষণ যুগপৎ পরিলক্ষিত হয়।

উগ্রক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তি সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করিতেছি একমাত্র এই শ্লোকটীই তাহার যথেষ্ট প্রতিপোষক। ক্ষত্রপ্রকৃতির সহিত যাহার জন্ম, যে ক্রূরকর্ম্মা এবং দুর্দ্দান্ত স্বভাববিশিষ্ট, তাহার পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর কোন বৃত্তি স্বভাবসঙ্গত বা সম্ভবপর হইতে পারে কি?

৬। উগ্রক্ষত্রিয়দিগের শ্রেণীবিভাগই অতঃপর আমাদের সমালোচনার বিষয়। ইহাদিগকে জানা এবং সুত এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ না করিয়া বর্দ্ধমানীয়, কাশীপুরী, বাঘা প্রভৃতি সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বর্দ্ধমানীয়, কাশীপুরী, বাঘা প্রভৃতি শব্দগুলি উগ্রক্ষত্রিয়ের শ্রেণীবাচক নহে; এ গুলি সুতশ্রেণীর থাক বিশেষ মাত্র। অতএব জানা এবং সুত শ্রেণীর সহিত উপরোক্ত থাক কয়েকটীকে এক পর্য্যায়ে বিভাগ করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং ন্যায়বিরুদ্ধ। এরূপ বিভাগকে ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্রে "ক্রস্ ডিবিজন" অর্থাৎ মিশ্র বিভাগ কহে; এবং সমগ্র মানবজাতিকে ফরাসী, আসিয়াবাসী আর্য্য, অনার্য্য, এই শ্রেণী চতুষ্ঠয়ে বিভক্ত করা যেমন অসঙ্গত এবং ন্যায়-বিরুদ্ধ ইহাও তদ্রূপ। ফলতঃ জানা এবং সুত এই দুইমাত্র শ্রেণীতে উগ্রক্ষত্রিয় জাতি বিভক্ত। আবার শেষোক্ত সুতশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট চারিটি থাক আছে; যথা, (১) চাগ্রামী, (২) পশ্চিম তরফী, (৩) কাশীপুরী, এবং (৪) বারগ্রামী। বেশ বুঝা যায় যে, এই শ্রেণীচতুষ্টয় বাসস্থানের নামানুসারেই তাহাদের নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণ সুতশ্রেণীর সহিত ইঁহাদের বিশেষ কোন বিভেদ নাই। কিন্তু জানা শ্রেণীর সহিত এরূপ ভাব নহে; তাহাদের সহিত সুত শ্রেণীর যে পার্থক্য, তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মৃত্যুর পর দ্বাদশ দিবসে জানা শ্রেণী এবং ত্রিংশৎ দিবসে সুতশ্রেণী আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে পরস্পরের পক্ষে স্ব স্ব শ্রেণী সম্বন্ধে একপ্রকার অনির্ণীত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা স্বাভাবিক হইলেও, কখন শুনা যায় নাই যে, একজন অপরকে "বেশ্যাপুত্র" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। একথা সম্পূর্ণ অমূলক এবং উল্লেখের অযোগ্য। অতএব ইহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

৭। কুলীন মৌলিক বিচার আমাদের পরবর্ত্তী সমালোচনার বিষয়। গ্রন্থকার বলেন কেশ, পৈ, শ্যাম এবং পাল ইহারাই উগ্রক্ষত্রিয়-দিগের কুলীন। কিন্তু কুলীন মৌলিক ভেদের ইহা যথেষ্ট কারণ নহে। একজন লোক উপ-রোক্ত পরিবারান্তর্গত হইয়াও কুলীন না হইতে পারে। কুলীন হইতে হইলে পূর্ব্বোক্ত বংশের মধ্যে কোন এক বংশভুক্ত হইতে হইবেই, তা ছাড়া চৌধুরী উপাধি থাকা চাহি।

৮। আমাদের ৮ম এবং শেষ আপত্তি গ্রন্থোল্লিখিত সামাজিক পদমর্য্যাদা লইয়া। স্থানভেদে, অপরাপর জাতির ন্যায় উগ্রক্ষত্রিয়-দিগেরও যে সামাজিক পদমর্য্যাদাভেদ ঘটিবে, এ বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্তার সহিত আমাদের ঐকমত্য আছে। তা বলিয়া উগ্রক্ষত্রিয় জাতি, বোধ হয়, কোথায়ও এত শোচনীয় অবনতি প্রাপ্ত হয় নাই যে, ব্যাধ বা ধীবর জাতির তুল্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে উগ্রক্ষত্রিয়দিগের যে এরূপ একটী থাক আছে, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। যাহা হউক, বর্দ্ধমান এবং পশ্চিম বঙ্গে উগ্রক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ সামাজিক অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহারা যে চিরদিনই নবশায়কদের অপেক্ষা উচ্চতর আসনে প্রতি-ষ্ঠিত একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

উপসংহারে নিবেদন এই যে, উল্লিখিত মন্তব্য কয়েকটী সম্পূর্ণ বিনীতভাবে ও ব্যগ্রতা সহকারে ভবৎসমীপে প্রেরিত হইল। ইহা বলা বাহুল্য যে, উক্ত মন্তব্যগুলিকে উগ্রক্ষত্রিয় সাধারণের মতানুযায়ী এবং ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য করিতে সাধ্যমত চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী হয় নাই।

আপনার
একান্ত বশম্বদ সেবকবৃন্দ
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী
সভাপতি, উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতি।
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, সি, আই, ই।
শ্রীনৃসিংহমুরারি পাঁজা বি, এ।
শ্রীকালিদাস চৌধুরী।
শ্রীকুমুদ বিহারী সামন্ত।
শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী।
শ্রীবনয়ারিলাল হাটী বি, এল।
শ্রীহেমচন্দ্র চৌধুরী এল, এম, এস।
শ্রীহারাধন তা।
শ্রীবিজয়নারায়ণ কুণ্ডু।
শ্রীহরিদাস সাঁই।
শ্রীনিবারণ চন্দ্র হুই বি, এল্।
শ্রীরাধাগোবিন্দ চৌধুরী এম, বি।
শ্রীগোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু।
শ্রীরজনীকান্ত কোঙার বি, এল।
শ্রীশশিচন্দ্র তা।
সম্পাদক, উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

শ্রীহরিদাস সাঁই।

সহস্র উপদেশ অপেক্ষা একটী আদর্শ ভাল।

স্বর্গগত পরমপূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহ নামক গ্রন্থের এক স্থলে বড় আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন;— "ব্রাহ্মণজাতির কন্যাবিক্রয় ব্যবসায় অপেক্ষা কায়স্থজাতির পুত্রবিক্রয় ব্যবসায় আরও ভয়া-নক ব্যাপার। মধ্যবিধ এবং হীনাবস্থ কায়স্থ জাতির কন্যা হইলেই সর্ব্বনাশ। কন্যার যত বয়োবৃদ্ধি হয়, পিতার সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে। যার কন্যা তার সর্ব্বনাশ, যার পুত্র তার পৌষ মাস। বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে, পুত্রবান ব্যক্তি অলঙ্কার, দান সামগ্রী প্রভৃতি উপলক্ষে, পুত্রের এত মূল্য প্রার্থনা করেন, যে, মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়-স্থের পক্ষে, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট হয়। এ বিষয়ে, বরপক্ষ এরূপ নির্লজ্জ ও নৃশংস ব্যবহার করেন, যে তাঁহাদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে। কৌতুকের বিষয় এই, কন্যার বিবাহ দিবার সময় যাঁহারা শশব্যস্ত ও বিপদ-গ্রস্ত হয়েন; পুত্রের বিবাহ দিবার সময়, তাঁহা-দেরই আর এক প্রকার ভাবভঙ্গী হয়। এই রূপে কায়স্থেরা কন্যার বিবাহের সময়, মহা বিপদ, ও পুত্রের বিবাহের সময়, মহোৎসব, জ্ঞান করেন। পুত্রবিক্রয় ব্যবসায় যে অতি কুৎ-সিৎ কর্ম্ম, তাহা কায়স্থ মাত্রে স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু, আপন পুত্রের বিবাহের সময়, সে বোধও থাকেনা, সে বিবেচনা ও থাকেনা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাহারা নিজে সুশিক্ষিত ও পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতেছেন এ ব্যবসায়ে তাহারাই নিতান্ত নির্দ্দয় ও নিতান্ত নির্লজ্জ। যে বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য অনেক; যে তদপেক্ষা উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক; যাহারা তদপেক্ষাও অধিকবিদ্য হইয়াছে, তাহাদের সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করা, অনেকের পক্ষে অসংসাহসিক ব্যাপার। আর যদি তদু-

পরি ইষ্টক নির্ম্মিত বাসস্থান ও গ্রাসাচ্ছাদনের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশের ব্যাপার। বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন না হইলে তাদৃশস্থলে বিবাহের কথা উত্থাপনে অধিকার নাই। * * যদি বাজার এইরূপ থাকে, অথবা আরও গরম হইয়া উঠে, তাহা হইলে, মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থ পরিবারের অনেক কন্যাকে, ব্রাহ্মণ জাতির কুলীন কন্যার ন্যায়, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হইবেক"। বিদ্যাসাগর মহাশয় কায়স্থ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ সম্বন্ধে ঐ কথাগুলি ঠিক অক্ষরে অক্ষরে প্রযুক্ত হইতে পারে।

বংশমর্য্যাদা, পাশ্চাত্যশিক্ষা এবং ধনের তারতম্যানুসারে বরের "বাজারদর" সকল সমাজে নির্দ্ধারিত হইলেও, আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে ইহার বাড়াবাড়িটা কিছু অদ্ভুত গোছের হইয়া পড়িয়াছে। তবে অন্য সমাজ হইতে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে এই টুকু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় যে, উল্লিখিত গুণত্রয়ের কেবল মাত্র একটী দ্বারা এই সমাজে "বরবিক্রয়ের" বড় একটা সুবিধা নাই। যে বরে উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে একযোগে দুইটী সমাবিষ্ট, সে বরের পিতার বা অভিভাবকের একাদশে বৃহস্পতি—তাহার লাঙ্গুল সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতেও কর্ত্তিত হয় না। উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ মধ্যে এইরূপ "দ্বি-পদ"-বিশিষ্ট বরের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এক দিকে আশা ও আনন্দের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইলেও, অন্য দিকে নির্ধন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মর্ম্মবেদনাসূচক দীর্ঘ নিশ্বাসে সমাজ ধ্বংশের আশঙ্কায় সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের অন্তঃকরণ স্বতঃই বিচলিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা সহৃদয়ত্বের দাবী না রাখিলেও, ধনহীন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মুখমণ্ডলে মলিনতার জীবন্ত ছবি পরিদৃষ্টি ও মর্ম্মস্পর্শী কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া আমাদের পাষাণ হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হয়, শুষ্ক নেত্রেও অশ্রুকণা দেখা দেয়।

দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলিতে পারি না, সময়ে সময়ে আমাদিগকে কার্য্যানুরোধে সমাজ মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে হয়। সেই সুযোগে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় ঘটিয়া থাকে। সমাজ মধ্যে গতিবিধি করিতে হইলেই সামাজিক কথাবার্ত্তা লইয়া আলোচনা করিতে হয়। আর সমাজ মধ্যে বিচরণের আমাদের উহাই অন্যমত উদ্দেশ্য। সামাজিক বিষয় ঘটিত কথা বার্ত্তার মধ্যে "কন্যাদায়" ও "বরবিক্রয়ের" কথাটা আপনিই আসিয়া পড়ে। যে সময়ে যে রীতির জন্য সমাজকে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়, সে সময়ে সমাজে তাহাই সামাজিক চর্চ্চার প্রধানতম অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ মধ্যে যে আমাদিগকে যথা তথা এই অশান্তিদায়ক প্রসঙ্গের কথা, শ্রবণ করিতে হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

একদিকে অসঙ্গতি প্রযুক্ত সৎপাত্রক্রয়ে অক্ষমতা হেতু কন্যার মুনিবচনসম্মত এমন কি সম্মতিআইনবিহিত বিবাহকাল উত্তীর্ণ হওয়ায়, লোকলজ্জা ও ধর্ম্ম ভয়ে হতভাগ্য কন্যা কর্ত্তার বিষণ্ণ বদনে অবিরল "মধুসূদন" ধ্বনি এবং "বঙ্গে শিশুকালে "কন্যাবধপ্রথা" অথবা "বরবিক্রেতার" "দ্বীপনির্ব্বাসনবিধি" প্রচলন পক্ষে উদাসীন বলিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি অভিসম্পাৎ; অন্যদিকে ভাগক্রমে "বরের [illegible] প্রসন্ন মুখে বাবার ধন বা "বংশমর্য্যাদা" এবং বরের বিদ্যার পরিমাণানুযায়ী "দরদস্তুরের" কথা এবং দুর্ভাগ্য কন্যাজনয়িতাকে বিভীষিকা প্রদর্শনের নিমিত্ত উল্লাসজনিত

বিকট হাস্য! উভয় দিকে এই শোচনীয় ও বিভৎস দৃশ্য দর্শন করিয়া এমন কোন সমাজহিতৈষী আছেন, যাঁহার মনে অশান্তি ও অসন্তোষের উদ্রেক না হয়?

তার পর আবার অধিকতর বিড়ম্বনার বিষয় এই যে, যাঁহারা আমাদের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বিষয় অপরিজ্ঞাত—পদমর্য্যাদার বাহ্য আড়ম্বরে মোহিত—সেই সকল কন্যাদায়গ্রস্তদিগের মধ্যে অনেকেই আমাদিগকে সময়ে সময়ে স্বল্প দরে বরক্রয়ের ভারার্পণ করিয়া অতিশয় মর্ম্মবেদনা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি জানিতেন, স্বার্থান্ধ সমাজের অলব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকার দুর্ব্বল পরিচালকদিগের কথা সমাজে কতদূর সমাদরে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কি বড় আশা করিয়া আমাদের প্রতি এই দুষ্কর কার্য্যভার অর্পণ করিতেন? আর আমরা যদি আমাদের আশাভরসাস্থল শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্য হইতে অন্ততঃ একজনকেও অনুদারতা ও স্বার্থপরায়ণতার কঠোর হস্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়া কন্যাদায়গ্রস্তের বিপদমোচনে আদর্শ খাড়া করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও কি আমাদিগকে এইরূপ বিষন্নবদনে নিরাশ হৃদয়ে এই "বরবিক্রয়" রূপ পাপ প্রথা উন্মূলনের নিমিত্ত উত্তেজিত হইয়া লেখনী ধারণ করিতে হইত?

বরবিক্রয় প্রথার দৃঢ়বন্ধন শিথিল করিয়া সমাজকে কিঞ্চিৎ শান্তি প্রদান করিতে অনেকেই মৌখিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিবেশী উচ্চহারে স্বীয় পুত্রের দাম আদায় করিয়া লইলে, যাঁহাদিগকে এতদিন ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া [illegible] য়ের অপকৃষ্টতা প্রমাণ করিতে দেখিয়া আসিতেছিলাম, তাঁহারাই এখন কার্য্যকালে কন্যাকর্ত্তার অক্ষমতা-জনিত কাতরোক্তিকে শঠতা মনে করিয়া, স্বীয় উদারতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত, গৃহিণীর স্কন্ধে দোষার্পণ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রের দাম চড়াইয়া লইতে অণুমাত্র সঙ্কোচ করিতেছেন না। অন্যের কথা কি বলিব, যাঁহারা এতদিন ধরিয়া বরবিক্রয়ের বিরুদ্ধে বাক্‌যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহারা "বিবাহে পণ গ্রহণ বা পুত্রকন্যাবিক্রয়" প্রবন্ধের প্রুফ উদারভাবে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন, ভ্রান্তিমুগ্ধ আমরা যে সকল শিক্ষিত বন্ধুদিগের উপর এই অনুদার প্রথা উন্মূলনের সম্পূর্ণ আশা ভরসা করিয়াছিলাম; হায়! এখন কি না তাঁহারাই সময় ক্রমে কন্যাকর্ত্তাকে ঘোরতর বিপন্ন করিয়া উচ্চহারে বরবিক্রয় করিয়া লইতে কোনরূপ দ্বিধা বা মমতা প্রকাশ করিতেছেন না! এতদপেক্ষা অধিকতর দুঃখের ও নিরাশর বিষয় আর কি আছে?

উগ্রক্ষত্রিয়-সমাজের ভাব গতি পরিদর্শন করিয়া আমাদের যতদূর প্রতীতি জন্মিয়াছে, তাহাতে সমাজের নিকট কোনরূপ প্রতিকারের আশা নাই। ক্ষমতা না থাকা এবং ক্ষমতা সত্ত্বে তাহার পরিচালনা না করা, একই কথা। সমাজের ক্ষমতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু সমাজ কোনরূপ সাধু অনুষ্ঠানে স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে এতই উদাসীন ও অলস যে, সমাজের ক্ষমতা থাকা না থাকা তুল্যমূল্য হইয়াছে। হয় হুজুগের বশে, না হয় যশের প্রত্যাশায়, কিছুকাল পূর্ব্বে সমাজের মধ্যে কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বরবিক্রয় প্রথার দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিয়া সমাজকে কিঞ্চিৎ শান্তি প্রদান করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জনকয়েক স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি নাকি বাধা প্রদান করায়, তাঁহারা সে চেষ্টাকে ফলবতী করিতে পারেন নাই—এই তাঁহাদের কৈফিয়ৎ। আমরা কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া মনে করি না। কারণ মুষ্টিমেয়

প্রতিপক্ষদিগের পরিমাণ ও বিঘ্নকারিণী শক্তি, অনুকূল পক্ষদিগের সংখ্যা ও সমাজহিতসাধিনী ক্ষমতাপেক্ষা এতই স্বল্প ও দুর্ব্বল ছিল যে, অসংযত বিবাহব্যয়কে পরিমিত করণে অকৃতকার্য্যতা তাঁহাদের অসাধ্যের পরিবর্ত্তে ক্ষমতা প্রয়োগে ঔদাসীন্যই প্রকাশ করিয়াছে। উগ্রক্ষত্রিয়-সমাজ যখন চেষ্টা দ্বারা কুসংস্কারাবদ্ধ প্রবল-প্রতাপ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকৃত দুরপনেয় জাতীয় পরিবাদ ক্ষালনে সফলকাম হইবার আশা করিয়াছেন, তখন যত্ন করিলে, যে, এই সমাজপীড়ক বিধির বিপর্য্যয় করিতে পারেন না, এরূপ আমরা ভাবিতে পারি না। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ কোন সাধু অনুষ্ঠানে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অগ্রসর নহেন; সুতরাং সমাজের ক্ষমতা থাকিলেও তাহার উপর সমাজের কোনরূপ মঙ্গলাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সমাজের নিকট বিবাহব্যয়সঙ্কট প্রতিবিধানের কোন আশা নাই কেন? ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, সমাজ মধ্যে সহৃদয়তা নাই, কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় স্বার্থপরায়ণতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রবল স্বার্থপরায়ণতাই সদুদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাতক। সমাজ-শরীরকে আমরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখাইব, কোন্ শ্রেণীতে স্বার্থপরায়ণতা কিরূপ সূত্রে বিজড়িত হইয়া সাধু কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে।

সদ্‌বংশীয়, শিক্ষিত, ধনী ও সাধারণ এই চারিটী শ্রেণী লইয়াই সমাজশরীর গঠিত। সমাজে এ ছাড়া আর লোক নাই।

যাঁহারা পুরুষ পরম্পরাক্রমে সৎক্রিয়া, বিদ্যা ও সদাচার দ্বারা বংশগৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই সদ্‌বংশীয় বলিয়া খ্যাত; সমাজে তাঁহাদেরই বংশমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত। বংশমর্য্যাদা ব্যক্তি বিশেষকে প্রদত্ত ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বজনক উপহার নহে; বংশমর্য্যাদা সদ্‌বংশীয়ের গুণেরই অন্যতম পুরস্কার। যাঁহারা বংশমর্য্যাদাশালী উদারতা ও সদাচার তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম। এমন কি উদারতা ও সদাচারই সদ্‌বংশীয়ের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। যাহাতে উক্ত গুণদ্বয়ের অভাব দৃষ্ট হয়, অপরিচিতেরা তাহাকে নীচ বলিয়া মনে করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেশের গুণে কালমাহাত্ম্যে এখন আর উদারতা ও সদাচারের আবশ্যক করেনা, কেবল মাত্র জন্মগুণেই সদ্‌বংশীয় হওয়া যায়। এখন আর নীচতা ও কদাচার বংশমর্য্যাদার গৌরব হানী করিতে পারে না।

সদ্‌বংশে জন্ম ব্যতীত, সদ্‌বংশে আদান প্রদান দ্বারা সদ্‌বংশীয় হইবার আর একটী পথ বহুকাল হইতে সমাজে উন্মুক্ত হইয়াছে। সকলের ভাগ্যে সদ্‌বংশে জন্ম গ্রহণ ঘটিয়া উঠে না; তাই আজ্‌কাল আদান-প্রদানের সিড়ি ভাঙ্গিয়া সদ্‌বংশের উপর তালায় উঠিতে অনেকেই ব্যতিব্যস্ত। কারণ এ ছাড়া আর পথ নাই। কলিতে অসবর্ণ বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে গুণে সদ্‌বংশীয় হইবার পথও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি হাজার শিক্ষিত হওনা কেন, হাজার ধন সম্পদ অর্জ্জন করনা কেন, হইলই বা সদাচার সৎক্রিয়া উদারতা তোমার অঙ্গের ভূষণ, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে "অবিকৃত" "সদ্‌বংশে" জন্মগ্রহণ করিতে না পারিলে, যদি আদানপ্রদানের কণ্টকিত বর্ত্ম দিয়া "সদ্‌বংশীয়ের' সালোক্য লাভ করিতে না পারিলে, তবে তোমার "সদ্‌বংশীয়ের' সারূপ্য লাভেচ্ছা বিড়ম্বনা মাত্র। তবেই দেখা গেল, দ্বিবিধ কৃত্রিম উপায়ের প্রসাদে এখনকার অধিকাংশ সদ্‌বংশেরই অস্তিত্ব। এরূপ "সদ্‌বংশের' অধিকারী মহাশয়েরা যে কতদূর উদারপ্রকৃতি, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাদের উদারতা নাই, কিন্তু বংশমর্য্যাদাভিমান যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। এই মর্য্যাদাভিমানই তাঁহাদের প্রধানতম স্বার্থ। এই স্বার্থ পূরণের অন্য ক্ষেত্র নাই। তাঁহাদের মতে দুর্ভাগ্য কন্যাকর্ত্তা তাহাদের এ স্বার্থ পূরণ করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। কন্যাকর্ত্তা যদি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাঁহাদের স্বার্থ পূরণ না করিবেন, তবে তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা "সাচ্চা' কি "ঝুটা' তাহা পরীক্ষার ক্ষেত্র কোথায়? তাঁহারা কোন মতেই এ স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে রাজী নহেন। তবেই দেখা গেল, যাঁহারা 'বংশমর্য্যাদার' বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত, তাঁহাদের নিকট কোন আশা নাই। গুণশালী সদ্‌বংশীয়ের যে উদারতা তাহা তাঁহাদের নাই, কৃত্রিম "সদ্‌বংশীয়ের' যে অনুদারতা তাহা তাঁহাদের যথেষ্টই রহিয়াছে। তাঁহারা উদার নীতির ত্রিসীমানা মাড়াইতে রাজী নহেন।

তার পর শিক্ষিতের পালা। অনুদার নীতি ঘুচাইয়া উদার নীতির আবির্ভাব করাই শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্য। ন্যায়বুদ্ধি, পরোপকার, স্বার্থত্যাগ, সৌজন্য, সদাচার প্রভৃতিই শিক্ষার অঙ্গ। এই গুলির অধিকারী করে বলিয়াই শিক্ষার এত আদর, এই গুলির অধিকারী বলিয়াই শিক্ষিতের এত সম্মান। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে শিক্ষার লক্ষণ এখন অন্যরূপ। বাক্‌পটুতা, লিপিকুশলতা ও অর্থার্জ্জনক্ষমতাই এখন শিক্ষার উচ্চতম নিদর্শন। এই সকল নিদর্শন যাঁহাতে যে পরিমাণে বিদ্যমান, তিনি সেই পরিমাণে শিক্ষিত বা Educated. এডুকেটেড্‌দের মধ্যে সকলেই পেশাদার বা professional man। কেন না "প্রোফেসনের" নিমিত্তই দের Education.। কথা, মুদ্রিত কাগজ, হাতের লেখা ও বিলাতি ঔষধ বা জল এই চতুর্ব্বিধ জড় পদার্থ বিক্রয়ই Educated দিগের ব্যবসায় বা profession—কর্ত্তব্যকর্ম্ম বা duty। আইন ব্যবসায়ী ও শিক্ষকেরা কথা বেচিয়া খান, সম্পাদক ও গ্রন্থকারেরা মুদ্রিত কাগজ বিক্রয়ের আয়ে উদর পোষণ করেন, কেরাণীদের উপজীবিকা হাতের লেখা বেচা; ডাক্তার বাবুদের ব্যবসায় বারিবিক্রয়। একে ব্যবসায় স্বার্থমূলক, তাতে বিদ্বানদের বিদ্যাবিক্রয়ই যখন ব্যবসায়, আর ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যই যখন পয়সা, তখন বিনা পয়সায় তাঁহাদের নিকট কিছু প্রত্যাশা করা নেহাত আহাম্মুকি। শিক্ষিতদিগের নিকট যখন নিরাকার জড় পদার্থই অগ্নিমূল্য, তখন সাকার জড়চৈতন্যরূপী যে "বর", তাহা যে তাঁহারা কেন, কোন্ হিসাবে, বিনা পয়সায় বিক্রয় করিয়া এককালে এডুকেশন এবং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির মাহাত্ম্য নষ্ট করিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। দুর্ভাগ্য কন্যাকর্ত্তা! শিক্ষিতের নিকট তোমার কোন প্রত্যাশা নাই। কারণ তাঁহাদের শিক্ষাই স্বার্থমূলক।

ধনীরা সমাজের মধ্যে অধিকতর স্বার্থপর। ইঁহাদের মধ্যে পায়ের ঘাম মাথায় ফেলিয়া কেহই ধনোপার্জ্জন করেন নাই; অনেকেই পৈতৃক বা ভাগ্যলব্ধ ধনে ধনী হইয়াছেন। যাঁহারা ধনার্জ্জনের কষ্ট জানেন, তাঁহারা কষ্টার্জ্জিত ধনের ব্যয়ে কিরূপ ক্লেশ হয়, তাহাও জানেন। বলা বাহুল্য ভাগ্যফলে ধনী মহাশয়েরা এ কষ্টের ধার ধারেন না। তা যদি ধারিতেন, তবে কি সদসৎ জ্ঞান পরিশূন্য হইয়া কন্যাকর্ত্তার রক্ত আওটান পয়সার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিতেন? যেমন লোকে জল দিয়া কাণের জল বাহির করে, সেইরূপ ধনীরাও টাকা দেখাইয়া টাকা আদায় করিয়া থাকেন। অতএব ধনীর নিকটও কন্যাদায়গ্রস্তের কোন আশা নাই। ধনীরা "দাতা" বলিয়া ধনী নহেন; ধনের রক্ষক বলিয়া ধনী। ধনে ধন মিশাইতে তাঁহাদের আকিঞ্চনটা অধিক অধিক।

বাকী থাকে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ। তাঁহাদের নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই এবং কোন কার্য্য করিতে তাঁহাদের বড় একটা হাতও নাই। আবার যে টুকু আছে, তাঁহারা এমনি হতভম্ব যে,উপরিওয়ালাদের দেখাদেখি সেটুকু প্রসারণ করিতেও রাজী নহেন। তাঁহারা কেবলি কর্ত্তাদের অনুকরণকারী। নিজে কোন কাজ করিতে পারিবেন না; হুজুক তুলিয়া দাও, তাহাতে খুব যোগ দিতে পারিবেন। বাঙ্গালিবৃত্তিপরায়ণ অনুকারীদিগের নিকট, হুজুক ছাড়া আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

আমরা উপরে যে সমাজ-চিত্র অঙ্কিত করিলাম, তাহা কাল্পনিক নহে। পাঠক মাত্রেই একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমাদের কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন।

এইখানে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিলেই সমাজ চিত্র আরও পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে। কোন একজন ভদ্রসন্তান তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে, এক যোগে আশাতিরিক্ত অর্থ ও কুলকন্যা পরিত্যাগ করিয়া একটী বিপন্ন ভদ্রলোকের নিকট কিছু মাত্র গ্রহণ না করিয়াই তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বরকর্ত্তা অসঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না; এবং বাজারে বিক্রীত বর অপেক্ষা তদধিকৃত বরের যোগ্যতাও কোন অংশে ন্যূন ছিল না। তাঁহার বংশমর্য্যাদা, নাম গ্রাম, মানসম্ভ্রম, ক্রিয়াকরণ, আচার ব্যবহারও যে নিতান্ত কম ছিল, এমত নহে। পাঠক বলিতে পারেন, তবে তার বংশে কলঙ্ক ছিল। কন্যাকর্ত্তাও সম্ভ্রান্তবংশীয়, তিনি কলঙ্কিত বংশে কার্য্য করিবেন কেন? তাঁহার কোনই দোষ ছিল না, দোষের মধ্যে ছিল সদয় হৃদয়। আমরা বরকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন "পয়সা লইবার আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল না এমত নহে, তবে দেখিলাম কন্যাকর্ত্তা সম্ভ্রান্তবংশীয় আর মেয়েটী সুন্দরী কিন্তু তাঁহার অর্থবল কিছুমাত্র নাই, অথ বেচারা বয়স্থা কন্যাটী লইয়া বড়ই বিপন্ন হইয়াছেন। আমার নিকট যখন তিনি ভিক্ষা প্রার্থন করিলেন, তখন আমি একবার তাঁহার পদে আপনাকে স্থাপিত করিয়া ভাবিয়া লইলাম "ঐরূপ কন্যাদায়ে পড়িলে আমি কি করিতাম আমিও কি এইরূপ বিপন্ন হইয়া বরকর্ত্তা নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতাম না"? এই ভা মনে উদয় হওয়ায় আমি কন্যাকর্ত্তার নিকট পয়সা লইতে পারি নাই।" উদারচেতা সমাজে কয়জন আছেন? কি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার এই উদারতা নিমিত্ত সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে ছাড়েন নাই। অপরাধ— তিনি বিনা মূল্যে কেন বর বিক্রয় করিলেন এইত সমাজের নৈতিক অবস্থা।

শনিগ্রহের ন্যায় স্বার্থ যে সমাজের রন্ধ্রগ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আর কোন ভুল নাই এই স্বার্থরূপী শনি পরিত্যাগ করিয়া না গেলে সমাজদেহের আর মঙ্গল নাই। "রাধাও কি নাচিবে না, বার মণ তেলও কিছু পুড়িবে না"।

আমর, উন্মাদ হই নাই যে, আমরা এমন দুরাশা করিব, আজ হইতে স্বার্থত্যাগ করিয় "সদ্বংশীয়েরা বিনা পয়সায় কন্যাকর্ত্তার দা উদ্ধার করত সদ্বংশোচিত উদারতা প্রকাশ শিক্ষিতেরা বিনাপণে বরটীকে ছাড়িয়া দি শিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকুন, ধনীরা অ লোভ পরিত্যাগ করিয়া নির্ধন কন্যাকর্ত্তার দা উদ্ধার করিয়া দিউন, আর সাধারণ লো অনুকরণবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিজের বুঝম এক একটা সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। নাই করিলাম কিন্তু কথাটা তলাইয়া বুঝিবা

নিমিত্ত আমরা একবার সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারি না কি?

আমরা সদ্বংশীয়দিগকে তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছিনা। তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা মাৎসর্য্য, নীচতা ও স্বার্থ কর্ত্তৃক বিমিশ্রিত হওয়ায় বড় হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ঐ আবর্জ্জনা গুলাকে দূর করিতে বলিতেছি; ঐ ময়লামাটিগুলি পরিস্কার করিয়া তাহাতে আত্মসম্মান, উদারতা ও স্বার্থত্যাগের রং মাখাইতে বলিতেছি। তাহা হইলেই বংশমর্য্যাদা এখনকার ভাল। বংশমর্য্যাদা বংশতরুর শাখা। সে শাখা যদি শুষ্ক না হইয়া পত্রপুষ্পশালী হয়, তবেই বংশতরুটী মানায় নাকি? আমরা সেই মানান দেখতে চাই। যাহাতে ঐ তরুমূলে ক্লিষ্ট কন্যাদায়গ্রস্ত গিয়া দাঁড়াইয়া একটুকু শান্তি ভোগ করিতে পারে, আমরা তহাই দেখিয়া সদ্বংশীয়ের জয় ঘোষণা করিয়া সুখী হইতে চাই।

ভাই শিক্ষিতগণ! তোমরাই আমাদের আশা ভরসা। তোমরা আমাদের সমাজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া আমরা চরিতার্থ হইয়াছি। তোমাদের দোহাই দিয়াই অজানিত উগ্রক্ষত্রিয় জাতিয় পরিচয় সভ্যসমাজে প্রদান করিতে পারিতেছি। কিন্তু ভাই, তোমাদের সুকুমার দেহে স্বার্থব্যাধি বিজড়িত হইয়া তোমাদের সদাপ্রফুল্ল মুখখানিকে কিরূপ পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কি বিবেকদর্পণ দিয়া দেখিবার একবার অবসর লইবে না? উদারতা ও স্বার্থত্যাগের আপাততিক্ত বটিকা সেবন বিনা তোমাদের এই দুর্ [illegible] রোগের উপশম হইবে কি? তোমরা ভাই, স্বার্থপর [illegible] ও মৌখিকতারোগে আক্রান্ত হইয়া বড়ই খিটখিটে হইয়াছ। খিট্‌খিটে লোক সুস্থ ব্যক্তিকে সুচক্ষে দেখিতে পারে না। কন্যাকর্ত্তারা কন্যা দায়ে সদাই শুষ্কমুখ ভাবনা চিন্তায় কঙ্কালসার; তাহাদিগকে কথা কহিতে দেখিলেই তোমাদের খিট্‌খিটি বাড়ে? কিন্তু হায়। তাহারা এত দিন সকল যায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরাশহৃদয়ে বড় আশায় বুক বাঁধিয়া দুঃখ প্রতিকারের নিমিত্ত তোমাদের দারস্থ হইয়াছে। তোমরা কি না, তোমাদের রোগের ধর্ম্মে, তাহাদের সুখ দুঃখের কথা কিছু না শুনিয়াই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত! অন্যের এ ধর্ম্ম হইতে পারে; তোমরা শিক্ষিত, তোমারা মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বলকারী, তোমরা স্বজাতির আশাভরসাস্থল, তোমাদের এ ধর্ম্ম নহে। যে সক্ষম, সে তাহার কন্যারত্নের সহিত ধনরত্ন দিয়া তোমাদের পূজা করিবে বৈ কি; না করিলে তাহার অর্থের সার্থকতা কি? কিন্তু ভাই, যে ভাগ্যচক্রে পড়িয়া সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছে, সে যদি তার রূপলাবণ্যবতী কন্যাটীকে লইয়া তোমাদের পদতলে আসিয়া আত্মসমর্পণ করে, তবে তোমরা কোন ধর্ম্ম বলে তাহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করাইয়া তাহাকে পথের ফকির করিতে উদ্যত হইবে? তাই বলিতেছি, যদি শিক্ষার গৌরব রক্ষা করিতে চাহ, তবে মৌখিকতা পরিত্যাগ কর; কন্যাদায়গ্রস্তকে সত্য সত্যই অভয় প্রদান করিয়া সমাজে "আদর্শ" হও।

ধনিবৃন্দ! ছি! ছি! তোমরা কোন লজ্জায় ছেলের বিয়েয় পয়সা চাও? তোমরা আচার ও কন্যা বিচার করিয়া পুত্রের বিবাহ দিবে। কন্যাটী ও ঘর যদি মনোনীত হয়, তবে কন্যাকর্ত্তা অক্ষম হইলে, তাহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াও তাহার কন্যা গ্রহণ করত ধনের সার্থকতা ও নিজের মহত্ব প্রদর্শন করা তোমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমরা ভগবানের কৃপায় ভাগ্যবান, অতিথি সজ্জনের তোমরাই আশ্রয়,

কাঙ্গালের তোমরাই রক্ষাকর্ত্তা। তবে নির্ধন কন্যাকর্ত্তা তোমাদের দারস্থ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে অভিসম্পাৎ করিতে করিতে ফিরিয়া যাইবে কেন?

সাধারণকে কিছু বলিবার নাই। উল্লিখিত তিন শ্রেণী শোধিত হইলেই সাধারণ-সমাজ আপ্‌না আপ্‌নিই সংস্কৃত হইবে।

তাই বলিতেছি, হে বংশমর্য্যাদাশালিগণ! হে শিক্ষিতবর্গ! হে ধনিবৃন্দ! হে সাধারণ জন সকল! আপনারা একবার স্বার্থের চস্‌মা চক্ষু হইতে খুলিয়া ফেলিয়া স্বাভাবিক চক্ষে সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন দেখি, বরের বাজার ক্রমশঃ চড়িতে থাকায়, নির্ধন কন্যাদায়গ্রস্তদিগের অবস্থা দিন দিন কিরূপ দাঁড়াইতেছে? কন্যাদায়গ্রস্তদিগের দায়ের কথা আপনারা যে কখন স্মরণ করেন না, এমত নহে, কিন্তু সে দায়টা যখন আপনাদের স্কন্ধে গিয়া চাপে। বিবাহ ক্ষেত্রে যখন আপনারা স্বপক্ষ বা তৃতীয় পক্ষ, তখন আপনারা কন্যাপক্ষ সমর্থন করেন তা জানি; বিবাহ ব্যয়সংক্ষেপ করণে লম্বা চৌড়া উপদেশ দিয়া থাকেন তাহাও অনবগত নহি। কিন্তু আপনারা যখন বরপক্ষ, তখন আমরা আপনাদের নৃশংস ও নির্লজ্জ ব্যবহার দর্শন করিয়া বড় মর্ম্মাহত হই। এই নিমিত্ত আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, উপদেশে কার্য্য হইবে না। কারণ যাঁহারা উপদেষ্টা, দেখিতেছি, উপদেশের অবমাননা লঙ্ঘন করিতে তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রণী। সেই জন্য ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন, "Example is better than precepts. আমরাও বলি, "সহস্র উপদেশ অপেক্ষা একটী আদর্শ ভাল"।

বর্ণাশ্রম-বিবেক। (৬)

[শাস্ত্র-বিচার।]

(জনৈক পূজ্যপাদ পরমহংসের বিবৃতি।)

ব্রাহ্মণ—অনেক দিনের পর আজ সৌভাগ্য ক্রমে, হে গুরুদেব, আপনার সাক্ষাৎকার পাইয়া যে পরম পরিতোষ লাভ করিলাম, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিবার নয়। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিঠাকুরের চরণপ্রান্তে প্রণত হইয়া বহুবিধ স্তুতিবন্দনাদি করিয়া কহিলেন, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আপনার সঙ্গে যে প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতে আমার চিরপোষিত ভ্রমরাশি বিদূরিত হইয়াছে; আর ইহাও আমার অন্তরে স্পষ্ট প্রতীতি হইয়াছে যে, ঋকাদি বেদচতুষ্টয় মনুষ্য কর্ত্তৃকই সমদ্ভূত হইয়াছে। ইহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু হে গুরুদেব, তদবধি এক গুরুতর প্রশ্ন আমার অন্তরে উত্থিত হইয়াছে। সেই প্রশ্নের আজ আপনাকে সুমীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। দেব দেবতা কর্ত্তৃকই হউক, আর দৈত্য দানব কর্ত্তৃকই হউক, বা মহাত্মা মুনিগণ কর্ত্তৃকই হউক, সে সম্বন্ধে যে যেমন বুঝিতে পারে, বুঝুক, তাহাতে আমার আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তৎসমুদায়ে মানবের জীবন পবিত্র হইবার পক্ষে যে সব নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তত্তাবতের ফলাংশে আমার সমূহ সন্দেহ জন্মিয়াছে। সেই সংশয় আজ হে গুরুদেব, কৃপা করিয়া নিরসন করুন।

বৃহস্পতি ব্রাহ্মণের বিধিবাদ বিষয়ে

সন্দেহ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আজ অতি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ। আজ তোমাকে এবিষয়ে উপদেশ করিবার ছলে তোমার মত সংশয়াচ্ছন্ন ব্যক্তি সকলের উপকারার্থে যথাশাস্ত্র কর্ম্মভোগ ও অদৃষ্টবাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে সমাহিত-চিত্ত হইয়া আমার কথায় মনোযোগ প্রদান কর। কর্ম্মফল বিচারের পূর্ব্বে, প্রারম্ভেই কর্ম্ম মাহাত্ম্যবিষয়ক কয়েকটী প্রমাণ বাক্য দর্শাইতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মা যেন কর্ম্মবিনির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকে ভিক্ষার্জ্জনং কারিতঃ
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ
কর্ম্মণে॥

নমস্যামো দেবান্ননু হতবিধে স্তেঽপি বশগাঃ।
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥

আরও এক শ্লোক শুন—

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিবর্দ্ধতে।
সুখং দুঃখং ভয়ং লজ্জা কর্ম্মণা সফলং ভবেৎ॥

এইবারে বাজসনেয় সংহিতার উপনিষদ্ ঈশের শ্রুতি বলিতেছি, শ্রবণ কর—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়িনান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।

অর্থাৎ, যদি ইহলোকে শতবর্ষব্যাপী জীবন লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কেবল কর্ম্মকর অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কর। এইরূপ নিত্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন অনুষ্ঠানদ্বারা কর্ম্ম জন্য পাপ হইতে জীব নিস্তার পাইতে পারে। কিন্তু এই শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, যাবৎ আত্মপ্রত্যয় না হয়, তাবৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক না, আর জ্ঞানের পক্ষে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই।

পূর্ব্বমীমাংসার আচার্য্য জৈমিনি মুনি ঘোর কর্ম্মবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে কর্ম্মই ঈশ্বর, অর্থাৎ কর্ম্ম ভিন্ন সর্ব্বব্যাপী সুখ দুঃখাদির বিধাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। আর মন্ত্রময়ী দেবতা অর্থাৎ মানবের ন্যায় হস্তপদাদি বিশিষ্ট কোন দেবতা নাই; আর স্বর্গপ্রাপ্তিই মোক্ষ। মানবাত্মা যজ্ঞাদি দ্বারা দেবলোক পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বিদেহমুক্তি জৈমিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে জগতের কর্ত্তা, পাতা, সংহারকর্ত্তা কর্ম্ম ভিন্ন আর কেহ নাই। কর্ম্মই সুখ দুঃখাদির নিয়ন্তা। কর্ম্মের দ্বারাই দেবতা, মনুষ্য ভূত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ধনী ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা, সুরূপ, কুরূপ, সুবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, সুকর্ম্মা ও দুষ্কর্ম্মী ইত্যাদি সমস্তই উৎপন্ন হয়। যেরূপ বীজানুসারে বৃক্ষ বনস্পতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ উদ্ভিদ্ জন্মিতেছে, সেইরূপ কর্ম্মানুসারে দেহধারী আত্মাও নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে"।

ব্রা—এইখানে আপনাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি। শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম কত প্রকার?

বৃ—বেশ কথা, তবে শুন। ঈশ্বরবাদীদিগের মতে কর্ম্ম ত্রিবিধ—যথা, ১। সঞ্চিত; ২। প্রারব্ধ; ৩। ক্রিয়মান্।

ব্রা—এ সকলের প্রভেদ কি আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

বৃ—এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না। আমি সকল কথাই তোমার বোধগম্য করিয়া বলিব, সে পক্ষে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে। এখন তবে শুন—

প্রথম, সঞ্চিত কর্ম্ম। যেমন গৃহীদের গৃহে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের শস্যাদি সঞ্চিত থাকে, সেইরূপ আসৃষ্টি আজ পর্য্যন্ত যে যে কর্ম্ম ফলভোগ দ্বারা ক্ষয় হয় নাই, সেই সব কর্ম্ম সঞ্চিত।

দ্বিতীয়, প্রারব্ধ। যদ্দ্বারা এই বর্ত্তমান শরীর ইন্দ্রিয়াদির এবং সুখ দুঃখাদির সাক্ষাৎকার হইতেছে, তত্তাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম। দেহাবসান পর্য্যন্ত এই কর্ম্মের সীমা।

তৃতীয়, ক্রিয়মান্। যাহা এই শরীরে করিতেছি, তাহাই ক্রিয়মান্ কর্ম্ম। ইহ জন্মের ক্রিয়মান কর্ম্মরাশি পরজন্মে সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়।

ব্রা—আর কোনরূপ ভেদ আছে কি?

ব্র—আছে। ক্রিয়মান্ কর্ম্ম, কর্ত্তার অভিলাষ ভেদে অষ্টপ্রকার হয়। যথা - নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা, কাম্য, নিষিদ্ধ, নিষ্কাম ও ভ্রমজনিত।

ব্রা—এখন এ সকলের ব্যাখা করুন।

ব্র—তুমি ত আচ্ছা ব্রাহ্মণ! এ সকলের অর্থও তোমার জানা নাই। ভাগ্যক্রমেই এমন গুণধর শিষ্য পাইয়াছি! যাহা হউক, তবে ব্যাখ্যা শুন। তোমার উপকার হইবে আর সেই সঙ্গে তোমার মত আর দশ জনেরও উপকার হইবে। অগ্রে নিত্য কর্ম্মের লক্ষণ শুন। যে কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় হয় অর্থাৎ যে কর্ম্ম না করিলে পাপ উৎপন্ন হয়,তাহারই নাম নিত্য কর্ম্ম। বৈদিক পণ্ডিতেরা ত্রিকাল সন্ধ্যাকে নিত্যকর্ম্ম কহেন. কিন্তু দেখা যায়, পূরক, কুম্ভক, রেচক সময়ে সন্ধ্যাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের যেরূপ ধ্যান বিহিত আছে, তাহা বেদবিরুদ্ধ। কারণ বেদে ব্রহ্মাদি দেবতার কোন মূর্ত্তি কল্পনা নাই। পরন্তু ব্রহ্মাদি নাম সেই এক পরব্রহ্মেরই নাম। সন্ধ্যার অর্থ—প্রাণায়াম অর্থাৎ সন্ধ্যাকারীকে কোন নির্জ্জন দূরদেশে কোন পবিত্র জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া জলমৃত্তিকাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়া আসনোপবিষ্ট হইয়া প্রথম ষোড়শ মাত্রাতে পূরক, চৌষট্টি মাত্রাতে কুম্ভক ও বত্রিশ মাত্রাতে রেচক করিতে হইবেক। মাত্রা শব্দের অর্থ প্রণব উচ্চারণ কাল। এইরূপে এক প্রাণায়াম হয়। যদ্যপি প্রথম শিক্ষার্থির পক্ষে এতদূর পরিশ্রম করা দুষ্কর বোধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে এ বিষয়ে ক্রমশঃ পরিপক্ক করিতে হইবে। প্রাণায়ামের ফলশ্রুতি শুনিবে? শুন—

নিত্যমেব তু কুর্ব্বীত প্রাণায়ামান্ত ষোড়শান্।
অপি ভ্রূণহরং পাপং পুনন্ত্যহরহঃ দ্বিজঃ।

অর্থাৎ উক্ত সম্পূর্ণ প্রাণায়াম প্রতিদিন ষোড়শ বার করিতে পারিলে, ভ্রূণহত্যাদি মহাপাতক হইতে দ্বিজগণ অব্যাহতি পান। এই প্রাণায়ামের পর অর্থস্মরণ পূর্ব্বক গায়ত্রীর জপ করিবেক। ঠাকুর,তোমার ও তোমার বন্ধুদিগের হিতার্থে এইখানে বেদমাতা গায়ত্রী ও তদর্থ প্রকাশ করিতেছি, খুব মন দিয়া শুন—

ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

এখন অর্থ শুন।

ওঁ—ব্রহ্মবাচক শব্দ।

ভূর্ভুবস্বঃ—ব্যাহৃতিবাচক শব্দ। এই তিন ব্যাহৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন উপলক্ষক জানিবে।

অর্থাৎ ঐ ওঁকারবাচ্য ব্রহ্ম চতুর্দ্দশ লোকেই পরিপূর্ণরূপে স্থিতি করিতেছেন।

তৎ—তস্য (দেবস্য)। সেই দেবতার।

বরেণ্যং—সর্ব্বজনপূজনীয়ং। সকলের পূজনীয়।

ভর্গঃ—জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিশ্চ।

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বকালে ব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয়ে যত পদার্থ ছিল,তাঁহার ক্রিয়াশক্তি সৃষ্টিতত্তাবৎকে প্রকাশ করিল।

সৃষ্টি ভগৎপ্রসব কর্ত্তার।

ধীমহি—ধ্যান করি। কেন ধ্যান করি?

কারণ তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিচয়কে সর্ব্বদা ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষের দিকে প্রেরণ করিতেছেন।